হাদীস শরীফ
তৃতীয় খণ্ড
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

হাদীস শরীফ

(তৃতীয় খণ্ড)

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং-২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১২১৮৫০০০

প্রসঙ্গ-কথা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অবয়ব নির্মাণে হাদীস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। কুরআনী নির্দেশাবলীর মর্মার্থ অনুধাবন এবং বাস্তব জীবনে উহার যথার্থ অনুশীলনে হাদীসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। এ কারণেই যুগে-যুগে দেশে-দেশে হাদীসের সংকলন, অনুবাদ ও বিশ্লেষণের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সময়ের চাহিদা মোতাবেক হাদীসের বিন্যাস ও ভাষ্য রচনার দুরূহ কাজও অনেক মনীষী সম্পাদন করিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় হাদীসের কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ হইলেও উহার যুগোপযোগী বিন্যাস ও ভাষ্য রচনার কাজটি প্রায় উপেক্ষিতই ছিল দীর্ঘকাল যাবত। ফলে এতদাঞ্চলের সাধারণ দ্বীনদার লোকেরা এসব অনুবাদ পড়িয়া খুব বেশী উপকৃত হইতে পারিতেন না; উহা হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লাভও অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সৌভাগ্যক্রমে, একালের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) সুদীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বৎসরব্যাপী অশেষ সাধনা বলে 'হাদীস শরীফ' নামক গ্রন্থমালা প্রণয়ন করিয়া বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের দীর্ঘকালের এক বিরাট অভাব পূরণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে তিনি হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার হইতে অতি প্রয়োজনীয় হাদীসসমূহ চয়ন করিয়া একটি নির্দিষ্ট ধারাক্রম অনুসারে সাজাইয়া দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আগাগোড়াই তিনি ইসলামের মৌল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আধুনিক মন-মানসের চাহিদার প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ইহাতে সন্নিবিষ্ট হাদীসসমূহের তিনি শুধু প্রাঞ্জল অনুবাদ ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং ইহার আলোকে প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধানগুলিও অতি চমৎকারভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই দিক দিয়া তিনি একই সঙ্গে মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ—উভয়ের দায়িত্বই অতি নিপুণভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন।

'হাদীস শরীফ' নামক এই গ্রন্থমালার প্রণয়নের কাজ তিনি শুরু করিয়াছিলেন ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। ইহার প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে—আইয়ুব শাহীর কারাগারে তাঁহার অবস্থানকালে। আর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। অতঃপর বিগত দুই যুগে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা হইতে ইহার পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একইভাবে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডও প্রথমতঃ দুই ভাগে এবং পরে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা হইতে। এক্ষণে

'খায়রুন প্রকাশনী' গ্রন্থটির সকল খণ্ডের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং সে অনুসারে ইহার তৃতীয় খণ্ড পাঠকদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকার ইসলামের বুনিয়াদী বিষয় যথা নিয়ত, আকায়িদ, শিরক, তওহীদ, ঈমান, নবুয়্যাত, আখিরাত, তাকদীর, রিজিক, নাজাত, সুন্নাত, বিদয়াত, ইলম, আখলাক, ইসলাম, সংগঠন, জিহাদ, রাষ্ট্র, বিচার প্রভৃতি বিষয় এবং দ্বিতীয় ফরয আমল যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাকার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন, আর আলোচ্য তৃতীয় খণ্ডে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নানা মৌলিক বিষয়াদি আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে। তৃতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার শুধু পারিবারিক জীবনের উপর আলোকপাত করার পর চতুর্থ খণ্ডে সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়া আলোচনা শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি আর সে আলোচনা সমাপ্তি করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই চতুর্থ খণ্ডে ঐ অসমাপ্ত আলোচনা আমরা তৃতীয় খণ্ডেরই শেষে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি।

বর্তমানে কাগজ-কালির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির দরুণ মুদ্রণ ব্যয় বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশক গ্রন্থটির মূল্য যথাসম্ভব যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রন্থকারের এই দ্বীনি খিদমত কবুল করুন এবং তাহাকে জান্নাতুল ফিরদৌসে স্থান দিন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

সূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিবাহ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

(بخاری، مسلم، ابوداؤد، مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেনঃ হে যুবক দল। তোমাদের মধ্যে যে লোক স্ত্রী গ্রহণে সামর্থ্যবান, তাহার অবশ্যই বিবাহ করা কর্তব্য। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে নীচ ও নিয়ন্ত্রিত করিতে ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিতে অধিক সক্ষম। আর যে লোক তাহাতে সামর্থ্যবান নয়, তাহার উচিত রোযা রাখা। কেননা রোযা তাহার জন্য যৌন উত্তেজনা নিবারণকারী।

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দায়ূদ, মুসনাদে আহ্‌মাদ)

ব্যাখ্যা এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) একজন অতীব মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী। হাদীসটি যে সময়কার, তখন তিনি যুবক ছিলেন। যে যুব সমাজকে সম্বোধন করিয়া নবী করীম (স) কথাটি বলিয়াছিলেন, তিনি নিজে তখন সেই সমাজের মধ্যেই গণ্য হইতে ছিলেন এবং কথাটি বলার সময় তিনিও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই কারণেই তিনি বলিতে পারিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) 'আমাদিগকে' সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন'।

হাদীসটিতে নবী করীম (স) যুব সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বিবাহ করার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ইহার সার নির্যাস হইল, পৌরুষ সম্পন্ন ও স্ত্রী সঙ্গমে সামর্থ্যবান সকল ব্যক্তিকেই বিবাহ করিতে হইবে, স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইবে। বিবাহ করার জন্য যুবকদিগকে তাকিদ দেওয়ার তাৎপর্য সুস্পষ্ট ও সহজেই অনুধাবনীয়।

হাদীসে ব্যবহৃত اَلْبَاءَةُ শব্দটির দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি اَلْجِمَاعُ—স্ত্রী-সঙ্গম। অর্থাৎ যাহারাই স্ত্রী-সঙ্গমে সক্ষম, বিবাহ করা তাহাদেরই কর্তব্য। ইহার দ্বিতীয় অর্থ مُؤْنُ النِّكَاحِ বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহের সামর্থ্য। এই দৃষ্টিতে হাদীসটির বক্তব্য হইল, যে সব যুবক বিবাহের দায়িত্ব পালনে সমর্থ, স্ত্রী গ্রহণ, প্রতিপালন ও পরিপোষণের দায়িত্ব পালনে সক্ষম, তাহাদেরই বিবাহ করা উচিত। হাদীসের ভাষ্য হইতে স্পষ্ট মনে হয়, স্ত্রী সঙ্গমে অসমর্থ লোকদের জন্য এই হাদীস নহে। এই কাজে যাহারা দৈহিক ভাবে সক্ষম তাহাদের জন্যই এখানে কথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, তাহারা যদি বিবাহের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সম্পন্ন হয় এবং বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে, তবে তাহাদের বিবাহ করা উচিত। এই লোকদের অবিবাহিত থাকা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় ও সমর্থনযোগ্য নয়। তবে এই শ্রেণীর যুবকরা যদি বিবাহের দায়িত্ব পালনে আর্থিক দিক দিয়া অসমর্থ হয়, তবে তাহাদিগকে রোযা রাখিতে বলা

—২

হইয়াছে। কেননা দৈহিক দিক দিয়া সামর্থ্য ও আর্থিক কারণে অসামর্থ্য মানুষকে ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিতে ও অন্যায় অবৈধ পন্থায় যৌন উত্তেজনা প্রশমনে প্রবৃত্ত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু যদি কেহ স্ত্রী সঙ্গমেই অসমর্থ্য হয় এবং এই সামর্থ্যহীনতা বা অক্ষমতা হয় দৈহিক দিক দিয়া, তবে তাহার যেমন বিবাহের প্রয়োজন হয় না, তেমনি রোযা রখিয়া যৌন উত্তেজনা প্রশমনেরও কোন প্রশ্ন তাহার ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোক তো রোগী বিশেষ।

যৌন উত্তেজনা সম্পন্ন ও স্ত্রী সঙ্গমে সক্ষম যুবকদের পক্ষে বিবাহ করা ও স্ত্রী গ্রহণ যে কত প্রয়োজন এবং বিবাহ তাহাদের জন্য কতদূর কল্যাণকর, তাহা বুঝাইবার জন্য রাসূলে করীম (স) ইহার পরই বলিয়াছেনঃ "উহা দৃষ্টিকে নীচ ও নিয়ন্ত্রিত করিতে ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিতে অধিক সক্ষ— অধিক কার্যকর"। বস্তুত যৌন উত্তেজনা সম্পন্ন যুবকদের পক্ষে পরস্ত্রী দর্শন একটি মারাত্মক রোগ হইয়া দেখা দেয়। এই রোগ যাহার হয় তাহার কেবল মনই খারাপ হয় না, মগজও বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন ফুলে ফুলে রূপ সুধা পান ও যৌবন মধু আহরণের মাদকতা তাহাকে নেশাগ্রস্থ করিয়া চরম চারিত্রিক কলুষতার গভীর পংকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে। ইহা কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নহে। এই কারণেই নবী করীম (স) ইহার পরই বলিয়াছেন, 'বিবাহ লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণে অধিক সক্ষম—অধিক কার্যকর'। এই কথা কেবল পুরুষ যুবকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, স্ত্রী যুবতীদের অবস্থাও সম্পূর্ণ অভিন্ন। বস্তুত যৌবনকালীন সঙ্গম ইচ্ছা অত্যন্ত তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য হইয়া দেখা দিয়া থাকে। এই ইচ্ছার যথার্থ চরিতার্থতা ভিন্ন এই কাজ হইতে বিরত থাকা অসম্ভব। পুরুষ ও নারী উভয়ের পারস্পরিক লিঙ্গের সহিত দৈহিক মিলন সাধনেই ইহা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। এই রূপ অবস্থায় যে (পুরুষ) যুবকের স্ত্রী নাই এবং যে (স্ত্রী) যুবতীর স্বামী নাই, তাহার পক্ষে স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কষ্টকর ও দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় সংযমের বাঁধন কিছুটা শিথিল হইলে যুবকদের বেলায় পরস্ত্রী দর্শনের এবং যুবতীদের বেলায় ভিন্ন পুরুষ দর্শনের ঝোক ও প্রবণতা অপ্রতিরোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরস্ত্রী বা ভিন্ পুরুষ দর্শনের এই প্রবণতা একদিকে যেমন যৌন উত্তেজনার মাত্রা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তেমনি যৌন সঙ্গম অভিলাস মানুষকে ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থানের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। মানুষ নৈতিক চরিত্র হারাইয়া ফেলে। আর নৈতিক চরিত্রহীন মানুষ পশুরও অধম।

ঠিক এই কারণেই নবী করীম (স) এই ধরনের যুবক-যুবতীদিগকে বিবাহ করার—বিধিসম্মত পন্থায় যৌন স্পৃহা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করার—নির্দেশ দিয়াছেন। বিবাহ করিলে যৌন-উত্তেজনা ও সঙ্গম-স্পৃহার চরিতার্থতা বিবাহের নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ইহার ফলে যৌন-অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা পাইতে পারে।

দৃষ্টি শক্তিকে সংযত করা না হইলে ভিন্ন লিঙ্গের সহিত দৈহিক মিলন স্পৃহা অদম্য হইয়া উঠে। এই কারণে কুরআন মজীদেও এই ব্যাপারে বলিষ্ঠ নির্দেশ উদ্ধৃত হইয়াছে। পুরুষদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছেঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - (النور: ٣٠)

হে নবী। মু'মিন লোকদিগকে নিজেদের দৃষ্টি নীচ রাখিতে ও এই উপায়ে নিজেদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিতে বল। বস্তুত ইহা তাহাদের জন্য অতীব পবিত্রতাপূর্ণ পদ্ধতি। তাহারা যাহা কিছুই করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা যে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত তাহা নিঃসন্দেহ।

এর পর পরই নারীদের সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

এবং ঈমানদার মহিলাদের বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখে, তাহাদের লিঙ্গ স্থানের সংরক্ষণ করে এবং তাহাদের সৌন্দর্য ও অলংকার প্রকাশ হইতে না দেয়।

দৃষ্টি সংযত করণের এই নির্দেশ বস্তুত অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত। ইহা বিবাহিত ও অবিবাহিত সব যুবক-যুবতীর জন্য সমান ভাবে অনুসরণীয়। কেননা যে সব ইন্দ্রিয়ের কারণে মনে-মগজে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, দৃষ্টি শক্তি তন্মধ্যে প্রধান এবং অধিক তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী। হাতের স্পর্শ না হইলেও দৃষ্টির পরশ শানিত তীরের মত গভীর সূক্ষ্ম তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মনের বিভ্রান্তি ও জ্বেনা-ব্যভিচারের দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই দৃষ্টির সংযম ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। আর ইহারই জন্য বিবাহ একমাত্র উপায়। ইহাতে যেমন মনের স্থিতি ও এককেন্দ্রিকতা লাভ হয়, তেমনি সৌন্দর্য সন্ধানী ও রূপ পিয়াসী দৃষ্টিও নিজ স্ত্রীতে কেন্দ্রীভূত হয়। আলোচ্য হাদীসে বিবাহের এই তাকীদের মূলে এই যৌক্তিকতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায়, যে সমাজে প্রত্যেক যুবক যুবতী উপযুক্ত বয়সে বিবাহিত হয় বা উহার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে না, সেখানে সাধারণত জ্বেনা-ব্যভিচারের দুর্ঘটনা খুব কমই ঘটিতে পারে। কিন্তু যে সমাজে অধিক বয়স পর্যন্ত যুবক-যুবতীরা অবিবাহিত থাকে বা থাকিতে বাধ্য হয় সেখানে জ্বেনা-ব্যভিচারের সয়লাব প্রবাহিত হওয়া ও পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন কলুষিত হওয়া ও উহা মারাত্মক ভাবে বিপর্যস্ত হওয়া একান্তই অবধারিত।

যে সব যুবক-যুবতী যৌন চেতনা থাকা সত্ত্বেও বিবাহের দায়িত্ব পালন ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ তথা পরিবার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণে অসমর্থ, রাসূলে করীম (স) তাহাদিগকে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়াছেন। রোযা মানুষের মধ্যে নিহিত ষড়রিপু দমন করিয়া রাখে। যৌন উত্তেজনা বহুলাংশে অবদমিত থাকে। ফলে অবিবাহিত থাকার কুফল ও খারাপ পরিণতি হইতে রক্ষা পাওয়া অনেকটা সহজ হইয়া দাঁড়ায়।

এই হাদীসটি হইতে স্পষ্ট জানা গেল, রাসূলে করীম (স) যে ধরনের সমাজ গঠনের দায়িত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন ও যে উদ্দেশ্যে আজীবন চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন, তাহাতে পুরুষ ও নারীর বিবাহ বিমুখতা, বেশী বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার প্রবণতা বা অবিবাহিত রাখার প্রচেষ্টা এবং তদ্দরুন নারী পুরুষের যৌন মিলনজনিত চরিত্রহীনতার কোনই স্থান নাই।

বিবাহ নবীর সুন্নাত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ اِلٰى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْاَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّىْ اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ. (بخارى، مسلم)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন। একদিন তিন জন লোক নবী করীম (স)-এর বেগমগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নবী করীমের দিনরাতের ইবাদাত বন্দেগী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন ও জানিতে চাহিলেন। তাঁহাদিগকে যখন এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা জানানো হইল তখন তাঁহারা যেন উহাকে খুব কম ও সামান্য মনে করিলেন। পরে তাঁহারা বলিলেনঃ নবী করীম (স)-এর তুলনায় আমরা কোথায়? তাঁহার তো পূর্বের ও পরের সব গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের একজন বলিলেনঃ আমি তো চিরকাল সারা রাত্র জাগিয়া থাকিয়া নামায পড়িব। অপর একজন বলিলেনঃ আমি তো সমস্তকাল ধরিয়া রোযা রাখিব এবং কখনই রোযা ভাঙিব না। তৃতীয় একজন বলিলেনঃ আমি স্ত্রীলোকদের সহিত সম্পর্ক বর্জন করিব। অতঃপর আমি কখনই বিবাহ করিব না। এই সময় রাসূলে করীম (স) তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেনঃ তোমরাই তো এই সব কথা-বার্তা বলিয়াছ? কিন্তু আল্লাহ্‌র নামে শপথ! তোমাদের মধ্যে সকলের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলাকে আমি-ই অধিক ভয় করি। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তোমাদের তুলনায় আমি-ই অধিক তাকওয়া অবলম্বন করিয়া থাকি। অথচ তাহা সত্ত্বেও আমি রোযা থাকি, রোযা ভাঙিও। আমি রাত্রিকালে নামাযও পড়ি, আবার ঘুমাইও। আমি স্ত্রী গ্রহণও করি। (ইহাই আমার সুন্নাত) অতএব যে লোক আমার সুন্নাতের প্রতি অনীহা পোষণ করিবে, সে আমার সহিত সম্পর্কিত নয়। (বুখারী, মুসলিম)[১]

ব্যাখ্যা হাদীসটি বিবাহ পর্যায়ে উদ্ধৃত হইলেও ইসলাম যে একটি বাস্তববাদী পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তাহা ইহা হইতে সঠিক রূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নবী করীম (স)-এর জীবনাদর্শ ও অনুসৃত নীতির বাস্তব ভূমিকা ইহা হইতে স্পষ্ট ভাবে জানা যাইতেছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই ইসলাম।

১. এই হাদীসটিই 'হাদীস শরীফ' ১ম খণ্ডেও সম্পূর্ণ দ্বীনদারীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে সেই একই হাদীস ভিন্নতর দৃষ্টিকোণে উদ্ধৃত হইয়াছে ও উহার ব্যাখ্যাও ভিন্ন দৃষ্টিতে করা হইয়াছে।

মূল হাদীসে বলা হইয়াছেঃ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ কিন্তু মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এই স্থানের ভাষা হইলঃ اِنَّ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'রাসূলের সাহাবীদের মধ্য হইতে কয়েকজন লোক'।

رَهْطٌও نَفَرٌ শব্দদ্বয়ের ব্যবহারিক অর্থে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। رَهْطٌ শব্দটি তিন হইতে দশ সংখ্যক পর্যন্ত ব্যক্তিদের বুঝায়। আর نَفَرٌ শব্দটি বুঝায় তিন হইতে নয় জন লোক। মূলত শব্দ দুইটির তাৎপর্যে কোনই বিরোধ বা মৌলিক পার্থক্য নাই।

এই তিনজন লোক কাহারা ছিলেন? সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হইতে আবদুর রাজ্জাক উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে জানা যায়, এই তিনজন লোক ছিলেন (১) হযরত আলী (রা), (২) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আ'চ (রা) এবং (৩) হযরত উসমান ইবনে মযয়ূম (রা)।

এই তিনজন সাহাবী রাসূলে করীমের বেগমদের নিকট হইতে রাসূলে করীম (স)-এর দিন রাত্রির ইবাদাত-বন্দেগী সংক্রান্ত ব্যস্ততা সম্পর্কে সঠিক খবর জানিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইখানে মুসলিম শরীফের বর্ণনার ভাষা হইলঃ عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ রাসূলে করীম (স) গোপনে সকলের চোখের আড়ালে ও অজ্ঞাতে কি কি আমল করেন সেই বিষয়েই তাঁহারা জানিতে চাহিয়াছিলেন। কেননা তিনি প্রকাশ্যে যাহা যাহা করিতেন, তাহা তো এই সাহাবীগণের কিছুমাত্র অজানা ছিল না। নবী (স)-এর বেগমগণের নিকট হইতে তাঁহারা জিজ্ঞাসিত বিষয়ে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা খুব খুশী হইতে পারিলেন না। যাহা কিছু জানিতে পারিলেন, তাহা তাহাদের খুবই সামান্য ও নগণ্য মনে হইল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, নবী করীম (স) হয়ত দিন-রাত্রি ধরিয়া কেবল ইবাদাতই করেন। ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন কাজই তিনি করেন না। কিন্তু বেগমগণের কথায় তাঁহাদের সে ধারণা অমূলক প্রমাণিত হইল। কিন্তু নবী করীম (স) সম্পর্কে তাঁহারা অন্য কোন ধরনের ধারণা তো করিতে পারেন না, এই জন্য তাঁহারা নিজেরাই নিজদিগকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নবী করীম (স)-এর পূর্ব ও পরবর্তী কালের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার কথা স্মরণ করিলেন। এই প্রেক্ষিতে তাঁহারা মনে করিয়া লইলেন যে, এই কারণেই রাসূলে করীম (স) খুব বেশী ইবাদাত করেন না। কিন্তু আমরা তো আর তাঁহার মত নহি, আমাদের পূর্ব ও পরের গুনাহ তো মাফ হইয়া যায় নাই। কাজেই আমাদের অত কম ইবাদাত করিলে চলিবে না। রাসূলে করীমের সাথে আমাদের কি তুলনা হইতে পারে! অতঃপর এক একজন লোক যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা হাদীসের মূল বর্ণনাতেই উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] সম্ভবত এই সময় নবী করীম (স) ঘরের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সব কথা-বার্তা তিনি নিজ কানেই শুনিতে পাইয়াছিলেন।

এই পর্যায়ে মুসলিম শরীফের বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ قَالُوْا كَذَا....

সাহাবী তিনজনের উক্তরূপ কথা-বার্তার খবর নবী করীম (স)-এর নিকট পৌঁছিল। অতঃপর তিনি (এই প্রসঙ্গে লোকদের বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুরু করিলেন) প্রথমে আল্লাহ্‌র

১. তাঁহাদের বলা কথাগুলির বর্ণনায় বুখারী মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনার মধ্যে ভাষার পার্থক্য হইয়াছে। উপরে যে হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে উহা বুখারী শরীফ হইতে গৃহীত। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত তাঁহাদের কথা গুলি এইরূপঃ একজন বলিলেনঃ لَا اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ 'আমি স্ত্রী গ্রহণ করিব না বা বিবাহ করিব না'। অন্যজন বলিলেনঃ لَا اٰكُلُ اللَّحْمَ 'আমি গোশত খাইব না'। তৃতীয় জন বলিলেনঃ لَا اَنَامُ عَلٰى فِرَاشٍ 'আমি বিছানায় ঘুমাইব না'। এই শাব্দিক পার্থক্যের কারণ হইল, হাদীসের বর্ণনা সমূহ সাধারণতঃ ভাব ও মূল কথার বর্ণনা। মূল বক্তার ব্যবহৃত শব্দ ও ভাষার হুবহু উচ্চারণ নয় এবং উহা বিভিন্ন বর্ণনাসূত্রে পাওয়া গেছে। তাই এই পার্থক্য স্বাভাবিক।

হাম্‌দ ও সানা বলিলেন। পরে বলিলেনঃ লোকদের কি হইয়াছে, তাহারা এই ধরনের কথা-বার্তা বলিতে শুরু করিয়াছে......?

বস্তুত এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে মূলত কোনই বিরোধ বা পার্থক্য নাই। রাসূলে করীম (স)-এর ভাষণের প্রথমাংশে লোকদের এই ভুল ধারণা দূর করা হইয়াছে যে, 'যে লোক আল্লাহ্‌র নিকট মায়াফী পাইয়াছে তাহার অন্যান্যদের তুলনায় বেশী বেশী ইবাদাত করার প্রয়োজন নাই'। তিনি জানাইয়া দিলেন যে, রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সর্বকালের গুনাহ হইতে ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদাতের চরম ও কঠোর কৃচ্ছতা অবলম্বন করেন। কেননা তিনি অন্যদের অপেক্ষা আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করেন, অধিক তাকওয়া অবলম্বনকারী তিনি তাহাদের অপেক্ষাও, যাহারা ইবাদাতে খুব বেশী কঠোরতা ও কৃচ্ছতা করিয়া থাকে।

রাসূল (স)-এর কথাঃ 'অথচ তাহা সত্ত্বেও' ......এইস্থানে একটি অংশ উহ্য রহিয়াছে। তাহা হইলঃ

أَنَا وَأَنْتُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعُبُوْدِيَّةِ سَوَاءٌ لٰكِنَّ أَنَا أَصُوْمُ. الخ

বান্দাহ হওয়ার দিক দিয়া আমি ও তোমরা সম্পূর্ণ সমান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি........

মূল হাদীসের শেষ ভাগে রাসূলে করীম (স)-এর উক্তিঃ

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ طَرِيْقَتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ أَىْ لَيْسَ عَلٰى طَرِيْقَتِىْ.

যে লোক আমার কর্মপন্থা ও জীবন-পদ্ধতি হইতে বিমুখ হইবে—উহা গ্রহণ ও অনুসরণের পরিবর্তে অন্য নিয়ম ও পদ্ধতিতে কাজ করিবে, সে আমার সহিত সম্পর্কিত নয়—অর্থাৎ সে আমার কর্মপন্থার অনুসারী নয়, সে আমার অনুসৃত পথে চলছে না।

ইহার আরও অর্থ হইলঃ সে আমার নিকটবর্তী নয়।

এই পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটির ভাষা হইলঃ

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ. (ابن ماجه)

বিবাহ আমার সুন্নাত—নীতি-আদর্শ ও জীবন-পদ্ধতি। যে লোক আমার এই নীতি-আদর্শ ও জীবন-পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করিবে না—ইহাকে কাজে পরিণত করিবে না, সে আমার নীতি ও আদর্শানুসারী নয়।

(এই হাদীসটির সনদে ঈসা ইবনে মায়মূন একজন যয়ীফ বর্ণনাকারী)

মুসনাদে দারীমী গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে এই ভাষায়ঃ

مَنْ قَدَرَ عَلَى النِّكَاحِ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا. (كتاب النكاح : باب الحث على التزويج)

যে লোক বিবাহ করার সামর্থ রাখে সে যদি বিবাহ না করে, তাহা হইলে সে আমাদের মধ্যের নয়।

আলোচ্য হাদীস হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, নিয়মিত নামায পড়া ও নিদ্রা যাওয়া, নফল রোযা রাখা—না-ও রাখা এবং বিবাহ করা—অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র হক আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ও সমাজের হকও আদায় করা, এক কথায় আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের ভিত্তিতে দুনিয়ার সমস্ত কাজ করা, পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করাই হইতেছে রাসূলে করীম (স)-এর আদর্শ ও জীবন পদ্ধতি। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র ধর্মপালনকারী হওয়া ও দুনিয়ার দাবি-দাওয়া ও দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করা, অথবা কেবল মাত্র দুনিয়াদারী করা ও দ্বীনী দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা রাসূলে করীম (স)-এর কর্মপন্থা ও জীবন পদ্ধতি নয়। রাসূলে করীম (স)-এর উপস্থাপিত জীবন-পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক। তাহা একদেশদর্শী নয়। এই হিসাবে বিবাহও—দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন যাপনও নবী করীম (স)-এর সুন্নাত। ইহা এই জীবন-পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, রাসূলে করীম (স)-এর উপস্থাপিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি।

মুহাল্লাব বলিয়াছেন, বিবাহ ইসলাম প্রবর্তিত কর্মপদ্ধতির একটি। ইসলামে 'রাহ্‌বানিয়াত'—বিবাহ না করিয়া চিরকুমার হইয়া থাকা—মাত্রই সমর্থিত নয়। যে লোক বিবাহ করিবে না, রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাতের বিপরীত পথে চলিবে, সে ঘৃণ্য বিদয়াতপন্থী। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে নবী-রাসূলগণের জীবন-আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য স্পষ্ট অকাট্য নির্দেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (الانعام: ٩٠) 'অতএব তোমরা নবী-রাসূলগণের হেদায়েত-বিধান অনুসরণ করিয়া চল।'

দায়ূদ যাহেরী ও তাঁহার অনুসারী ফিকাহ্‌বিদগণ মনে করিয়াছেন, বিবাহ করা ওয়াজিব। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে বিবাহ করা কর্তব্য। ইমাম আবূ হানীফা (র) মত দিয়াছেন, আর্থিক দৈন্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করা সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা কবে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসিবে সে জন্য অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবশিষ্ট অংশে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিবাহ না করা, চিরকুমার হইয়া থাকা পুরুষ ও মেয়ে লোক উভয়ের পক্ষেই ইসলামী শরীয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ। যথা সময়ে বিবাহ করা উভয়ের পক্ষেরই কর্তব্য। ইহা কেবল নৈতিকতার সার্বিক সংরক্ষকই নয়, জৈবিক ও দৈহিক দাবিও। আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রাসূলগণ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনই যাপন করিয়াছেন। কুরআন মজীদে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছেঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً (الرعد: ٣٨)

আর আমরা তোমার পূর্বে বহু নবী-রাসূল পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের জন্য আমরা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বানাইয়া দিয়াছি।

অর্থাৎ বিবাহ, পারিবারিক জীবন যাপন ও সন্তান জন্মদান নবী-রাসূলগণের জীবন-পদ্ধতি। আর তাঁহারাই হইতেছেন দুনিয়ার সমগ্র মানুষের আদর্শ ও অনুসরণীয় নেতা। বিশেষভাবে বিশ্বমুসলিমের জন্য তাঁহারা অনুসরণীয়। অতএব তাঁহাদের অনুসৃত নীতি ও জীবন-পদ্ধতির বিনা কারণে বিরুদ্ধতা করা কোন মুসলমানের ক্ষেত্রেই কল্পনীয় নয়।

সায়াদ ইবনে হিসাম (তাবেয়ী) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট বিবাহ না করিয়া পরিবারহীন কুমার জীবন যাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেনঃ لَا تَفْعَلْ 'না, তুমি তাহা করিবে না'। অতঃপর তিনি তাঁহার এই কথার সমর্থনে উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করিলেন।

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالْخِتَانُ. (ترمذی، مسند احمد)

চারটি কাজ রাসূলগণের জীবন-নীতির অন্তর্ভুক্ত। তাহা হইলঃ সুগন্ধি ব্যবহার, বিবাহ করা, মিসওয়াক করা—দাঁত পরিষ্কার ও নির্মল রাখা এবং খাতনা করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقُوْلُ لَا صَرُوْرَةَ فِى الْإِسْلَامِ. (مسند احمد)

নবী করীম (স) প্রায়ই বলিতেনঃ ইসলামে অবিবাহিত, কুমার-কুমারী—বৈরাগী জীবন যাপনের কোন অবকাশ নাই।

আল্লামা কাযী আয়ায বলিয়াছেনঃ صَرُوْرَةٌ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থঃ

اَلْاِنْقِطَاعُ عَنِ النِّكَاحِ وَسُلُوْكُ سَبِيْلِ الرَّهْبَانِيَّةِ

বিবাহ না করা—বিবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক থাকা এবং বৈরাগ্যবাদীর পথে চলা। অবিবাহিত জীবন যাপন করা।

এই আলোচনা হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইল যে, যে লোক বিবাহ করিতে সক্ষম এবং বিবাহ না করিলে যাহার পক্ষে পাপ কাজে আকৃষ্ট হইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে তাহার পক্ষে বিবাহ করা ফরয। কেননা নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা এবং নিজেকে হারাম কাজ হইতে বিরত ও পবিত্র রাখা ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য। ইমাম কুরতুবী ইহাকে সর্বসম্মত মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (قرطبى، نيل الاوطار)

বস্তুত বিবাহ পুরুষ-নারীর নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষাকারী এবং মানব বংশের ধারা সুষ্ঠুরূপে অব্যাহত রাখার একমাত্র উপায়। মানব সমাজ গঠিত হয় যে ব্যক্তিদের দ্বারা, তাহারা এই বিবাহেরই ফসল। পুরুষ ও নারীর উভয়েরই একটা নির্দিষ্ট বয়সকালে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি তীব্র আকর্ষণ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহা জন্মগত প্রবণতা।

বিবাহের ফলে এই আকর্ষণ ও জন্মগত প্রবণতার সুষ্ঠু ও পবিত্র পন্থায় চরিতার্থতা সম্ভব। ফলে মানব সমাজ নানাবিধ সংক্রামক রোগ হইতেও রক্ষা পাইতে পারে। এই পথে পুরুষ ও নারীর যে দাম্পত্য জীবন লাভ হয়, তাহাতেই উভয়েরই হৃদয়-মন-অন্তরের পূর্ণ শান্তি, স্বস্তি ও পূর্ণ মাত্রার পরিতৃপ্তি লাভ হওয়া সম্ভব।

বস্তুত বিবাহ কেবল রাসূলে করীম (স) এবং নবী-রাসূলগণেরই সুন্নাত নয়, ইহা আল্লাহ্র সৃষ্টিধারা ও বিশ্ব প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য সম্পন্ন একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থাও। ইহা যেমন মানব জগত সম্পর্কে সত্য, তেমনি সত্য জন্তু জানোয়ার ও উদ্ভিদ জগত্ সম্পর্কেও। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেনঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ★ (الذريت: ٤٩)

প্রত্যেকটি জিনিসকেই আমরা জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি।

বলিয়াছেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ★

(يس: ٦٢)

সেই মহান আল্লাহ্ বড়ই পবিত্র, যিনি সমস্ত জোড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি যাহা উৎপাদন করে তাহা হইতে, তাহাদের নিজেদের হইতে এবং এমন সব জিনিস হইতে যাহা তাহারা জানেনা।

প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব ও প্রাণীকেই আল্লাহ্ তা'আলা নারী ও পুরুষ সমন্বিত জোড়া হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবনকে রক্ষা করা ও উহার ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখাই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি বংশ জন্মের নিয়ম জারী করিয়াছেন। এই উপায়ে তিনি দুইজন হইতে বহু সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেনঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى (الحجرات: ١٣)

হে মানুষ! আমরা তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

সেই দুই জনও আসলে একজনই। বলিয়াছেনঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً۔ (النساء: ١)

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রব্বকে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে মূলত একজন লোক হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই একজন লোক হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জুড়ি। অতঃপর এই দুই জন হইতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি সৃষ্টিকেই পুরুষ ও নারী এই উভয় লিঙ্গে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জীবন-বিধান নাযিল করিয়াছেন এবং নবী ও রাসূল পাঠাইয়াছেন কেবলমাত্র মানুষের জন্য। কেননা মানুষ সেরা সৃষ্টি, তাহাদের জীবন, নিয়ম-বিধান মুক্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিবে, তাহা তিনি আদৌ পছন্দ করেন নাই। মানুষের মধ্যে যে পৌরুষ ও প্রজনন ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই রহিয়াছে, তাহা উচ্ছৃঙ্খলভাবে ব্যবহৃত হউক, তাহাও তিনি পছন্দ করিতে পারেন নাই। এই কারণে মানুষের জন্য তাহার নিকট হইতে নাযিল করা জীবন বিধানে বিবাহের বিধানও পূর্ণাঙ্গ ভাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহার মাধ্যমেই তিনি চাহিয়াছেন মানুষের মান-মর্যাদা সংরক্ষিত হউক এবং সম্মানজনক ভাবে ও পূর্ণ পবিত্রতা সহকারেই হউক পুরুষ ও নারীর মিলন—যৌনমিলন।

এই প্রেক্ষিতেই বিবাহে পুরুষ ও নারীর ঈজাব-কবুল—প্রস্তাবনা ও মানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ এক পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব হইবে আর অপর পক্ষ হইতে উহা গ্রহণ করা ও মানিয়া লওয়া হইবে। উপরন্তু এই কাজ কেবল মাত্র বিবাহেচ্ছু পুরুষ ও নারীর মধ্যেই সাধিত হইবে না, ইহা সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক ভাবে হইতে হইবে এবং উহাতে সাক্ষীও রাখিতে হইবে। অন্য কথায়, ইহা গোপনে ও সংশ্লিষ্ট লোকদের অজ্ঞাতসারে অগোচরে হইতে পারিবে না, ইহা হইতে হইবে সমাজ পরিবেশকে জানাইয়া শুনাইয়া ও প্রকাশ্য ভাবে।

এই ভাবেই মানুষের পৌরুষ ও জন্মদান ক্ষমতার সংরক্ষণ ও বংশের ধারার মর্যাদা বিধান সম্ভব। আর এই ভাবেই নারীর মান-মর্যাদা ও জীবন-ধারা সংরক্ষিত হইতে পারে। ঠিক এই কারণেই ইসলামে বিবাহের এত গুরুত্ব।

এই জন্যই নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ كَانَ مُوْسِرًا لِاَنْ يَّنْكِحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّيْ: (طبرانى، بيهقى)

যে লোক বিবাহ করার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াও বিবাহ করিবে না, সে আমার মধ্যে গণ্য নয়৷

বস্তুত বিবাহ হইতে বিরত থাকা—বিবাহ না করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। কেননা বিবাহ না করিয়া—অবিবাহিত থাকিয়া যে জীবন যাপন হয়, তাহা নিছক বৈরাগ্যবাদী জীবন। আর বৈরাগ্যবাদী জীবন ইসলামের পরিপন্থী। যাহা ইসলাম পরিপন্থী, তাহাই প্রকৃতি ও স্বভাব বিরোধী। আর স্বভাব পরিপন্থী জীবন ধারা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

বিবাহ সামাজিক-সামষ্টিক কল্যাণের উৎস। মানব বংশের ধারা এই পন্থায়ই অব্যাহতভাবে চলিতে ও সমুখে অগ্রসর হইতে পারে।

বিবাহ পুরুষ-নারীর মন-মানসিকতার সান্ত্বনা, স্থিতি ও স্বস্তির উপায়।

বিবাহ মানবীয় চরিত্রের সংরক্ষক ও পবিত্রতা বিধায়ক।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا، وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوٰجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً
(النحل: ٧٢)

আর আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য হইতেই জুড়ি বানাইয়াছেন। এবং ঐই জুড়ি হইতেই তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্র বানাইয়া দিয়াছেন।

এবং

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا (الروم: ٢١)

আল্লাহ্র একত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের একটি অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতেই তোমাদের জন্য জুড়ি বানাইয়া দিয়াছেন, যেন তোমরা উহার নিকট মনের স্বস্তি শান্তি ও স্থিতি লাভ করিতে পার।

বিবাহে আল্লাহ্‌র সাহায্য

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

(ترمذی، نسائی، ابن ماجه)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, তিনজন লোকের সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছেন। সে তিন জন হইলঃ (১) যে ক্রীতদাস মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে চুক্তিনামা লিখিয়া দিয়াছে ও প্রতিশ্রুত পরিমাণ অর্থ আদায় করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে; (২) বিবাহকারী—যে, চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক এবং (৩) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে তিন জন ব্যক্তিকে একই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সম্ভাব্যতার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই তিন জন ব্যক্তি আসলে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি কাজের কারক। কাজ তিনটি হইল; (১) দাসত্ব বন্ধন হইতে আর্থিক বিনিময়ের ভিত্তিতে মুক্তি লাভের চেষ্টা, (২) নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করা এবং (৩) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। কাজ তিনটির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য বাহ্যতঃ কিছু নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মানবিক ও দ্বীনদারীর দৃষ্টিতে এই তিনটি কাজই অতিশয় গুরুত্বের অধিকারী। ক্রীতদাসের মুক্তি চেষ্টা মানবিক মর্যাদার দৃষ্টিতে অবর্ণনীয় গুরুত্বের অধিকারী। আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে জন্মগতভাবেই মুক্ত ও স্বাধীন মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মানবতার দুশমন লোকদের মনগড়া ও ভুল সমাজ-ব্যবস্থার দরুন মানুষ তাহারই মত মানুষের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। এই রূপ অবস্থায় এহেন দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভই হইতে পারে তাহার সর্বপ্রথম কর্তব্য। এই মুক্তি যদি অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে হয়, মানবতা বিরোধী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুন অর্থ-বিনিময় ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের কোন পথই যদি উন্মুক্ত না থাকে, তবে অর্থের বিনিময়েই তাহা ক্রয় করিতে হইবে এবং এই জন্য প্রয়োজনে মনিবের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতেও দ্বিধা করা যাইবে না। এই চুক্তি যদি আন্তরিকতা সহকারে সম্পাদিত হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী অর্থ দিয়া মুক্তি অর্জন করিতে ক্রীতদাস যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালায়, তাহা হইলে হাদীসে বলা হইয়াছে—তাহার সাহায্য করা, চুক্তি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে তাহাকে সমর্থ বানাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার কাজ আর কিছুই হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, চরিত্রের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করাও আল্লাহ্‌র নিকট নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা চরিত্রহীন মানুষ পশুর অপেক্ষা অধম। চরিত্র হারাইয়া ফেলার ভয় আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে পড়িয়া যাওয়ার ভয়। এই ভয় যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট খুবই পছন্দীয় তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই ভয়ের দরুন অন্য কথায় চারিত্রিক পবিত্রতা নিষ্কলুষতা রক্ষার তাকীদে যে লোক বিবাহ করে, স্ত্রী ভরণ-পোষণের আর্থিক যোগ্যতা তাহার না থাকিলেও আল্লাহ্‌

তা'আলা সেজন্য তাহার সাহায্য করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। কেননা মনুষ্যত্বের দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আর তৃতীয় হইল, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। আল্লাহ্র পথে জিহাদের চরম লক্ষ্য হইল মানুষের প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্ব ও মানুষের মনগড়া ভাবে রচিত আইন-বিধানের রাজত্ব খতম করিয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও তাহারই নাযিল করা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ্র সৃষ্ট এই জমীনে, আল্লাহ্র সৃষ্ট মানুষের উপর একমাত্র আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, মানুষ মানুষের গড়া আইন ও শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া একান্ত ভাবে আল্লাহ্র বান্দা হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিবে, ইহা অপেক্ষা আল্লাহ্র অধিক সন্তুষ্টির কাজ আর কি হইতে পারে! কাজেই যে লোক এই উদ্দেশ্য লইয়া জিহাদে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, সে যে মহান আল্লাহ্র অসামান্য সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই।

বস্তুত এই তিনটি কাজই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই তিনটি কাজের ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আল্লাহ্ নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই আলোচ্য হাদীসের বক্তব্য। আর এই বক্তব্য যে আল্লাহ্র কালাম কুরআন মজীদের বিভিন্ন ঘোষণার সহিত পুরাপুরি সমাঞ্জস্যশীল, তাহা বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বলা যায়।

তবে এই তিনটি কাজেরই মূলে নিহিত রহিয়াছে চরিত্র। চরিত্রই মানুষের মানবিক মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমনীয় করিয়া দেয়। সে দাস হইলে তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা চালাইবে। যৌন উত্তেজনার প্রাবল্যের চাপে চরিত্র হারাইয়া ফেলার আশঙ্কা দেখা দিলে সে তাহা রক্ষা করার জন্য তৎপর হইবে, বিবাহ অপরিহার্য বোধ হইলে সে বিবাহ করিবে। আর আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে সে সম্মুখ সমরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। খালেস নিয়্যাতের উপর ভিত্তিশীল এই কাজ কয়টিতে একমাত্র ভরসা থাকিবে আল্লাহ্র সাহায্য লাভের আশার উপর। উপরোক্ত হাদীসটিই এই আশার বাণী ঘোষণা করিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্র সাহায্য না হইলে এই তিনটি কাজের কোন একটিও করা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে যাহার চরিত্র নাই, সে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের কোন চেষ্টাই করিবে না, নৈতিক পতনের আশঙ্কা দেখা দিলে সে হাল ছাড়িয়া দিবে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে পড়িয়া গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া যাইবে এবং আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম না থাকিলে সে তাহা কায়েম করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে না—ইহাই স্বাভাবিক। তাই চরিত্রই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করাই যে অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা ইহার জন্য মানুষের স্বভাবজাত ও কেন্দ্রীভূত যৌন-উত্তেজনা দমন করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যৌন শক্তি আসলে দুর্দমনীয় পাশবিকতা। ইহা মানুষের উপর একবার জয়ী হইয়া চাপিয়া বসিতে পারিলে মানুষকে চরম অধঃপতনের নিম্নতম পংকে নামাইয়া দেয়। কিন্তু মানুষ যদি এই শক্তির নিকট পরাজয় বরণ করিতে অস্বীকার করে ও পূর্ণ শক্তিতে উহার মুকাবিলায় নিজেকে জয়ী করিয়া রাখে, তবে তাহার প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও সাহায্য অবশ্যই নাযিল হইবে। আর তাহা সম্ভব হইতে পারে শরীয়াত সম্মত বিবাহের মাধ্যমে। কাজেই কোন লোক যদি নিজের চরিত্র পূত-পবিত্র ও নির্মল-নিষ্কলুষ রাখার নিয়্যাতে বিবাহ করে, বিবাহের মূলে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে, বিবাহ করিলেই তাহার চরিত্র রক্ষা পাইয়া যাইবে মনে করিয়া কেহ বিবাহ করে, তবে এই কাজে সে আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করিবে। তাহার আর্থিক দৈন্য ও অসচ্ছলতা থাকিলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহা ক্রমশ দূর করিয়া দিবেন। কুরআন মজীদে পূর্ণ বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়ার পরই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ٣٢)

এই লোকেরা যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাঁহার অনুগ্রহ দানে তাহাদিগকে সচ্ছল ও ধনশালী করিয়া দিবেন।

এই আয়াতের ভিত্তিতে মুফাস্‌সিরগণ লিখিয়াছেন, কেবলমাত্র দারিদ্রের কারণে তোমরা কাহাকেও বিবাহ করা হইতে বিরত রাখিও না। কেননা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁহার নাফরমানী হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেহ বিবাহ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সচ্ছলতা দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। তবে ইমাম শওকানীর মতে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নিশ্চিত ও অবশ্যপূরণীয় কোন প্রতিশ্রুতি নহে। বিবাহ করলেই দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র্য দূর হইয়া যাইবে এবং তাহার সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হইয়া যাইবে, এমন কথা বলা হয় নাই, আর তাহা বাস্তবও নহে। কেননা অসংখ্য দম্পতিকেই চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত দেখা যায় অহরহ। তবে ইহা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ও তাঁহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে এই ব্যাপারে নিশ্চিয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলিয়াছেনঃ

اِلْتَمِسُوا الْغِنٰى فِى النِّكَاحِ

তোমরা বিবাহের মাধ্যমে সচ্ছলতা লাভ করিতে চেষ্টা কর।

হযরত উমর (রা) বলিয়াছেনঃ

عَجَبِىْ مِمَّنْ لَا يَطْلُبُ الْغِنٰى فِى النِّكَاحِ

লোকেরা বিবাহের মাধ্যমে সচ্ছলতা অর্জন করিতে চাহিতেছে না দেখিয়া আমার আশ্চর্য লাগে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-ও এইরূপ উক্তি করিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকে উপরোক্ত আয়াতটিকেই এই কথার দলীল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এই হাদীসটির ভাষায় ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। উহাতে হাদীসটির রূপ এইঃ

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالنَّاكِحُ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتِبُ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ

তিন শ্রেণীর লোকের সাহায্য করা আল্লাহ্‌র উপর অর্পিত। (১) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী, (২) বিবাহকারী—যে নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছা করে এবং (৩) অর্থের বিনিময়ে দাস মুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ—যে চুক্তির অর্থ আদায় করিতে ইচ্ছুক।

কিন্তু এই বর্ণনায় হাদীসের মূল কথাগুলি অভিন্নই রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতেও এই হাদীসের তাৎপর্যস্বরূপ ইহাতে বলা হইয়াছেঃ

اَلْمَعْنٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ اِلَى النِّكَاحِ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ بِالْحَلَالِ لِيَتَعَفَّفُوْا عَنِ الزِّنٰى

লোকেরা যদি বিবাহের মুখাপেক্ষী হইয়াই পড়ে তাহা হইলে আল্লাহ্ হালাল উপায়ে তাহাদের এই মুখাপেক্ষিতা দূর করিয়া দিবেন, যেন তাহারা জ্বেনা-ব্যভিচার হইতে নিজেদের চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ করিয়া রাখিতে পারে।

এই আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেন, দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষেও বিবাহ করা জায়েয এবং সঙ্গত। কেননা রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্র। রাসূলে করীম (স) বহু দরিদ্র নারী পুরুষেরই বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দারিদ্র্যই যদি বিবাহ হইতে বিরত থাকার ভিত্তি হইত, তাহা হইলে নবী করীম (স) নিশ্চয়ই তাহা করিতেন না।

এতসব সত্ত্বেও যদি কোন লোক বিবাহ করার সুযোগ বা ব্যবস্থা করিতেই সমর্থ নাই হয়, তবে আল্লাহ্ তাহাকে বলিষ্ঠভাবে স্বীয় নৈতিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা রক্ষা করিবার ও কোনরূপ নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও পদস্খলন জ্বেনা-ব্যভিচারে না পড়িবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। উপরোক্ত আয়াতের পরই বলা হইয়াছেঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ٣٣)

যে সব লোক কোনরূপেই বিবাহের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না, তাহাদের কর্তব্য হইল শক্তভাবে স্বীয় নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা, যতদিন না আল্লাহ্ তাহাদিগকে সচ্ছল করিয়া দেন।

প্রথমোক্ত হাদীসে এইরূপ অবস্থায় চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য নফল রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(الجامع لاحكام القران للقرطبى، التفسير القران للشوكانى، عمدة القارى،تحفة الاحوذى)

প্রজনন ক্ষমতা ধ্বংস করা হারাম

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ اَلتَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا .

(بخاري، مسلم، ترمذي،نسائي، ابن ماجه)

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত সায়াদ ইবনে আবূ অক্কাস (রা)কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলে করীম (স) হযরত উসমান ইবনে মযয়ূনের স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি যদি ইহার অনুমতি তাঁহাকে দিতেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের খাসী বানাইয়া লইতাম। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে স্পষ্ট জানা যায়, হযরত উসমান ইবনে মযয়ূন (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করার অনুমতি চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। এখানে ব্যবহৃত মূল শব্দ হইল اَلتَّبَتُّلُ। ইহার আভিধানিক অর্থ 'সম্পর্ক ছিন্ন করা'। কেহ যখন কোন জিনিসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহৃত হওয়া কোন জিনিস পরিত্যক্ত হয়—উহার ব্যবহার শেষ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই এই কথা বুঝাইবার জন্য আরবী ভাষায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর আলোচ্য হাদীসে ব্যবহৃত এই শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হইল اَلْاِنْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ التَّزَوُّجِ 'স্ত্রীলোকের সহিত নিঃসম্পর্কতা ও বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ এবং বিবাহ পরিহার করা'। কিন্তু কুরআন মজীদে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ভিন্নতর অর্থে ও দৃষ্টিতে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (স)কে নির্দেশ দিয়াছেনঃ

وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا (المزمل: ٨)

এবং সারা দুনিয়ার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্র দিকে ঐকান্তিকভাবে একনিষ্ঠ ও একমুখী হইয়া থাক।

এখানে تَبَتُّلُ অর্থ নিয়্যাত খালেছ করিয়া একান্তভাবে আল্লাহ্র ইবাদাতে মশগুল হইয়া যাওয়া। আর হাদীসে ব্যবহৃত تَبَتُّلُ অর্থঃ অবিবাহিত থাকা, স্ত্রী সংসর্গ ও সঙ্গম পরিহার করা।

হাদীসটির বক্তব্য হইল, হযরত উসমান ইবনে মযয়ূন (রা) স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করা—বিবাহ না করিয়া চিরকুমার হইয়া থাকার অনুমতি চাহিলে রাসূলে করীম (স) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাঁহাকে ইহার অনুমতি দেন নাই; বরং এই মত বা নীতি গ্রহণ করিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেন।

রাসূলে করীম (স)-এর এই প্রত্যাখ্যান ও নিষেধের উল্লেখ করিয়া হযরত সায়াদ ইবনে আবূ অক্কাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) যদি তাঁহাকে এই কাজের অনুমতি দিতেন তাহা হইলে স্ত্রী-সংসর্গ পরিহার করার এই অনুমতির ভিত্তিতেই আমরা আরও অগ্রসর হইয়া নিজদিগকে 'খাসী' করিয়া লইতাম। 'খাসী' করার কথাটি এতদ্দেশে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ও সর্বজনবোধ্য। এই শব্দটি

সাধারণতঃ জন্তু জানোয়ার, ছাগল-ভেড়া-গরু-মহিষের পুরুষাঙ্গ কাটিয়া উহার প্রজনন ক্ষমতা হরণ করা বুঝায়। হযরত সায়াদের কথার তাৎপর্য হইল, স্ত্রী সংসর্গ পরিহার বৈধ হইলে পুরুষাঙ্গ কাটিয়া ফেলা—নিজদিগকে খাসী করা বা বন্ধ্যাকরণ অবৈধ হইতে পারে না। ইসলামী আইন-বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে বলা হয় 'কিয়াস'। একটি বৈধ কাজের উপর অনুমান স্থাপন করিয়া অনুরূপ ফল পূর্ণ অপর একটি কাজের বৈধতা জানিয়া লওয়াকেই কিয়াস বলা হয়। অন্য কথায়, ইহা 'নিম্ন ধাপে পা রাখিয়া উপরের ধাপে উঠিয়া যাওয়া'র মতই ব্যাপার। আরবী ভাষারীতি অনুযায়ী হযরত সায়াদের কথাটি এইরূপ হওয়া উচিত ছিলঃ لَوْ اَذِنَ لَهُ لَتَبَتَّلْنَا 'তিনি যদি তাঁহাকে স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করিবার অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে আমরা স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করিতাম।

কিন্তু তিনি এইরূপ না বলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, لَاخْتَصَيْنَا আমরা অবশ্যই নিজেদের খাসী করিয়া লইতাম। ইহার অর্থ দাঁড়ায়ঃ

لَوْاَذِنَ لَهُ لَبَالَغْنَا فِى التَّبَتُّلِ حَتَّى الْاِخْتِصَاءِ

তাঁহাকে স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করার অনুমতি দিলে আমরা এই কাজে চরমে পৌঁছিয়া নিজদিগকে 'খাসী' বানাইয়া ফেলিতাম।

নিজদিগকে 'খাসী' বানাইবার কথাটি হযরত সায়াদ (রা) অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলিয়া ফেলেন নাই। তদানীন্তন আরবের খৃষ্টান সমাজে ধর্মীয় অনুমতির ভিত্তিতে ইহার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়। কিন্তু নবী করীম (স) ইহা করার অনুমতি দেন নাই, না প্রথম কাজটির, না দ্বিতীয় কাজটির। বরং তিনি তাঁহার উম্মতকে এই ধরনের কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন।

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীসের ভাষা এইরূপঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَاْمُرُ بِالْبَاَةِ وَيَنْهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا.

(مسند احمد، ابن حبان، طبرانى فى الاوسط، ابن ابى حاتم)

রাসূলে করীম (স) বিবাহ করার জন্য আদেশ নির্দেশ দিতেন এবং অবিবাহিত কুমার থাকিতে ও স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করিতে তীব্র ভাষায় নিষেধ করিতেন।

ইমাম কুরতুবী লিখিয়াছেনঃ এই হাদীসের আলোকে বলা যায়, স্ত্রী সংসর্গ পরিহার ও চিরকুমার (বা কুমারী) থাকা শরীয়াতে জায়েয হইলে নিজদিগকে 'খাসী' করাও জায়েয হইয়া যায়। কেননা উভয়ের পরিণতি অভিন্ন।

'খাসী' করা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেনঃ 'খাসী করা অর্থ, যে দুইটি অঙ্গ দ্বারা সন্তান প্রজনন ও বংশ ধারা অব্যাহত থাকে, তাহা কাটিয়া ফেলা।' ইহা অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্টদায়ক কাজ। ইহার ফলে অনেক সময় মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। কোন কোন যুবতী অস্ত্রোপাচারে সন্তান ধারণ ক্ষমতা বিলুপ্ত করার পরিণতিতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়াও জানা যায়। 'ভেসেকটমী' (Vesectomy)—নির্বীর্যকরণের নিমিত্তে পুরুষের উপর অস্ত্রোপাচার বা লাইগেশন (ligation) মহিলাদের বন্ধ্যাকরণের ইত্যাকার আধুনিক পদ্ধতিই এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পূর্ণ হারাম।

ইমাম নববী উপরোদ্ধৃত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, হাদীসে উদ্ধৃত হযরত সায়াদের কথার অর্থ হইল, স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ করার, সম্পর্ক পরিহার করার ও এই ধরনের অন্যান্য বৈষয়িক স্বাদ আস্বাদন

পরিত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হইলে আমরা যৌন সঙ্গমের প্রবৃত্তি দমনের জন্য—যেন স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করা কিছুমাত্র কষ্টকর না হয়—আমরা নিজদিগকে 'খাসী' বা বন্ধ্যা করিয়া ফেলিতাম। (প্রচলিত কথায়, না থাকিবে বাঁশ, না বাজিবে বাঁশি) তাঁহার এই কথাটি কিয়াস ও ইজতিহাদের পর্যায়ভুক্ত। প্রথম কাজটি জায়েয হইলে এই কাজটিও জায়েয হইত বলিয়া তিনি মনে করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কেননা ইহা মূলতঃই ইজতিহাদের ব্যাপার নয়। ইজতিহাদ তো হইতে পারে সেই সব বিষয়ে, যাহাতে শরীয়াতের কোন অকাট্য দলীল বর্তমান নাই। অথচ 'খাসী' করা সম্পর্কে শরীয়াতের স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে। আর তাহা হইলঃ إِنَّ الْإِخْتِصَاءَ فِي الْآدَمِيِّ حَرَامٌ مُطْلَقًا মানুষকে 'খাসী' করানো বিনা শর্তে ও নিরংকুশভাবে হারাম। ইমাম নববীর ভাষায়ঃ فَإِنَّ الْإِخْتِصَاءَ فِي الْآدَمِيِّ حَرَامٌ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ছোট হউক বড় হউক—যে কোন বয়সের লোককে 'খাসী' করানো সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম বগভী বলিয়াছেনঃ যে সব জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া হয় না সেই সবের খাসী করাও হারাম। আর যে সব জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া হয় সে সবের ছোট বয়সে খাসী করা জায়েয। বেশী বয়স হইলে নয়। জন্তুর খাসী করানো জায়েয এই মতের দলীল হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوئَيْنِ রাসূলে করীম (স) দুইটি খাসী কৃত ছাগল কুরবানী করিয়াছেন। বস্তুত খাসী করা জায়েয না হইলে নবী করীম (স) নিশ্চয়ই খাসী করা ছাগল কুরবানী দিতেন না। কিন্তু ইহার বিপরীত মতও কম প্রবল ও কম প্রমাণিত নয়। একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) জন্তুর খাসী করিতে নিষেধ করিয়াছেন, উহার গোশ্‌ত খাওয়া হউক, কি না-ই হউক, ছোট হউক, কি বড় হউক।'

এই পর্যায়ে সঠিক ও যথার্থ কথা হইল, হযরত উসমান ইবনে মযয়ূন (রা) স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করার জন্য যে অনুমতি চাহিয়াছিলেন সেই অনুমতি যদি তিনি পাইতেন, তাহা হইলে লোকদের পক্ষে নিজদিগকে খাসী করাও জায়েয হইয়া যাইত। কেননা হযরত উসমান ইবনে মযয়ূনের স্ত্রী সংসর্গ পরিহারের অনুমতি প্রার্থনা পরিণতির দিক দিয়া খাসী করার অনুমতি প্রার্থনার সমান। এই ব্যাখ্যার আলোকে বুঝিতে পারা যায়, খাসী করার কথাটি হযরত সায়াদের নিজস্ব কোন 'কিয়াস' বা 'ইজতিহাদের' ব্যাপার ছিল না। আয়েশা বিন্‌তে কুদামাহ বর্ণিত অপর একটি হাদীস হইতে এই কথাই স্পষ্ট হইয়া যায়। সে হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী হযরত উসমান ইবনে মযয়ূন (রা) নিজে। তাহা এইঃ

إِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ فِي الْمَغَازِي أَفَتَأْذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِي الْخِصَاءِ فَأَخْتَصِيَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلٰكِنَّ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَظْعُونٍ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ مُجْفِرٌ (الاستيعاب لابن عبد البر)

তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূল! আমরা যুদ্ধ জিহাদের কাজে দূরদেশে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হই বলিয়া তখন স্ত্রী সঙ্গহীন অবস্থায় থাকা আমাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় আপনি যদি খাসী করার অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে আমি নিজেকে খাসী করিয়া লইতাম; তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ না, তবে হে মযয়ূন পুত্র! তুমি রোযা রাখিতে থাক। উহাই তোমাকে এই কষ্ট হইতে মুক্তি দিবে।

ইবনে আবদুল বার্ এই হাদীসটির উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন, হযরত উসমান ইবনে মযয়ূন, হযরত আলী ও হযরত আবূ যার গিফারী (রা) নিজদিগকে খাসী করার ও স্ত্রী সংসর্গ সম্পূর্ণ পরিহার করার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু নবী করীম (স) তাঁহাদিগকে এই কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

মুহাদ্দিস তাবারানী হযরত উসমান ইবনে মযয়ূন (রা) হইতে অপর একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদীসটি এইঃ

إِنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ رَجُلٌ يَشُقُّ عَلَىَّ الْعُزُوْبَةُ فَاْذَنْ لِىْ الْخِصَاءَ قَالَ لَا وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ ـ

তিনি বলিলেনঃ ইয়া রাসূল! আমি এমন ব্যক্তি যে, স্ত্রী হইতে নিঃসম্পর্ক ও সংসর্গহীন হইয়া থাকা আমার পক্ষে খুবই কঠিন ও বিশেষ কষ্টকর। অতএব আমাকে খাসী করার অনুমতি দিন। রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ না, এমতাবস্থায় রোযা রাখাই তোমার কর্তব্য।

এই পর্যায়ে আরও একটি হাদীস উল্লেখ্য। কায়স বলেন, আমি আবদুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছি; আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সাথে যুদ্ধে মগ্ন ছিলাম। আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রী ছিল না। তখন আমরা রাসূলে করীম (সা)কে জিজ্ঞাসা করিলামঃ أَلَا نَسْتَخْصِىْ। আমরা কি নিজদিগকে খাসী করিয়া লইব না'? ইহার জওয়াবে তিনি فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ আমাদিগকে এই কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। (মুসলিম)

এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

فِيْهِ مِنْ تَغْيِيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ وَلِمَا فِيْهِ مِنْ قَطْعِ النَّسْلِ

কেননা উহার ফলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ধারাকে পরিবর্তিত ও ব্যাহত করা হয় এবং উহার ফলে মানব-বংশ বৃদ্ধির ধারা রুদ্ধ ও স্তব্ধ হইয়া যায়।

ইসমাঈল ইবনে আবূ খালেদ কায়স ইবনে আবূ হাজিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ

كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَا نَسْتَخْصِىْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ.... ثُمَّ قَالَ: لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

আমরা এক যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের স্ত্রীরা সঙ্গে ছিল না। তখন আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি খাসী করাইয়া লইব না? ... পরে তিনি আমাদিগকে এই কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। ইহার পর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করিলেনঃ 'তোমরা হারাম করিও না আল্লাহ্ যেসব পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন'।

ব্যাখ্যা এই হাদীসে প্রথমতঃ 'খাসী' করিতে—প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্ট বা উৎপাটিত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর এই নিষেধকে দলীল ভিত্তিক করার জন্য রাসূলে করীম (স) একটি আয়াত পাঠ করিলেন। তাহাতে আল্লাহ্‌র হালাল করা জিনিসকে হারাম করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইহার অর্থ হইল, বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর যৌন-সুখ লাভ ও স্বাদ-আস্বাদনকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করিয়াছেন। 'খাসী' করিয়া এই সুখভোগ ও স্বাদ-আস্বাদনের উপায় বিনষ্ট করিয়া দেওয়ায় আল্লাহ্‌র হালাল করা জিনিসকেই হারাম করিয়া লওয়ার শামিল হয়। আর ইহা একটি অতিবড় অপরাধ (আহকামুল কুরআন—আবূ বকর আল-জাসসাদ, ২য় খন্ড, ১৮৪ পৃঃ)

এই বিস্তারিত আলোচনার নির্যাস হইল, যৌবন, যৌন শক্তি, স্ত্রীসঙ্গম ও প্রজনন ক্ষমতা মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত। ইহাকে কোনক্রমেই বিনষ্ট, ব্যাহত বা ধ্বংস করা যাইতে পারে না। ইসলামী আইন-বিধানে এই কাজ সম্পূর্ণ হারাম।
(عمدة القارى تفسير القرطبى، نبوى، طبرانى، تحفة احوذى، الاستيعاب)

স্ত্রীহীন অবস্থায় কাহারও যদি স্বীয় চরিত্র নিষ্কলুষ ও অকলংক রাখা কঠিন হইয়া দেখা দেয়, তাহা হইলে রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত শিক্ষানুযায়ী তাহার রোযা রাখা কর্তব্য। কিন্তু নিজেকে খাসী করা—যৌন অঙ্গকে প্রজনন ক্ষমতাশূন্য করা কোনক্রমেই জায়েয হইবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলিয়াছেন, একজন লোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِئْذَنْ لِىْ اَنْ اَخْتَصِىْ

ইয়া রাসূল! আমাকে নিজেকে খাসী করার অনুমতি দিন।

তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

خِصَاءُ اُمَّتِىْ اَلصِّيَامُ وَالْقِيَامُ

আমার উম্মতের লোকদের জন্য রোযা রাখা ও রাত্র জাগিয়া ইবাদত করাই তাহাদের খাসী করণ (এর বিকল্প পন্থা)।

অর্থাৎ খাসী করণের উদ্দেশ্যে এই দুইটি কাজ দ্বারা সম্পন্ন করাই আমার উম্মতের জন্য বিধি।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, একজন যুবক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নিজেকে খাসী করণের অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেনঃ

صُمْ وَسَلِ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ

রোযা থাক এবং আল্লাহ্র নিকট (বিবাহের সঙ্গতির ব্যাপারে) তাহার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতে থাক।

এই দুইটি হাদীস মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী আল-আওসাত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবূ ইমামা (রা) হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ

تَزَوَّجُوْا فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌبِكُمُ الْاُمَمَ وَلَا تَكُوْنُوْا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارٰى

তোমরা বিবাহ কর, কেননা আমি বেশী সংখ্যক উম্মত লইয়া অন্যান্য নবীর উম্মতের উপর অগ্রবর্তী হইব এবং তোমরা খৃস্টান (পাদ্রীদের) ন্যায় (বিবাহ না করার) বৈরাগ্য গ্রহণ করিও না।

বিবাহ না করা ও বৈরাগ্য গ্রহণ ইসলামে আদৌ পছন্দ করা হয় নাই। বরং বিবাহ করা ও যতবেশী সম্ভব সন্তানের জন্মদানই অধিক পছন্দনীয় কাজ।

বদল বিবাহ্ জায়েয নয়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ. (مسلم، ابوداؤد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বদল বিবাহ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। (মুসলিম, আবূ দায়ূদ)

ব্যাখ্যা মূল হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটি হইল اَلشِّغَارُ —ইমাম নববী লিখিয়াছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে এই হাদীসের বর্ণনাকারী নাফে এই শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

وَالشِّغَارُ أَنْ يُّزَوِّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهٗ عَلٰى أَنْ يُّزَوِّجَهٗ اِبْنَتَهٗ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

'শিগার'—বদল বিবাহ—হয় এই ভাবে যে, এক ব্যক্তি তাহার কন্যাকে অপর একজনের নিকট বিবাহ দিবে এই শর্তে যে, তাহার কন্যা এই ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে এবং এই দুইটি বিবাহে মহরানা ধার্য হইবে না।

আল-কামুস-আল মুহীত গ্রন্থে 'শিগার' শব্দের অর্থ বলা হইয়াছেঃ তুমি এক ব্যক্তির নিকট একজন মেয়েলোককে বিবাহ দিবে এই শর্তে যে, সে তোমার নিকট অপর একটি মেয়েকে বিবাহ দিবে কোনরূপ মহরানা ছাড়াই।

অপর একটি বর্ণনায় 'শিগার' বিবাহের ব্যাখ্যায় اِبْنَتَهٗ-র পর أَوْ أُخْتَهٗ 'কিংবা তাহার বোন' উল্লেখিত হইয়াছে। ইমাম খাত্তাবী এই কথাটি লিখিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

وَيُنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهٗ أُخْتَهٗ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

এবং এক ব্যক্তির বোনকে বিবাহ দিবে এবং সে তাহার বোনকে বিবাহ দিবে মহরানা ছাড়া।

এই ধরনের বিবাহের প্রস্তাবনায় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলেঃ

زَوِّجْنِيْ بِنْتَكَ أَوْ قَرِيْبَتَكَ أَوْ مُؤَكِّلَتَكَ فُلَانَةً فِيْ مُقَابِلِ أَنْ أُزَوِّجَكَ بِنْتِيْ أَوْ قَرِيْبَتِيْ أَوْ مُؤَكِّلَتِيْ فُلَانَةً

তুমি তোমার কন্যাকে বা তোমার নিকটাত্মীয়া অথবা তোমার মুয়াক্কিলা অমুক মেয়েটিকে আমার নিকট বিবাহ দাও ইহার মুকাবিলায় যে, আমি আমার কন্যা বা নিকটাত্মীয় অথবা আমার মুয়াক্কিলা অমুক মেয়েটিকে তোমার নিকট বিবাহ দিব।

شِغَار শব্দের আভিধানিক অর্থ 'উত্তোলন' বা উঠানো, উপরে তোলা। কুকুর যখন প্রস্রাব করার জন্য পা উপরে তোলে, তখন বলা হয় شَغَرَ الْكَلْبُ 'কুকুরটি পা উপরে তুলিয়াছে'। আলোচ্য ধরনের বিবাহকে شِغَار বলা হয় এই সাদৃশ্যের কারণে যে, এই রূপ বিবাহের কথা-বার্তায় একজন যেন অপর জনকে বলিলঃ

لاَ تَرْفَعْ رِجْلَ بِنْتِيْ حَتّٰى اَرْفَعَ رِجْلَ بِنْتِكَ

তুমি আমার কন্যার পা উপরে তুলিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার কন্যার পা উপরে না তুলি।

বলা বাহুল্য, পা উপরে তোলার অর্থ, স্ত্রীর সহিত যৌন কর্মের প্রস্তুত হওয়া, উদ্যোগী হওয়া।

কাহারও কাহারও মতে شَغَر শব্দের অর্থ শূন্যতা। আরবী ভাষায় বলা হয় شَغَرَ الْبَلَدُ 'শহর শূন্য হইয়া গিয়াছে'। আলোচ্য ধরনের বিবাহ যেহেতু মহরানা শূন্য—মহরানা ছাড়াই হয়, এই সাদৃশ্যে উহাকেও شَغَر বা شِغَار বলা হয়। আর স্ত্রী যখন সঙ্গম কালে পা তোলে তখন বলা হয় شَغَرَتِ الْمَرْاَةُ 'স্ত্রী লোকটি নিজেকে শূন্য করিয়া দিয়াছে'। ইবনে কুতাইবা বলিয়াছেন, এই নারীদের প্রত্যেকেই সঙ্গম কালে পা উপরে তোলে বলিয়া এই বিবাহকে نِكَاحُ الشِّغَارِ 'শিগার বিবাহ' (বদল বিবাহ) বলা হয়। এই ধরনের বিবাহ আরব জাহিলিয়াতের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। অপর একটি বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছেঃ (مسلم عن ابن عمر، ابن ماجة عن انس بن مالك) — لاَ شِغَارَ فِى الْاِسْلاَمِ 'ইসলামে বদল বিবাহ নাই'। 'মজমাউজ্ জাওয়ায়িদ' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এই হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস ও ফিকাহবিদগণ একমত হইয়া বলিয়াছেন, উক্তরূপ বদল বিবাহ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই রূপ বিবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে হইয়া গেলেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে মূলত-ই সংঘটিত হয় না। ইহা বাতিল।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে, কোন মুসলমান যদি এইরূপ বিবাহ করিয়াই বসে, তাহা হইলে সে বিবাহটিকে কি বাতিল ঘোষণা করিতে ও ভাঙিয়া দিতে হইবে? কিংবা না? এই পর্যায়ে বিভিন্ন ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, হ্যাঁ, এইরূপ বিবাহ হইয়া গেলেও উহাকে বাতিল করিতে হইবে। ইমাম খাত্তাবীর বর্ণনানুযায়ী ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও আবূ উবাইদও এই মতই দিয়াছেন। ইমাম মালিক বলিয়াছেন, এইরূপ বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গম হইয়া গেলেও; কিংবা না হইলেও উহা ভাঙিয়া দিতে হইবে। অবশ্য তাহার অপর একটি মতে সঙ্গমের পূর্বে ভাঙিয়া দিতে হইবে, সঙ্গম হওয়ার পর নয়। কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ বলিয়াছেন, এই রূপ বিবাহ হইয়া গেলে পরে বংশের অন্যান্য মেয়ের জন্য ধার্যকৃত পরিমাণে মহরানা مَهْرِمِثْل নির্ধারিত করা হইলে উক্ত বিবাহ বহাল রাখা চলিবে। ইমাম আবূ হানীফাও এই মতই দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আতা, জুহরী, লায়স এবং একটি বর্ণনানুযায়ী ইমাম আহমাদ, ইসহাক রাহওয়ায়, আবূ সওর ও ইবনে জরীর তাবারী প্রমুখও এইমত যাহির করিয়াছেন। ফিকাহবিদগণ এই মতও দিয়াছেন যে, কেবল নিজের মেয়ের ক্ষেত্রেই এই নিষেধ প্রযোজ্য নয়, নিজ কন্যা ছাড়া বোন, ভাইঝি, ফুফি ও চাচা-ফুফার মেয়ের বদলের ক্ষেত্রেও এই নিষেধ কার্যকর হইবে।

আবূ দায়ূদ কিতাবে আ'রাজ হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ তাঁহার কন্যাকে আবদুর রহমানের নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন এবং আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহর নিকট তাঁহার নিজের কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। আর ইহাকেই তাঁহারা পরস্পরের

মহরানা বানাইয়াছিলেন। হযরত মুয়াবীয়া (রা) সরকারী ক্ষমতায় তাঁহাদের দুইজনের বিবাহ ভাঙিয়া দিয়াছিলেন, উভয়ের মধ্য বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেনঃ

هٰذَا الشِّغَارُ الَّذِىْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইহাতো সেই 'শিগার' বিবাহ, যাহা করিতে রাসূলে করীম (স) নিষেধ করিয়াছেন।

এইরূপ বিবাহ হারাম হওয়ার বিভিন্ন কারণ শরীয়াত বিশেষজ্ঞগণ উল্লেখ করিয়াছেন। বলা হইয়াছে, ইহাতে একটি বিবাহ অপর বিবাহের উপরে ঝুলন্ত হইয়া থাকে। অথচ কোন শর্তের উপর বিবাহের ঝুলন্ত হইয়া থাকা ইসলামী শরীয়াতে মূলতই জায়েয নয়। কেননা তাহাতে কথাটি শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায়, যেন একজন অপরজনকে বলিতেছে, আমার মেয়ের বিবাহ তোমার সহিত সংঘটিত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মেয়ের বিবাহ আমার সহিত সংঘটিত না হইবে।

এতদ্ব্যতীত ইসলাম এই কারণেও এই রূপ বিবাহ হারাম করিয়াছে যে, ইহাতে স্ত্রীর হক—মহরানা পাওয়ার হক—বিনষ্ট হয়, তাহার মর্যাদার হানি হয়। ইহাতে দুইজন পুরুষের প্রত্যেকে স্ত্রী গ্রহণ করে অপর এক স্ত্রীর বিনিময়ে—মহরানা ব্যতীতই। অথচ মহরানা প্রত্যেক স্ত্রীরই অনিবার্যভাবে (ওয়াজিব) প্রাপ্ত। কিন্তু এই ধরনের বিবাহে তাহারা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হয়।

(نبوى معالم السنن يسئلونك عن الدين والحياة)

যে সব পুরুষ-মেয়ের পারস্পরিক বিবাহ হারাম

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. (الترمذى مسند احمد)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা দুগ্ধ পানের কারণে সেই সব পুরুষ-মেয়ের পারস্পরিক বিবাহ হারাম করিয়া দিয়াছেন, যাহা হারাম করিয়াছেন বংশ ও রক্ত সম্পর্কের কারণে। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা এখানে হযরত আলী (রা) বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা দশজন সাহাবী হইতে বর্ণিত। হযরত আলী (রা) ব্যতীত অপর নয় জন সাহাবী হইলেনঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আয়েশা, উম্মে সালমা, উম্মে হাবীবা, আবূ হুরায়রা, সওবান, আবূ আমামাতা, আনাস ইবনে মালিক এবং কায়াব ইবনে আজুজাতা (রা)। হযরত আয়েশা (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে এই ভাষায়ঃ

إِنَّ النَّبِىَّ صلعم قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. (ابوداؤد . بخارى)

জন্মসূত্রে যে বিবাহ হারাম, দুগ্ধপান সূত্রেও সেই বিবাহ হারাম।

ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, এই হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা ও স্থায়ীত্বের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সমাজে কতিপয় মেয়ে-পুরুষের পারস্পরিক বিবাহ সম্পূর্ণ এবং চিরকালের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যাপারটি মোট নয়টি বিভাগে বিভক্ত। তাহা হইল (১) নিকটবর্তীতার কারণে হারাম (২) বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম (৩) দুগ্ধ পানের কারণে হারাম (৪) একত্রিত করণ হারাম (৫) স্বাধীনা মেয়ের উপর ক্রীতদাসী বিবাহ হারাম (৬) অন্য লোকের অধিকারের কারণে হারাম (৭) মালিকানার কারণে হারাম (৮) শিরক-এর কারণে হারাম এবং (৯) তিন তালাক দেওয়ার কারণে হারাম।

নিকটাত্মীয়তার কারণে সাত বিভাগের মেয়েরা হারামঃ মা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফী, খালা, ভাইঝি, বোনঝি।

মা শাখায়ঃ ব্যক্তির নিজের মা, দাদী, নানী ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

তোমাদের মাদেরকে তোমাদের প্রতি হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কন্যা শাখায়ঃ ব্যক্তির নিজের ঔরষজাত কন্যা, ছেলের মেয়ে—আরও নিচের দিকে।

বোন শাখায়ঃ তিনটি প্রশাখা। আপন বোন, পিতার দিকের বোন, মায়ের দিকের বোন।

ফুফি শাখায়ঃ তিনটি প্রশাখা। আপন ফুফি, বাবার দিক দিয়া ফুফি, মা'র দিক দিয়া ফুফি। পিতার ফুফি, দাদার ফুফি, মায়ের ফুফি, দাদীর ফুফি ইত্যাদি।

খালা পর্যায়েঃ আপন খালা, বাবার দিক দিয়া খালা, মা'র দিক দিয়া খালা ইত্যাদি।

ভাইঝি পর্যায়েঃ বোনঝি, ভাইঝির কন্যা, বোনঝির কন্যা, ভাইর ছেলেদের কন্যা, বোনের ছেলেদের কন্যা—নিচের দিকে.....

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে চারটি শাখা হারামঃ

স্ত্রীর মা, স্ত্রীর পিতা-মাতার দিক দিয়া দাদী। কেহ যদি একটি মেয়ে বিবাহ করে, সেই স্ত্রীর সহিত তাহার সঙ্গম হউক কি না হউক, সর্বাবস্থায়ই এই স্ত্রীর মা এই পুরুষটির জন্য হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীদের মা'রাও.........

স্ত্রীর কন্যা—যদি সে স্ত্রীর সহিত ব্যক্তির সঙ্গম হইয়া থাকে। কুরআনে বলা হইয়াছেঃ

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

তোমরা সঙ্গম করিয়াছ তোমাদের এমন স্ত্রীদের কোলে লইয়া আসা নিজ গর্ভজাত সন্তান যাহারা তোমাদের লালিতা-পালিতা—তাহারা তোমাদের জন্য হারাম।—স্ত্রীর কন্যার কন্যা এবং স্ত্রীর পুত্রের কন্যাও হারাম।

পুত্রের স্ত্রী—তাহার সহিত পুত্রের সঙ্গম হউক, কি না হউক। পৌত্রের স্ত্রীও হারাম। কুরআনে বলা হইয়াছেঃ

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরাও হারাম।

আলোচ্য হাদীসের ঘোষণা হইল, বংশ বা রক্ত সম্পর্কের কারণে যাহারা হারাম, দুগ্ধ পানের কারণেও সেই সব আত্মীয়ও হারাম হইয়া যায়। হযরত হামজার কন্যা রাসূলে করীম (সা)-এর সহিত বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হইলে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. (مسلم، نسائى عن على)

হামজার কন্যা আমার জন্য হালাল নয়। কেননা সে তো আমার দুধ ভাইর কন্যা।

রাসূলে করীম (স) ও হযরত হামজা পরস্পর দুধ ভাই ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আবুল কুয়াইসের ভাই আফলাহ আমার সহিত সাক্ষাত করিতে চাহিলে আমি বলিলামঃ

وَاللّٰهِ لَا آذَنُ حَتّٰى اِسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم فَاِنَّ اَخَا اَبِى الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ مَنْ اَرْضَعَنِىْ وَلٰكِنْ اَرْضَعَتْنِىْ اِمْرَأَتُهٗ. (بخارى، مسلم،مالك، احمد، ابوداؤد، ترمذى، نسائى)

আল্লাহ্র নামে শপথ, রাসূলে করীমের নিকট হইতে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিব না। কেননা আবুল কুয়াইসের এই ভাইতো আমাকে দুধ খাওয়ায় নাই। আমাকে দুধ খাওয়াইয়াছে তাহার স্ত্রী।

পরে রাসূলে করীম (স) ইহা শুনিয়া বলিলেনঃ

إِئْذَنْ لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

হ্যাঁ, তুমি তাহার সহিত দেখা করিতে পার। কেননা সে তোমার দুধ পানের কারণে চাচা।

কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

তোমাদের সেই সব মা-ও হারাম, যাহারা তোমাদিগকে দুধ খাওয়াইয়াছে এবং দুধের বোনেরাও।

ইহার কারণ এই যে, যে মেয়ে বা ছেলেকে যে স্ত্রীলোকটি দুধ পান করাইয়াছে, সে দুধ সে পাইয়াছে তাহার স্বামীর নিকট হইতে। অতএব এই দুধ স্ত্রী ও তাহার স্বামী এই দুইজনের মিলিত দেহাংশ। আর এই দেহাংশ পান করিয়া যে লালিত পালিত হইয়াছে, সে তাহাদেরই অংশ হইয়াছে। এই দিক দিয়া এই দুধপানকারী সন্তান তাহাদের ঔরষজাত সন্তানের মতই হারাম হইয়া গিয়াছে। ইহাই এই পর্যায়ের হাদীস সমূহের বক্তব্য। (بذل المجهود، تحفة الفقهاء)

তাহ্লীল-বিবাহ হারাম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ. (مسند احمد، نسائى، ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) হালালকারী ব্যক্তি ও যাহার জন্য হালাল করা হয় সেই ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন।
(মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী, নাসায়ী, তিরমিযী)
(ইবনুল কাতান ও ইবনে দকীকুল-ঈদ-এর মতে এই হাদীসটি বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ্ হাদীস।)

ব্যাখ্যা হাদীসের শব্দ اَلْمُحَلِّلُ অর্থ 'তাহ্লীলকারী'—অর্থাৎ অন্য একজনের জন্য কোন মেয়ে লোককে হালাল বানাইবার উদ্দেশ্যে সেই মেয়ে লোকটিকে বিবাহ করাকে বলা হয় তাহ্লীল বিবাহ। ইহার তাৎপর্য হইল, একজন লোক তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক বাইন দিয়াছে। তালাক দেওয়ার পর সে আবার সেই স্ত্রীকেই স্ত্রীরূপে রাখিতে ইচ্ছুক হইয়াছে এবং সে স্ত্রীও তাহার স্ত্রী হইয়া থাকিতে ও পূর্বে তালাক দাতাকেই পুনরায় স্বামীরূপে বরণ করিয়া লইতে রাযী হইয়াছে। কিন্তু কুরআনের বিধান মতে এ স্ত্রী লোকটি যতক্ষণ অন্য একজন লোককে বিবাহ না করিবে, ততক্ষণ সে তাহার প্রথম স্বামীকে স্বামীরূপে বরণ করিতে পারে না। এই রূপ অবস্থায় একজন আপন জনকে রাযী করানো হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে এই স্ত্রী লোকটিকে বিবাহ করিবে, তাহার সহিত সঙ্গম করিবে এবং পরে সে তাহাকে তালাক দিবে—যেন মেয়ে লোকটি তাহার প্রথম স্বামীর বিবাহিত স্ত্রী হইতে পারে ও সেই প্রথম স্বামীর পক্ষেও তাহাকে বিবাহ করা হালাল হইয়া যায়। মোটামুটি এই রূপ বিবাহকে তাহ্লীল বিবাহ বলে এবং যে লোক এই বিবাহ করে তাহাকে বলা হয় 'মুহাল্লিল' (مُحَلِّل)। আর যাহার জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে সে বিবাহ করে তাহাকে বলা হয় 'মুহাল্লিল লাহু' (مُحَلَّل لَهٗ)। আলোচ্য এই দুই ব্যক্তির উপরই রাসূলে করীম (স) লা'নত ও অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া জানানো হইয়াছে। বস্তুত এই লা'নত ও অভিশাপ বর্ষণের বাস্তব কারণ রহিয়াছে। যাহারা এই বিবাহকে হালাল মনে করে তাহারা কুরআনের আয়াতের ধৃষ্টতাপূর্ণ কদর্য করে। কেননা কুরআনের আয়াতঃ

فَلَا تَحِلُّ لَهٗ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ (البقرة: ٢٣٠)

তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকটি তালাকদাতার জন্য হালাল হইবে না যতক্ষণ না সে অপর একজন লোককে স্বামীরূপে বরণ করিবে। (ও তাহার সহিত সঙ্গম করিবে)

ইহার সঠিক অর্থ হইল, একজন স্বামী তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া দিলে মূলত এই স্ত্রীলোকটি তাহার এই স্বামীর জন্য চিরকালের তরে হারাম হইয়া যায়—তবে মেয়ে লোকটি যদি সাধারণ নিয়মে অন্য এক স্বামী গ্রহণ করে ও তাহার সহিত সঙ্গম হয় ও তাহার পর সে হয় মরিয়া যায়, কিংবা সেও তিন তালাক দিয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে সেই প্রথম স্বামী ও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নূতন ব্যক্তির ন্যায় এই

মেয়ে লোকটিকে বিবাহ্ করিতে পারিবে। তখন এই বিবাহ জায়েয এবং এই মেয়েলোকটি তাহার জন্য হালাল হইবে। ইহা অতীব স্বাভাবিক নিয়মের কথা। ইহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই। কিন্তু বর্তমান কালে কুরআনের এই আইনটির সম্পূর্ণ ভুল অর্থ করিয়া কার্যত করা হইতেছে এই যে, কেহ্ রাগের বশবর্তী হইয়া স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে পরে তাহার ঘর-সংসার সব রসাতলে যাইতেছে ও জীবন অচল হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া আবার সেই স্ত্রীকেই গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু কুরআনের এই আয়াতটি তাহার সম্মুখে বাধা হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া ইহাকেই অতিক্রম করার জন্য এই তাহ্লীল বিবাহ করিতেছে এবং মেয়েলোকটিও জানে যে, তাহাকে স্থায়ী রূপে বরণ করার জন্য নয়—একরাত্রির যৌন সঙ্গিনী হইবার জন্যই সে তাহাকে বিবাহ্ করিতেছে এবং সেও তাহার নিকট বিবাহ বসিতে রাযী হইয়াছে। নবী করীম (স) এই তাহ্লীল বিবাহকারীকে 'ভাড়া করা বলদ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُوَ الْـمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللّٰهُ الْـمُحَلِّلَ وَالْـمُحَلَّلَ لَهٗ.

(ابن ماجه، بيهقى، حاكم)

আমি কি তোমাদিগকে ধার করা ষাড়ের সম্পর্কে বলিব? সাহাবাগণ বলিলেনঃ হ্যাঁ রাসূল! বলুন, তখন তিনি বলিলেনঃ তাহ্লীল বিবাহকারীই হইতেছে ধার করা ষাড়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহ্লীলকারী ও যাহার জন্য তাহ্লীল করে এই উভয় ব্যক্তির উপরই অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে এই একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এই সব হাদীস হইতে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাহ্লীল বিবাহ সম্পূর্ণ হারাম। কেননা রাসূলে করীম (স)-এর মুখে এই ব্যাপারে এতবেশী কঠোর ও তীব্র ভাষায় হাদীস উচ্চারিত ও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা পড়িলে শরীর মন কাঁপিয়া উঠে। ইহা প্রমাণ করে যে, ইহা নিশ্চয়ই অতি বড় গুনাহ। তাহা না হইলে এতভাবে ও এত কঠোর ভাষায় নবী করীম (স) এই কথা বলিতেন না। কেননা সুস্পষ্ট হারাম কবিরা গুনাহের কাজ এবং যে করে কেবল তাহার প্রতিই অভিশাপ বর্ষণ করা যাইতে পারে। অন্য কাহারও প্রতি নয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম লিখিয়াছেনঃ لِاَنَّ اللَّعْنَ اِنَّمَا تَكُوْنُ عَلٰى ذَنْبٍ كَبِيْرٍ "অভিশাপ হয় বড় কোন গুনাহের জন্য"। এই জন্য শরীয়াত বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, অন্য কাহারও জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে যে বিবাহ হয়, তাহা শরীয়াত মুতাবিক বিবাহ নয়। আর এইরূপ বিবাহের পর যে যৌন সঙ্গম হয় তাহা নির্লজ্জ ও প্রকাশ্য ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কি, যদি মৌলিকভাবে এজন্য কোন শর্তও করা নাও হয় যে, একরাত্রির সঙ্গমের পর সে তাহাকে তালাক দিবে, তবুও ইহা শরীয়াত মুতাবিক বিবাহ হইতে পারে না।[১]

---

১. তাহ্লীল বিবাহ সম্পর্কে রাসূলে করীম-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জওয়াবে বলিলেনঃ
لَا اِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لَا دَلْسَةً وَلَا اِسْتِهْزَاءً بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى تَذُوْقَ عُسَيْلَتَهٗ.
(ابو اسحاق الجورجانى عن ابن عباس)
না জায়েয নয়। কেবল সেই বিবাহই জায়েয যাহা বিবাহের উদ্দেশ্যে ও আগ্রহে করা হইবে, যাহাতে কোন ধোঁকা প্রতারণার অবকাশ থাকিবে না এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপও হইবে না, উহার অপমান হইবে না—যতক্ষণ তুমি তোমার স্বামীর নিকট যৌন মিলনের স্বাদ-আস্বাদন না করিবে।

২. 'ফাসেদ বিবাহ' বলা হয় সেই বিবাহকে যাহা আনুষ্ঠানিক ভাবে হইলেও প্রকৃত পক্ষে শরীয়াত অনুযায়ী সংঘটিত হয় না।

ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেন, নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (র) প্রমুখ, তাবেয়ী ফিকাহবিদ সুফিয়ান সওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ী, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণ একমত হইয়া এইরূপ বিবাহকে হারাম বলিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফার মত হইল, কেহ যখন কোন মেয়েলোককে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করে যে, সে মেয়েলোকটিকে তাহার তালাক দাতার জন্য হালাল করিয়া দিবে এবং শর্ত করে যে, সে যখন তাহার সহিত যৌন সঙ্গম করিবে, তখনই সে তালাক হইয়া যাইবে—কিংবা অতঃপর এই বিবাহের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, তাহা হইলে এই বিবাহটা সহীহ হইবে; কিন্তু যে শর্ত করিয়াছে, তাহার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। ইমাম মালিকের মতে তালাকদাতার (প্রথম স্বামীর) জন্য এই মেয়েটি হালাল হইবে কেবল সহীহ ও আগ্রহ প্রসূত বিবাহ অন্য কাহারও সহিত অনুষ্ঠিত হইলে ও সে তাহার সহিত যৌন সঙ্গম করিলে। এই যৌন সঙ্গম হইবে তখন যখন মেয়েটি পাক থাকিবে ও হায়েয অবস্থায় থাকিবে না এবং এই বিবাহে তাহলীল—অন্য কাহারও জন্য হালাল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে বিবাহ করিতেছে এই রূপ কোন ইচ্ছা বা ধারণা থাকিতে পারিবে না। তাহার পর যদি সেও তালাক দেয় কিংবা সে মরিয়া যায়, তাহা হইলে। যদি তাহলীলের শর্ত করা হয়, কিংবা উহা নিয়্যাত থাকে, তাহা হইলে এই বিবাহ সহীহ্ হইবে না ও দ্বিতীয় জনের জন্যও সে হালাল হইবেনা, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়া তো দূরের কথা।

এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী হইতে দুইটি কথার উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে নির্ভুলতম কথা হইল, এই বিবাহ সহীহ্ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ বলিয়াছেনঃ ইহা ফাসেক বিবাহ। কেননা ইহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হইয়াছে। ইমাম মুহাম্মাদ (بلوغ الامانى سبل السلام نيل الاوطار) বলিয়াছেনঃ দ্বিতীয় স্বামীর সহিত বিবাহ শুদ্ধ, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে না।

হযরত উমর (রা) বলিয়াছেনঃ

لَا أُوْتِىَ بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ اِلَّا رَجَمْتُهُمَا

হালাল বিবাহকারী ও যাহার জন্য হালাল করা হয় এই দুই জন এমন যে, আমার নিকট তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইলে আমি তাহাদের 'রজম'—পাথর নিক্ষেপে হত্যা দন্ডে দন্ডিত—করিব।

হযরত ইবনে উমর (রা) বলিয়াছেনঃ

كِلَاهُمَا زَانٍ (ابن المنذر ابن ابى شيبه، عبد الرزاق)

ইহারা উভয়ই ব্যভিচারী।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলঃ

আমি একটি মেয়ে লোককে বিবাহ করিলাম তাহাকে তাহার স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু সে আমাকে কোন আদেশ করিল না, জানাইলও না। এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ

لَا اِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، اِنْ اَعْجَبَتْكَ اَمْسَكْتَهَا وَاِنْ كَرِهْتَهَا فَارَقْتَهَا وَاِنْ كُنَّا نَعُدُّهٰذَا سِفَاحًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

না ইহা বিবাহ হইবে না। বিবাহ হইবে যদি বিবাহের আন্তরিক আগ্রহ লইয়া বিবাহ করা হয়। অতঃপর তোমার পছন্দ হইলে তাহাকে স্ত্রী হিসাবে রাখিবে আর তাহাকে অপছন্দ করিলে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে।

উক্তরূপ বিবাহকে রাসূলে করীম (স)-এর যুগে আমরা ব্যভিচার গণ্য করিতাম।

তিনি আরও বলিয়াছেনঃ

এইরূপ বিবাহের পর পুরুষ-নারী উভয়ই ব্যভিচারীরূপে গণ্য হইবে বিশ বৎসর পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হইলেও—যখন সে জানিবে যে, সে স্ত্রী লোকটিকে কাহারও জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যেই বিবাহ করিয়াছিল। (فقه السنة)

বিবাহের এক প্রস্তাবের উপর অন্য প্রস্তাব দেওয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ بَعْضٍ. (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং একজনের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর অন্যজন বিবাহের প্রস্তাব না দেয়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা বিবাহের প্রস্তাবদান প্রসঙ্গে এই হাদীস। মূল শব্দ خُطْبَةٌ অর্থ طَلَبُ لِلزَّوَاجِ بِوَسِيْلَةِ الْمَعْرُوْفَةِ بَيْنَ النَّاسِ সমাজের লোকদের মধ্যে প্রচলিত ও—সকলের পরিচিত নিয়মে বিবাহের প্রস্তাব দান। এই প্রস্তাবদান বিবাহের পূর্বশর্ত। বিবাহকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বর ও কনে—উভয় পক্ষের লোকদের সহিত এই উদ্দেশ্যে পরিচিতি লাভের জন্য ইসলামী শরীয়াতে এই ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। হাদীসটির মূল প্রতিপাদ্য ও বক্তব্য সুস্পষ্ট। নবী করীম (স) বিশ্ব মানবের জন্য যে সামাজিক নিয়ম বিধান ও আচার-রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসটি তাহারই একটি অংশ। এই হাদীসটিতে পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় ও বিবাহের প্রস্তাব সংক্রান্ত দুইটি মৌলিক নিয়ম উদ্ধৃত হইয়াছে। ক্রয়-বিক্রয় সামাজিক-সামষ্টিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে খুব বেশী ঘটিতব্য ব্যাপার। একজন বিক্রয় করে, অন্যজন ক্রয় করে। এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর মানুষের জৈবিক জীবন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ক্রয়-বিক্রয় হীন কোন সমাজ-সংস্থার ধারণা পর্যন্ত করা যায় না। ক্রয়-বিক্রয় হইবে না এমন কোন সমাজ ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত পেশ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সেই ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, একজন লোক কোন একটি বিশেষ জিনিস ক্রয় করার জন্য কথা-বার্তা বলিতে শুরু করিয়াছে ও দাম দস্তুর লইয়া আলাপ করিতেছে, ঠিক এই সময় অপর একজনও ঠিক সেই জিনিসটি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে আগাইয়া আসিয়া দুই জনের কথার মধ্যে কথা বলিতে ও নিজের পছন্দসই দাম বলিতে শুরু করিয়া দেয়। কথাবার্তার মাঝখানে এই দ্বিতীয় ক্রেতার অনুপ্রবেশের ফলে প্রথম ক্রেতা-বিক্রেতার বিরক্তির উদ্রেক হওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের কথাবার্তা ভাঙিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। ইহার ফলে দুই ক্রেতার পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠা ও পরম শত্রুতার উদ্ভব হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইহা সুস্থ-শালীনতা পূর্ণ সমাজ পরিবেশের পক্ষে খুবই মারাত্মক। এই কারণে নবী করীম (স) ইহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

এই ব্যাপারে সঠিক নিয়ম হইল একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা শেষ হইয়া ও চূড়ান্তভাবে ভাঙিয়া গেলে অপর জন কথাবার্তা বলিতে শুরু করিবে, তাহার পূর্বে নয়।

বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার ব্যাপারটিও অনুরূপ। এরূপ প্রায়ই হইয়া থাকে যে, একটি ছেলের পক্ষ হইতে একটি মেয়ের বিবাহের কিংবা ইহার বিপরীত একটি মেয়ের পক্ষ হইতে একটি ছেলের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। এই প্রস্তাব কোন চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই অপর একটি ছেলে বা

মেয়ের প্রস্তাব তাহাদের—ছেলে বা মেয়ের—জন্য দেওয়া হইল। ইহাতেও পূর্ববর্ণিত রূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে এবং তাহাতে সমাজ সংস্থার ঐক্য সংহতিতে ফাটল ধরিতে পারে। কিন্তু তাহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

এই পর্যায়ে হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসের ভাষা এইঃ

لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ اِلَّا اَنْ يَّأْذَنَ لَهٗ. (مسلم)

এক ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করিবে না এবং তাহার ভাইর দেওয়া বিবাহ-প্রস্তাবের উপর দ্বিতীয় প্রস্তাব দিবে না। তবে সে ভাই যদি অনুমতি দেয়, তবে ভিন্ন কথা।

হযরত উকবা ইবনে আমের হইতে তৃতীয় একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَّبْتَاعَ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خُطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَذَرَ. (مسند احمد، مسلم)

মু'মিন মু'মিনের ভাই। অতএব এক ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অন্য মু'মিনের ক্রয়-বিক্রয় করিতে চাওয়া হালাল নয়। আর তাহারই এক ভাইয়ের দেওয়া বিবাহ-প্রস্তাবের উপর আর এক প্রস্তাব দিবে না। যতক্ষণ না সে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।

বুখারী ও নাসায়ী গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসে এই কথার স্পষ্ট সমর্থন রহিয়াছে। হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خُطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ

এক ব্যক্তি কোন মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাইবে, অথবা প্রস্তাবদাতা কর্তৃক উহা প্রত্যহৃত হইবে—এই চূড়ান্ত পরিণতি না দেখিয়া অপরকে আর একটি প্রস্তাব দিয়া বসিবে না।

আহমাদ, বুখারী ও নাসায়ী বর্ণিত অপর এক হাদীসের ভাষা এইঃ

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خُطْبَةِ الرَّجُلِ حَتّٰى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهٗ اَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

প্রথম প্রস্তাবদাতা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কিংবা নূতন প্রস্তাব দেওয়ার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি প্রস্তাব দিবে না।

এই সব হাদীস হইতে একথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, একজনের দেওয়া প্রস্তাব চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই আর একটা বিবাহ প্রস্তাব দেওয়া হারাম। এই কাজটির হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরীয়াতবিদদের পূর্ণ ঐকমত্য ও ইজমা রহিয়াছে। বিশেষত প্রথম প্রস্তাবকারীকে ইতিবাচক জওয়াব দেওয়া হইলে ও দ্বিতীয় প্রস্তাবের পক্ষে কোন অনুমতি পাওয়া না গেলে ইহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তবে যদি কেহ জোর পূর্বক প্রস্তাব দেয় এবং বিবাহ সম্পন্ন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে বিবাহটা তো শুদ্ধ হইবে, উহা ভঙ্গ হইয়া যাইবে না; কিন্তু ইহার দরুণ তাহাকেও গুনাহগার হইতে হইবে। জমহুর ও শাফেয়ী ফিকাহবিদদের মত ইহাই। দায়ূদ যাহেরী বলিয়াছেনঃ এই

রূপ বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ইমাম মালিকের দুইটি মত উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি মত শাফেয়ী মতের পক্ষে, আর অপর মতটি দায়ূদ যাহেরীর পক্ষে। মালিকী মাযহাবের অন্যান্য ফিকাহ্‌বিদ্‌রা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই রূপ বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটিয়া গেলে সে বিবাহ ভাঙিবে না। তবে উহার পূর্বে আপত্তি উঠিলে এই বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া হইবে। মালিকী মাযহাবের অন্যান্য কিছু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ্‌দের মত হইল, বিবাহ যদি উভয় পক্ষের মতের ভিত্তিতে হয়, উভয় পক্ষই বিবাহে সন্তুষ্ট হয় এবং উহাতে মহরানা সুনির্দিষ্ট হয়, তবে এই বিবাহ হারাম হইবে না। হযরত ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) বলিয়াছেন, আবূ জহম ও মুয়াবিয়া উভয়ই আমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু নবী করীম (স) একজনের প্রস্তাবের উপর আর একজনের এইরূপ প্রস্তাব দেওয়ার প্রতিবাদ করেন নাই। বরং তিনি হযরত উসামার জন্যও প্রস্তাব পাঠাইলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের এক প্রস্তাবের উপর আর একটি প্রস্তাব দেওয়া বুঝি নিষিদ্ধ বা হারাম নয়। কিন্তু এইরূপ ধারণা ঠিক নহে। কেননা হযরত ফাতিমার উপরোক্ত বর্ণনার ভিন্নতর ব্যাখ্যা রহিয়াছে এবং তাহা এই যে, জহম ও মুয়াবিয়া দুইজনের কেহই হয়ত অন্যজনের প্রস্তাবের কথা জানিতেন না। আর নবী করীম (স) প্রস্তাব দিয়াছিলেন বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক নয়, এই জন্য যে, তিনি রীতিমত কোন প্রস্তাব দেন নাই, তিনি শুধু ইঙ্গিত করিয়াছিলেন মাত্র। কাজেই সাহাবীদ্বয় বা স্বয়ং নবী করীম (স) কোন নিষিদ্ধ কাজ করিয়াছেন, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। তবে প্রথম প্রস্তাবদাতা যদি অপর পক্ষের অনীহা ও অনাগ্রহ হওয়ার দরুন প্রস্তাব প্রত্যাহার বা প্রত্যাখ্যান করে; কিংবা একটি প্রস্তাব থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় প্রস্তাব দেওয়ার অনুমতি কোন পক্ষ দেয়, তবে সেখানে দ্বিতীয় প্রস্তাব দেওয়া হারাম হইবে না। এই ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণ সম্পূর্ণ একমত। পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহ হইতে এই কথাই সুস্পষ্টরূপে জানা যায়।

উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেন, এই হাদীস দুইটির ভাষা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিবাহের এক প্রস্তাবের উপর আর একটি (বিবাহের) প্রস্তাব দেওয়া হারাম হইবে কেবল তখন যদি প্রথম প্রস্তাবদাতা প্রকৃত ও নেককার মুসলমান হয়। কিন্তু সে যদি ফাসেক-ফাজের ধরনের লোক হয়, তাহা হইলে ইহা হারাম হইবে না। ইবনুল কাসেম বলিয়াছেন تَجُوزُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ প্রথম প্রস্তাব দাতা ফাসেক ব্যক্তি হইলে তাহার উপর দ্বিতীয় প্রস্তাব দেওয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

ইমাম আওজায়ীও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই নিষেধ لِلتَّأْدِيبِ সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম-শৃংখলা রক্ষার ও জনগণকে শাসনে রাখার উদ্দেশ্যে। চূড়ান্ত ভাবে হারাম ঘোষণা ইহার লক্ষ্য নহে।

কিন্তু জমহুর মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদগণের মতে এইরূপ নির্ধারণও কাহারও জন্য জায়েয কাহারও জন্য জায়েয নয় বলার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। হাদীসে যে 'ভাই' বলা হইয়াছে, ইহা সাধারণ প্রচলন অনুযায়ীই বলা হইয়াছে। ইহার বিশেষ কোন অর্থ নাই। ইমাম নববী লিখিয়াছেন, এই পর্যায়ে যতগুলি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে নেককার মুসলমান ও ফাসেক-ফাজের মুসলমানের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা চলে না।

.দায়ূদ বলিয়াছেনঃ

إِذَا تَزَوَّجَهَا الْخَاطِبُ الثَّانِى فَسَخَ الْعَقْدُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ

দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতা যদি বিবাহ করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার এই আকদ্‌ ভাঙিয়া দিতে হইবে—বিবাহের পর স্ত্রী সঙ্গম হওয়ার পূর্বে হইলেও এবং পরে হইলেও।

বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া পর্যায়ে দুইটি শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছেঃ

একটিঃ উপস্থিতভাবে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পথে শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন বাধা না থাকা।

দ্বিতীয়ঃ শরীয়াত মুতাবিক বিবাহের প্রস্তাব এখনও অপর কেহ দেয় নাই।

এই দুইটি দৃষ্টিতে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে, তাহা হইলে তখন বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া সঙ্গত কারণেই হারাম হইবে। ইদ্দাত পালনরত মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম, সে ইদ্দাত তালাক দেওয়ার কারণে হউক; কিংবা স্বামীর মৃত্যুর কারণে। আর তালাক রিজয়ী হউক, কি বায়েন। কেননা এই অবস্থাসমূহের মধ্যে কোন একটি অবস্থায়ও স্ত্রী লোকটি বিবাহের উপযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে না। (نبوی، فتح الباری، نیل الاوطار، فقه السنة)

এক সঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِىَّ اَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَسْلَمْنَ مَعَهُ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا.

(ترمذی، مسند احمد، ابن ماجه، دار قطني، البيهقي)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, সাকাফী বংশের গাইলান ইবনে সালামাতা ইসলাম গ্রহণ করিল। এই ব্যক্তির ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের সময়ে দশজন স্ত্রী ছিল। তাহারা ও তাহার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিল। তখন নবী করীম (স) তাহাকে স্ত্রীদের মধ্য হইতে মাত্র চারজন বাছিয়া লইবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

(তরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ, দারে কুতনী, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ইসলামে এক সঙ্গে কয়জন স্ত্রী রাখা জায়েয, এই বিষয়ে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। এই হাদীস হইতে স্পষ্ট জানা যায়, জাহিলিয়াতের যুগে গাইলান সাকাফী দশজন স্ত্রীর স্বামীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইসলাম কবুল করিলে তাঁহার এই স্ত্রীরাও তাঁহার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার পর নবী করীম (স) তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন যে, ইহাদের মধ্য হইতে মাত্র চার জন স্ত্রী বাছিয়া লও এবং স্বীয় স্ত্রীরূপে রাখ। অবশিষ্ট ছয়জন স্ত্রী তোমার স্ত্রীরূপে থাকিতে পারিবে না। কেননা ইসলামে একই সময়ে মাত্র চার জন স্ত্রী রাখা যাইতে পারে, তাহার অধিক একজনও নহে।

নাসায়ী গ্রন্থে এই হাদীসটির শেষাংশের ভাষা এইরূপঃ

فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّخْتَارَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا

নবী করীম (স) তাহাকে স্ত্রীদের মধ্য হইতে মাত্র চার জন পছন্দ করিয়া রাখার জন্য আদেশ করিলেন।

অপর এক বর্ণনায় এই হাদীসটির ভাষা হইলঃ

اِخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا

ইহাদের মধ্য হইতে মাত্র চার জন বাছিয়া লও।

আর একটি বর্ণনার ভাষা এইঃ

اَمْسِكْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (مسند الشافعی)

ইহাদের মধ্য হইতে মাত্র চারজনকে রাখিয়া দাও। আর অবশিষ্ট সকলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও।

এই পর্যায়ের আর একটি হাদীস হইলঃ

أَنَّ عُمَيْرَةَ الْأَسَدِىْ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِىْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (ابو داؤد)

উমাইরাতুল আসাদী বলিয়াছেন, আমি যখন ইসলাম কবুল করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। আমি এই কথা নবী করীম (স)-এর নিকট উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন, ইহাদের মধ্য হইতে মাত্র চার জন বাছিয়া লও। (আবূ দায়ূদ)

মুকাতিল বলিয়াছেন, কাইস ইবনে হারেসের আটজন স্ত্রী ছিল। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম (স) তাহাকে চারজন রাখিয়া অপর চারজনকে ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। (আবূ দায়ূদ)

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস এইরূপঃ

عَنْ نَوْفَلِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيْلِىْ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِىْ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَرْ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شِئْتَ وَفَارِقِ الْأُخْرٰى (مسند الشافعى)

নওফল ইবনে মুয়াবীয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি যখন ইসলাম কবুল করি, তখন আমার পাঁচজন স্ত্রী ছিল। তখন নবী করীম (স) আমাকে বলিলেনঃ তোমার স্ত্রীদের মধ্য হইতে তুমি তোমার ইচ্ছামত যে কোন চারজনকে বাছাই করিয়া লও এবং অবশিষ্টকে বিচ্ছিন্ন কর। (মুসনাদে শাফেয়ী)

এই সব কয়টি হাদীস একত্রে পাঠ করিলে একসঙ্গে রাখা স্ত্রীদের সংখ্যা সম্পর্কে ইসলামী শরীয়াতের বিধান স্পষ্ট ভাবে জানা যায়।। এই ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াতের অকাট্য বিধান হইল, এক সঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা সম্পূর্ণ হারাম। ইহা কেবল মাত্র কাফির থাকা অবস্থায়ই সম্ভব, মুসলমান থাকা অবস্থায় নয়। কোন কাফির যদি একসঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রীর স্বামী হইয়া থাকে, আর এই অবস্থায় সে নিজে এবং তাহার সবকয়জন স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে স্বামীকে এই স্ত্রীদের মধ্য হইতে মাত্র চারজন বাছাই করিয়া লইতে হইবে ও অবশিষ্টদের ত্যাগ করিতে হইবে। কেননা একসঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা যদি ইসলামে জায়েয হইতে, তাহা হইলে—উপরোদ্ধৃত হাদীস সমূহে যেমন বলা হইয়াছে—চারজন মাত্র স্ত্রী রাখিয়া অবশিষ্টদিগকে বিচ্ছিন্ন ও বিদায় করিয়া দিবার জন্য রাসূলে করীম (স) কাহাকেও নির্দেশ দিতেন না। বিশেষত তাঁহারাও যখন স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন তখন সাধারণ বিবেক বুদ্ধির দৃষ্টিতে তাহাদের সকলকেই স্ত্রীরূপে থাকিতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু ইসলামী শরীয়াতের অকাট্য বিধানে এক সঙ্গে চার জনের অধিক স্ত্রী রাখার কোন অবস্থাতেই একবিন্দু অবকাশ নাই। এই কারণে চারজনকে রাখিয়া অবশিষ্টদিগকে ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

এক সঙ্গে অনধিক চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি মূলত কুরআন মজীদে দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ (النساء:٣)

তোমরা বিবাহ কর যত সংখ্যকই তোমাদের মন চাহে—দুইজন, তিনজন, চারজন।

নবী করীম (স) কোন সাহাবী—কোন মুসলমানকেই এক সঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেন নাই। কোন মুসলমানই তাঁহার সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রীর স্বামী ছিলেন না। ইহা হইতে একথাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে চারজন পর্যন্ত স্ত্রীর রাখার জায়েয হওয়া সম্পর্কে এবং ইহার অধিক সংখ্যক স্ত্রী একসঙ্গে রাখার নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে মুসলিম মিল্লাতে কোন কালেই কোন দ্বিমত ছিল না। ইহার উপর ইজমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বর্ণিত ও এখানে উদ্ধৃত সব কয়টি হাদীসের সনদ সম্পর্কে কঠিন প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং তাহা তুলিয়াছেন প্রখ্যাত ও বিশেষভাবে পারদর্শী হাদীস বিশেষজ্ঞগণ; ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই হাদীস সমূহ পরস্পর সম্পূরক। পরস্পর সমার্থক, কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় সমর্থিত এবং রাসূলে করীম (স) কর্তৃক কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত, এই কারণে এক সঙ্গে ও এক সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা নাজায়েয—বরং হারাম হওয়া সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। (تحفة الاحوذى، تفسير محاسن التاويل، تفسير ابن كثير)

বিবাহের পূর্বে কনে দেখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَظَرْتَ اِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِىْ اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا. (مسلم)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিন বলিয়াছেন, আমি একদিন নবী করীমের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাহার নিকট এক ব্যক্তি আসিল। সে রাসূলে করীম (স)-কে জানাইল যে, সে আনসার বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ? লোকটি বলিল, না। রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তাহা হইলে এখনই চলিয়া যাও এবং তাহাকে দেখ। কেননা আনসার বংশের লোকদের চক্ষুতে একটা কিছু আছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে মোট দুইটি কথা জানা যায়। একটি এই যে, নবী করীম (স) আনসার বংশের লোকদের চোখে একটা কিছু থাকার কথা বলিয়াছেন এমন ব্যক্তিকে যে সেই বংশের একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে।

আর দ্বিতীয় কথা এই যে, রাসূলে করীম (স) আনসার বংশের মেয়ের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেই মেয়েটিকে দেখিয়াছ কিনা? সে যখন দেখে নাই বলিয়া জানাইল, তখন নবী করীম (স) মেয়েটিকে দেখার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিলেন।

প্রথম কথাটি সম্পর্কে হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেনঃ এই রূপ বলা কল্যাণকামী ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ জায়েয। ইহা কোন গীবত নয়, নয় তাহারও বিষয়ে মিথ্যা দুর্নাম রটানো বা কোন রূপ বিদ্বেষ ছড়ানো বরং একটা প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচিত করা মাত্র। কেননা আনসার বংশের মেয়েদের চোখে যদি এমন কিছু থাকে যা অন্য লোকদের পছন্দনীয় নাও হইতে পারে, তাহা হইলে সেই মেয়েকে লইয়া দাম্পত্য জীবন সুখের নাও হইতে পারে। তাই পূর্বাহ্নেই সে বিষয়ে জানাইয়া দেওয়া কল্যাণকামী ব্যক্তির দায়িত্বও বটে।

কিন্তু আনসার বংশের লোকদের চোখে কি জিনিস থাকার কথা রাসূল করীম (স) বলিয়াছিলেন? কেহ কেহ বলিয়াছেন, আনসার বংশের লোকদের চক্ষু আকারে ক্ষুদ্র হইত। আর ক্ষুদ্র চোখ অনেকেই স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ করে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহাদের চক্ষু নীল বর্ণের হইত, যাহা অনেক লোকেরই অপছন্দ। রাসূলে করীম (স) এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। মোট কথা, ইহা কোন বিশেষ বংশ বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারণাও নহে।

রাসূলে করীম (স)-এর দ্বিতীয় কথাটি হইতে জানা যায়, যে মেয়েকে বিবাহ করা হইবে, তাহাকে দেখিয়া লওয়া বাঞ্ছণীয়। বিবাহ করার পর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা যে, সে বিয়ে-করা-মেয়েটিকে দেখিয়াছে কিনা, ইহার দুইটি তাৎপর্য হইতে পারে? হয় ইহা হইবে যে, বিবাহ করার পূর্বে তাহাকে

দেখিয়াছ কিনা। নতুবা এই হইবে যে, বিয়ে করার পর-পরই তাহাকে দেখিয়াছ কিনা। আলোচ্য লোকটি বিবাহ করিয়াছে, এই সংবাদ দেওয়ার পর নবী করীম (স) তাহাকে চলিয়া যাইতে ও তাহাকে দেখিতে বলিলেন—দেখিতে হুকুম করিলেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এই ঘটনা হইতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলঃ

ندب مَنْ اَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ اِلَى اَنْ يَنْظُرَ اِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا قَبْلَ خِطْبَتِهَا

যে মেয়েকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা বা সংকল্প করা হইয়াছে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বেই তাহার মুখাবয়ব ও হস্তদ্বয় দেখিয়া লওয়া মুস্তাহাব—পছন্দনীয় ও বাঞ্ছনীয়।

ইহা মুসলিম শরীফে এতদ্‌সংক্রান্ত হাদীস সমূহের শিরোনামা। কিন্তু এই শিরোনামার অধীন মাত্র দুইটি হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার একটি এখানে উদ্ধৃত করিয়াছি। আর দ্বিতীয়টিও হযরত আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত এবং তাহাতেও আনসার বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করা সংক্রান্ত একটি ঘটনার বিবরণ বলা হইয়াছে। তবে এই দ্বিতীয় হাদীসটির ঘটনা কতকটা ভিন্নতর। তাহাতে বলা হইয়াছে, এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলে করীম (স)কে জানাইল, সে আনসার বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করিয়াছে। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ هَلْ نَظَرْتَ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِىْ عُيُوْنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا 'তুমি কি সে মেয়েটিকে দেখিয়াছ?' কেননা আনসারদের চোখে কিছু একটা আছে? লোকটি বলিল, قَدْ نَظَرْتُ اِلَيْهَا 'হ্যাঁ, আমি তাহাকে দেখিয়াছি।'

কিন্তু এই দুইটি হাদীসের কোন একটিতেও একথার উল্লেখ নাই যে, বিবাহ করার পূর্বে মেয়েটিকে দেখিয়াছে কিনা, নবী করীম (স) এই কথাই জানিতে চাহিয়াছিলেন। হইতে পারে বিবাহের পর দেখিয়াছে কিনা, তাহাই তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন। হইতে পারে, বিবাহের পূর্বে দেখার কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন। রাসূলের জিজ্ঞাসার জওয়াবে প্রথমোদ্ধৃত হাদীসের লোকটি জানাইল, সে মেয়েটিকে দেখে নাই। আর দ্বিতীয় হাদীসের লোকটি বলিল, সে দেখিয়াছে। কিন্তু এই দেখার ব্যাপারে কি বিবাহের পূর্বের সঙ্গে জড়িত, না বিবাহের পরে দেখার সহিত এবং প্রথম ব্যক্তি না দেখার কথা বলিয়াছে তাহা কি বিবাহের পূর্বের ব্যাপার না বিবাহের পরের ব্যাপার? এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হাদীস ও ফিকাহবিদগণ এই সব ও এই সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, যে, মেয়েকে বিবাহ করার ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করার পূর্বে এমনকি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ারও পূর্বে দেখিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী, মাযহাবের ইহাই মত। সমস্ত কুফী ফিকাহ্‌বিশারদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও জমহুর হাদীসবিদগণও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। কাযী ইয়ায বলিয়াছেন, কোন কোন লোক বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখা বিবাহেচ্ছু পুরুষের জন্য মকরূহ। কিন্তু ইমাম নববী লিখিয়াছেন, ইহা সঠিক মত নয়। কেননা এই মত এই হাদীসের ও সমস্ত উম্মতের ইজ্‌মা'র পরিপন্থী। বিশেষতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার লেন-দেন কালে মূল জিনিসটিকে পূর্বেই দেখিয়া ও যাচাই পরখ করিয়া লওয়া সম্পূর্ণ জায়েয এবং ইসলামে ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বিবাহও অনুরূপ একটি সামাজিক ব্যাপার। বিবাহে সাধারণতঃ ভিন্ন এক পরিবারের আদেখা-অচেনা-অজানা একটি মেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবারের অতীব আদব ও মর্যাদা সম্পন্ন সদস্য হইয়া যায়। মেয়েটিকে লইয়া একটি পুরুষের জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ছেলেটির বংশের ধারা সম্মুখে অগ্রসর হইবে, সে হইবে তাহার সন্তানের মা—পরবর্তী বংশধরের উৎস কেন্দ্র। কাজেই সে মেয়েটি সর্বদিক দিয়া পছন্দমত কিনা তাহা ছেলেটির ভাল ভাবে দেখিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা অতীব যুক্তিপূর্ণ কথা।

বিবাহের পূর্বে কনে দেখা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সেই দেখার মাত্রা কতখানি? ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

إِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ النَّظْرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَط

মেয়েটির শুধু মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় দেখাই ছেলেটির জন্য জায়েয।

ইহার কারণ বলা হইয়াছে, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় যেহেতু মেয়ের 'সতর' বা 'অবশ্য আচ্ছাদনীয় অঙ্গ' নয়, কাজেই তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা বা দেখা একজন ভিন্ পুরুষের জন্য নাজায়েয নয়। দ্বিতীয়তঃ মুখমণ্ডল দেখিলেই তাহার রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে—মেয়েটি সুন্দরী-রূপসী, সুদর্শনা না কৃষ্ণ-কুৎসিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর হস্তদ্বয় দেখিলে সমস্ত দেহের গঠন-সংস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। সমস্ত ফিকাহবিদের ইহাই অভিমত। ইমাম আওজায়ী বলিয়াছেন, মেয়েদের দেহের মাংসল স্থান সমূহ দেখিবে। আর দায়ূদ যাহেরী বলিয়াছেন, يَنْظُرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا মেয়েটির সমস্ত দেহ ও অংগ-প্রতঙ্গ দেখিবে। কিন্তু এই দুইটি মত সম্পর্কে ইমাম নববী লিখিয়াছেন, এই মত সুন্নাত ও ইজমার মূল নীতির পরিপন্থী।

কনেকে দেখার ব্যাপারে তাহার পূর্বানুমতি গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি? এই বিষয়ে ইমাম নববী লিখিয়াছেন, সকল মাযহাব ও জমহুর ফিকাহবিদদের মতে বিবাহের উদ্দেশ্যে মেয়েকে দেখার ব্যাপারে তাহার পূর্বানুমতির বা পূর্ব সম্মতির কোন প্রয়োজন নাই। বরং মেয়ের অজ্ঞাতসারেই তাহার অসতর্ক থাকা অবস্থায় এবং পূর্ব জানান ব্যতিরেকেই তাহাকে দেখার অধিকার বিবাহেচ্ছু ছেলের রহিয়াছে। তবে ইমাম মালিক বলিয়াছেন, মেয়ের অসতর্কতাবস্থায় তাহাকে দেখা আমি পছন্দ করি না। কেননা তাহাতে মেয়ের 'সতর'—অবশ্য আচ্ছাদনীয় অংগের উপর দৃষ্টি পড়ার আশংকা রহিয়াছে। মেয়ের অনুমতিক্রমে মেয়েকে দেখিতে হইবে। এ মতও যথার্থ নয়। কেননা নবী করীম (স) দেখার অনুমতি দিয়াছেন বিনা শর্তে। তাহার পূর্বানুমতি বা সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কথা রাসূলে করীম (স) বলেন নাই। আর অনুমতি চাওয়া হইলে সে হয়ত লজ্জায় অনুমতি দিবে না, ইহার আশংকা রহিয়াছে। উপরন্তু সেরূপ দেখায় প্রতারিত হওয়ারও আশংকা রহিয়াছে। অনেক সময় এমনও হয় যে, মেয়েকে রীতিমত জানান দিয়া ছেলে তাহাকে দেখিল, কিন্তু সে মেয়েকে পছন্দ করিতে পারিল না। ফলে সে তাহাকে বিবাহ করিতে রাযী হইতে পারিল না, তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। ইহাতে মেয়েটির কি পরিণতি হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার ফলে মেয়েটি সমাজে অবাঞ্ছিতা ও পরিত্যক্তা হইয়া যাইতে পারে। আর শেষ পর্যন্ত ইহা যে এক নিদারুণ কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই কারণেই শরীয়াত বিশেষজ্ঞগণ মত দিয়াছেন যে, কোন মেয়েকে বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বেই তাহাকে ছেলের দেখিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। তখন যদি পছন্দ না হয়, ও বিবাহ করিতে অরাযী হয়, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও কোন লজ্জা অপমান বা মনোকষ্টের কারণ ঘটিবে না।

বিশেষজ্ঞগণ আরও বলিয়াছেন, ছেলের নিজের পক্ষে কাঙ্খিতা মেয়েকে দেখা যদি সম্ভবই না হয়, তাহা হইলে সে আপনজনের মধ্য হইতে কোন এক মেয়ে লোককে পাঠাইয়া মেয়ে সম্পর্কে যাবতীয় খবরাখবর লইবে। কিন্তু এই সবই আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে হওয়া উচিত, পরে নয়।

একালে মেয়ের ছবি দেখার একটা সাধারণ প্রচলন—বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলে ও আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত ভদ্র সমাজে রহিয়াছে। তবে ছবিদ্বারা মুখ ও অবয়ব সম্পর্কে একটা ভাষা-ভাষা ও অস্পষ্ট ধারণা করা যায় বটে; কিন্তু সে সত্যই মনপুত কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাই কেবল মাত্র ছবি দেখিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত হইবে না। (نبوى، عمدة القارى)

عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ خَطَبَ اِمْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُودَمَ بَيْنَكُمَا. (ترمذى)

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি একজন মেয়েলোককে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিলেন। তখন নবী করীম (স) বলিলেন, তুমি মেয়েটিকে (আগেই) দেখিয়া লও। কেননা এই দর্শন তোমাদের মধ্যে সম্পর্কের স্থায়িত্ব আনিয়া দেওয়ার জন্য অধিকতর কার্যকর ও অনুকূল হইবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে বিবাহ করার পূর্বে কনেকে দেখার জন্য নবী করীম (স)-এর স্পষ্ট নির্দেশ উচ্চারিত হইয়াছে। এই দেখার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা নবী করীম (স) নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। আর তাহা হইল, এই দর্শন তোমাদের দুইজনের মনে ঐকান্তিকতা, আন্তরিকতা, মনের আকর্ষণ, সংগতি, সহমর্মিতা ও সংহতি জাগাইয়া দিবে। দুই জনের মধ্যে আনুকূল্য ও পারস্পরিক কল্যাণ কামনার সৃষ্টি করিবে। আর ইহার ফলে তোমাদের দাম্পত্য জীবন দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে। তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার মাধুর্যে মাদকতায় ভরপুর ও সুদৃঢ় হইয়া থাকিবে। কখনই মনোমালিন্য ও ছাড়াছাড়ির কারণ ঘটিবে না। কেননা পারস্পরিক পরিচিতি ও ভালবাসার ফলে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে পরবর্তীকালে কোনরূপ ক্ষোভ বা অনুশোচনার কারণ দেখা দিবে না বলিয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আশা করা যায়।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর ইহার অর্থ লিখিয়াছেনঃ

اَحْرٰى اَنْ تَدُوْمَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا

তোমাদের দুইজনের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা ইহার (বিবাহ পূর্বে দেখার) ফলে স্থায়ী হইয়া থাকিবে।

অতঃপর ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেনঃ

قَالُوْا لَا بَاْسَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهَا مَالَمْ يَرِمِنْهَا مُحَرَّمًا

বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেনঃ যে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে, প্রস্তাবক পুরুষ বিবাহের পূর্বে তাহাকে দেখিলে—অবশ্য তাহার দেহের হারাম অঙ্গ না দেখিলে—কোনই দোষ হইবে না।

এই পর্যায়ের আর একটি হাদীস হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমাতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِذَا اَلْقَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِىْ قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ اِمْرَأَةٍ فَلَا بَاْسَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهَا.

(ابن ماجه، مسند احمد، ابن حبان، حاكم)

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন পুরুষের দিলে কোন মেয়েকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দেয়ার ইচ্ছা জাগাইয়া দেন, তখন সে মেয়েটিকে দেখিবে তাহাতে কোনই দোষ নাই।

(ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

অনুরূপভাবে হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছিঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَاَنْ يَّرٰى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ-

(ابوداؤد ، مسند احمد)

তোমাদের কেহ যখন কোন মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিবে, তখন সেই মেয়ের দেহের এমন কোন অংশ দেখা যদি সেই পুরুষের পক্ষে সম্ভব হয় যাহা তাহাকে বিবাহ করিতে সেই পুরুষকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহী করিবে, তবে তাহা তাহার এইকাজ অবশ্যই করা উচিত।

(আবূ দায়ূদ, মুসনাদে আহমাদ)

এই হাদীসটির শেষাংশে হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেন, রাসূলে করীমের এই কথা শুনার পর আমি বনু সালমা বংশের একটি মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলাম। অতঃপর আমি তাহার এমন কিছু দেখার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম যাহা তাহাকে বিবাহ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে فَكُنْتُ اَخْتَبِئُ لَهَا تَحْتَ الْكَرَبِ আমি তাহাকে দেখিবার জন্য খেজুর গাছের ডালের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিলাম। পরে সেই রকম কিছু দেখিতে পাওয়ায় আমি সেই মেয়েকেই বিবাহ করিলাম। (مسند احمد)

রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত কথাটি আবূ হুমাইদ এই ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّنْظُرَ مِنْهَا اِذَا كَانَ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَاِنْ كَانَتْ لَاتَعْلَمْ.

(مسند احمد، طبرانی، بزار)

তোমাদের কেহ যখন কোন মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিবে, তখন এই প্রস্তাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেই মেয়ের দেহের কোন অংশ যদি সে দেখে—এরূপ অবস্থায় যে, সে মেয়ে তাহা টেরই পায় না, তবে তাহাতে কোনই দোষ হইবে না।

বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে মেয়েকে দেখার জন্য ইসলামী শরীয়াতে এই যে উৎসাহ দান করা হইয়াছে—নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়াছেন, ইহার মূলে একটি কারণ হইল, ইসলামী সমাজে মেয়ে পুরুষে অবাধ মেলা-মেশার কোন সুযোগ থাকিতে পারে না। তথায় সহশিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। ছেলেরা অবাধে মেয়েদিগকে দেখার কোনই সুযোগ পাইতে পারে না। গোপন বন্ধুতা, প্রেম-ভালবাসা, সহঅভিনয় ও হোটেল-রেস্তোঁরা-পার্কে-খেলার মাঠে- ক্লাসে-সভা-সম্মেলনে পরস্পরকে প্রকাশ্যভাবে দেখার, কথাবলার, পারস্পরিক জানা-জানির কোন সুযোগ হয় না। এই কারণেই বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার সময় যাহাতে পরস্পরকে দেখিতে ও পছন্দ করিতে পারে এবং পারস্পরিক বুঝা-শুনার পরই বিবাহিত হইতে পারে, এই জন্যই ইসলামে এই সুযোগ রাখা হইয়াছে। বর্তমান নগ্নতা ও অবাধ মেলা-মেশার যুগেও যে সব পরিবারে শরীয়াত মুতাবিক পর্দা পালিত হয়, সে সব ক্ষেত্রে বিবাহের প্রস্তাব পূর্বে এইরূপ কনে দেখারও প্রচলন রহিয়াছে। ইহা মূলত ইসলাম প্রবর্তিত একটি অতীব কল্যাণকর প্রচলন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কনের বাঞ্ছিত গুণাবলী

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

(بخاری،مسلم، ابوداؤد ، نسائی، ابن ماجه)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ কনে বাছাই করার সময় চারটি বিষয়ে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। কোন মেয়েকে বিবাহ্ করা হয় তাহার ধন-সম্পত্তির জন্য, তাহার বিশেষ বংশীয় মর্যাদা ও বিশেষত্বের জন্য, তাহার রূপ ও সৌন্দর্যের জন্য এবং তাহার ধার্মিকতা ও ধর্মপালন প্রবণতার জন্য। অতএব তুমি অন্য সবদিক বাদ দিয়া কেবলমাত্র ধার্মিকতা ও দ্বীন-পালনকারী মেয়েকে গ্রহণ করিয়াই সাফল্য মণ্ডিত হও।.... তোমার দুই হাত মাটিতে মিশ্রিত হউক...।

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, লোকেরা সাধারণত কনে বাছাই করার সময় এই চার গুণের দিকেই গুরুত্ব দিয়া থাকে এবং এই গুণগুলি কিংবা ইহার কোন একটি গুণ যে মেয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মেয়েকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। ইহা যেমন মানব সমাজের চিরকালের সাধারণ নিয়ম, তেমনি ইহা মানুষের রুচি ও পছন্দ বাছাইয়ের যুক্তিসম্মত মানও বটে। যে কোন ধরনের একটা মেয়ে পাওয়া গেলেই মানুষ তাহাকে বিবাহ করার জন্য আগ্রহী ও উৎসাহী হইয়া উঠে না।

এই গুণ কয়টির মধ্যে প্রথম হইতেছে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হওয়া। মেয়ে নিজে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইবে; কিংবা সে কন্যা হইবে কোন ধন-সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তির। প্রায়ই দেখা যায়, বিবাহেচ্ছু যুবক ধন-সম্পত্তির অধিকারী কোন পরিবারের মেয়ে বিবাহ করিতে চায়। ইহার পিছনে যে মনস্তত্ব কাজ করে, তাহা হইল, স্ত্রীর অর্থ-সম্পদে সুখী জীবন যাত্রার ভাবনা-চিন্তাহীণ সুযোগ লাভ। উপরন্তু স্ত্রী নিজে ধন-সম্পত্তির মালিক হইলে স্বামীর উপর স্ত্রীর দাবি-দাওয়া কিংবা পরিবার পরিচালন্যর ব্যয় নির্বাহ্ করার দায়িত্ব অনেক কম চাপিবে। অথবা শ্বশুরের মৃত্যুর পর অনেক সম্পত্তি মীরাসী সূত্রে পাওয়ার আশা মানসলোকে প্রবল হইয়া থাকে। আর শ্বশুরের জীবদ্দশায় ও শ্বশুর বাড়ীর উপঢৌকনে সুখের বন্যা প্রবাহিত হইবে।

মুহাল্লাব বলিয়াছেন, হাদীসের এই কথাটি প্রমাণ করে যে, স্ত্রীর ধন-সম্পদে স্বামীর ভোগাধিকার আছে। স্ত্রী যদি নিজ খুশীতে স্বামীকে টাকা-পয়সা দেয় তবে তাহা ভোগ-ব্যবহার করা তাহার জন্য সম্পূর্ণ জায়েয। কিন্তু স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছামত নিজের টাকা পয়সা ব্যয় করিতে বাধ্য করার কোন অধিকার স্বামীর নাই। ইমাম আবূ হানীফা, সওরী ও ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেনঃ

لَا تُجْبَرُ عَلٰى شَرَاءِ مَالَا تُرِيْدُ

স্ত্রী যাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নয়, তাহার অর্থ দ্বারা তাহাকে সেই জিনিস ক্রয় করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

আর স্বামীর দেওয়া মহরানার নিরংকুশ মালিক স্ত্রী। মহরানা বাবত পাওয়া অর্থ বা সম্পদ লইয়া সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে। সে ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রীর ইচ্ছার উপর প্রাধান্য বা অধিক প্রভাবশালী হওয়ার অধিকারী নয়।

দ্বিতীয় যে গুণটির জন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করার আগ্রহ একজন বিবাহেচ্ছু যুবকের মনে সাধারণত জাগে তাহা হইল মেয়ের বিশেষ বিশেষত্ব। মূল আরবী শব্দ হইলঃ حَسَبُهَا। حَسَبٌ হইল সেই জিনিস যাহা মানুষ সাধারণত পৈতৃক বা বংশীয় গৌরবের বিষয় রূপে গণ্য করে। এই জন্য ইহার অর্থ হইল اَلشَّرَفُ بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ পিতৃ পুরুষ বা বংশীয় ও নিকটাত্মীয়দের সূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক মান-মর্যাদা ও বিশেষত্ব। এই কথাটিও সাধারণ সামাজিক প্রথার দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে। কেননা কোন লোক বা পরিবার যদি বংশীয় মর্যাদা লইয়া গৌরব করে—গৌরব করার মত বংশ মর্যাদা থাকে, তখন লোকেরা ইহাকে একটা বিশেষ গুণ ও বিশেষত্ব রূপে গণ্য করে। অনেক ক্ষেত্রে বেশী সংখ্যক লোক সম্পন্ন পরিবার বা বংশ বিশেষ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হইয়া থাকে। অনেকে মনে করিয়াছেন, এখানে حَسَبٌ বলিতে উত্তম ও ভাল ভাল কাজ বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ পারিবারিক উচ্চতর ঐতিহ্য।

তৃতীয় বিষয় হইল, মেয়ের রূপ ও সৌন্দর্য। কনের রূপ ও সৌন্দর্য সাধারণভাবে প্রায় সকলের নিকটই অধিক আকর্ষণীয়। আর সব জিনিসেরই রূপ ও সৌন্দর্য প্রত্যেক মানুষেরই প্রার্থিত ও কাঙ্খিত। বিশেষ করিয়া স্ত্রীর সুন্দরী ও রূপসী হওয়াটা সব বিবাহেচ্ছু যুবকের নিকটই কাম্য। কেননা স্ত্রীই হয় স্বামীর জীবন-সঙ্গিনী, চির সহচর। স্ত্রীর মুখ ও অবয়বের উপর স্বামীর দৃষ্টি সব সময়ই আকর্ষিত ও আপতিত হইয়া থাকে। কাজেই স্ত্রীর সুন্দরী রূপসী হওয়ার কামনা প্রত্যেক বিবাহেচ্ছুর মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান থাকে। ইহা চিরকালই মনস্তাত্ত্বিক সত্য ও শাশ্বতরূপে বিবেচিত।

চতুর্থ বিষয় হইল, মেয়েটির ধার্মিক ও সচ্চরিত্রশীলা হওয়া। বস্তুত বিবাহেচ্ছু যুবক যদি ধর্ম বিশ্বাসী ও চরিত্রবাদী হয়, তাহা হইলে তাহার অর্ধাঙ্গিণী ও চিরসহচরীরও ধার্মিকা ও চরিত্রশীলা হওয়া স্বাভাবিক ভাবেই তাহার নিকট কাম্য হইয়া থাকে। এমন যুবক নিশ্চয়ই এমন মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে রাযী হয় না, যে-মেয়ে ধর্মবিশ্বাসী ও ধর্মানুসারী নয়। আর ধর্মের সাথে চরিত্রের ওতোপ্রোত সম্পর্ক। যে লোক প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বিশ্বাসী ও ধর্মানুসারী, সে অবশ্যই আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। আর যে লোক কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয়, তাহার চরিত্র বলিতেও কিছু নাই। কেননা 'চরিত্র' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ধর্ম হইতেই নিঃসৃত ও উৎসারিত। এক কথায়, ধর্মই চরিত্রের উৎস। এই কারণে যে মেয়ে ধর্ম মানে না, ধর্মানুসারী নয়, তাহার চরিত্রের নিষ্কলুষতা বিশ্বাস্য নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়। ইহা সাধারণত সমস্ত ধার্মিক সমাজেরই রুচি, প্রবণতা ও রেওয়াজ। কেননা প্রকৃত পক্ষে ইহকাল ও পরকাল—উভয় জীবনের সমস্ত কল্যাণ কেবল মাত্র দ্বীন পালনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। তাই দুনিয়ার দ্বীনদার আত্মমর্যাদাবোধ ও সুরুচিসম্পন্ন সব লোকের দৃষ্টি সাধারণতঃ মেয়ের ধার্মিকতা—অতএব চরিত্রবতী হওয়ার উপরই অধিক গুরুত্ব নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বিশেষত ইহা চির জীবনকালেরও বংশানুক্রমিক ব্যাপার।

আর এই কারণেই নবী করীম (স) কনের এই গুণটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং কথার শেষ ভাগে বলিয়াছেনঃ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ অতএব তুমি—বিবাহেচ্ছু প্রত্যেক যুবকই—দ্বীন বিশ্বাসী ও দ্বীন পালনকারী কনে গ্রহণ করিয়া সাফল্য মণ্ডিত হও।

বস্তুত কনে বাছাই করার ব্যাপারটি অত্যন্ত দুরূহ। কনের সন্ধানে বাহির হইয়া এত বিচিত্র ধরনের মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যে, তন্মধ্যে কাহাকে গ্রহণ করিবে, কাহাকে অগ্রাহ্য করিবে, তাহা চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। তাই জীবন-সমস্যার সমাধান উপস্থাপক ও বিশ্বমানবতার শাশ্বত দিশারী হযরত মুহাম্মাদ (স) এই সমস্যাটিরও নির্ভুল সমাধান পেশ করিয়াছেন। আর তাহা হইল, একটি ধার্মিকা ও দ্বীন পালনকারী মেয়ে খোঁজ করিয়া লওয়া ও তাহাকেই বিবাহ করা

বাঞ্ছনীয়। কেননা, স্ত্রী যদি দ্বীন পালনকারী হয়, তাহা হইলে ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করা সম্ভব হইবে। অবশ্য এই কথার অর্থ এই নয় যে, ধার্মিকা হইলে তাহার সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও ধনী কন্যা বা ধনশালিনী হওয়া চলিবে না। রাসূলের কথার আসল তাৎপর্য হইল সব কয়টি গুণের উপর এই গুণটির অগ্রাধিকার রহিয়াছে, অতএব এই গুণটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হইবে, অন্য গুণ ইহার পরে কাম্য, প্রথমেই নয়। মেয়েটি যদি দ্বীন-পালনকারী না হয়, আর হয় রূপে অপসরা, ধনে-মানে অতুলনীয়, তবে সে এমন কনে নয়, যাহাকে খুব আগ্রহ উৎসাহ ভরে গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে মেয়েটি যদি দ্বীনদার হয় এবং অন্যান্য কোন একটি গুণও না থাকে, তবে তাহাকে বিবাহ করাই বাঞ্ছনীয়।

হাদীসের শেষ কথাটি হইলঃ تَرِبَتْ يَدَاكَ 'ইহার শাব্দিক অর্থঃ তোমার হস্তদ্বয় মাটিযুক্ত হউক'। কিন্তু এই অর্থ এখানে লক্ষ্য নয়। এখানে ইহার সম্পূর্ণ বাক্যরূপ হইল, تَرِبَتْ يَدَاكَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ مَا اَمَرْتُ بِهٖ আমি তোমাকে এই যে আদেশ করিলাম, তুমি যদি তাহা কাজে পরিণত না কর, তাহা হইলে তোমার হস্তদ্বয় মাটি যুক্ত হউক। —অর্থাৎ তোমার দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। মুহাদ্দিস কিরমানী রাসূলে করীম (স)-এর মূল কথার শেষ বাক্যটির অর্থ করিয়াছেনঃ তোমার নিকট যখন সমস্ত ব্যাপার সবিস্তারে বলা হইল, তখন ইহার মধ্যে সর্বোত্তম কাজটি—দ্বীনদার কনে বিবাহ অবশ্যই করিবে। আর এই কথা দ্বারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীনদার লোকদের সাহচর্য গ্রহণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বস্তুত জীবন-সংগ্রামে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ইহাই।

এই পর্যায়ের আর একটি হাদীস এইঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى اِحْدٰى خِصَالٍ ثَلَاثَةٍ ـ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى مَالِهَا وَتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى جَمَالِهَا وَتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى دِيْنِهَا فَخُذْ ذَاتَ الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ.

(مسند احمد، ابن حبان، ابو يعلى، بزار)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ তিনটি বিশেষত্বের যে কোন একটির কারণে একটি মেয়েকে বিবাহ করা হয়। একটি মেয়েকে বিবাহ করা হয় তাহার ধন ও ঐশ্বর্যের কারণে, একটি মেয়েকে বিবাহ করা হয়, তাহার রূপ ও সৌন্দর্য দেখিয়া, আর একটি মেয়েকে বিবাহ করা হয়, তাহার দ্বীনদারী ও ধর্মপরায়নতা দেখিয়া। কিন্তু তুমি গ্রহণ কর দ্বীনদার ধার্মিকা ও চরিত্রবতী মেয়ে। তোমার ডান হাত মাটি মুক্ত হউক। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হাবান, আবু ইয়া'লী, বাজ্জার)

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতেও বিবাহ ও কনে বাছাই করার ব্যাপারে সমাজে সাধারণ প্রচলিত রেওয়াজেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কথার ধরন এই যে, সমাজে সাধারণত এই সব দৃষ্টিকোণ ও মানদণ্ডে কনে বাছাই করা হয়। কিন্তু রাসূলে করীম (স)-এর আদর্শবাদী ও অনুসারী ব্যক্তির পক্ষে ইহার মধ্যে কোন্ দৃষ্টিকোন অবলম্বন করা উচিত এবং কোন্ ধরনের মেয়েকে জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করা কল্যাণকর, তাহা জানাইয়া দেওয়াই এই পর্যায়ের হাদীস সমুহের মূল ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেই সঙ্গে কনে বাছাই করার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রচলিত রেওয়াজের অসারতা দেখানোও এই লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রী গ্রহণের সময় লোকেরা সাধারণত নিজ নিজ রুচি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী বিশেষ গুণ সম্পন্না মেয়ের সন্ধান করিয়া থাকে। যাহারা অর্থলোভী, তাহারা কোন্ মেয়ে বা কাহার মেয়ে বিবাহ করিলে

ধন-সম্পত্তি লাভ করা যাইবে, তাহারই সন্ধান করিয়া বেড়ায়। অন্য কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, সেদিকে লক্ষ্য দেওয়ার তাহারা কোন প্রয়োজন বোধ করে না। তাহাদের দৃষ্টিতে ধন-সম্পত্তির মূল্য ও মর্যাদা সর্বাধিক ও সর্বোচ্চে। উহা পাইলেই অন্য সব বিষয়ে একেবারে অন্ধকার হইলেও আপত্তি বা অনিচ্ছার কোন কারণ নাই।

যাহারা কেবল রূপ ও সৌন্দর্যের পিপাসু, তাহারা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও অপসরা তুল্য রূপসী কন্যার খোঁজ করে। তাহাদের মতে কন্যার চোখ ঝলসানো রূপ ও সৌন্দর্য থাকাই অধিক কাম্য। তাহা মাকাল ফলের ন্যায় লাল খোসার তলায় মলিন অভ্যন্তর হইলেও তাহাদের জন্য তাহা ক্ষতির বা অপছন্দের কারণ হয় না। রূপই তাহাদের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। চরিত্র পশুর অপেক্ষাও খারাপ হইলে তাহাদের কিছুই আসিয়া যায় না।

অনেকে আবার উচ্চ ও অভিজাত বংশের মেয়ে বিবাহ করিয়া জাতে উঠিতে চায়। কিন্তু সে উচ্চ ও অভিজাত বংশীয় মেয়েটি নিজে কি পদার্থ, তাহার বিচার ও বিবেচনা ইহাদের নিকট নিষ্প্রয়োজন।

অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। এমন লোকও আছে, যাহারা প্রধানত দ্বীনদার চরিত্রবতী মেয়েই পাইতে চায়। অন্যান্য দিক না হইলেও ক্ষতি নাই।

ইহা যেমন সমাজের সাধারণ প্রচলন, তেমনি সমাজের লোকদের বিভিন্ন রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যমানের পার্থক্যেরও ফসল। কিন্তু রাসূলে করীম (স) তাঁহার অনুসারী আদর্শবাদী লোকদের জন্য কনে বাছাই করার একটা বিশেষ মানদণ্ড দিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আলোচ্য তিনটি দৃষ্টিকোন ও মূল্যমানের মধ্যে প্রথম দুইটি শুধু ধন-সম্পত্তির কারণে বা রূপ ও সৌন্দর্য বা বংশ গৌরবের দৃষ্টিতে অন্ধভাবে কোন মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী বানানো কোন মতেই উচিত হইতে পারে না। কেননা এই কয়টি বিশেষত্ব নিতান্তই বাহ্যিক, বস্তুনিষ্ঠ ও ক্ষণস্থায়ী। ধন-সম্পত্তি যায় এবং আসে। শ্রেষ্ঠা সুন্দরীও অরূপা ও কুৎসিত হইয়া যায়। যে কোন কারণে তাহা হইতে পারে। কাজেই যে গুণ ও বিশেষত্ব স্থায়ী ও চিরন্তন, সেই বিশেষত্ব যে মেয়ের আছে, সেই মেয়েকেই বিবাহ করা রাসূলের আদর্শবাদী ও অনুসারী লোকের কর্তব্য। বিশেষত যাহার সহিত দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহার গুণ-বিশেষত্ব ও স্থায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উপরে উদ্ধৃত হাদীস দুইটিতে এ বিষয়ে ইতিবাচক কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু নবী করীম (স) এ সম্বন্ধে কেবল ইতিবাচক কথা বলিয়াই শেষ করেন নাই। তিনি এ বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধবাণীও উচ্চারণ করিয়াছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّيْنِ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ أَفْضَلُ. (ابن ماجة)

তোমরা কোন মেয়েকে কেবল তাহার বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য দেখিয়াই বিবাহ করিও না। কেননা ইহা অসম্ভব নয় যে, তাহার রূপ ও সৌন্দর্য তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখে পৌঁছাইয়া দিবে। তোমরা কোন মেয়েকে এই উদ্দেশ্যেও বিবাহ করিও না যে, তাহার ফলে ধন-সম্পত্তি লাভ করা যাইবে। কেননা ইহার সম্ভাবনা অনেক বেশী যে, তাহার ধন-সম্পত্তি তাহাকে বিদ্রোহী অনমনীয়া বানাইয়া দিবে। বরং তোমরা একটি মেয়েকে বিবাহ কর তাহার দ্বীনদারীর চরিত্র দেখিয়া। বস্তুত একটি দ্বীনদার কানকাটা, নাককাটা, কৃষ্ণাঙ্গী ক্রীতদাসীও উত্তম।

রাসূলে করীম (স)-এর এই বাণীটি হইতেও অধিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, কেবল রূপ ও সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদ পাওয়ার আশার ভিত্তিতে কোন মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে—ইসলামী আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে ইহার মূল্য খুবই সামান্য ও নগণ্য। বরং নিছক সুন্দরী রূপসী ও নিছক বিত্তশালী মেয়ের তুলনায় নিছক ধার্মিকা ও ধর্মানুসারী মেয়ে অনেক ভাল। আর মেয়ে যদি ধার্মিকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীও হয় কিংবা হয় ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী, তবে সেত সোনায় সোহাগা। কনে বাছাই করার ব্যাপারে ইসলামের এই দৃষ্টিকোন ও মানদণ্ড বৈষয়িক ও বস্তুনিষ্ট নয়। ইহা একান্তভাবে আদর্শভিত্তিক এবং ইসলামী আদর্শবাদী লোকদের নিকট এই দৃষ্টিভঙ্গীই অধিক প্রিয় ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। (مرقات، بلوغ الامانى، نبوى، عمدة القارى)

হাদীসের এই সব দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার ভিত্তিতে আল্লামা ইবনুল হুমাম লিখিয়াছেন, কেহ যখন কোন মেয়ের মান-মর্যাদার জন্য, কিংবা তাহার ধনমাল পাওয়ার আশায় অথবা তাহার বংশ গৌরবের কারণে তাহকে বিবাহ করে, তখন সে শরীয়াতের দৃষ্টিতে একটা নিষিদ্ধ কাজ করে। কেননা নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَءَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلاَّ ذُلاًّ وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَا لِهَا لَمْ يَزِدْهُ اِلاَّ فِقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اِلاَّدَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْءَةَ لَمْ يُرِدْبِهَا اِلاَّ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ اَوْ يَصِلَ رَحْمَهُ بَارَكَ اللّٰهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ.

(طبرانى فى الاوسط)

যে ব্যক্তি কোন নারীর সম্মান দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করে, আল্লাহ তাহার লাঞ্ছনাই বৃদ্ধি করেন; যে তাহার সম্পদের জন্য তাহাকে বিবাহ করে, তিনি তাহার দারিদ্র্যই বৃদ্ধি করেন আর যে তাহার আভিজাত্যের কারণে তাহাকে বিবাহ করে, তিনি তাহার নীচতাই বৃদ্ধি করেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করার সময়ে তাহার মধ্যে এইসব চায় না; বরং সে নিজের দৃষ্টি অবনত রাখে, নিজের গুপ্তাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করে ও নিজের আত্মীয়তা-সম্পর্ক বজায় রাখে, আল্লাহ তাহার কারণে ঐ নারীরও কল্যাণ করেন এবং ঐ নারীর কারণে তাহারও কল্যাণ করেন।

عَنْ مَعْقَلِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّى اَصَبْتُ اِمْرَءَةً ذَاتَ جَمَالٍ اَحْسِبُ اَنَّهَا لاَ تَلِدُ اَفَاَ تَزَوَّجُهَا قَالَ لاَثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّى مُكَاثِرٌبِكُمُ الْاُمَمَ.

(ابوداؤد، نسائى، مسند احمد)

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর নিকট একব্যক্তি আসিল এবং বলিলঃ আমি একটি সুন্দরী মেয়ে পাইয়াছি। আমার ধারণা হয়, সে সন্তান প্রসব করিবে না। এমতাবস্থায় আমি কি তাহাকে বিবাহ করিব? রাসূলে করীম (স) বলিলেন, না। লোকটি আবার আসিয়া এই প্রশ্ন করিল। এই দ্বিতীয়বারেও রাসূলে করীম (স) তাহাকে নিষেধ করিলেন। লোকটি তৃতীয়বারও আসিল এবং পূর্বরূপ প্রশ্ন পেশ করিল। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমরা বিবাহ কর এমন মেয়ে, যে স্বামীকে খুব বেশী ভালবাসিবে, যে বেশী

সংখ্যক সন্তান প্রসব করিবে। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য লইয়া অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশী অগ্রবর্তী হইয়া যাইব। (আবু দায়ূদ, নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে মোট তিনটি আলোচনাযোগ্য বিষয় রহিয়াছে। প্রথম, একটি লোকের বার বার রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নিজের বিবাহ সংক্রান্ত জটিলতায় তাঁহার পথ-নির্দেশ প্রর্থনা করা। দ্বিতীয়, লোকটির এই আশংকা প্রকাশ করা যে, মেয়েটি হয়ত সন্তান প্রসব করিবে না এবং তৃতীয় হইল, রাসূলে করীম (স)-এর সর্বশেষে দেওয়া নীতিগত নির্দেশ।

রাসূলে করীম নিকট একটি লোক পর পর তিনবার তাহার নিজের বিবাহ সংক্রান্ত একটি সমস্যার মীমাংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আসে। লোকটি কে তাহা হাদীসের মূল ভাষায় বলা হয় নাই। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত মা'কালের কথার ধরন হইতে বুঝা যায়, তিনি লোকটিকে চিনিতে পারেন নাই এবং তাহার নামও তাঁহার জানা নাই। তবে লোকটি মুসলমান এবং রাসূলে করীমের সাহাবীদের মধ্যের কেহ, তাহা নিঃসন্দেহ। লোকটি তাহার যে সমস্যার কথা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট প্রকাশ করে তাহা তাহার বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপার। সে একটি সুন্দরী মেয়ে পাইয়াছে, ইচ্ছা করিলেই সে তাহাকে বিবাহ করিয়া জীবন-সঙ্গিনী রূপে ঘরে লইয়া আসিতে পারে। কিন্তু মেয়েটি সম্পর্কে তাহার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, সে হয়ত বন্ধ্যা, সন্তান প্রসব করিবে না। এখন এই বন্ধ্যা মেয়েটিকে সে বিবাহ করিবে কিনা তাহাই তাহার মনের জিজ্ঞাসা এবং ইহাই তাহার সমস্যা।

ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলে করীম (স) তাঁহার গঠন করা সমাজে এই মর্যাদার অধিকারী যে, এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার একান্ত ব্যক্তিগত—এমনকি কোন্ ধরনের মেয়ে বিবাহ করিবে, আর কোন্ ধরনের নয়—তাহাও রাসূলে করীমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ও তাঁহার মত ও পরামর্শ লইয়া সিদ্ধান্ত করার প্রয়োজন মনে করিত। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইহাই শাশ্বত কর্মনীতি।

লোকটি বলিল, أَحْسَبُ أَنَّهَا لَا تَلِدُ আমি মনে করি, মেয়েটি সন্তান প্রসব করিবে না। অর্থাৎ মেয়েটি বন্ধ্যা। কিন্তু সে ইহা কি ভাবে জানিতে পারিল? সম্ভবত মেয়েটি ইতিপূর্বে বিবাহিতা ছিল এবং স্বামীর সহিত যথেষ্ট সময় থাকা সত্ত্বেও তাহার কোন সন্তান জন্মায় নাই। ফলে মেয়েটির বন্ধ্যা হওয়া সম্পর্কে প্রবল আশংকা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অথবা সে হয়ত জানিতে পারিয়াছে যে, মেয়েটির মাসিক ঋতু আসে না। আর যাহার ঋতু হয় না, তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া সন্দেহ করা কোনক্রমেই অমূলক নয়। এতদ্ব্যতীত আরও একটা নিদর্শন আছে। হয়ত দেখা গিয়াছে, মেয়েটির পূর্ণ বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও হয়ত তাহার স্তনদ্বয় উদ্গত হইয়া উঠে নাই। আর যে মেয়ের বয়স হওয়া সত্ত্বেও স্তনদ্বয় উদ্গত হইয়া উঠে নাই, সে মেয়ে সন্তানবতী নাও হইতে পারে, এরূপ সংশয় উদ্রেক হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। মেয়েটি সম্পর্কে লোকটির উপরোক্ত উক্তির ইহাই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

রাসূলে করীম (স) উপরোক্ত ধরনের একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে ও জীবন সঙ্গিনী বানাইতে নিষেধ করিলেন এইজন্য যে, যে মেয়ে সন্তান জন্ম দিবে না, সে মেয়ের জীবন নিস্ফল ও অর্থহীন। তাহার দ্বারা কোন অধঃস্তন বংশের উদ্ভব হইবে না; বরং তাহার নিজের বংশধারা এইখানে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সে হইবে নির্বংশ। আর নির্বংশ হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। রাসূলে করীম (স) লোকটিকে—যিনি একজন সাহাবীই হইবেন—এই দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। বস্তুত নির্বংশ হইতে, অধঃস্তন বংশ হইতে বঞ্চিত হইতে দুনিয়ার কোন মানুষই স্বাভাবিকভাবেই রাযী হইতে পারে না।

তৃতীয় প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স) যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহার দুইটি অংশ প্রথমাংশে বলিয়াছেনঃ

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ অর্থ الَّتِى تُحِبُّ زَوْجَهَا مُحَبَّةً شَدِيْدَةً

'যে মেয়ে তাহার স্বামীকে গভীর তীব্র ও দৃঢ়ভাবে ভালবাসে।'

আর اَلْوَلُوْدُ অর্থ اَلَّتِىْ تَكْثُرُ وِلَادَتُهَا যে মেয়ে বেশী বেশী সন্তান প্রসব করে। স্বামীকে বেশী ভালবাসে ও খুব বেশী সংখ্যায় সন্তান প্রসব করে এমন মেয়েকে বিবাহ করার জন্য রাসূলে করীমের এই নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্ত্রী লোকের এই দুইটি গুণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, পরস্পর পরিপূরক, পরিপোষক। যে স্ত্রী স্বামীকে অধিক মাত্রায় ভালবাসিতে পারে না, সে স্বামীসঙ্গ ও সঙ্গম বেশী লাভ করিতে পারে না। স্বামীও তাহার প্রতি বেশী আকৃষ্ট ও ঐকান্তিক হয় না। আর স্বামীর প্রতি অধিক মাত্রায় ভালবাসা পোষণকারী স্ত্রী যদি অধিক সংখ্যক সন্তানবতী না হয়, তাহা হইলে দাম্পত্য জীবনের আসল লক্ষ্য অর্জিত হইতে পারে না। সে আসল লক্ষ্য হইল বেশী সংখ্যক সন্তান জন্মদানের ফলে রাসূলে করীম (স)-এর উম্মতের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করা।

এই কথাটি পূর্ব কথার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে হাদীসের শেষ বাক্যেঃ فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ কেননা আমি তোমাদের লইয়া অন্যান্য জাতি ও নবীর উম্মতের তুলনায় অধিক সংখ্যক উম্মতশালী হওয়ার গৌরব করিব।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে এই বাক্যটির ভাষা এইরূপঃ

فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن حبان، طبرانی، ابن ابی حاتم)

কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য লইয়াই অন্যান্য নবীগণের তুলনায় বেশী অগ্রবর্তী হইব।

মুসনাদে আহ্‌মদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত অপর একটি বর্ণনার ভাষা এই রূপঃ

اَنْكِحُوْا اُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ فَاِنِّىْ اُبَاهِىْ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

তোমরা সকলে 'সন্তানের মা' বিবাহ কর। কেননা আমি তোমাদের লইয়া কিয়ামতের দিন গৌরব করিব।

'সন্তানের মা বিবাহ কর' অর্থ, সন্তানের মা বানাইবার উদ্দেশ্যে এবং সন্তানের মা হইতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত, সন্তানের মা হওয়ার যোগ্য—সন্তান গর্ভধারণে ও প্রজননে সক্ষম মহিলা বিবাহ কর। কেবল বিলাস-সঙ্গিনী ও অংকশায়িনী ও যৌন স্পৃহা পরিতৃপ্তকারিণী বানাইবার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিবে না। যে স্ত্রী সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে, সন্তান প্রসব করিতে ও সন্তান লালন পালন করিতে প্রস্তুত না, সে জীবন-সঙ্গিনী হইতে পারে, সন্তানের মা হইতে পারে না। আর যে সন্তানের মা হয় না, হইতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নয়, তাকে বিবাহ করা অর্থহীন। ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী লিখিয়াছেনঃ এই পর্যায়ে যতগুলি হাদীসই উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা সবই প্রমাণ করে যে, এই হাদীসসমূহে যদিও মূলত বিবাহ করার জন্য উৎসাহদান করা হইয়াছে; কিন্তু আসল গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে অধিক সন্তানদায়িনী ও বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধির সহায়ক স্ত্রী গ্রহণের উপর।

এই পর্যায়ের সব কয়টি কথা উপরোক্ত গুণের মেয়ে বিবাহ করার আদেশ দানের যুক্তি হিসাবে বলা হইয়াছে। এই কথাটি দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে নবী করীম (স) বন্ধ্যা মেয়ে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ কারণে নয় যে, বন্ধ্যা মেয়ে বিবাহ করা বুঝি হারাম। বরং এই নিষেধের একমাত্র কারণ হইল, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে ও সন্তান জন্ম না হইলে দুনিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে না এবং কিয়ামতের দিন নবী করীমের উম্মত অন্যান্য নবী রাসূলগণের উম্মতের তুলনায় অধিক সংখ্যক হওয়ার লক্ষ্য অনর্জিত থাকিয়া যাইবে। আর তাহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। দ্বিতীয়তঃ

কোন স্ত্রীর অধিক সন্তান হওয়া তাহার কোন দোষ নয়, ইহার দরুন লজ্জিত হওয়ারও কোন কারণ নাই। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা নারীত্বের বৈশিষ্ট্য, একটি বিশেষ প্রশংসাযোগ্য গুণ এবং এই গুণ নারী জীবনেই নয়, সামাজিক জীবনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে 'বিস্ফোরণ' বলিয়া বিদ্রূপ করা হইলেও এবং ইহাকে একালের আনবিক বোমা বিস্ফোরণের তুলনায়ও অধিক ধ্বংসাত্মক বলিয়া অভিহিত করা হইলেও রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটির গুরুত্ব ও মূল্য কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না। অধিক সন্তান হওয়া বা লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রকৃত পক্ষে বিশ্বমানবতার পক্ষে কখনই অকল্যাণের কারণ হইতে পারে না। মানুষ শুধু পেট লইয়াই জন্মায় না, কাজ করিতে ও উপার্জন-উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম মন-মগজ ও দুই খানি হাতও সে তাহার সঙ্গে লইয়া আসে। অতীতের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, বিশ্বে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে, খাদ্য সম্ভারও খাদ্যোপযোগী দ্রব্যাদির বিপুলতাও সেই সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। লোক সংখ্যা বাড়ে; কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়ে না, ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্য ও অর্ধাশন-অনশনের কারণ হইয়া দেখা দেয় বলিয়া যুক্তি দেখানো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। জমি বাড়ে না একথা ঠিক নয়। বহু দেশে সমুদ্রগর্ভ হইতে বিশাল বিশাল এলাকা মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। সল্প জমিতে বিশাল বিশাল ইমারত গড়িয়া উঠিতেছে। আর বিজ্ঞানের বিকাশ ও উৎকর্ষ এবং বিভিন্ন দিকে উহার কার্যকরতা মানুষকে নিছক জমি নির্ভর করিয়া রাখে নাই। জীবন-মান উন্নয়নের আধুনিক শ্লোগান যতই প্রবল ব্যাপক ও চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, রাসূলে করীম (স)-এর আলোচ্য বাণীটি বিন্দু মাত্র মূল্যহীন হইতে পার না। তাঁহার এই কথাটির গুরুত্ব কেবলমাত্র অতীত কালের স্বল্প জনসংখ্যা সম্পন্ন পৃথিবীর প্রেক্ষিতে কিংবা একালের কোন স্বল্প জন সংখ্যা সমন্বিত দেশের প্রেক্ষিতেই স্বীকৃতব্য নয়। ইহা সর্বকালের ও সকল দেশের জন্য শাশ্বত মূল্য ও তাৎপর্যের অধিকারী। বেশী ফলন ও বেশী ফসল সকলেরই কাম্য। যে লোক হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল-ভেড়া পালে, সেও এসবের বেশী বেশী সন্তান কামনা করে। সেই হিসাবে মানব সংখ্যা বৃদ্ধিও কাম্য ও উৎসাহব্যাঞ্জক হওয়া বাঞ্ছণীয়। অবশ্য আটকুরে ব্যক্তিদের কথা আলাদা। সংখ্যা বিপুলতাকে জাতীয় সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও অংশীদার মনে করা হইলে এবং জাতীয় উৎপাদনকে মুষ্টিমেয় লোকদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা না হইলে জন সংখ্যা বৃদ্ধি কোন দিনই 'বিপজ্জনক' প্রতীত হইবে না। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবিকা সামগ্রীর বিপুলতা সমান্তরালভাবে ও পাশাপাশি চলিতেছে। অনেক সময় বরং খাদ্যোৎপাদন পরিমাণ জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও ছাড়াইয়া যায়। এ দুইটিকেই সমান উৎফুল্লতা সহকারে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার লোকেরা উভয়টিকে আল্লাহ্‌র দান বলিয়া মনে করে।

কুমারী কন্যা বিবাহ করাই উত্তম

حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَالَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ. (بخاری)

মুহারিব (তাবেয়ী) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, বলিয়াছেন, আমি রসূলের সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি (তিনি বলিলেন) 'আমি বিবাহ করিয়াছি।' এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) আমাকে বলিলেনঃ 'তুমি কি ধরনের মেয়ে বিবাহ করিয়াছ'? আমি বলিলামঃ আমি বিবাহ করিয়াছি স্বামী পরিত্যাক্তা (বা-অকুমারী -Not virgin: Widow, or divorese)—বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা) মেয়ে বিবাহ করিয়াছি। তখন নবী করীম (স) বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? অক্ষতা—পূর্বে বিবাহ হয় নাই এমন মেয়ে বিবাহ করিলে না কেন? তাহা করিলে তাহার সহিত তুমি খেলা করিতে পারিতে?... পরে এই ঘটনাটি আমি আমর ইবনে দীনারের নিকট উল্লেখ করিলাম, তখন আমর বলিলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেন, রাসূলে করীম (স) আমাকে বলিলেন, কেন তুমি এমন যুবতী কন্যা বিবাহ করিলে না যাহার সহিত তুমি খেলা করিতে এবং সেও তোমার সহিত খেলা করিত? (বুখারী)

ব্যাখ্যা হাদীসটি হযরত জাবির (রা)-এর বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-এর সহিত কথোপকথন সম্পর্কিত। বুখারী গ্রন্থে উপরোদ্ধৃত হাদীসের পূর্বে এই পর্যায়েরই অপর একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে এই কথোপকথনের একটা পটভূমি জানা যায়। তাহা এই যে, একটি যুদ্ধ হইতে ইসলামী কাফেলা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। মদীনার নিকটে পৌছার পর হযরত জাবির (রা) খুব দ্রুত উষ্ট্র চালাইয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন। তাহা দেখিয়া নবী করীম (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন مَا يُعْجِلُكَ তুমি খুব দ্রুত যাইতেছ কেন? জওয়াবে তিনি বলিলেন كُنْتُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ আমি নূতন নূতন স্ত্রী সঙ্গম শুরু করিয়াছিলাম, (সেই অবস্থায়ই আমাকে এই যুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল।) এই কারণে আমি যত শীঘ্র সম্ভব ঘরে ফিরিয়া যাইতে চাহি। এই পর্যায়ে মুসলিম শরীফে হযরত জাবির হইতে বর্ণিত হইয়াছে, মদীনার নিকটে পৌছার পর রাসূলে করীম (স) ঘোষণা করিলেনঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَتَعَجَّلَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَلْيَتَعَجَّلْ

যদি কেহ খুব তাড়াতাড়ি পরিবার বর্গের নিকট চলিয়া যাইতে চাহে, তবে সে যাইতে পারে।

এই সময়ই হযরত জাবিরের সহিত রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত কথা-বার্তা হইয়াছিল।

উপরোদ্ধৃত হাদীসে রাসূলে করীমের প্রশ্নের ভাষা হইলঃ مَاتَزَوَّجْتَ তুমি কি ধরনের মেয়ে বিবাহ করিয়াছ? আর মুসলিম-এ উদ্ধৃত হাদীসে ইহার ভাষা হইল أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا কুমারী মেয়ে বিবাহ করিয়াছ না পূর্বে স্বামী প্রাপ্তা? এই প্রশ্নের জওয়াবে হযরত জাবির (রা) বলিলেন, 'সইয়্যেবাহ'—'কুমারী মেয়ে নয়, পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা মেয়ে'।

এই হযরত জাবির হইতে অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর প্রশ্ন উদ্ধৃত হইয়াছেঃ তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? তিনি বলিলেনঃ 'হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ'! কি ধরনের মেয়ে বিবাহ করিয়াছ, কুমারী, না পূর্বে স্বামী প্রাপ্তা? .... এই প্রশ্ন ছিল সরাসরিভাবে। তখন নবী করীম (স) বলিলেন, مَالَكَ وَلِلْعَذْرَى وَ لِعَابِهِ 'তোমার কি হইয়াছে, একজন কুমারী মেয়ে বিবাহ করিলে না কেন? তাহা হইলে তাহার সহিত তুমি 'খেলা' করিতে পারিতে'?

মুসলিমে-এ উদ্ধৃত হাদীসে এই কথাটির ভাষা হইলঃ

فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ

তুমি কেন একটি কুমারী কন্যা বিবাহ করিলে না?........ তাহা হইলে তুমি তাহার সহিত খেলা করিতে এবং সে তোমার সহিত খেলা করিত?

অপর একটি বর্ণনায় ইহার সহিত অতিরিক্ত দুইটি শব্দ যুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলঃ تُضَاحِكُهَا وَ تُضَاحِكُكَ 'তুমি তাহার সহিত হাসাহাসি করিতে এবং সেও তোমার সহিত হাসাহাসি করিত'। আর আবূ উবাইদের বর্ণনায় ইহার ভাষা হইলঃ تُذَاعِبُهَا وَتُذَاعِبُكَ ' তুমি তাহার মিষ্টতা পান করিতে ও সে তোমার মিষ্টতা পান করিত'।

কুমারী কন্যা বিবাহ করিলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শৃঙ্খলা পর্যায়ের বিভিন্ন কাজ বুঝাইবার জন্য উক্তরূপ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে, ইহা সবই কাম্য ও লক্ষ্য। অর্থাৎ কুমারী কন্যা বিবাহ করিলে দাম্পত্য জীবনে যে আনন্দ সুখ ও স্ফূর্তি লাভ সম্ভব, অ-কুমারী—পূর্বে স্বামী সুখ প্রাপ্তা বা যৌনকর্মে অভ্যস্তা মেয়ে—বিবাহ করিলে তাহা পাওয়া সম্ভব নয়। রাসূলে করীম (স) তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে খেলা করা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে لِعَابِ শব্দটি। ইহার একটি রূপ لِعَابِ অর্থাৎ খেলা করা। আর لُعَابِ শব্দের সরাসরি অর্থ হইল 'মুখের পানি'। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর শৃংগায় পরস্পরের মুখের, ওষ্ঠের ও জিহ্বার মিলন, চুম্বন ও চোষণ একটি জরুরী অংশ এবং ইহাও কাম্য। একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِفَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا

তোমরা কুমারী মেয়ে বিবাহ কর। কেননা উহারাই অধিক মিষ্টমুখ ও গর্ভ ধারণে অধিক সক্ষম।

অপর একটি বর্ণনায় হযরত জাবিরের অ-কুমারী মেয়ে বিবাহ করার কারণ স্বরূপ কথিত উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে এই যে, আমার বাবা মরিয়া যাওয়ার সময় আমার কয়েকটি বোন রাখিয়া যায়।

فَاحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِمْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ

তখন আমি এমন একটি নারী বিবাহ করা পছন্দ করিলাম যে, আমার বোনদিগকে একত্রিত রাখিতে, তাহাদের চুল আচড়াইয়া দিতে ও সার্বিকভাবে তাদের খেদমত করিতে পারিবে।

অর্থাৎ আমার বোনদের দেখা-শুনা, লালন-পালন ও পরিচর্যা ইত্যাদি কাজ করার উদ্দেশ্যেই কুমারী মেয়ের পরিবর্তে পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা একটি নারীকে বিবাহ করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) কি বলিলেন, তাহা উপরোক্ত বর্ণনায় উদ্ধৃত হয় নাই। মুসলিম এর বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে, নবী করীম (স) এই কথা শুনিয়া বলিলেনঃ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ 'আল্লাহ্ তোমার এই কাজে বরকত দিন'। অথবা বলিলেন, ভালই। কিতাবুল মাগাজীতে উদ্ধৃত হযরত আমর (রা)-এর কথাটির ভাষা এইঃ

وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِيْ تِسْعَ اَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ اَنْ اَجْمَعَ اِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلٰكِنِ امْرَأَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ قَالَ اَصَبْتَ

আমার পিতা ইন্তেকাল করিলে নয়টি কন্যা রাখিয়া যান, তাহারা ছিল আমার নয়টি ভগ্নি। তখন আমি তাহাদেরই মত 'নিজের ও অপরের কল্যাণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞা' ও 'নিজ হাতে কাজ করিতে অক্ষম'। একটি মেয়ে বিবাহ্ করা অপছন্দ করিলাম। বরং এমন একটি মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা পছন্দ করিলাম, যে উহাদের দেখা-শুনা পরিচর্যা ও খেদমত করিতে পারিবে এবং উহাদের মাথায় চিরুনী চালাইতে পারিবে। নবী করীম (স) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি ঠিকই করিয়াছ।

হাদীসটির মূল বর্ণনা হইতে ইসলামী সমাজে স্ত্রী গ্রহণে অনুসৃতব্য নীতি স্পষ্ট ভাষায় জানা যায়। প্রথম কথা, কুমারী কনেকেই বিবাহ করা বাঞ্ছনীয়। তাহা হইতে দাম্পত্য জীবন অধিকতর মধুময় সুখ-তৃপ্তি-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হইবে। দ্বিতীয়, দুইটি কল্যাণময় কাজ পরস্পর সাংঘর্ষিক হইলে তন্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিতে হইবে। কেননা হযরত জাবির (রা) কুমারী কন্যার পরিবর্তে এক অভিজ্ঞা স্ত্রী গ্রহণ করিলে নবী করীম (স) তাঁহার কাজ সঠিক হইয়াছে বলিয়া বরকতের জন্য দোয়া করিয়াছেন। যেহেতু তিনি নিজের দাম্পত্য সুখের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাঁহার ইয়াতীম ভগ্নিদের লালন-পালনের প্রয়োজনের দিকটিকে। তৃতীয়, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কর্তব্য সঙ্গী-সাথী অনুসারী কর্মীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথা দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে খোঁজ খবর লওয়া। চতুর্থ, কেহ কোন ভাল কাজ করিয়া থাকিলে তাহার কাজের ন্যায্যতা স্বীকার করা ও সেই কাজে বরকত হওয়ার জন্য দোয়া করা কর্তব্য। নবী করীম (স) হযরত জাবির (রা)-এর এই তুলনাহীন স্বার্থ ত্যাগ ও ইয়াতীম ভগ্নিদের কল্যাণের দিকটিকে অধিকতর গুরুত্ব দানের ব্যাপারটিকে উচ্চতর মর্যাদা দিয়াছেন। সেজন্য তিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা হইতে সাহাবীগণের উন্নত মানবিক গুণরাশি সম্পর্কে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে। রাসূলে করীম (স)-এর জিজ্ঞাসা সংক্রান্ত বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, হয়ত হযরত জাবিরের বিবাহের অব্যাহতি পরই তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ও এই কথোপকথন হইয়াছিল। কিন্তু আসল ঘটনা এই যে, হযরত জাবির (রা)-এর বিবাহ ও রাসূলে করীম (স)-এর এই জিজ্ঞাসার মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রহিয়াছে। (فتح الباری)

কুমারী মেয়ে বিবাহ করাই একজন নব্য যুবকের জন্য পছন্দনীয়। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ فَاِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفْوَاهًا وَاَنْتَقُ اَرْحَامًا وَاَقَلُّ خِبَاءً وَاَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ.

(ابن ماجه، بیهقی)

তোমার উচিত কুমারী কন্যা বিয়ে করা। কেননা তাহাদের সুখ অধিক সুমিষ্ট হয়। তাহাদের গর্ভ সন্তান ধারণে অধিক সক্ষম হয়। ধোকা-প্রতারণায় কম পটু হয় এবং অল্পতেই ও সহজেই খুশী হইয়া যায়।

এই বিষয়টি হযরত আয়েশা (রা) অধিক স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন একটি রূপকথার মাধ্যমে। তিনি নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে রাসূল! আপনিই বলুন, আপনি উটে সওয়ার হইয়া কোন উপত্যকায় উপনীত হইলেন। সেখানে একটি গাছ আছে যাহার পাতা সমূহ ইতিপূর্বে খাওয়া হইয়াছে। আর একটি গাছ আছে যাহার পত্র-পল্লব এখনও খাওয়া হয় নাই। এমতাবস্থায় আপনি আপনার উটটিকে কোন্ গাছের পাতা খাইবার জন্য চরাইবেন? জওয়াবে নবী করীম (স) বলিলেন, সেই গাছটিতেই উট চরাইব যাহার পাতা ইতিপূর্বে খাওয়া হয় নাই। তখন হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, فَاَنَا هِىَ আমিই হইতেছি সেই গাছটি'। (বুখারী)

বস্তুত নবী করীম (স) হযরত আয়েশা (রা) ছাড়া আর কোন কুমারী মেয়েকেই বিবাহ করেন নাই। তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন কুমারী।

উত্তম স্ত্রীর পরিচয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِىْ تَسُرُّهُ اِذَا اَنْظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيْمَا يَكْرَهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَا لِهٖ.

(مسند احمد)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ মেয়ে উত্তম? জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেন, যে মেয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিয়া দিবে যখন সে তাহার দিকে তাকাইবে, অনুসরণ ও আদেশ পালন করিবে যখন সে তাহাকে কোন কাজের হুকুম করিবে এবং তাহার স্ত্রীকে নিজের ব্যবহারে এবং তাহার নিজের ধনমালের ব্যাপারে সে যাহা অপছন্দ করে তাহাতে সে স্বামীর বিরুদ্ধতা করিবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে উত্তম স্ত্রীর তিনটি গুণের কথা বলা হইয়াছে। এই তিনটি গুণ হইলঃ (১) স্ত্রীর প্রতি স্বামী যখনই তাকাইবে, তখনই সে স্ত্রীকে দেখিয়া আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইবে, (২) স্বামী যখন তাহাকে কোন কাজ করিতে বলিবে তখন সে তাহা পালন করিবে এবং (৩) স্ত্রীর নিজের ব্যাপারে স্বামী যাহা অপছন্দ করে এবং তাহার ধন-মালে স্ত্রীর যে ভূমিকা পালনে স্বামী সন্তুষ্ট হয় না, তাহাতে সে স্বামীর বিরুদ্ধতা করিবে না।

স্ত্রীর যে তিনটি বাঞ্ছিত গুণের উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন সাপেক্ষ। স্বামী যখনই স্ত্রীর দিকে তাকাইবে, স্বামী তাহার স্ত্রীকে দেখিয়া আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইবে। স্বামীর এই আনন্দ ও উৎফুল্লতা লাভের উৎস হইতে পারে স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্য ও তাহার দৈহিক গঠন ও অঙ্গ সৌষ্ঠব। হইতে পারে তাহার স্বামী-প্রীতি, স্বামীর জন্য প্রাণ ভরা ভালবাসা, দরদ-মায়া, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা। হইতে পারে স্বামীর আদর যত্নে তাহার সদা নিমগ্নতা। হইতে পারে দাম্পত্য ও সাংসারিক দায়িত্ব পালনে একাগ্রতা ও যোগ্যতা। হইতে পারে স্বামীর সন্তানের মা হওয়ার যোগ্যতা।

ইহার যে কোন একটা কারণে স্বামী স্ত্রীর প্রতি তাকানো মাত্রই আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারে, স্ত্রী সুখে তাহার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে।

স্বামী তার ঘর-সংসারের প্রধান (Head)। আর ঘরের রাজ্যের প্রধান কর্মাধ্যক্ষা হইতেছে স্ত্রী। ঘর ও সংসার প্রধানের আদেশ নিয়মিত পালিত ও কার্যকর হওয়ার উপর পারিবারিক নিয়ম শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাকা নির্ভর করে। কাজেই স্বামীর আদেশ পালনে স্ত্রীর সদা সযত্ন প্রস্তুত হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রী স্বামীর মান-সম্ভ্রম, স্ত্রী স্বামীর ধন-মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পন্না। স্ত্রীর নিজের ব্যাপারে স্বামীর খুশী-অখুশীর অনেক দিক আছে। এ ক্ষেত্রে আছে স্বামীর রুচি-অরুচির প্রশ্ন, ভাল লাগা না-লাগার প্রশ্ন এবং নীতি ও আদর্শের প্রশ্ন। স্ত্রীর কর্তব্য এই সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এমনভাবে চলা ফিরা করা যাহাতে স্বামীর বিরুদ্ধতা না হয়। স্বামীর মনে কোনরূপ অনীহা অসন্তোষ বা দুঃখ ক্ষোভের সঞ্চার না হয়।

অনুরূপভাবে স্বামীর ধন-মালের ব্যয়-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও স্বামীর ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং সাধ্য-অসাধ্যের প্রশ্ন প্রবল হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ কাজে অর্থব্যয় করা স্বামীর পছন্দ নয়। অনেক ব্যয় এমন আছে, যাহা স্বামীর আর্থিক সামর্থে কুলায় না। এই সব ক্ষেত্রে স্ত্রীর উচিত, সমস্ত ব্যাপারে এমন ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা যাহাতে যাবতীয় প্রয়োজন মিটে এবং স্বামীর মতের বা সামর্থের সহিত কোনরূপ সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয়।

বস্তুত স্ত্রীর এ সব গুণই এমন যাহা প্রত্যেকটি পরিবারের সুখ-শান্তি ও স্থায়ীত্বের নিয়ামক হইয়া থাকে এবং স্বামীর সুখানুভূতির মূল উৎস এখানেই নিহিত।

অন্য একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. (مسلم، احمد، نسائی)

দুনিয়ার সবকিছুই ভোগ ব্যবহারের সামগ্রী। আর দুনিয়ার এসব ভোগ-ব্যবহার সামগ্রীর মধ্যে সর্বোত্তম হইতেছে সদাচারী সৎ স্বভাব ও সুরুচি সুনীতি সম্পন্না স্ত্রী। কেননা এইরূপ স্ত্রীই স্বামীর পরকালীন সাফল্য লাভে সাহায্যকারী হইতে পারে। আর যাহা বা যেই পরকালীন সাফল্যে সাহায্যকারী, তাহা এবং সেই যে সর্বোত্তম, তাহা নিঃসন্দেহ। (مرقات، بلوغ الامانی)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَّهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ. (ابن ماجه)

হযরত আবূ আমামাতা (রা) হইতে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি প্রায়ই বলিতেন, মু'মিনের তাকওয়ার পক্ষে অধিক কল্যাণকর ও কল্যাণ লাভের উৎস হইতেছে সচ্চরিত্রবতী এমন একজন স্ত্রী, যাহাকে সে কোন কাজের আদেশ করিলে সে তাহা মানিবে, তাহার দিকে সে তাকাইলে সে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিবে। সে যদি তাহার উপর কোন কীড়া-কছম দেয়, তবে সে তাহাকে কছমমুক্ত বানাইবে। সে যদি স্ত্রী হইতে দূরে চলিয়া যায়, তবে সে তাহার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে তাহার কল্যাণ চাহিবে। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা 'তাকওয়া' অর্থ আল্লাহকে ভয় করিয়া তাঁহার আদেশাবলী পালন করা এবং তাঁহার নিষেধ সমূহ হইতে যথাযথভাবে বিরত থাকা। বস্তুত একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য ইহকাল ও পরকালের দৃষ্টিতে ইহাই সর্বাধিক কল্যাণকর জিনিস। এই জিনিস যাহার আছে সে যে অতিবড় ভাগ্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গুণের পর দ্বিতীয় কোন্ জিনিসটি মু'মিনের পক্ষে অধিক কল্যাণকর? আলোচ্য হাদীসে ইহারই জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, তাকওয়ার পর মু'মিনের জন্য অধিক কল্যাণকর ও কল্যাণের উৎস হইতেছে একজন স্ত্রী। কিন্তু কেবল একজন যেন-তেন প্রকারের স্ত্রী নয়, সে স্ত্রীর প্রধান পরিচয় হইল, সে হইবে 'সালেহা'—সদাচারী, সচ্চরিত্রবতী, সদগুণ সম্পন্না। আর এই গুণের স্ত্রী হইতে মু'মিনের সুখ ও কল্যাণ লাভের দিক হইল অন্ততঃ চারটি। প্রথম, সে হইবে স্বামীর অনুগতা, স্বামীর আদেশ পালনে সদা প্রস্তুত। স্বামীই ঘরের কর্তা ও পরিচালক। অতএব তাহার আদেশাবলী ঘরের লোকদের দ্বারা পালিত ও অনুসৃত হওয়া আবশ্যক। নতুবা ঘরের শৃঙ্খলা রক্ষা হইতে পারে না। আর স্বামীর পর ঘরের অন্যান্য সন্তানাদি ও লোকজনের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে

প্রধান কর্ত্রী হইল স্ত্রী। তাহাকে স্বামীর অনুগতা ও আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিন্তু এই আদেশ পালন শর্তহীন নয়, নয় সীমাহীন। উহার শর্ত হইল, স্বামীর আদেশ যদি আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধের পরিপন্থী না হয়, তবেই তাহা পালন করা চলিবে। পরিপন্থী হইলে তাহা পালন না করাই সচ্চরিত্রবতী স্ত্রী হওয়ার প্রধান গুণ, উহা পালন করা নয়। আর স্বামীর হুকুম পালন চলিবে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ লংঘিত না হওয়া পর্যন্ত। যখনি দেখা যাইবে, স্বামীর আদেশ পালন করিতে গেলে আল্লাহ্‌র নিষেধের অমান্যতা হয়, আল্লাহ্‌র আনুগত্য সীমা লংঘিত হইয়া যায়, তখনই সে আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানাইতে হইবে। কেননা নবী করীম (স) স্পষ্ট অকাট্য ভাষায় বলিয়াছেনঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. (مسند احمد)

স্রষ্টার নাফরমানী করিয়া সৃষ্টির আনুগত্য করা চলিতে পারে না।

দ্বিতীয় দিক হইল, স্বামী যখন তাহার প্রতি তাকাইবে, তখন স্ত্রীর রূপ ও গুণ, তাহার কাছ থেকে পাওয়া অকৃত্রিম গভীর ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি এবং তাহার সহিত একাত্মতা মিশ্রিত সুখময় জীবন যাত্রার কথা স্মরণ করিয়াই স্বামী গভীর ভাবে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে।

তৃতীয়, যে কাজ করা বা না করা স্ত্রী পছন্দ করে না, সেই কাজ করিতে বা না করিতে স্বামী যদি আদেশ করে এবং সে আদেশকে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে যদি কিড়া-কছম দেয়, তখন স্ত্রী স্বামীর কথার আনুকূল্য করিয়া ও বিরুদ্ধতা পরিহার করিয়া স্বামীকে কছমমুক্ত করিবে। ইহা হইবে স্বামীকে সন্তুষ্ট বিধানের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর ত্যাগ স্বীকার। দাম্পত্য জীবনের সুখ-মাধুর্য, স্থিতি ও স্থায়ীত্বের জন্য স্ত্রীর এই ত্যাগ স্বীকার প্রবণতার মূল্য অনেক। এই রূপ ত্যাগ স্বীকারের প্রবৃত্তি না থাকিলে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় ও ভাঙন অনিবার্য হইয়া দেখা দেয়।

আর চতুর্থ হইল, স্বামী যখন ঘরের বাহিরে যাইবে—ঘরে অনুপস্থিত থাকিবে, তখন স্ত্রী স্বামীর প্রতি গভীর কল্যাণ কামনা সম্পন্না থাকিবে। সে তাহার স্বামীর জন্য নিজেকেও রক্ষা করিবে। রক্ষা করিবে স্বামীর ধন-মালও। এই দুইটি ব্যাপারে সেই হইবে স্বামীর আমানতদার। সে তাহার এই আমানতদারীত্বে কোন দিক দিয়া ক্ষুণ্ন হইতে দিবে না। বস্তুত এইরূপ একজন স্ত্রী মু'মিন ব্যক্তির জন্য বিরাট সৌভাগ্যের কারণ। যে লোক স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহার মনে এই রূপ স্ত্রী পাওয়ার জন্য ঐকান্তিক কামনা ও চেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয়। আর যাহার স্ত্রী এই সব গুণে গুণান্বিতা তাহার উচিত আল্লাহ্‌র অশেষ শোকর আদায় করা।

উদ্ধৃত হাদীস সম্পর্কিত জরুরী কথা এখানেই শেষ। কিন্তু মহানবীর এই সংক্ষিপ্ত বাণীটির অনুরনন ও চিন্তার ক্ষেত্রে সৃষ্ট আলোড়ন আরও ব্যাপক। উত্তম স্ত্রীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স)-এর বলা চারটি কথার তাৎপর্য বাস্তব জীবনের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করিলে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে, এই কয়টি কেবলমাত্র নীতি কথাই নয়। এই গুণ গুলির বাস্তবতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অন্যথায় দাম্পত্য সুখলাভ করা স্বামী বা স্ত্রী কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. (مسلم)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, দুনিয়াটাই জীবন-উপকরণ। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম জীবনোপকরণ হইতেছে নেককার-সচ্চরিত্রবান স্ত্রী। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা পৃথিবী ও ইহকালীন গোটা জীবনই মানুষের ভোগ-ব্যবহার ও যাপনের ক্ষেত্র। পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের ইহকালীন জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশেষ। কিন্তু এই জীবনের প্রকৃত সুখ নির্ভর করে কল্যাণময়ী উত্তম পবিত্র চরিত্রের অধিকারী স্ত্রীর উপর। আল্লাহ্ দুনিয়ার সব কিছু—উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল—কে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের জন্যও জুড়ি ইহজীবনের অপরিহার্য অংশ। নারীর জন্য পুরুষ এবং পুরুষের জন্য নারী অবশ্যম্ভাবী। ইহা ব্যতীত মানুষের দুনিয়ার জীবন অকল্পনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষের জন্য যেমন-তেমন একজন নারী এবং নারীর জন্য যেমন-তেমন একজন পুরুষ হওয়াই ইসলামের দৃষ্টিতে কল্যাণবহ হয় না। বরং পুরুষের জন্য উত্তম চরিত্রের স্ত্রী প্রয়োজন এবং স্ত্রীর জন্য প্রয়োজন উত্তম চরিত্রের পুরুষ।

অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ইসলাম পরিকল্পিত সমাজে পুরুষ প্রধান। তাই হাদীসটিতে পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া কথাটি বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে নারীর দিকটি উপেক্ষিত হয় নাই। ইসলামের মানবিক দৃষ্টিকোণে পুরুষ ও নারীর মর্যাদা ও সামাজিক গুরুত্ব অভিন্ন। তাই পুরুষের জন্য যদি নেককার চরিত্রবান স্ত্রী সর্বোত্তম জীবনোপকরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে নারীর জন্যও অনুরূপভাবে সর্বোত্তম চরিত্রবান ও নেককার পুরুষ হইবে সর্বোত্তম জীবনোপকরণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

হযরত সায়াদ ইবনে আবূ অক্কাস (রা) হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ...... وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوْءُ

আদমের পুত্রের বড় সৌভাগ্যের বিষয় হইতেছে উত্তম চরিত্রবান স্ত্রী.....এবং আদম পুত্রের চরম দুর্ভাগ্যের কারণ হইল খারাপ স্ত্রী।

আমাদের সমাজের সাধারণ ও সর্বজনবিদিত কথাঃ 'সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে'। এই হাদীস সমূহেরই নির্যাস বা প্রতিধ্বনি। কথাটির 'রমনী' বলিতে স্ত্রীকেই বুঝাইয়াছে, অতএব বিবাহের প্রসঙ্গে পুরুষের নিকট সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত উত্তম ও নেক চরিত্রের মেয়ে, তেমনি মেয়ের নিকট উত্তম চরিত্রের ছেলে।

ইহা না হইলে নারী বা পুরুষ কাহারও জীবন সুখের হইতে পারে না।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَائَتْ.

(ابونعيم فى حلية الابرار)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেনঃ একজন স্ত্রী লোক যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করে, রমযান মাসের রোযা থাকে, স্বীয় যৌন অঙ্গ সুরক্ষিত রাখে এবং তাহার স্বামীর আনুগত্য করে, তাহা হইলে সে জান্নাতে যে কোন দ্বারপথে ইচ্ছা হইবে প্রবেশ করিতে পারিবে। (আবূ নয়ীম—হুলিয়াতুল-আবরার)

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে মোটামুটি একজন আদর্শ স্ত্রীলোকের পূর্ণাঙ্গ চরিত্র অংকন করা হইয়াছে। সাধারণভাবে একজন লোকের—সে পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক—কর্তব্য হইল একদিকে আল্লাহর হক্ক

আদায় করা, আর অপর দিকে বান্দাহর হক্ক আদায় করা। বান্দাহ যেহেতু আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই তাহার পক্ষে দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভ ও জীবন যাপন সম্ভবপর হইয়াছে। এই কারণে তাহাকে আল্লাহ্‌র হক্ক অগ্রাধিকারভাবে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। কিন্তু দুনিয়ায় সে একাকী বাস করিতে পারে না। অন্যান্য বান্দাহদের সঙ্গে একত্রে সামাজিক জীবন যাপন করিতে সে বাধ্য। এই কারণে কেবল আল্লাহ্‌র হক্করূপে চিহ্নিত কয়েকটি কর্তব্য করা কাহারও পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না। তাহাকে সমাজের হক্কও আদায় করিতে হইবে। ইহাও আল্লাহ্‌র হক্ক এর মধ্যে গণ্য।

এই দুই দিকের বাহ্যত দুই ধরনের হক্ক পরস্পর বিপরীত নয়। এই দুই হক্কের মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্য নাই। শুধু তাহাই নয়, এই দুইটি হক্ক পরস্পর সম্পৃক্ত। একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। তাই এই দুইটি এক সঙ্গে জীবনের কর্মধারা ও কর্মসূচীর মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে। কখনও একটি হক্ক আদায় করিবে, কখনও অপর হক্ক, এই দ্বৈত নীতি বাস্তবে চলিতে পারে না। ইহা যেমন বিবেক বিরোধী তেমনই ইসলাম বিরোধীও। এই দিক দিয়া ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ধারা ও জীনব সূচী উপস্থাপিত করিয়াছে, যাহা পুরাপুরি পালন ও অনুসরণ করিয়া চলিতে ও এক সঙ্গেই এই দুই ধরনের হক্ক যথাযথভাবে আদায় করা যাইতে পারে। ইহা সাধারণভাবে ইসলামী জীবন পদ্ধতির দার্শনিক তত্ত্ব ও সত্য।

আলোচ্য হাদীসটিতে বিশেষভাবে ইসলামী আদর্শবাদী একজন স্ত্রীলোকের জন্য এমনিই এক পূর্ণাঙ্গ ও দুই ধরনের হক্ক আদায়কারী কর্মসূচী পেশ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকটি প্রথমেই আল্লাহ্‌র বান্দাহ। এই জন্য তাহাকে প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে একান্তভাবে চিহ্নিত আল্লাহ্‌র হক্ক আদায় করিতে হইবে। এজন্য তাহাকে রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইবে ও বছরে রমযানের একটি মাস রোযা থাকিতে হইবে। এই দুইটি সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত—আল্লাহ্‌র হক্ক আদায়ের কর্মসূচী। এই কারণে এই দুইটির কথা হাদীসে প্রথমেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দাহর হক্ক-এর কথা বলা হইয়াছে। বিবাহিতা স্ত্রীর অতীব নিকটবর্তী ব্যক্তি হইতেছে তাহার স্বামী। তাহার উপর অন্যান্য সকলের অপেক্ষা তাহার স্বামীর হক্ক সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে মাত্র দুইটি কথা বলা হইয়াছে। একটি, أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا 'সে তাহার যৌন অঙ্গ সুরক্ষিত রাখিয়াছে'। أَحْصَنَتْ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে حِصْنٌ হইতে। ইহার অর্থ দুর্গ। দুর্গ এক সুদৃঢ় সুরক্ষিত স্থান। সেখানে প্রবেশ করিতে পারে কেবল তাহারা যাহাদের জন্য প্রবেশানুমতি ও আইন ভিত্তিক প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। যাহাদের তাহা নাই, তাহারা উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য সশস্ত্র ব্যক্তিরা চব্বিশ ঘন্টা উহার পাহারা দিয়া থাকে। স্ত্রীর যৌন অঙ্গও দুর্গবৎ। দুর্গের মতই উহাকে সদা-সচেতন পাহারাদারীর মাধ্যমে রক্ষা করিতে হইবে। এই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্ত্রীলোকটির নিজের। উহার দ্বার উদঘাটন ও অনুপ্রবেশ করার অধিকার কেবল তাহাকেই দেওয়া যাইবে ও দিতে হইবে, যাহাকে একটি বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক সমর্থনের মাধ্যমে তাহার স্বামীরূপে বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। স্ত্রীর যৌন অঙ্গ কেবল তাহার স্বামীর জন্যই সুরক্ষিত রাখিবে। অন্য কাহারও উহার অনুপ্রবেশ বা উহা স্পর্শ তো দূরের কথা, উহা দেখিবার সুযোগও থাকিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় বলা হইয়াছে, সে যদি তাহার স্বামীর আনুগত্য করে। আল্লাহ্ ও রাসূলের পরে স্ত্রীলোকের প্রধানত যাহাকে মানিতে হইবে, যাহার আনুগত্য করিতে হইবে, সে হইল তাহার স্বামী। স্বামীর আনুগত্য করিতে হইবে স্ত্রীকে, একথা ঠিক; কিন্তু সে আনুগত্য শর্তহীন ও অবাধ উন্মুক্ত নয়। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের সীমার মধ্যেই স্বামীর আনুগত্য করিতে হইবে। আসলে ঈমানদার মানুষ আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল ছাড়া আর কাহারও আনুগত্য করিতে পারে না। তবে স্বামী বা অন্য কাহারও আনুগত্য

করা যাইবে—করিতে হইবে, কেননা তাহা করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (স) দিয়াছেন। অতএব স্বামীর আনুগত্য আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য সীমার মধ্যে দৃঢ়ভাবে সীমিত।

মোটকথা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িলে, রোযা থাকিলে, যৌন অঙ্গ কেবল স্বামীর জন্য সুরক্ষিত রাখিলে এবং স্বামীর আনুগত্য করিলে স্ত্রীর পক্ষে জান্নাতে যাওয়ার পথে অন্য কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে না। শুধু তাহাই নয়, জান্নাতের দিকে তাহার গতি হইবে তীব্র ও দ্রুত এবং সে এই গতিতেই জান্নাতে চলিয়া যাইতে পারিবে। আর যে লোক দ্রুত ও তীব্র গতিতে জান্নাতে যাইতে পারিবে, তাহার মত সফল ও সার্থক অন্য কেহ হইতে পারে না। বস্তুত যে স্ত্রীর এই গুণাবলী আছে, যে স্ত্রী একই সময় ও একই জীবন ধারায় আল্লাহ্র হক্ক ও স্বামী এবং সমাজের লোকদের হক্ক পুরাপুরি আদায় করে এবং ইহার ফলে পরকালে জান্নাত লাভ করিতে পারিবে বলিয়া নিশ্চিত আশা করে, সেই উত্তম স্ত্রী।

উত্তম স্ত্রী বলিতে এইসব গুণের অধিকারী স্ত্রীকেই বুঝায়। (مرقات)

বিবাহে কুফু

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ-

(ترمذى)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তি যখন বিবাহের প্রস্তাব দিবে, যাহার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ কর, তাহা হইলে তাহার নিকট মেয়ে বিবাহ দাও। তোমরা যদি ইহা না কর, তাহা হইলে পৃথিবীতে অশান্তি ও ব্যাপক বিপর্যয় সংঘটিত হইবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা বিবাহের দুইটি পক্ষ। একটি পক্ষে ছেলে—যে বিবাহ করিবে। আর অপর পক্ষে মেয়ে এবং তাহার নিকটাত্মীয়গণ। ছেলে বা মেয়ে পক্ষ যখন কাহারও ঘরে মেয়ে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়, তখন মেয়ে পক্ষের লোকদের কর্তব্য হইল ছেলেকে দেখিয়া বা তাহার সম্পর্কে খবরাখবর লইয়া বিবাহ সম্বন্ধ করা হইবে কিনা, সে বিষয়ে অনতিবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এই পর্যায়ে মেয়ের বা মেয়ে পক্ষের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল ছেলের দ্বীনদারী ও চরিত্র, আচার-আচরণ ও সভ্যতা-ভব্যতা। এই বিবেচনায় ছেলের দ্বীনদারী ও চরিত্র যদি তোমাদের পছন্দ হয়, তাহা হইলে তোমরা এই বিবাহে সম্মত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। হাদীসের ঘোষণানুযায়ী মনে হয়, বিবাহের প্রথম প্রস্তাব ছেলে বা ছেলের পক্ষ হইতে হইবে এবং উহা গ্রহণ করা ও বিবাহে সম্মত হওয়ার দায়িত্ব মেয়ের—মেয়ে পক্ষের। (তবে এইরূপই যে হইতে হইবে, ইহার বিপরীত হইলে—মেয়ে পক্ষ হইতে প্রথম প্রস্তাব দিলে যে তাহা নাজায়েয হইয়া যাইবে, এমন কথা বলা যায় না।) এই ব্যাপারে মেয়ে পক্ষের বিবেচ্য বিষয় ছেলের শুধু দ্বীনদারী ও চরিত্র। ইহা ছাড়া অন্য কিছু নয়। দ্বীনদারী ও চরিত্রের দিক দিয়া ছেলে যদি পছন্দ না হয়, তাহা হইলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি পছন্দ হয় তাহা হইলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার কোন অধিকার তোমাদের নাই। দ্বীনদারী ও চরিত্রের দিক দিয়া ছেলে পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমরা বিবাহে সম্মত না হও, ছেলের শুধু উচ্চবংশ, রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-ঐশ্বর্যতেই বেশী গুরুত্ব দাও, আর এই দিক দিয়া কোন দ্বীনদার চরিত্রবান ছেলেকে মেয়ের বর হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হও, তাহা হইলে—হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী—দুই ধরনের বিপদ আসিতে পারে। একটি হইল, বহু মেয়ে অবিবাহিতা থাকিয়া যাইবে, স্বামী-সঙ্গ লাভ হইতে বঞ্চিতা থাকিবে এবং সেই সঙ্গে বহু সংখ্যক পুরুষ স্ত্রীহীন থাকিতে বাধ্য হইবে। তাহারা স্ত্রী লাভ করিতে পারিবে না। কেননা দুনিয়ায় খুব বেশী লোক দেখিতে সুশ্রী, উচ্চ ও অভিজাত বংশ সম্ভূত এবং ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী নয়—হয় না। আর এই উভয় কারণে সমাজের বিবাহ যোগ্য ছেলে ও মেয়েরা বিবাহের মাধ্যমে যৌন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিতে এবং জ্বেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয়, দ্বীনদারী ও চরিত্রের দিক দিয়া ছেলে উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলে ছেলে নিজে বা তাহার অভিভাবক পক্ষ অপমানিত বোধ করিতে পারে আর ইহার পরিণামে মনোমালিন্য, তিক্ততা, ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতে পারে, হইতে পারে

মারামারি ও রক্তপাত। আর ইহার পরিণামে বংশ নষ্ট, বংশের ধারা বিচ্ছিন্ন, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার পতন ও পবিত্র পরিশুদ্ধ পরিবেশের অনুপস্থিতি সংঘটিত হইতে পারে।

ইমাম মালিক বিবাহের উপযুক্ততার (কুফূ) জন্য একমাত্র দ্বীনদারী ছাড়া অন্য কোন ভিত্তি স্বীকার করেন নাই। আর জমহুর ফিকাহবিদগণ এই পর্যায়ে চারটি জিনিসের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইল, দ্বীনদারী, স্বাধীন-মুক্ত হওয়া—ক্রীতদাস না হওয়া (বর্তমানে ইহা অবান্তর), বংশ ও পেশা। ফলে মুসলিম মেয়ে অমুসলিম পুরুষের নিকট বিবাহ দেওয়া চলিবে না। চরিত্রবতী দ্বীন পালনকারী মেয়ে ফাসিক, নীতি-আদর্শহীন, পাপীষ্ঠ ও চরিত্রহীন পুরুষের নিকট বিবাহ দেওয়া চলিবে না। স্বাধীন মুক্ত মেয়ে ক্রীতদাসের নিকট বিবাহ দেওয়া চলিবে না। অত্যন্ত হীন-নীচ বংশের পুরুষের নিকট বিবাহ দেওয়া চলিবে না উচ্চ ভদ্র-অভিজাত বংশীয় মেয়ে। ব্যবসায়ীর মেয়ে কৃষিজীবি ছেলেকে বিবাহ করিলে রুচি ও আচার-আচরণ এবং সাংসারিক কাজ-কামের পার্থক্য, পারিবারিক নিয়ম-নীতি ও ধরন-ধারণের পার্থক্যের কারণে বিশেষ অসুবিধা অমিল ও মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই কারণেই ইহা পছন্দ করা হয় নাই। কিন্তু যদি এই রূপ বিবাহ হয়ই, তবে বিবাহ যে ছহীহ্ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। (تحفة الاحوذى، مرقات)

তিরমিযীরই আর একটি বর্ণনা আবূ হাতিম আল-মুজানী হইতে বর্ণিত। তাহাতে উপরোদ্ধৃত হাদীসটি হইতে কিছুটা বেশী কথা রহিয়াছে এবং ভাষারও পার্থক্য আছে। সে হাদীসটি এইঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صعلم اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوْهُ اِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ؟ قَالَ اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, তোমাদের নিকট এমন কেহ যখন (বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিবে) যাহার দ্বীনদারী ও চরিত্র তোমরা পছন্দ কর ও ভাল মনে কর, তাহা হইলে তাহার সহিত মেয়ের বিবাহ দাও। তোমরা যদি ইহা না কর, তাহা হইলে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় দেখা দিবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তাহার মধ্যে ..... হয়? ..... রাসূলে করীম বলিলেন, 'তোমাদের নিকট পছন্দসই দ্বীনদারী ও ভাল চরিত্রের ভূষিত কেহ (বিবাহের প্রস্তাব লইয়া) আসে, তাহা হইলে তাহার নিকট (মেয়ে) বিবাহ দাও—এই কথাটি তিনবার বলিলেন।

হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী আবূ হাতিম আল মুজানী। তিনি রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবী ছিলেন এবং এই একটি মাত্র হাদীসই তাঁহার কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে মূল কথার উপর রাসূলে করীম (স)-এর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ বুঝা যাইতেছে এবং এই ধরনের ছেলে পাওয়ার পর তাহার উচ্চ বংশ—শরীফ খান্দান ও বিপুল ধন-সম্পদ আছে কিনা এসব প্রশ্ন করা ও উহার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা, উপরন্তু এসব দিক দিয়া তাহাকে 'শূন্য' পাইলে তাহার নিকট মেয়ে বিবাহ না দেওয়াকে কিছুমাত্র পছন্দ করেন নাই।

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তাহা এইঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صلعم قَالَ لَهُ ثَلَاثٌ لَاتُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ اِذَااَتَتْ وَالْجَنَازَةَ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمَ اِذَاوُجِدَتْ لَهَا كُفْوًا. (ترمذى، ابن ماجه، مسند احمد، ابن حبان)

হযরত আলী (রা) কে লক্ষ্য করিয়া নবী করীম (স) নির্দেশ দিয়াছেন, তিনটি কাজ কখনই বিলম্বিত করিবে না। নামায পড়া যখন উহার সময় উপস্থিত হইবে, জানাজার নামায ও দাফন যখন উহা উপস্থিত হইবে এবং স্বামী নাই এমন পূর্ণ বয়স্কা মেয়ের জন্য উপযুক্ত সম্বন্দ পাইলে তাহাকে বিবাহ দিতে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হাব্বান) (تحفة الاحوذى، مرقات)

ব্যাখ্যা স্বামী নাই এমন পূর্ণ বয়স্কা মেয়ের জন্য যখন 'কুফু' পাওয়া যাইবে তখন তাহার বিবাহে বিলম্ব করা উচিত নয়। এই 'কুফু' অর্থ ইসলাম, সামাজিক মর্যাদা, চরিত্রগুণ ও ভাল উপার্জনের দিক দিয়া মেয়ের সহিত সামঞ্জস্যশীলতা ও উপযুক্ততা। যে সব দিক দেখিয়া-শুনিয়া মেয়ে বিবাহ দেওয়া হয়, এই গুলিই হইল সেই সব দিক। এই সব দিক দিয়া যোগ্য বর পাওয়া গেলে অন্য কোন কারণে বিবাহ বিলম্ব করা শরীয়াত পরিপন্থী কাজ। (بلوغ الامانى)

উপরোদ্ধৃত হাদীসে কনে পক্ষের লোকদেরকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং বর-পক্ষের বিয়ের প্রস্তাব আসিলে কনে পক্ষের কি করা উচিত তাহা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক নিয়মে 'বর' এর পক্ষ থেকেই বিয়ের প্রথম প্রস্তাব আসা উচিত এবং 'কনে' পক্ষের তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা। তাই বলিয়া মেয়ের দিক হইতে বিবাহের প্রস্তাব হওয়া নিষিদ্ধ হইবে এমন কথা নয়।

ইসলামে ছেলে-মেয়ের বিবাহের 'কুফু'র প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; কিন্তু এই পর্যায়ে বর্ণিত সব কয়টি হাদীস একত্রিত করিয়া পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই 'কুফু'র ব্যাপারটি বংশ প্রভৃতির দিক দিয়া যতটা না বিবেচ্য, তাহার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচ্য হইতেছে ছেলের চারিত্রিক গুণের দিক দিয়া। আল্লামা শাওকানী এই পর্যায়ের সব কয়টি হাদীস এক সঙ্গে উদ্ধৃত করার পর মন্তব্য করিয়াছেনঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اِعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِى الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ

এই সব হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে এই বিষয়ে যে, দ্বীনদারী ও চরিত্রের দিকদিয়াই 'কুফু'র বিবেচনা করিতে হইবে।

অর্থাৎ এই দুইটি দিকদিয়া ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিলে তাহাদের পারস্পরিক বিবাহ হইতে কোনই বাধা হইতে পারে না।

ইমাম মালিক দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছেনঃ

اِعْتِبَارُ الْكَفَاءَةِ مُخْتَصٌّ بِالدِّيْنِ

'কুফু'র ব্যাপারটি কেবলমাত্র দ্বীনের দিক দিয়াই বিবেচ্য।

অর্থাৎ কনে যদি দ্বীনদার ও পবিত্র চরিত্রের হয় আর বর হয় বেদ্বীন-চরিত্রহীন কিংবা ইহার বিপরীত, তাহা হইলে অন্যান্য সব দিক দিয়া মিল হইলেও সে মিল যেমন শরীয়াতের দিক দিয়া কাম্য নয়, তেমনি এই বিবাহ স্থিতিশীল নাও হইতে পারে, হইলেও সে দাম্পত্য জীবন হইতে পারে তিক্ত ও বিষাক্ত।

হযরত উমর ইবনে মাসউদ (রা) ও মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন ও উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ হইতেও এই কথাই বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। আর এই কথাই প্রমাণিত হয় কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত হইতেঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: ١٣)

নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার সেই লোক আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানার্হ যে লোক তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেনঃ

لَيْسَ نِكَاحُ غَيْرِالْاَكْفَاءِ حَرَامًا

'কুফু'র বাহিরে বিবাহ হওয়াটা হারাম নয়।

ইমাম শাওকানী আরও লিখিয়াছেনঃ

لَمْ يَثْبُتْ فِيْ اِعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ بِالنَّسَبِ مِنْ حَدِيْثٍ

বংশের দিক দিয়া 'কুফু'র বিবেচনা করিতে হইবে এমন কথার কোন হাদীসই সহীহ্ প্রমাণিত হয় নাই।

তবে এই পর্যায়ে মুহাদ্দিস বাজ্জার হযরত মুয়ায বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদীসটি এইঃ

اَلْعَرَبُ بَعْضُهَا اَكْفَاءُ بَعْضٍ وَالْمَوَالِىْ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءُ بَعْضٍ

আরব দেশের লোকেরা পরস্পরের জন্য কুফু এবং মুক্ত ক্রীতদাসরা পরস্পরের কুফু।

এই হাদীসটিতে আঞ্চলিক ভাষা ভিত্তিক ও বংশীয় দিকদিয়া কুফু'র বিবেচনা করার কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, আরব-অনারবের পারস্পরিক বিবাহ বুঝি জায়েয নয় এবং মুক্ত ক্রীতদাস বুঝি স্বাধীন বংশের মেয়ে বিবাহ করিতে পারে না। ইহাতে বংশের দিকদিয়া আশরাফ-আত্রাফের মধ্যে পার্থক্য করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই হাদীসটিই সহীহ নয়। ইহার সনদ দুর্বল। অতএব উক্ত ধারণা ঠিক নয়।

ইবনে হাজার আল-আস্কালানী লিখিয়াছেনঃ

اِعْتِبَارُ الْكَفَائَةِ الدِّيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَلاَ تَحِلُّ الْمُسْلِمَةُ لِكَافِرٍ

দ্বীনের দিকদিয়া কুফু'র বিচার ও বিবেচনাই সর্বসম্মত। অতএব কোন মুসলিম মহিলার কোন কাফের ব্যক্তির সহিত (অথবা ইহার বিপরীত) বিবাহ হালাল ও জায়েয হইতে পারে না।

ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেনঃ অধিকাংশ মনীষীর মতে কুফু'র বিবেচনা কেবলমাত্র চারটি দিক দিয়া হইতে পারে। তাহা হইলঃ

দ্বীন ও দ্বীনদারী, স্বাধীনতা (ক্রীতদাস না হওয়া), বংশ ও শিল্প ব্যবসায়—তথা পেশা বা উপার্জন উপায়।

বস্তুত স্বামী-স্ত্রীতে গভীর মিল-মিশ ও সুখময় দাম্পত্য জীবন লাভই কুফু'র ক্ষেত্রে একমাত্র লক্ষ্য অন্য কিছু নয়। (فتح البارى نيل الاوطار، معالم السنن)

মেয়ের বিবাহে অভিভাবকত্ব

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ.

(ترمذی)

হযরত আবূ মূসা আনসারী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নাই। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নাই' এই মর্মে বহু কয়জন সাহাবী হইতে বহু সংখ্যক হাদীস হাদীসের গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পর্যায়ে হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস আবূ দায়ূদ, তিরমিযী, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাবান ও হাকেম কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস তাবারানী ও জামে' সুফিয়ানে উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত হুরাইরা বর্ণিত হাদীস ইবনে মাজাহ, দারে কুতনী ও বায়হাকী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীস মুসনাদে আহমদ, দারে কুতনী, তাবারানী, বায়হাকী, মুসনাদে শাফেয়ী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত আনাস বর্ণিত হাদীস ইবনে আদী, নাসায়ী কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, আলোচ্য হাদীসটির বর্ণনা ও উদ্ধৃতি অত্যন্ত ব্যাপক।

তিরমিযী আবূ দায়ূদ-এ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি এইঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

যে মেয়েই তাহার অভিভাবক ব্যতীতই বিবাহিত হইবে, তাহার বিবাহ বাতিল, তাহার বিবাহ বাতিল, তাহার বিবাহ বাতিল।

কিন্তু ইহা তিরমিযীর ভাষা। আর আবূ দায়ূদের ভাষায় হাদীসটি এইঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلٰثُ مَرَّاتٍ.

যে মেয়েই তাহার মুরব্বীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিবে, তাহার বিবাহ বাতিল—ইহা তিনবার।

আর হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসের ভাষা এইরূপঃ

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَّ وَلِىَّ لَهُ

অভিভাবক-মুরব্বী ব্যতিরেকে কোন বিবাহ নাই। আর যাহার অভিভাক-মুরব্বী নাই, রাষ্ট্র সরকারই তাহার অভিভাবক ও মুরব্বী।

মেয়ের অভিভাবক ছাড়া মেয়ের বিবাহ হইতে পারে না এবং যে মেয়েই তাহার অভিভাবক ছাড়া বিবাহিতা হইবে বা বিবাহ করিবে; তাহার সে বিবাহই বাতিল হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গের সমস্ত

হাদীসের মূল বক্তব্য ইহাই। ফিকাহবিদগণ এই হাদীসের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী, উমর ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও আবূ হুরাইরা, আয়েশা (রা) এবং হাসান বছরী ও ইবনুল মাসাইয়্যিব প্রমুখ তাবেয়ীগণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনুল মুনযির তো দাবি করিয়া বলিয়াছেনঃ

لا يعرف عن احد من الصحابة خلاف ذلك

কোন একজন সাহাবী হইতেও ইহার বিপরীত মত জানা যায় নাই।

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِدُوْنِ وَلِيٍّ অভিভাক-মুরব্বী ব্যতিরেকে বিবাহের মূল আক্‌দ—ঈজাব-কবুলই সহীহ হয় না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রা) বলিয়াছেনঃ لَا يُعْتَبَرُ الْوَلِيُّ فِى الْبَالِغَةِ 'পূর্ণ বয়স্কা মেয়ের বিবাহে অভিভাবক গণনার যোগ্য নয়'। তিনি উপরোক্ত হাদীসকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বরং এ পর্যায়ের অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে এই মত ব্যাক্ত করিয়াছেন। তাঁহার একটি দলীল হইল এই হাদীসঃ

اَلثَّيِّبُ، وَ فِىْ رِوَايَةٍ اَلْاَيِّمُ، اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

পূর্বে স্বামী প্রাপ্তা—অন্য বর্ণনানুযায়ী—বর্তমানে স্বামীহারা মেয়ে তাহার নিজের বিবাহের ব্যাপারে তাহার অভিভাবক অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্না।

মুল্লা আলী আল-কারী লিখিয়াছেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলিয়াছেনঃ

لَا يَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ اَصْلًا سَوَاءٌ كَانَتْ اَصِيْلَةً اَوْ وَكِيْلَةً

মেয়েদের কথা ও উদ্যোগেই বিবাহ মূলতই সংঘটিত হয় না—সে নিজেরই হউক কি অন্য কাহারও প্রতিনিধি হইয়া হউক।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলিয়াছেনঃ

'কুফূ' ছাড়া বিবাহ করার ব্যাপারেই শুধু অভিভাবকের মতামত দেওয়ার ইখতিয়ার রহিয়াছে। আর কুফূ'তে বিবাহ হইলে তাহাতেও অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন রহিয়াছে।

ইমাম মালিক এর মত উদ্ধৃত হইয়াছেঃ উচ্চতর মানের ছেলের সহিত নিম্ন বংশের মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন হইবে। পক্ষান্তরে নিম্ন মানের ছেলের সহিত নিম্ন বংশের বোঝা বিবাহে ইহার প্রয়োজন হইবে না।

অবশ্য এই সব কয়টি মতেরই বিপরীত মতও প্রকাশ করা হইয়াছে। আবূ সওর বলিয়াছেনঃ অভিভাবকের অনুমতি লইয়া মেয়ে নিজেই নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করিলে তাহা জায়েয হইবে।

মওলানা খলীল আহ্‌মাদ লিখিয়াছেন, কেবলমাত্র অল্প বয়স্কা নাবালেগা ও পাগল মেয়ের বিবাহ অভিভাবক ছাড়া হয় না। ইমাম সয়ূতী লিখিয়াছেন, উপরোল্লিখিত হাদীসটি হইতে জমহুর ফিকাহবিদগণ এইমত গ্রহণ করিয়াছেন যে, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ আদপেই সহীহ্‌ হয় না।

(بذل المجهود شرح ابو داؤد)

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) অভিভাবক ছাড়া বিবাহ অসম্পূর্ণ হয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইমাম মালিক বলিয়াছেনঃ মেয়েটি যদি চরিত্রহীনা হয়, আর সে নিজেই নিজের বিবাহ সম্পন্ন করে; কিংবা নিজেই অন্য কাহাকেও দায়িত্ব দেয় তাহাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য, তবে তাহার বিবাহ বৈধ হইতে পারে; কিন্তু যে মেয়ে ভদ্র সচ্চরিত্রবতী তাহার জন্য অভিভাবক অপরিহার্য।

ইবনুল হুম্মাম উল্লেখ করিয়াছেন, মেয়েদের বিবাহ অভিভাবকের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন পর্যায়ে হাদীস ও ফিকাহবিদদের সাতটি মত উদ্ধৃত হইয়াছে, ইমাম আবূ হানীফার দুইটি মতের একটি এই যে, পূর্ণবয়স্কা ও সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ের পক্ষে নিজের ও অন্য মেয়ের বিবাহ পরিচালনা করা মোটামুটিভাবে জায়েয। তবে উহা নিশ্চয়ই পছন্দনীয় এবং বাঞ্ছিত নয়! আর দ্বিতীয় মতটি এই যে, কোন মেয়ে যদি তাহার জন্য 'উপযুক্ত' ও মানানসই (كفو) কোন বিবাহই করিয়া বসে তবে তাহা জায়েয হইবে। আর যদি ইহার বিপরীত হয়, তবে তাহা জায়েয হইবে না।

এই সব হাদীস বাহ্যত মুসলিম ও মুয়াত্তা মালিক উদ্ধৃত এই হাদীসটির বিপরীতঃ اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا 'স্বামীহীনা মেয়ে তাহার নিজের বিবাহের ব্যাপারে তাহার অভিভাবক-মুরব্বী অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্না। কিন্তু প্রকৃতভাবে ইহা উহার সহিত সাংঘর্ষিক নয়। কেননা শেষোক্ত হাদীস মেয়ের অভিভাবকের অধিকারকে সম্পূর্ণ কাড়িয়া বা হরণ করিয়া লওয়া নাই। বরং উহাতে অভিভাবকেরও কিছু না কিছু অধিকার আছে একথা বলিষ্ঠ ভাবেই বুঝাইতেছে—যদিও তাহাতে পূর্ণ বয়স্কা মেয়ের অধিকারকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীস অনুযায়ীও মেয়ের অনুমতি ও সন্তোষ জানিতে পারার পর সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন ব্যবস্থা করার ব্যাপারে অভিভাবকের অধিকার অনস্বীকার্য। এই দিক দিয়া 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নাই' হাদীসটির তাৎপর্য ও ব্যবহারিকতা স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং ইমাম আবূ হানীফার মত—অভিভাবক ছাড়া মেয়ের বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না—এই কথার যৌক্তিকতা প্রতিভাত হয়। উপরন্তু এই দুই ধরনের হাদীসের মধ্যে তেমন কোন বৈপরীত্যও প্রকট হইয়া উঠিতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত এই কথাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নাই' অর্থের হাদীস সমূহের সনদ দুর্বল—যয়ীফ, মুজতারিব (কথার অসামাঞ্জস্যতা ও সনদের আউল-ঝাউল) খুব বেশী। কাহারও মতে ইহার সনদ নবী করীম (স) পর্যন্ত 'মুত্তাসিল', কাহারও মতে 'মুত্তাসিল' নয়—মুনকাতা, ছিন্ন-ভিন্ন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, মুরসাল—পরবর্তী বর্ণনাকারী তাহার পূর্বের বর্ণনাকারীর উল্লেখ না করিয়া তাহার উপরের বর্ণনাকারীর নামে বর্ণনা করা হাদীস। হযরত আয়েশা হইতে বর্ণিত হাদীসটিরও এই অবস্থা। এই হাদীসটির বর্ণনায় জুহ্‌রীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু জুহরী নিজে এই হাদীসটির সত্যতা ও যথার্থতা অস্বীকার করিয়াছেন। ইমাম তাহাভী লিখিয়াছেন, ইবনে জুরাইন ইবনে শিহাব জুহরীর নিকট এই হাদীসটি পেশ করিলে তিনি ইহা চিনিতেই পারিলেন না এবং তিনি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইতেও অস্বীকার করিলেন।

হাফেয ইবনে হাজার আল-আসকালানী লিখিয়াছেন, বিবাহে অভিভাবকের শর্ত সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রহিয়াছে। জমহুর ফিকাহবিদ এই শর্তের যথার্থতা মানিয়া লইয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَصْلًا 'কোন মেয়েই নিজেকে বিবাহ দিবে না—একেবারেই না।' 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না' এই পর্যায়ের হাদীস সমূহকেই তাঁহারা দলীল বানাইয়াছেন। সেই সঙ্গে কুরআনের একটি আয়াতকেও তাঁহারা দলীলরূপে পেশ করিয়াছেন। হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলিয়াছেনঃ আমার বোনকে আমি এক ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিলাম। পরে সে তাহাকে (বাঈন নয় এমন) তালাক দেয়। অতঃপর তাহার ইদ্দাত শেষ হইয়া গেলে সেই লোকটিই আবার তাহাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়। আমি লোকটিকে বলিলামঃ আমার বোন তোমার নিকট কখনও ফিরিয়া যাইবে না। কিন্তু বোনটি তাহার নিকটই ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিল। তখন এই প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের এই আয়াতটি পেশ করা হয়ঃ

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ. (البقرة: ٢٣٢)

তোমরা মেয়েদিগকে তাহাদের স্বামীর সহিত নূতন বিবাহ করা হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিও না—যদি তাহারা ভালভাবে ও প্রচলিত নিয়মে পারস্পরিক পুনঃবিবাহে সম্মত হয়।

ইহারা এই আয়াতটিকে ভিত্তি করিয়া বলিয়াছেন, যেহেতু বিবাহের অভিভাবকের কর্তৃত্ব রহিয়াছে, সেই কর্তৃত্ব চালাইয়া মেয়েদিগকে তাহাদের আগের স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে এ আয়াতে নিষেধ করা হইয়াছে। যদি অভিভাবকের কোনই কর্তৃত্ব না থাকিত এবং মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছাতেই বিবাহ করিতে পারিত, তাহা হইলে এই আয়াতের কোন তাৎপর্য থাকে না। কেননা যাহার আদৌ কর্তৃত্ব নাই, তাহাদের নিষেধ কে শুনে!

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা এই মত সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, বিবাহে অভিভাবকের অনুমতির কোনই শর্ত নাই এবং বয়স্কা মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের বিবাহ সম্পন্ন করিবার পূর্ণ অধিকারী। যদি কোন মেয়ে উপযুক্ত ও মানান সই বিবাহ করে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীতও, তবুও তাহা জায়েয হইবে।

বলা হয়, তিনি প্রধানতঃ ক্রয়-বিক্রয়ে মেয়েদের স্বাধীন অধিকারের উপর কিয়াস করিয়াই বিবাহের ক্ষেত্রে ও এই স্বাধীন অধিকারের পক্ষে এই মত রচনা করিয়াছেন। আর অভিভাবকের শর্তের হাদীস সমূহ সম্পর্কে বলিয়াছেন, ইহা কেবল অল্প বয়স্কা মেয়েদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য, বড়দের ও একবার স্বামী প্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এই কথা ঠিক নয়। ইহা ইমাম আবূ হানীফার উপর মিথ্যা দোষারোপ মাত্র।

বস্তুত ইমাম আবূ হানীফা (র) কেবলমাত্র কিয়াসের উপর নির্ভর করিয়া এই ব্যাপারে এতবড় মত দিয়াছেন, এই কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আসলে ইমাম আবূ হানীফার মতটি সাধারণ বিবেক বুদ্ধি প্রসূত। উপরন্তু তিনি কুরআনের আয়াত ও প্রমাণিত হাদীসের ভিত্তিতেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমত কুরআনের আয়াতঃ

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا (الاحزاب: ٥٠)

কোন মু'মিন স্ত্রীলোক যদি নিজেকে নবীর জন্য উৎসর্গ করে........ নবী যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেন.......।

এই আয়াত হইতে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, একটি পূর্ণ বয়স্কা মেয়ের তাহার মনোনিত পুরুষের নিকট নিজের বিবাহের প্রস্তাব নিজ থেকেই পেশ করার অধিকার আছে এবং পুরুষটি সে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লইলে বিবাহও হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে অভিভাবকের মত-অমত বা মঞ্জুরী-না মঞ্জুরীর কোন শর্ত করা হয় নাই।

কুরআনে দ্বিতীয় আয়াত হইলঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

স্বামী যদি স্ত্রীকে (তিন) তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে অতঃপর সে এই (তালাকদাতা) স্বামীর জন্য হালাল হইবে না যতক্ষণ না সে তাহাকে ছাড়া অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করিবে।

এই আয়াত সম্পর্কে প্রথম কথা হইল, ইহাতে বিবাহ করা বা স্বামী গ্রহণ করার কাজটি স্ত্রীলোকের বলা হইয়াছে, কোন অভিভাবকের কাজ বলা হয় নাই। কাজেই বয়স্কা মেয়ের নিজের ইচ্ছানুক্রমে

বিবাহ সংগত হইবেনা কেন? আর দ্বিতীয় কথা হইল, আয়াতটিতে মেয়ে লোকের বিবাহকে হারাম হওয়ার চরম লক্ষ্য বলা হইয়াছে। অতএব তাহার নিজের বিবাহেই সে হারাম হওয়ার অবসানও হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا 'তাহাদের (স্ত্রী ও পুরুষ) দুইজনই যদি পরস্পরের নিকট প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তাহাতে কোন দোষ হইবে না'। ইহাতেও বিবাহ ও পুনর্বিবাহের সমস্ত কাজ স্ত্রী ও পুরুষের বলা হইয়াছে। এই মূল ব্যাপারে অভিভাবকের কিছু করার আছে একথা বলা হয় নাই। অতএব মেয়েদের নিজেদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তক্রমেই বিবাহ হইতে পারে। তাহাতে অভিভাবকের অনুমতির কোন শর্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ উপরোক্ত আয়াতে মেয়েদের নিজেদের সম্মতিক্রমে স্বামী গ্রহণ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিতে অভিভাবককে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হইয়াছে। আর অভিভাবককে এইরূপ নিষেধ করায় স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের এই কাজ করার স্বাধীন অধিকার রহিয়াছে।

অতঃপর হাদীসের দলীল হইল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ 'পূর্ণ বয়স্কা কুমারী অকুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে অভিভাবকের কোনই কর্তৃত্ব নাই'।

এই হাদীস অভিভাবকের কর্তৃত্ব হরণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় হাদীসঃ

اَلْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

স্বামীহীনা পূর্ণ বয়স্কা মেয়ে তাহার নিজের বিবাহের ব্যাপারে তাহার অভিভাবক অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্না।

অর্থাৎ কোন মেয়ে যখন পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করে এবং তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি সুস্থ ও বিকশিত হয়, তখন তাহার বিবাহের অভিভাবকত্ব সে নিজেই অধিকার করিয়া বসে। তখন তাহার বিবাহের চূড়ান্ত মঞ্জুরী দানের কর্তৃত্ব অন্য কাহারও হাতে থাকে না, এই দিক দিয়া কেহ তাহার অভিভাবক হয় না। ইহা কেবল মহিলাদের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, এইরূপ কর্তৃত্বের অধিকারই লাভ করিয়া থাকে একটা বালকও যখন সে পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করে।

মোট কথা, পিতা তাহার অল্পবয়স্কা ও নাবালিকা মেয়ের অভিভাবক হয় মেয়ের প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র এবং তাহা ততদিন যতদিন সে মেয়ে পূর্ণ বয়স্কা হয় না। ইহাই শরীয়াতের সিদ্ধান্ত। কেননা বিবাহ একটা সামাজিক বৈষয়িক ও দ্বীনী কল্যাণ মূলক কর্মতৎপরতা। ইহার প্রয়োজন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় দিকদিয়াই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাল্য বয়সে এই কাজে মেয়ে অক্ষম থাকে বলিয়াই পিতার অভিভাবকত্বের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পূর্ণবয়স্কতা লাভ হইলে এই অক্ষমতা দূর হইয়া যায় এবং নিজের বিবাহের ব্যাপারে ভাল-মন্দ নিজেই বিবেচনা করিতে পারে বলিয়া সমস্ত ইখতিয়ার তাহার একার হইয়া যায়। তখন তাহার উপর অন্য কাহারও অভিভাবকত্বের কর্তৃত্ব চালাবার সুযোগ থাকে না।

কুরআন মজীদের আয়াতঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ (النور: ٣٢)

তোমরা তোমাদের স্বামীহীনা মেয়েদিগকে বিবাহ দাও।

এই কথাটি অভিভাবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, একথা ঠিক। কিন্তু এই কথা বলিয়া এ কথা বুঝানো হয় নাই যে, অভিভাবকরা বিবাহ দিলেই বিবাহ জায়েয ও শুদ্ধ হইবে, নতুবা নয়।

সমাজের সাধারণ অবস্থা ও প্রচলন প্রথার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই কথাটি বলা হইয়াছে। কেননা বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ—খবরাখবর লওয়া, উপযুক্ত বর সন্ধান, কথাবার্তা ঠিক করা, বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করা প্রভৃতি মেয়েরা নিজেরা কখনও করে না। কারণ, এই জন্য বাহিরে দৌড়া-দৌড়ি, যাতায়াত ও পুরুষদের সঙ্গে অনেক যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়। মেয়ের মঞ্জুরী লইয়া পুরুষরাই এই সব কাজ করিবে ইহাই নিয়ম।

এই প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (স)-এর বাণী لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ 'মেয়েদিগকে কেবল অভিভাবকরাই বিবাহ দিবে কথাটিও বুঝিতে হইবে। ইহাতেও সেই সাধারণ নিয়ম ও প্রচলনের কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। ইহার অর্থ কক্ষণই ইহা নয় যে, মেয়েদের বিবাহের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বুঝি অভিভাবকদের হাতে। নবী করীম (স)-এর বাণী لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নাই' কথাটিও পুরাপুরিভাবে এই পর্যায়ের ও এই ধরনের। সেই সঙ্গে স্মরণীয়, মুহাদ্দিস ও সনদ বিশারদগণ বলিয়াছেনঃ তিনটি হাদীস রাসূলে করীম (স) হইতে প্রমাণিত নয়। তন্মধ্যে ইহাও একটি। এ কারণেই বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে এই হাদীসটি স্থান পায় নাই। আর হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী জহুরী ইহাকে অস্বীকার করিয়াছেন যেমন, তেমন হযরত আয়েশার নিজের আমল ছিল ইহার বিপরীত। অভিভাবক ছাড়াও মেয়ের বিবাহ হয় এবং তাহা বৈধ, ইহাই ছিল তাঁহার ফিক্হী মত। কাজেই হাদীসের মূল বর্ণনাকারীর নিজের আমলের (কাজ) বিপরীত মত জ্ঞাপক এই হাদীস গ্রহণ যোগ্য নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, অভিভাবকদের এড়াইয়া ডিঙ্গাইয়া ও তাহাদিগকে সঙ্গে না লইয়া কেবল মাত্র নিজের ইচ্ছা ও একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে বিবাহ করাও কোন শরীফ-শালীন চরিত্রবান মেয়ের কাজ হইতে পারে না।

বিবাহের ঘোষণা দেওয়া

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ اِذْ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذِهٖ وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ. (بخاری)

হযরত রুবাই বিনতে মুয়াওয়ায ইবনে আফ্‌রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) আসিলেন এবং আমার ফুল শয্যার রাত্রে ঘরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর আমার শয্যার উপর বসিলেন যেমন তুমি আমার নিকট হইতে দূরত্ব রক্ষা করিয়া বসিয়াছ। তখন আমাদের কতকগুলি মেয়ে দফ্ বাজাইতে শুরু করিল এবং বদর যুদ্ধে আমার পিতৃবংশের যেসব লোক শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন ও কীর্তি সৌন্দর্যের উল্লেখ পূর্ণ গৌরবগীতি গাহিতে লাগিল। সহসা একটি মেয়ে বলিয়া উঠিলঃ আমাদের মধ্যে আছেন এমন নবী যিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমরা এই কথাটি বলা বন্ধ কর এবং তোমরা যাহা বলিতেছিলে তাহাই বলিতে থাক। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ফুল শয্যার রাত্রির একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই হাদীসটিতে দেওয়া হইয়াছে। ঘটনার বর্ণনাকারী একজন মহিলা সাহাবী—আফ্‌রা পুত্র মুওয়াযের কন্যা হযরত রুবাই (রা)। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার যখন বিবাহ হইল ও তাঁহাকে লইয়া ঘর বাঁধার উদ্দেশ্যে বিবাহের উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল এবং তিনি রাত্রিকালে ফুল শয্যার ঘরে বসিয়াছিলেন, এই সময় রাসূলে করীম (স) সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া হযরত রুবাই হইতে খানিকটা দূরে আসিয়া বসিয়া গেলেন। তখন বিবাহ উৎসবের একটি অংশ হিসাবে কতকগুলি অল্প বয়স্ক মেয়ে একত্রিত হইয়া গীত গাহিতে ছিল ও 'দফ্' বাজাইতেছিল। গীতের বক্তব্য ছিল বদর যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত লোকদের জীবন ও কীর্তি সৌন্দর্যের গৌরব গাঁথা। গায়িকা মেয়েগুলির মধ্যে হইতে একটি মেয়ে নবী করীম (স)কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রশংসার উদ্দেশ্যে গীতের বাক্যসমূহের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন বাক্য শামিল করিয়া দিল। তাহাতে সে বলিলঃ আমাদের মধ্য একজন নবী রহিয়াছেন, যিনি আগামীকালের অর্থাৎ ভবিষ্যতের কথা জানেন। নবী করীম (স) মেয়েটির এই কথা শুনিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ এইরূপ কথা বলিও না—ইহা বলা বন্ধ কর। ইহা ছাড়া যাহা বলিতে ছিলে তাহা বলিতে থাক। নবী করীম (স) সম্পর্কে যে বাক্যটি বলা হইয়াছিল তাহা যেহেতু প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাহা ছিল অমূলক, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা—উপরন্তু নবী করীম (স) নিজের প্রচারিত তওহীদী আকীদা-বিশ্বাসেরও পরিপন্থী, তাই তাহা বলিতে নিষেধ করিলেন। ইহার কারণ এই যে, নবী করীম (স) আগামীকালের, অর্থাৎ ভবিষ্যতের কথা জানেন ইহা সম্পূর্ণ শিরকী আকীদা। ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেহই জানে না। কেননা ঃ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ (الانعام: ۵۹) 'গায়ব ও অদৃশ্য

জগতের সব চাবিকাঠি একান্তভাবে আল্লাহ্‌র মুঠির মধ্যে। সে বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহই কিছু জানে না'। ইসলামের ইহাই আকীদা এবং এই আকীদারই প্রচারক ছিলেন স্বয়ং নবী করীম (স)। তাঁহারই সম্মুখে তাঁহারই প্রচারিত আকীদা পরিপন্থী ও শিরকী কথা বলা হইবে, তিনি উহার প্রতিবাদ করিবেন না বা ভুল শোধরাইয়া দিবেন না তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। নবী করীম (স) সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বলিতে নিষেধ করিলেন এবং এই বাক্যটি ব্যতীত তাহারা আর যাহা যাহা বলিতেছিল তাহা বলিবার অনুমতি দিলেন। তাঁহার এই অনুমতির তাৎপর্য ছিল, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায়ঃ

اِشْتَغِلِىْ بِالْاَشْعَارِ الَّتِىْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَغَازِىْ وَالشُّجَاعَةِ وَغَيْرِه

বীরত্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে যে সব গীত গাহিতেছিলে তাহাই গাহিতে নিমগ্ন থাক।

আলোচ্য হাদীসটি হইতে কয়েকটি কথা জানা গেল।

প্রথম কথা, ইহাতে হযরত রুবাই'র বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কথা বলা হইয়াছে। আর তাহা হইল তাঁহার নিকট নবী করীম (স)-এর তাঁহার ঘরে উপস্থিতি এবং তাঁহার নিকটে আসন গ্রহণ। এখানে প্রশ্ন উঠে, রুবাই একজন ভিন্ মহিলা—গায়র মুহাররম, নবী করীম (স) তাঁহার ঘরে কি ভাবে গেলেন এবং তাঁহার সম্মুখেই বা আসন গ্রহণ করিলেন কেমন করিয়া? ইহার জওয়াবে বলা যায়, নবী করীম (স) হয়ত তাঁহার ঘরে পর্দার আড়ালে বসিয়াছিলেন। তাহা হইলে তো পর্দা নষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিংবা এই ঘটনা হয়ত তখনকার সময়ের যখন পর্দার বিধান নাযিল হয় নাই। অথবা বলা যাইতে পারে, বিশেষ প্রয়োজনের কারণে ভিন্ মহিলার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তো সম্পূর্ণ না জায়েয নয়। ইহা ছাড়া কোনরূপ অঘটন ঘটিবার আশংকা না থাকিলে এইরূপ ঘরে প্রবেশ ও উপবেশন করা শরীয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী নয়। সর্বোপরি নবী করীম (স)-এর পক্ষে কোন ভিন্ মেয়ের ঘরে যাওয়া ও তাহার উপর দৃষ্টি দেওয়ার একটা বিশেষ অনুমতি থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু মুল্লা আলী আল-কারীর মতে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। কেননা মূল হাদীসে একথা আদৌ বলা হয় নাই যে, হযরত রুবাই মুখ খুলিয়া রাসূলে করীমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ছিলেন এবং তাঁহার সহিত নিভৃত একাকীত্বে মিলিত হইয়াছিলেন। বরং ইহার বিপরীত কথাই হাদীস হইতে বোঝা যায়। কেননা ইহা ছিল তাঁহার لَيْلَةُ الزِّفَافِ ফুল শয্যার রাত্র বা মধু যামিনী। এই রাত্রে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সহিত নিভৃত একাকীত্বে মিলিত হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না, তাহার কোন সুযোগ থাকাও স্বাভাবিক নয়।

আলোচ্য হাদীসে রুবাই বিবাহ ও ফুল শয্যার রাত্রিতে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে 'দফ্' বাজানো ও ছোট ছোট মেয়েদের গীত গাওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। তাহাও আবার করা হইয়াছে শরীয়াতের বিধান প্রবর্তক স্বয়ং নবী করীম (স)-এর উপস্থিতিতে এবং তাঁহার বিশেষ সংশোধনীসহ অনুমোদনক্রমে। একতারা ঢোলকে দফ্ বলা হয়। ইহা বাজাইয়া বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া ও প্রচার করা হইতেছিল। বস্তুত ইহার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। বিবাহ একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। ইহাতে সমাজের অনুমোদনের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা সমাজের সকল লোককে সাধারণভাবে জানাইয়া দেওয়া। বিবাহের পূর্বমুহূর্তে যে যুবক ও যুবতী পরস্পরের জন্য হারাম ছিল, এই দুইজনের নিভৃত নির্জনতায় একত্রিত হওয়া ছিল অননুমোদিত। বিবাহ হইয়া যাওয়ার মুহূর্ত হইতেই পরস্পরের জন্য হালাল হইয়া গেল। অতঃপর দুইজনের নিভৃত নিরালায় একত্রিত হওয়াটার উপর কাহারও আপত্তি থাকে না, কেহ তাহার প্রতি কটাক্ষ পর্যন্ত করিতে পারে না। ইহা সম্ভব সামাজিক সমর্থন ও সাধারণের অনুমতি ও অবগতির কারণে। এই কারণেই বলা হইয়াছ, সামাজিক সমর্থন ও সাধারণের অবগতি ব্যতীত যুবক-যুবতীর নিভৃতে মিলন সুস্পষ্ট ব্যভিচার ছাড়া

কিছু নয়। বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য। বিবাহ হয় সমাজের সমর্থন অনুমোদনক্রমে এবং সকলকে প্রকাশ্যে জানাইয়া শুনাইয়া। আর ব্যাভিচার হয় গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, সাধারণ্যের অজ্ঞাতসারে। মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব আল-জুমহা বর্ণনা করিয়াছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِى النِّكَاحِ. (ترمذى، بخارى، مسلم، نسائى، ابن ماجه)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ হালাল ও হারাম বিবাহের মধ্যে পার্থক্যকারী হইল বাদ্য ও শব্দ। (তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম, নিসায়ী, ইবনে মাযাহ্)

হাদীসের 'হালাল বিবাহ' অর্থ বৈধভাবে স্ত্রীগ্রহণ এবং 'হারাম বিবাহ' বলিয়া বোঝানো হইয়াছে অবৈধভাবে নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন যাপন। বাদ্য বাজাইয়া ও শব্দ ধ্বনি সহকারে সাধারণের অবগতির ভিত্তিতে বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের যে মিলন, তাহা সম্পূর্ণ হালাল। পক্ষান্তরে যে নারী-পুরুষের মিলনে সাধ্যমত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়—লোকেরা জানুক, তাহা কিছুতেই চাওয়া হয় না, পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করা হয় লোকদের অবগতি হইতে তাহা গোপন রাখার জন্য, তাহাই হারাম, তাহাই ব্যভিচার। প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যক যে, এই সব হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হইল লোকদের জানাইয়া-শুনাইয়া বিবাহ অনুষ্ঠান করা, গোপনে গোপনে নয়। আর প্রচার মাধ্যম যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। যে যুগে যে ধরনের প্রচারে উদ্দেশ্য সাধিত হয় সে যুগে তাহাই গ্রহণীয়। সব যুগে একই মাধ্যম গ্রহণের কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন حديث حسن ভাল হাদীস। ইবনে হাব্বান ও হাকেম এই হাদসীটিকে বলিয়াছেন 'সহীহ'। দারে কুতনী ও মুসলিমের সূত্রে ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী মুজাহিদ ইবনে মুসা হইতে এবং ইবনে মাজাহ্ আমর ইবনে নাফের সূত্রে এই হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পর্যায়ের আর একটি হাদীস হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ. (ترمذى)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমরা এই বিবাহের ঘোষণা ও সাধারণ্যে জানান দাও। বিবাহের মূল অনুষ্ঠান মসজিদে কর এবং এই সময় দফ্ বাদ্য বাজাও।

ইবনে মাজাহ্ হাদীস গ্রন্থেও এই হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে اِجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ বাক্যটি নাই। উহার ভাষা এইঃ

اِعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ

এই বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রচার কর এবং এই উপলক্ষে বাদ্য বাজাও।

এই পর্যায়ে আর একটি বর্ণনা হইলঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتّٰى يُضْرَبَ بِدُفٍّ

নবী করীম (সা) গোপনে বিবাহ করাকে অপছন্দ করিতেন, যতক্ষণ না বাদ্য বাজানো হইবে।

বিবাহের প্রচার করার ও ঘোষণা দেওয়ার অর্থ, প্রথমতঃ বিবাহ হওয়ার প্রমাণ ও সাক্ষী রাখ। লোকদের উপস্থিতিতে বিবাহের 'ইজাব কবুল' করাও এবং বিবাহ যে হইল তাহার লিখিত প্রমাণ (Document) বা দলীল দস্তাবেজ তৈয়ার কর। রাসূলের এই আদেশটি পালন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ ইহার অর্থ, প্রচার ও বিজ্ঞপ্তি কর। এই আদেশ মুস্তাহাব। মসজিদে বিবাহ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এই কারণে যে, মসজিদে ইসলামী জনতা সদা সমপস্থিত থাকে এবং ইহাতে সমাজে বিবাহের সংবাদ সহজেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে পারে, অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতেই সাধারণ্যে জানাজানি হইয়া যায়। অথবা এই নির্দেশ এজন্যও হইতে পারে যে, মসজিদ অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতের স্থান। এখানে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে উহা পবিত্র পরিমণ্ডলে সমাপ্ত হইবে এবং উহাতেও বরকাত আসিবে। মসজিদে বিবাহ (অর্থাৎ আক্‌দ্ عقد) অনুষ্ঠিত হইলে বাদ্যবাজনা নিশ্চয়ই মসজিদে বাজানো যাইবে না। তাহা করিতে হইবে মসজিদের বাহিরে—নিজের ঘরে কিংবা অন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে।

হাদীস সমূহে এই যে দফ্ (دف) বাজাইবার নির্দেশ দেওয়া ইহয়াছে, ইহা হইতে কি ধরনের বাদ্য বুঝায়? ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেনঃ اَلْمُرَادُ بِالدَّفِّ مَالاَجُلاَجُلَ فِيْهِ 'দফ্ এমন বাদ্য যাহাতে ধ্বনি আছে কিন্তু ইহার ঝংকার নাই, যাহাতে সুরের মুর্ছনা বাজিয়া উঠে না'। 'বাদ্য বাজাও' এই নির্দেশে বাহ্যত সাধারণ এবং নারী-পুরুষ উভয়ই বাদ্য বাজাইবার কাজ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। অনেক ব্যাখ্যাকারী এই মতই দিয়াছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার আল-আসকালানী লিখিয়াছেন, এই মতটি দুর্বল। বলিষ্ঠ হাদীসসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাদ্য বাজাইবার এই অনুমতি বিবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট মহিলাদের জন্য। বাদ্য কেবল মেয়েরাই বাজাইবে। সেখানে পুরুষের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত। কেননা সাধারণত নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ। শধু বাদ্যই নয়, শালীনতাপূর্ণ ও জায়েয ধরনের গীত গান গাওয়ার কাজটিও কেবলমাত্র মেয়েদেরই করণীয়। এই কাজ পুরুষদের জন্য নাজায়েয।

ইমাম তিরমিয়ী ও ইবনে হাজার আসকালানীর মতে তিরমিযী বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি যয়ীফ। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেনঃ এই হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী ইসা ইবনে মায়মুন দুর্বল ব্যক্তি। ইবনে মাজাহ বর্ণিত হাদীসটির সনদে খালিদ ইবনে ইলিয়াস একজন বর্ণনাকারী, সে পরিত্যাক্ত—তাহার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনুজ্ জুবাইর হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর ইবনে হাব্বান ও হাকেম উহাকে সহীহ্ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে হাদীসের কথা শুধু এতটুকুঃ اَعْلِنُوْا بِالنِّكَاحِ 'বিবাহের ঘোষণা দাও'। তাহাতে وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بالدفوف 'এবং উহাতে 'দফ্' বাজাও' কথাটুকুর উল্লেখ নাই। (عمدة القاری، تحفة الاحوذی، نيل الاوطار)

বিবাহের আনন্দ উৎসব

عَنْ قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّيْنَ قَالاَ رُخِّصَ لَنَا فِى اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرُوْسِ. (نسائ)

কুরাজা ইবনে কায়াব ও আবূ মাসউদ আনসারী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা দুইজন একসঙ্গে বলিয়াছেনঃ বিবাহ উৎসবে আমাদিগকে খেলা-তামাসা ও আনন্দস্ফূর্তি করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। (নাসায়ী)

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

لَقِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَارِىَ يُغَنِّيْنَ وَيَقُلْنَ حَيُّوْنَا نُحَيِّيكُمْ قَالَ لاَ تَقُولُوا هٰكَذَا وَلٰكِنْ قُولُوا حَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُرَخِّصُ لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ، اِنَّهُ نِكَاحٌ لاَ سِفَاحٌ. (طبرانى)

রাসূলে করীম (স) কতিপয় মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাহারা গীত গাহিতে ছিল এবং তাহাতে বলিতেছিলঃ 'তোমরা আমাদিগকে বাঁচাও, আমরা তোমাদিগকে বাঁচাইব।' নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমরা এইরূপ কথা বলিও না। বরং তোমরা বল '(আল্লাহ্) আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন, তিনি তোমাদিগকেও বাঁচাইবেন।' তখন একজন লোক বলিলঃ ইয়া রাসূল! আপনি কি বিবাহে লোকদিগকে এই সব কাজের অনুমতি দিতেছেন? রাসূলে করীম (স) বলিলেন, 'হ্যা, নিশ্চয়ই। কেননা, ইহাতো বিবাহ, ব্যাভিচার নয়।' (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা এই হাদীস দুইটি হইতে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, বিবাহ কার্যটি উৎসবের ব্যাপার এবং এই উৎসব অনুষ্ঠানে আনন্দ স্ফূর্তি ও গানবাদ্য করাটা শরীয়াতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়। বরং ইহার অনুমতি রহিয়াছে। তবে শর্ত এই যে, তাহা পুরাপুরিভাবে শালীনতাপূর্ণ ও শরীয়াতের আওতার মধ্যে হইতে হইবে। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, উহাতে গান বাদ্য করিবে কেবল মাত্র মেয়েরা। কোন্ মেয়েরা। যে কয়টি হাদীসে গান-বাদ্য করার ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মেয়েরাই গান ও গীত গাহিতেছিল। এই পর্যায়ে ব্যবহৃত শব্দ হইল جُوَيْرِيَةٌ অথবা جُيَوَارِى কিংবা جُوَيْرِيَاتٌ. ইহা جَارِيَةٌ শব্দ হইতে ছোটত্ব বুঝাইবার জন্য বানানো শব্দ। অর্থাৎ ইহারা ছিল ছোট ছোট মেয়ে। এই সব মেয়ে কাহারা ছিল? বলা হয় اَلْمُرَادُ بِهِنَّ بَنَاتُ الْاَنْصَارِ دُوْنَ الْمَمْلُوْكَاتِ 'ইহারা ছিল আনসার বংশের ছোট ছোট মেয়েরা— দাসী-বান্দীরা নয়'। আবার অন্যরা বলিয়াছেনঃ تِلْكَ الْبَنَاتُ لَمْ تَكُنْ بَالِغَاتٍ حَدَّ الشَّهْوَةِ এই মেয়েরা পূর্ণ বয়স্কা ছিল না। তাহাদিগকে দেখিলে যৌনকামনা উত্তেজিত হইতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বিবাহ উৎসবে বর-কনে পক্ষের ছোট ছোট মেয়েরা কিছুটা গান-বাদ্য করিয়া যদি স্ফূর্তি আনন্দ প্রকাশ করে তাহা হইলে তাহা ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত কাজ হইবে না। তবে সমাজের বড়দের সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, যেন উহাতে কোন রূপ অশ্লীলতা বা শির্ক প্রবেশ করিতে না পারে এবং যে গীত গাওয়া হইবে, তাহাতে কোন অসত্য বা শির্কী কথা-বার্তা শামিল হইতে না পারে।

এই পর্যায়ে একটি বিশেষ হাদীস উল্লেখ্য। আমের ইবনে সায়াদ তাবেয়ী বলেন, আমি কুরাইজা ইবনে কায়াব ও আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রা) এই সাহাবীদ্বয়ের সহিত এক বিবাহ অনুষ্ঠানে একত্রিত হইলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক মেয়ে গীত গাহিতেছিল। আমি ইহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে বলিলামঃ

اَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ بَدْرٍ يُفْعَلُ هٰذَا عِنْدَكُمْ

রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীদ্বয়, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদ্বয়! আপনাদের উপস্থিতিতে এইরূপ করা হইতেছে, (অথচ আপনারা কিছুই বলিতেছেন না)?

তখন তাঁহারা দুইজন বলিলেনঃ

اِجْلِسْ اِنْ شِئْتَ فَاسْتَمِعْ مَعَنَا وَاِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ فَاِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا اللَّهْوُ عِنْدَ الْعُرْسِ. (نسائى، حاكم وصحيحه)

তুমি ইচ্ছা হইলে বস ও আমাদের সঙ্গে থাকিয়া শুন। অন্যথায় এখান হইতে চলিয়া যাও। এখানে যে আনন্দ ও হাসিখুশী করা হইতেছে, বিবাহানুষ্ঠানে ইহা করার আমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

ইমাম শাওকানী এই পর্যায়ের হাদীস সমূহ উদ্ধৃত করার পর লিখিয়াছেনঃ

وَفِيْ ذٰلِكَ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّهُ يَجُوْزُ فِى النِّكَاحِ ضَرْبُ الْاَدْفَافِ وَرَفْعُ الْاَصْوَاتِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْكَلَامِ

এইসব হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ্ একতারা বাদ্য বাজানো এবং উচ্চ শব্দে কোন কথা (গদ্য-পদ্য-গীত) পাঠ করিয়া প্রচার করা সম্পূর্ণ জায়েয।

তিনি আরও লিখিয়াছেনঃ

لَا بِالْاَغَانِىْ الْمُهَيِّجَةِ لِلشُّرُوْرِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلٰى وَصْفِ الْجَمَالِ وَالْفُجُوْرِ وَمُعَاقَرَةِ الْخُمُوْرِ فَاِنَّ ذٰلِكَ يَحْرُمُ فِى النِّكَاحِ كَمَا يَحْرُمُ فِىْ غَيْرِهِ

অন্যায়, দুষ্কৃতি, চরিত্রহীনতার উদ্বোধক ও রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা সম্বলিত গান এবং মদ্যপানের আসর জমানো বিবাহনুষ্ঠানেও হারাম, যেমন হারাম উহার বাহিরে। (نيل الاوطار، فقه السنة)

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهَا اَنْكَحَتْ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّيْ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَا فَقَالَ اِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ فَلَوْبَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ اَتَيْنَا كُمْ اَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ. (ابن ماجه)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার নিকটাত্মীয় আনসার বংশের একটি মেয়েকে বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সময় রাসূলে করীম (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি এই মেয়েটির সঙ্গে অন্য মেয়েও পাঠাইয়াছ? লোকেরা বলিলঃ হ্যাঁ, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা মেয়েটির সঙ্গে এমন কাহাকেও পাঠাইয়াছ, যে গীত গাহিবে, গান করিবে? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ইহার উত্তরে আমি বলিলামঃ না, তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ আনসার বংশের লোকেরা গান-গজল খুব পছন্দ করে। তোমরা যদি কনের সঙ্গে এমন কাহাকেও পাঠাইতে যে বলিতঃ আমরা আসিয়াছি, আমরা আসিয়াছি। আল্লাহ্ আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন, তোমাদিগকেও বাঁচাইয়া রাখুন! (তাহা হইলে খুবই ভাল হইত) (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে এই হাদীসটি যায়ীফ। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলিয়াছেনঃ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ ইহা গ্রহণ অযোগ্য হাদীস। কিন্তু ইহা ইবনে মাজাহর বর্ণনার সনদ সম্পর্কে মন্তব্য। হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বা বক্তব্যই ভিন্নতর সনদ সূত্রে বুখারী, বায়হাকী, মুস্তাদরাক হাকেম

এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল কর্তৃক তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সে বর্ণনা সমূহের ভাষায়ও তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। মুসনাদে আহমাদে উদ্ধৃত হাদীসটির ভাষা এইঃ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم قَالَتْ كَانَ فِىْ حُجْرِىْ جَارِيَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَزَوَّجْتُهَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يَوْمَ عُرْسِهَا فَلَمْ يَسْمَعْ لَعِبًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يُحِبُّوْنَ كَذَا وَكَذَا

নবী করীম (স)-এর বেগম হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেনঃ আমার কোলে আনসার বংশের একটি মেয়েকে লালন-পালন করিয়া বড় করিয়াছিলাম। পরে আমি সে মেয়েটিকে বিবাহ দিলাম। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই সময় রাসূলে করীম (স) মেয়েটির বিবাহ (বা বাসর রাত্রির) দিনে আমার ঘরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোন খেলা-তামাসা-স্ফূর্তির শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ হে আয়েশা! আনসারদের এই লোকেরা অমুক অমুক কাজ খুব পছন্দ করে ও ভালবাসে.........।

এই হাদীসটি হইতে দুইটি কথা স্পষ্ট জানা গেল। একটি, মেয়েটির সঠিক পরিচয়। আর দ্বিতীয়, বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠানে নবী করীম (স) স্বাভাবিকভাবেই কিসের আশা করিতেছিলেন।

মেয়েটির পরিচয় এই জানা গেল যে, সে আনসার বংশের এক ইয়াতীম মেয়ে ছিল। হযরত আয়েশার অভিভাবকত্বে লালিতা পালিতা হইয়াছিল এবং হযরত আয়েশা (রা) নিজ দায়িত্বেই মেয়েটির বিবাহ দিয়াছিলেন।

আর দ্বিতীয় কথা এই যে, এই উৎসব উপলক্ষে বেশ আমোদ-স্ফূর্তি অনুষ্ঠিত হইবে। খেলা, তামাসা, গীত ও বাদ্য হইবে। যাহাতে বুঝা যাইবে ও চারিদিকে লোকেরাও টের পাইবে যে, এই বাড়ীতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু তিনি হযরত আয়েশার ঘরে উপস্থিত হইয়া তেমন কিছুরই টের পাইলেন না। কোন বাদ্যের শব্দ শুনিতে পাইলেন না। গীত গানের ধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল না। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন এবং হযরত আয়েশা (রা) কে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, আমোদ-স্ফূর্তিহীন, খেলা-তামাসা, গীত ও বাদ্য ধ্বনি শূন্য—নিতান্ত সাদামাটা ধরনের বিবাহ অনুষ্ঠান তিনি পছন্দ করিতে পারেন নাই।

এই সব কথা অধিক স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত হাদীসে। উহার ভাষা এইঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم لِعَائِشَةَ اَهْدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ اِلٰى بَيْتِهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَهَلَّا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّيْهِمْ ...... فَاِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ. (مسند احمد)

রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)কে বলিলেনঃ সেই মেয়েটির শ্বশুরবাড়ী কোন মেয়েকে সঙ্গী করিয়া পাঠাইয়াছ কি? হযরত আয়েশা বলিলেনঃ হ্যাঁ। তখন নবী করীম (স) বলিলেন, তাহার সঙ্গে এমন কাহাকেও কেন পাঠাইলে না, যে তাহাদিগকে গান ও গীত গাহিয়া শুনাইবে?.... কেননা আনসাররা এমন লোক যে, তাহাদের মধ্যে মেয়েদের পারস্পরিক গীত বিনিময় করার ব্যাপার প্রচলন করিয়াছে।

এই হাদীস হইতে প্রথমত জানা গেল, কনের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র মেয়ে পাঠাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই মেয়েটি কনের সঙ্গে থাকিবে। নূতন বাড়ীতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশে আসিয়া কনে লজ্জায় ও অপরিচিতির কারণে সেখানকার লোকদের সাথে কথাবার্তা বলিতে সংকোচ বোধ করিবে। কাজেই তাহার পরিচিত সঙ্গী কোন মেয়ে থাকিলে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বা নিজের কোন প্রয়োজনের কথা জানাইতে পারিবে। ইহার প্রচলন বোধ হয় সকল দেশে ও সকল সমাজে আছে এবং সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত ইহা পরিব্যাপ্ত।

দ্বিতীয় জানা গেল, কনের শ্বশুর বাড়ী গিয়া গীত ও গান গাহিয়া শুনাইবে এমন একজনও (বা সম্ভব হইলে একাধিক) মেয়ে পাঠানোও আবশ্যক। কেননা এই ভাবে গান-গীতের বিনিময় করা—কনের পিতার বাড়ি হইতে যাওয়া মেয়ে এবং স্বামীর বাড়ীর মেয়েরা একের পর এক গান-গীত গাহিয়া বিবাহ বাড়ীটিকে আনন্দ মুখর করিয়া তুলিবে। এইরূপ কাহাকেও পাঠানো হইয়াছে কিনা তাহা নবী করীম (স) হযরত আয়েশার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। শুরাইক বর্ণিত হাদীসে এই কথাটির ভাষা এইরূপঃ

فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيْ؟

তোমরা কি কনের সঙ্গে এমন একটি মেয়ে পাঠাইয়াছ, যে সেখানে বাদ্য বাজাইবে ও গান-গীত গাহিবে?

আর হিশাম ইবনে ওরওয়া সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত এবং বুখারী মুস্তাদরাক হাকেম-এ উদ্ধৃত অপর একটি হাদীসে এই কথাটির ভাষা হইলঃ

يَاعَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَاِنَّ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوَ

হে আয়েশা! তাহাদের সঙ্গে কি কোন আমোদ-স্ফূর্তির আয়োজন নাই? কেননা আনসার বংশের লোকেরা আমোদ-স্ফূর্তি ও খেলা তামাসা খুব পছন্দ করে।

গান-গীত গাহিবার জন্য লোক সঙ্গে গিয়াছে কিনা? এই প্রশ্নের কারণ স্বরূপ (প্রত্যেকটি হাদীসের ভাষায়) নবী করীম (স) আনসারদের গান-গীত প্রিয়তার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে দুইটি কথা বুঝিতে পারা যায়। একটি হইল, মেয়েটি ছিল আনসার বংশের ইয়াতীম, হযরত আয়েশার অভিভাবকত্বে বিবাহিতা হইয়াছিল সেই আনসার বংশেরই কোন ছেলের সাথে। আর দ্বিতীয় এই যে, আনসার বংশের লোকেরা গান-গীত পছন্দ করে। অতএব বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠানে তাহাদের এই রুচি ও পছন্দ রক্ষা করা ও তদনুযায়ী কাজ করা—উহার আয়োজন ব্যবস্থা করা—কনে পক্ষেরও কর্তব্য। অবশ্য তাহা যদি সুস্পষ্ট হারাম না হইয়া থাকে। তৃতীয় যে কথাটি জানা গেল তাহা এই যে, আনসার বংশের প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসা এই রসমটি ইসলাম পরিপন্থী ছিল না বলিয়া উহাকে চালু রাখা হইয়াছে।

আর এই পর্যায়ের সমস্ত উদ্ধৃত অনুদ্ধৃত হাদীস এবং হাদীসের মূল ভাষার পর্যালোচনা হইতে আরও দুইটি বড় বড় কথা জানা যায়। তাহার একটি হইল, নবী করীম (স)-এর বেগমদের নিজস্ব ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে এমন অনেক কাজ হইত, যাহাতে তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। রাসূলে করীম (স) নিজে তাহাতে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করিতেন না। আনসার বংশের এই মেয়েটির নবী করীম (স)-এর বেগম হযরত আয়েশার অভিভাবকত্বে লালিতা-পালিতা ও বিবাহিতা হওয়ার সমস্ত ব্যাপারটি আমাদের এই কথার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে নবী করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)কে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যাহা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন ও নীতিগত উপদেশ দিয়াছেন, তাহা একচেটিয়া কর্তৃত্ব

সম্পন্ন গৃহকর্তার মত নয়। তাহা একজন কল্যাণকামী প্রতিবেশী বা সম্মানিত অতিথি কিংবা সামাজিক সুষ্ঠুতা বিধানকারী কোন মুরব্বীর মত।

আর দ্বিতীয় কথা এই যে, বিবাহ কাজটি একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক, আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ স্ফূর্তির সমন্বিত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানকে নিরেট সাদামাটা ও যেন-তেন প্রকারের সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়, উচিত নয় এই অনুষ্ঠানকে কিছুমাত্র তুচ্ছজ্ঞান করা। কেননা ইসলামী সমাজের প্রথম ইউনিট হইল পরিবার। আর পরিবারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বিবাহের মাধ্যমে। ইহার সহিত আরও দুইটি কথা আছে। একটি হইল, মানুষের প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই আমোদ-উৎসব প্রিয়তা রহিয়াছে। সমীচীন পরিধি-পরিমন্ডলের মধ্যে ও সুরুচি-শালীনতা রক্ষা করিয়া যতটা সম্ভব, ইহার চরিতার্থতার সুযোগ ও ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছণীয়। ইসলাম সে সুযোগ দিয়াছে। বস্তুত ইসলাম নিছক শুষ্ক-নিরস আনন্দ শূন্য কোন ধর্মমাত্র নয় ইহা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বিধায় ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত স্বাভাবিক রুচি-প্রবণতার চরিতার্থতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, বিবাহে দুইটি ভিন্ন পরিবার জড়িত। এই উভয় পরিবারের উচিত অপর পরিবারের প্রচলিত বৈধ আচার রীতির সহিত আনুকূল্য ও সহযোগিতা করা। কেবল নিজের রুচিটি অপরের বা অপর পরিবারের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করা কোনক্রমেই উচিত হইতে পারে না। আনসার বংশের এই ইয়াতীম মেয়েটির বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া নবী করীম (স) এত গুরুত্বসহকারে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন এই কারণেই।

(عمدة القاری، تحفة الاحوذی، بلوغ الامانی، فتح الباری، مرقات، نیل الاوطار)

বিবাহে উকীল নিয়োগ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ اَتَرْضٰى اَنْ اُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ اَتَرْضَيْنَ اَنْ اُزَوِّجَكِ فُلاَنًا ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ اَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُمْ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِىْ فُلاَنَةَ وَلَمْ اَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ اُعْطِهَا شَيْئًا وَاِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ اَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِىْ بِخَيْبَرَ فَاَخَذَتْ سَهْمَهُ فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ اَلْفٍ. (ابوداؤد)

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) এক ব্যক্তিকে বলিলেনঃ আমি তোমার সহিত অমুক মেয়ে লোকটির বিবাহ দিব, তুমি কি রাযী আছ? সে বলিলঃ হ্যাঁ। তিনি মেয়ে লোকটিকে বলিলেনঃ আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিব, তুমি রাযী আছ? সে বলিলঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি একজনের সহিত অপরজনকে বিবাহ দিলেন। পরে সে তাহার সহিত মিলিত হইল; কিন্তু তাহার জন্য কোন মহরানা ধার্য করা হয় না, কোন জিনিসও সে তাহাকে দেয় নাই। এই লোকটি হুদাইবিয়ার সন্ধি অভিযানে শরীক ছিল। আর হুদাইবিয়ার সন্ধি অভিযানে শরীক হওয়া লোকদিগকে খায়বরের জমি দেওয়া হইয়াছিল। শেষে লোকটির মৃত্যু মুহূর্ত উপস্থিত হইলে সে বলিলঃ রাসূলে করীম (স) আমার সহিত অমুক মেয়ে লোকটিকে বিবাহ করাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাহার জন্য কোন মহরানা ধার্য করি নাই এবং তাহাকে কিছু দেইও নাই। এখন আমি তোমাদিগকে সাক্ষী বানাইয়া বলিতেছিঃ আমি আমার এই স্ত্রীকে তাহার মহরানা বাবদ আমার খায়বরে প্রাপ্ত অংশের জমি খন্ড দিলাম। পরে স্ত্রী লোকটি তাহার (স্বামীর) অংশটি গ্রহণ করিল ও একলক্ষ্য মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া দিল। (আবূ দায়ূদ)

ব্যাখ্যা হাদীসটি ব্যাপক তাৎপর্যবহ। প্রথমত ইহাতে বিবাহের উকীল নিয়োগ বা উকীলের সাহায্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিবাহকালে মহরানা ধার্য না হইলেও বিবাহ সহীহ্ হয় এবং স্ত্রীর সহিত একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জীবন যাপন ও সঙ্গম করা যায়। আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মহরানা আদায় করাও নাজায়েয নয়।

উকীল দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যায়ে হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর বিবাহের ব্যাপারটি উল্লেখ্য। তিনিও অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে হাবশায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। সেখানেই নাজাশী তাঁহাকে রাসূলে করীম (স)-এর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে রাসূলে করীম (স)-এর পক্ষ হইতে

উকীল হইয়াছিলেন হযরত আমর ইবনে উমাইয়্যাতা আজ-জামারী (রা)। রাসূলে করীম (স) নিজে তাঁহাকে এই জন্য উকীল বানাইয়াছিলেন। আর নাজাশী নিজে রাসূলে করীম (স)-এর পক্ষ হইতে চারশত দীনার মহরানা আদায় করিয়া দিয়াছিলেন। (আবূ দায়ূদ)

'অকালাত' (اَلْوَكَالَةُ) শব্দের অর্থ কাহাকেও কোন কাজের জন্য নিজের পক্ষ হইতে দায়িত্বশীল বানানো। নির্দিষ্ট কোন কাজ সমাধা করার উদ্দেশ্যে একজনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করা। যাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বা নিজের স্থলাভিষিক্ত বানানো হয় তাহাকেই 'উকীল' বলে। ফিকাহ্‌বিদগণ বলিয়াছেন, যে কাজ কাহারও নিজের করা জায়েয সেই কাজের জন্য অপর কাহাকেও দায়িত্বশীল বা উকীল বানানোও সম্পূর্ণ জায়েয। ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, হক্ক দাবি করা, কোন কিছু হাসিল করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদি সব কাজই ইহার মধ্যে গণ্য। স্বয়ং নবী করীম (স) তাঁহার কোন কোন সাহাবীর বিবাহ কার্যে নিজে উকীল হইতেন ও বিবাহ সম্পন্ন করিতেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত হাদীস হইতে স্পষ্ট ও অকাট্যরূপে জানা যাইতেছে। উপরোক্ত হাদীস হইতে একথাও জানা যায় যে, একই ব্যক্তি বিবাহের—বর পক্ষ ও কনে পক্ষ—উভয়ের উকীল হইতে পারে। যে কোন পূর্ণ বয়স্ক—বালেগ—সুস্থ বিবেক বুদ্ধিমান স্বাধীন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে উকীল বানাইতে পারে। তাহার পক্ষ হইতে এই গুণের কাহাকেও উকীল বানানো যাইতে পারে, নিজে নিজের বা অপর কাহারও উকীল হইতে পারে। যে লোক এই গুণ সম্পন্ন নয়, সে উকীল হইতেও পারে না, বানাইতেও পারে না। যেমন পাগল, নাবালেগ, ক্রীতদাস, দিশাহারা ব্যক্তি।

পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন স্ত্রী লোক নিজের পক্ষ হইতে নিজের ইচ্ছামত কাহাকেও উকীল বানাইতে পারে কিনা এই বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মত-বিরোধের ভিত্তি হইতেছে এই বিষয়ের মতবিরোধ যে, সে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করিতে পারে কিনা।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পুরুষ যেমন উকীল বানাইতে পারে, একজন স্ত্রী লোকও তেমনিই উকীল নিযুক্ত করিতে পারে। কেননা মেয়ে লোক যে কোন চুক্তি করার অধিকার রাখে। এই অধিকার যখন রহিয়াছে, তখন সে নিজের কাজ করার জন্য অপর কাহাকেও দায়িত্বশীল বানাইতে পারে। তাহা সম্পূর্ণ জায়েয। শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ পিতা ও দাদা এবং তাহাদের ছাড়া অন্যান্য 'ওলী' (অভিভাবক) দের মধ্যে স্ত্রীলোকের উকীল বানাইবার ব্যাপারে পার্থক্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, পিতা ও দাদাকে নূতন করিয়া উকীল বানাইবার প্রয়োজন নাই। কেননা তাহারা স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবক ও উকীল। অন্যদের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে উকীল বানাইতে হইবে। যদি বানানো হয় তবেই সে তাহার পক্ষ হইতে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।

উকীল বানানোর কাজ দুইভাবে হইতে পারেঃ শর্তহীন বা শর্তাধীন। শর্তহীন উকীল বানানোর অর্থ, কোন নির্দিষ্ট মেয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরানা ছাড়াই বিবাহ করাইয়া দেওয়ার জন্য কেহ কাহাকেও উকীল বানাইতে পারে। আবার কেহ নির্দিষ্ট মেয়ে ও নির্দিষ্ট পরিমাণের মহরানার ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য উকীল বানাইতে পারে। ইমাম আবূ হানীফার মতে উকীলকে কোন শর্ত দেওয়া যাইতে পারে না। উকীল যদি তাহার মুয়াক্কিলকে কোন নির্দিষ্ট মেয়ের সহিত বিবাহ দেয়, আর তাহা কুফু ছাড়া ও অতিরিক্তি পরিমাণের মহরানায় হয়, তবে সে বিবাহ শুদ্ধ ও জায়েয হইবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলিয়াছেনঃ উকীল বানাইবার সময় মেয়েটির সুস্থ, কুফুর সামঞ্জস্য ও সমপরিমাণ মহরানার শর্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

আর শর্তাধীন উকীল বানানো হইলে উহার বিরুদ্ধতা করা জায়েয নয়। তবে যদি দেওয়া শর্তের অপেক্ষাও উত্তম মেয়ের সহিত বিবাহ দেয়, তবে তাহাতে কোন দোষ হইবে না, মুয়াক্কিলের পক্ষে তাহা মানিয়া লওয়া কর্তব্য।

হানাফী মাযহাবের মতে মেয়ে লোক যদি বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে সে যদি কোন নির্দিষ্ট পুরুষের সহিত বিবাহ ঘটাইবার জন্য উকীল বানাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পুরাপুরি

শর্তাদি পূর্ণ হইলেই বিবাহ সংঘটিত হইবে ও মুয়াক্কিলার জন্য তাহা বাধ্যতামূলক হইবে—অন্যথায় নয়। আর অনির্দিষ্টভাবে যে কোন পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়াইবার আদেশ করিয়া থাকিলে বিবাহ হইয়া যাওয়ার পর উহার কার্যকারতা তাহার মঞ্জুরীর উপর নির্ভর করিবে।

বিবাহের উকীল মুয়াক্কিলের দূত বা প্রস্তাবক মাত্র। কাজেই তাহার সম্পন্ন করা বিবাহের বাধ্যবাধকতা তাহার উপর বর্তিবে না। তাহার নিকট হইতে মহরানারও দাবি করা যাইবে না। স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইলে তাহাকে অনুগতা বানাইয়া দেওয়ার দায়িত্বও তাহার মাথায় চাপিবে না।

উকীল বানানো নীতিগত জায়েয হওয়া সত্ত্বেও বিবাহে কন্যার ক্ষেত্রে অপর একটি ব্যাপার রহিয়াছে। তাহা হইল বিবাহেচ্ছু নারীর উপর وِلَايَةٌ বা অভিভাবকত্বের ব্যাপার। এই অভিভাবকত্ব দুই প্রকারের। একটি হইল জোর খাটাইতে সক্ষম অভিভাবকত্ব। যে নারীর নিজের বিবাহ নিজের করা অধিকার বা ক্ষমতা নাই, তাহার উপর অভিভাবকত্ব। ইহা জোর প্রয়োগের অভিভাবকত্ব (ولايت اجبارى)। যেমন নাবালেগা মেয়ে। তার বালেগা-পূর্বে বিবাহ হয় নাই, কুমারী মেয়ে। তাহার উপর এই অভিভাবকত্ব কাজ করিবে। বালেগা-পূর্ণ বয়স্কা-কুমারী ও অ-কুমারী 'সাইয়্যেবা' মেয়ের উপর তাহা কোন কাজ করিবে না। জমহুর ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, পূর্ণ বয়স্কা কুমারী ও অ-কুমারী উভয় ধরনের মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে তাহার নিজের মতই সর্বাগ্রগণ্য। কোন অভিভাবকই তাহার মতের বিরুদ্ধে তাহাকে বিবাহ দিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের وِلَايت বা অভিভাবকত্ব ইখতিয়ারী বা ইচ্ছামূলক। ইহা পূর্ণ বয়স্কা ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এই প্রেক্ষিতে ফিক্‌হবিদগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে নিজে সরাসরি বা উকীলের মাধ্যমে নিজের বিবাহ নিজে সম্পন্ন করাইতে পারে না।

পূর্ণ বয়স্কা সুস্থ বিবেক বুদ্ধির মেয়ের পিতাই তাহার বিবাহের ইখতিয়ারী অভিভাবক। তাহার পিতা নিজের কন্যার সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাহার অনুমতি লইয়া নিজের কন্যাকে বিবাহ দিবে। তবে সে কন্যা নিজেই যেহেতু নিজের বিবাহের প্রকৃত অধিকারী, তাই পিতার অনুমতি ও উপস্থিতিতে যে কোন মুহাররম পুরুষকে উকীল বানাইতে পারে। স্বয়ং নবী করীম (স) কোন কোন সাহাবী মহিলার বিবাহের উকীল হিসাবে কাজ করিয়াছেন। আর বিবাহের উকীল বানানোর ইহাই অন্যতম একটি অকাট্য দলীল। হযরত আব্বাস (রা) তাঁহার স্ত্রীর ভগ্নি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা বিনতিল হারেস (রা)-কে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট বিবাহ দেওয়ার জন্য স্বয়ং মায়মুনার অনুরোধক্রমেই উকীল হইয়াছিলেন। ইহা সপ্তম হিজরী সনের ঘটনা।

(يسئلونك عن الدين (ج ٤، ص : ٩١-٩٢) يسئلونك عن الدين (ج ١، ص : ٢١٠-٢١١)

বিবাহে কনের অনুমতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ.

(مسلم، بخاري، نسائي)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ পূর্বে স্বামীসঙ্গ প্রাপ্তা কনের স্পষ্ট আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে বিবাহ দেওয়া যাইবে না এবং পূর্বে স্বামী অ-প্রাপ্তা কনের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে বিবাহ দেওয়া যাইবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার অনুমতি কিভাবে লওয়া যাইতে পারে? বলিলেনঃ তাহার চুপ থাকাই (অনুমতি)।

(মুসলিম, বুখারী, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা হাদীসটির মূল বক্তব্য স্পষ্ট। ইহাতে বিবাহের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিককে উদঘাটিত করা হইয়াছে। বিবাহ মূলত একটি মেয়ে ও একটি ছেলের নিজস্ব ব্যাপার হইলেও ইহা একটা বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মেয়ে ও ছেলের অভিভাবকরাই সাধারণত কর্তৃত্ব করিয়া থাকে এবং সে কর্তৃত্বে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ছেলে ও মেয়ের—মূলত যাহাদের বিবাহ—মতামত, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও খুশী-অখুশীর প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা বা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের উপর অভিভাবকদের জবরদস্তি ও নিপীড়নও চলে। তাহাদের ইচ্ছা ও মর্জীর বিরুদ্ধে ও কেবল অভিভাবকদের ইচ্ছানুক্রমেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এইরূপ বিবাহ ছেলে বা মেয়ের—বর বা কনে যাহার মনেই সামান্য অনিচ্ছার বীজ বপিত থাকিবে, সে এই বিবাহকে অন্তর দিয়া কখনই গ্রহণ করিতে পারিবে না। ফলে তাহাদের গোটা দাম্পত্য জীবনই তিক্ত বিষাক্ত এবং শেষ পর্যন্ত চরম ভাঙন ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পড়ে। এই কথা কেবল আরব জাহিলিয়াতের সমাজেই প্রচলিত ছিল না, বর্তমান সুসভ্য সমাজেও এইরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত নেহাত বিরল নয়।

কিন্তু মানব সমস্যার সুষ্ঠু নির্ভুল সমাধান ও সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য যাঁহার আগমন সেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান পেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘোষণা স্পষ্ট, অকাট্য এবং শরীয়াতের বিধান ইহার উপরই ভিত্তিশীল।

হাদীসবিদরা বলিয়াছেন, হাদীসের শব্দ اَلْاَيِّمُ অর্থঃ اَلثَّيِّبُ। বিবাহিতা, স্বামী প্রাপ্তা, যে স্ত্রীর স্বামী মরিয়া গিয়াছে, কিংবা তালাক পাইয়াছে। ইহার আরও কয়েকটি অর্থ রহিয়াছে। এই পর্যায়ের অন্যান্য হাদীস হইতে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসের ভাষা এইঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَاِذْنُهَا سُكُوْتُهَا.

(مسلم)

পূর্বে স্বামী প্রাপ্তা মেয়ে তাহার নিজের যাবতীয় (বিশেষ করিয়া বিবাহ) ব্যাপারে তাহার

অভিভাবকের তুলনায় বেশী অধিকার সম্পন্না। আর পূর্বে স্বামী অপ্রাপ্তা কুমারী মেয়ের নিকট বিবাহের নির্দেশ চাহিতে হইবে। আর তাহার অনুমতি হইল তাহার চুপ থাকা।

تُسْتَأْمَرُ শব্দের অর্থ طَلَبُ الْأَمْرِ নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত চাওয়া, কিংবা الْمُشَاوَرَةُ পরামর্শ করা, মত চাওয়া।

আর হযরত ইবনে আব্বাস হইতে অপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا اَبُوهَا فِىْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صِمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا. (مسلم)

পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা মেয়ে তাহার নিজের যাবতীয় ব্যাপারে তাহার অভিভাবকদের তুলনায় বেশী অধিকার সম্পন্না। আর পূর্বে স্বামী অপ্রাপ্ত কন্যার নিকট অনুমতি চাহিবে তাহার পিতা। আর তাহার অনুমতি হইল তাহার চুপ করিয়া থাকা। অনেক সময় বলা হয়, তাহার চুপ থাকাই তাহার স্বীকৃতি।

শরীয়াত বিশারদ কাজী ইয়ায বলিয়াছেন, اَلْاَيِّمُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল এমন মেয়ে লোক, যাহার স্বামী নাই, সে ছোট হউক বা বড়। অবিবাহিতা হউক, কি পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা। এই আভিধানিক অর্থের দৃষ্টিতে এই শব্দটি পুরুষদের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়। আরবী ভাষায় বলা হয়ঃ رَجُلٌ اَيِّمٌ وَامْرَاَةٌ اَيِّمٌ স্ত্রীহীন পুরুষ, স্বামীহীনা মেয়ে। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে الايم বলিয়া কি বোঝানো হইয়াছে, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ ও ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসে اَلْاَيِّمُ অর্থ اَلثَّيِّبُ 'স্বামী নাই এমন মেয়ে লোক'। তাঁহাদের দলীল হইল, প্রথমোক্ত হাদীসটিতে الاَيِّمُ বলিয়া যাহাদিগকে বুঝাইয়াছেন, অন্যান্য হাদীসে اَلثَّيِّبُ বলিয়া ঠিক তাহাদিগকেই বোঝানো হইয়াছে। উপরন্তু এই দুইটি শব্দ প্রত্যেকটি হাদীসেই اَلْبِكْرُ এর বিপরীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর الاَيِّمُ শব্দটির অধিক ব্যবহারও الثَّيِّب অর্থেই হইয়া থাকে। কূফী ফিকাহবিদ ও ইমাম জুফার বলিয়াছেনঃ

اَلْاَيِّمُ هُنَا كُلُّ امْرَاَةٍ لاَ زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ اَوْثَيِّبًا

'আল-আয়েম' বলিতে এখানে এমন প্রত্যেক মেয়েকে বুঝায়, যাহার স্বামী নাই। সে পূর্বে স্বামী অপ্রাপ্তা হউক, কি স্বামী প্রাপ্ত।

এসব হাদীসের মূল বক্তব্য হইল, যে মেয়েই পূর্ণ বয়স্কা হইয়াছে, সে তাহার নিজস্ব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাহার অভিভাবক অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্না। আর সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া যদি তাহার নিজের বিবাহ সম্পন্ন করে, তবে তাহা সম্পূর্ণ সহীহ হইবে। শা'বী ও জুহ্রী এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আর অভিভাবকদের কর্তৃত্ব পর্যায়ে তাঁহাদের মত হইলঃ

لَيْسَ الْوَلِيُّ مِنْ اَرْكَانِ صِحَّةِ النِّكَاحِ بَلْ مِنْ تَمَامِهِ

কোন মেয়ের অভিভাবক তাহার (মেয়ের) বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোন অপরিহার্য শর্ত নয়; বরং উহা বিবাহের পূর্ণত্ব লাভের অংশ বিশেষ।

ইমাম আওজায়ী আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলিয়াছেন, পূর্বে স্বামী প্রাপ্তা মেয়ের ইচ্ছাকৃত বিবাহের শুদ্ধতা অভিভাবকের অনুমতির উপর নির্ভরশীল। কাযী ইয়ায বলিয়াছেন, নবী করীম (স)-এর বাণী اَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا এ কথার তাৎপর্যে মতভেদ রহিয়াছে। প্রশ্ন হইয়াছে, 'সাইয়্যেবা'—'পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা

মেয়ে তাহার বিবাহে তাহার অভিভাবকের অপেক্ষাও বেশী অধিকার সম্পন্না' কোন্ ব্যাপারে? তাহা কি কেবল অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে, না অনুমতি দান ও নিজের বিবাহ সংঘটন—এই উভয় ব্যাপারে? জমহুর আলিমগণের মধ্যে কেবলমাত্র বিবাহের অনুমতির ব্যাপারেই তাহার অধিকার তাহার অভিভাবকের অপেক্ষাও বেশী। আর অন্যান্য ফিকাহবিদদের মতে এই উভয় ব্যাপারেই তাহার অধিকার সর্বাধিক। নবী করীম (স)-এর বাণী احق بنفسها। শাব্দিক অর্থের দিক দিয়া ইহার অর্থ হইলঃ

اَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا فِىْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ عَقْدٍ وَغَيْرِهِ

সে তাহার অভিভাবকের অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্ন সব ব্যাপারেই—বিবাহ সংঘটন করা ইত্যাদি।

ইমাম আবূ হানীফা ও দায়ূদ যাহেরীও এই মত দিয়াছেন। তবে রাসূলের এই কথাটির এ-ও অর্থ হইতে পারেঃ اَنَّهَا اَحَقُّ بِالرِّضَا 'রাযী হওয়ার ব্যাপারে সে-ই বেশী অধিকার সম্পন্না'। অর্থাৎ সে যতক্ষণ পর্যন্ত সশব্দে অনুমতি দান না করিবে, ততক্ষণ তাহার বিবাহ সংঘটিত হইতে পারে না। পূর্বে স্বামী অপ্রাপ্তা—اَلْبِكْرُ—মেয়ের কথা ভিন্নতর। কিন্তু রাসূলে করীম (স)-এর অপর একটি কথাও রহিয়াছে। তাহা হইল لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ 'অভিভাবক ছাড়া কোন মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না'। এই পর্যায়ে রাসূলে করীমের আরও অনেক উক্তি রহিয়াছে। এই সব হাদীসের দৃষ্টিতে মেয়ে বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকের সম্মতি জরুরী শর্ত বিশেষ। তাই 'মেয়ের বেশী অধিকার সম্পন্না হওয়া' সংক্রান্ত আলোচ্য বাণীটির দ্বিতীয় অর্থ—'কেবলমাত্র বিবাহের চূড়ান্ত অনুমতি দানের ব্যাপারেই বেশী অধিকার সম্পন্না' মনে করা সমীচীন।

এই পর্যায়ে আরও কথা হইল, রাসূলের কথা اَحَقُّ শব্দটি মূলত অধিকারের ব্যাপারে অংশীদারিত্ব বুঝায়। অর্থাৎ 'সাইয়্যেবা' মেয়ে তাহার নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সম্পন্না। সেই সঙ্গে তাহার অভিভাবকদের এই ব্যাপারে মত দেওয়া ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উদ্যোগ-আয়োজন করার অধিকার রহিয়াছে। তবে এই দুইটি অধিকারের মধ্যে মেয়ের অধিকার অধিক প্রভাবশালী ও অগ্রাধিকার সম্পন্ন। কেননা অভিভাবক যদি মেয়েকে কোন উপযুক্ত ছেলের নিকট বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে আর সে মেয়ে সেখানে অরাযী থাকে ও নিষেধ করে, তাহা হইলে সে বিবাহে মেয়েকে বাধ্য করা যাইবে না। আর মেয়ে নিজে যদি কোন উপযুক্ত ছেলের সহিত বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়; কিন্তু অভিভাবক তাহাতে অরাযী হয়, তাহা হইলে সরকার মেয়ের মত অনুযায়ী বিবাহ দিতে অভিভাবককে বাধ্য করিতে পারিবে। ইহা শরীয়াতের সর্বসম্মত শাশ্বত বিধান। ইহা হইতেও মেয়ের বেশী অধিকার থাকার কথাটাই প্রমাণিত হয়।

এই পর্যায়ে হযরত খানসা (কিংবা খুনাস) বিনতে খিজাম বর্ণিত হাদীসটি স্মরণীয়। তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اِنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ. (بخارى)

তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ দেন, অথচ তিনি সাইয়্যেবা—পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা। তিনি এই বিবাহ পছন্দ করেন নাই—এই বিবাহে রাযী হন নাই। পরে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিয়া

তাঁহার অসম্মতি জানাইলে রাসূলে করীম (স) তাঁহার পিতার দেওয়া বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন।

মুসনাদে আহ্‌মাদে এই মেয়েটির পরিচয় দিয়া বলা হইয়াছে, এই মেয়েটির একবার বিবাহ হইয়াছিল। পরে সে স্বামীহীনা হয়। তখন তাহার পিতা তাহার মতের বিরুদ্ধে বিবাহ দেন। তখন এই বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া নবী করীম (স) ফরমান জারী করিলেনঃ

هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا فَأَلْحِقْهَا بِهَوَاهَا

তাহার নিজের বিবাহের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাহার অধিকারই বেশী। অতএব তাহাকে তাহার নিজের ইচ্ছামত স্বামী গ্রহণের জন্য ছাড়িয়া দাও।

ফলে এই মেয়েটি যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, তাহাকেই বিবাহ করিল।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে স্বামী প্রাপ্তা মেয়েকে তাহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী গ্রহণে বাধ্য করা যাইবে না। করা হইলে তাহা সেই মেয়ের ইচ্ছামত বাতিল হইয়া যাইবে। (بلوغ الامانى)

কিন্তু মেয়ে সাইয়্যেবা—পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা নয়, কুমারী—তাহার প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। এই পর্যায়ের মেয়ের বিবাহ ব্যাপারে রাসূলে করীমের পূর্বোদ্ধৃত বাণীর শেষাংশ। তাহা হইলঃ

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

এই কথাটির সঠিক তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতের উল্লেখ হইয়াছে। ইমাম শাফেয়ী, ইবনে আবূ লাইলা, ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক প্রমুখ ফিকাহবিদ্গণ বলিয়াছেনঃ কুমারী মেয়ের বিবাহে তাহার অনুমতি গ্রহণ করার জন্য শরীয়াতের স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। অভিভাবক যদি পিতা হয় কিংবা দাদা হয়, তাহা হইলে মেয়ের অনুমতি গ্রহণ মুস্তাহাব। এইরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবক যদি মেয়ের মত জানিতে না চাহিয়াও বিবাহ দেয় তবে সে বিবাহ সহীহ্ হইবে। কেননা পিতা বা দাদা এমন অভিভাবক, কন্যার প্রতি যাহার স্নেহ মমতা ও সার্বিক কল্যাণ কামনা সকল প্রকার সন্দেহ বা প্রশ্নের উর্ধ্বে। অভিভাবক যদি পিতা বা দাদা ছাড়া অন্য কেহ হয়, তাহা হইলে মেয়ের সন্তুষ্টিমূলক অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব। এইরূপ অনুমতি ব্যতিরেকে মেয়ের বিবাহ কোনক্রমেই সহীহ্ হইতে পারে না। কিন্তু ইমাম আওজায়ী ও ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখ কূফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলিয়াছেনঃ

يَجِبُ الْاِسْتِيْذَانُ فِيْ كُلِّ بِكْرٍ بَالِغَةٍ

প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্কা কুমারী মেয়ের বিবাহে তাহার অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ

اَلْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ اِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ يَنْفُذُ نِكَاحُهَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَتَوَقَّفُ عَلٰى اِجَازَةِ الْوَلِيِّ

পূর্ণ বয়স্কা ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্না মেয়ে যদি অভিভাবক ছাড়াই নিজে বিবাহিতা হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে তাহার এই বিবাহ কার্যকর হইবে। তবে ইমাম মুহাম্মাদের মতে এই বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষ থাকিবে।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ তিনি বলিলেনঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِ قَالَ رِضَا هَا صَمْتُهَا. (بخارى)

ইয়া রাসূল! কুমারী মেয়ে তো বিবাহের অনুমতি দিতে লজ্জাবোধ করে। তাহা হইলে তাহার অনুমতি পাওয়া যাইবে কিরূপে? রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তাহার চুপ থাকাটাই তাহার অনুমতি ও রাযী থাকা বুঝাইবে।

মুসলিম শরীফে রাসূলে করীমের এই কথাটির ভাষা হইলঃ وَاِذْنُهَا صِمَاتُهَا 'তাহার চুপ থাকাই তাহার অনুমতি'—এই কথাটি সাধারণভাবে প্রত্যেক বয়স্কা কুমারী মেয়ে এবং প্রত্যেক অভিভাবকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মেয়ের নিকট যথারীতি অনুমতি চাওয়া হইবে। অনুরূপভাবে অভিভাবকের সম্মতিও জানিতে চাওয়া হইবে। ইহাদের কেহ চুপ থাকিলে—হ্যাঁ বা না কিছু না বলিলে—ধরিয়া লইতে হইবে যে, প্রস্তাবিত বিবাহে তাহার অনিচ্ছা বা অমত নাই, বরং সম্মতিই রহিয়াছে। ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ 'ইহাই সঠিক, যথার্থ ও সহীহ বিধান'। অন্যান্য হাদীসবিদগণ লিখিয়াছেনঃ অভিভাবক যদি পিতা বা দাদা হয়, তাহা হইলে তাহার অনুমতি গ্রহণ মুস্তাহাব। জিজ্ঞাসার পর চুপ থাকিলে অনুমতি আছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু অভিভাবক যদি এই দুইজন ব্যতিরেকে অন্য কেহ হয়—যেমন ভাই, চাচা, মামা, নানা ইত্যাদি—তাহা হইলে মেয়ের স্পষ্ট সশব্দ উচ্চারিত অনুমতি আবশ্যক। কেননা মেয়ে পিতা বা দাদার নিকট লজ্জায় চুপ থাকিতে পারে; ইহা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অন্যদের বেলায় এই লজ্জার মাত্রা অতটা হওয়া স্বাভাবিক বিবেচিত হইতে পারে না। অবশ্য জমহুর হাদীস-ফিকাহ্‌বিদ্‌দের মতে সব অভিভাবকের বেলায়ই কনের চুপ থাকাটা অনুমতির সমার্থবোধক হইবে। ইহাকে বলিতে হইবে 'মৌন সম্মতি'। কেননা এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষা সাধারণ ও ব্যাপক এবং লজ্জা কুমারী মেয়ের শালীনতার পরিচায়ক বিধায় সর্বক্ষেত্রেই প্রকট হইতে পারে। তবে অ-কুমারী—সাইয়্যেবার ব্যাপারে মৌন সম্মতি যথেষ্ট বিবেচিত হইবে না। সেখানে সশব্দ অনুমতির উচ্চারণ আবশ্যক, সে অভিভাবক যে-ই হউক না কেন। ইহাতে কোন মতবিরোধ নাই। কেননা ইতিপূর্বে একবার সে এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। সে বিবাহের ফলে স্বামী কর্তৃক সঙ্গমকৃত ও সতীত্বের আবরণ ছিন্ন হউক, আর না-হউক, তাহাতে কোন পার্থক্য হইবে না। শাফেয়ী ও অন্যান্য সব ফকীহী মযহাবে একথা স্বীকৃত যে, কুমারী মেয়ের চুপ থাকাটাই যে তাহার সম্মতি ও অনুমতির সমার্থবোধক, এ কথা প্রকাশ করিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে মালিকী মাযহাবের কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ ইহার শর্ত করেন। তবে ইহা প্রকাশ করা যে ভাল, সে বিষয়ে মালিকী মাযহাবের সকলেই একমত।

এখানে আর একটি প্রশ্ন আলোচিতব্য। তাহা হইল, বিবাহের শুদ্ধতায় অভিভাবকের অনুমতি কি শর্ত? এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেনঃ

يُشْتَرَطُ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحٌ اِلَّا بِوَلِيٍّ

হ্যাঁ, অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত কুমারী মেয়ের বিবাহ সহীহ্ হইবে না। এই সম্মতি বিবাহের শুদ্ধতার জন্য জরুরী শর্ত।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিয়াছেনঃ

لَا يُشْتَرَطُ فِى الثَّيِّبِ وَلَا فِى الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ بَلْ لَهَا اَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا

অভিভাবকের সম্মতি ও অনুমতি অ-কুমারী—সাইয়্যেবা মেয়ের বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। কুমারী বালিগা মেয়ের ক্ষেত্রেও নয়। বরং কুমারী বালিগা মেয়ে তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীতই নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করিতে পারে।

ইমাম আবূ সওর বলিয়াছেন, কুমারী বালিগা মেয়ে তাহার অভিভাবকের অনুমতি লইয়া নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিজেই লইতে পারে। কিন্তু অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া তাহা জায়েয নয়।

দায়ূদ যাহেরী বলিয়াছেন, কুমারী মেয়ের বিবাহে অভিভাবকের সম্মতি একটা জরুরী শর্ত। সাইয়্যেবা মেয়ের জন্য নয়।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর দলীল হইল, রাসূল (স)-এর প্রখ্যাত হাদীস لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নাই—হয় না'। এই কথাটির স্পষ্ট প্রতিপাদ্য হইল, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। আর দায়ূদ বলিয়াছেনঃ মুসলিম শরীফের উপরোদ্ধৃত হাদীসে কুমারী ও অকুমারী মেয়ের বিবাহে সুস্পষ্ট পার্থক্য ঘোষিত হইয়াছে। সে অনুযায়ী সাইয়্যেবা নিজের ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। আর কুমারী মেয়ের অনুমতি লওয়ার শর্ত করা হইয়াছে।

শাফেয়ী মাযহাবের পক্ষ হইতে ইহার জবাবে বলা হইয়াছে যে, অকুমারী—অর্থাৎ সাইয়্যেবা মেয়ে—'অধিক অধিকার সম্পন্না' বলার অর্থই হইল এই অধিকার সম্পূর্ণ নিরংকুশ নয়। ইহাতে তাহার অধিকারের সঙ্গে অভিভাবকের অধিকারও স্বীকৃত। তবে একথা সঠিক যে, সাইয়্যেবা মেয়েকে অভিভাবকের মতে চাপ দিয়া বাধ্য করা যাইবে না। আর স্বামী কে হইবে তাহা নির্ধারণেও মেয়ের বক্তব্যই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

আবূ সওর তাঁহার মতের সমর্থনে একটি হাদীসের উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসটি এইঃ

اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (ترمذى)

যে মেয়েই তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে, তাহারই সে বিবাহ বাতিল গণ্য হইবে।

ইহার যৌক্তিকতা এখানে যে, ওলী বা অভিভাবক সব সময়ই মেয়ের উপযুক্ত এবং ভাল বর-এর নিকট বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট থাকে। যেন পরে কোন দিক দিয়াই লজ্জার, অপমানের বা দুঃখের কারণ না ঘটে। এমতাবস্থায় অভিভাবকের অভিমত অনুযায়ী বিবাহ হইলে এই দিকটি পুরাপুরি রক্ষা পায়। কেননা অভিভাবক সর্বদিক বিচার করিয়াই বিবাহে অনুমতি দিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

ইমাম তিরমিযী উপরোদ্ধৃত হাদীস নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া ইহাকে حَدِيْثٌ حَسَنٌ 'উত্তম সনদভিত্তিক হাদীস' বলিয়া নিজে মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন, জুহরী বর্ণিত এই হাদীসটির সনদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ আপত্তি তুলিয়াছেন। এই কারণে এই হাদীসটিকে 'যয়ীফ' বলা যাইতে পারে। স্বয়ং ইমাম জুহরীও এই হাদীসটিকে অপছন্দ করিয়াছেন। আর হাদীসের বর্ণনাকারী নিজেই যদি তাহার বর্ণিত হাদীসকে অপছন্দ করেন, তা হইলে সে হাদীসটি মিথ্যাও হইতে পারে, তাহাতে বিস্মৃতিও লাগিতে পারে। আর কোন হাদীসের ক্ষেত্রে তাহা ঘটিলে তাহা গ্রহণযোগ্যতা হারাইয়া ফেলে অনিবার্যভাবে। (عمدة القارى شرح البخارى)

এমতাবস্থায় বলা যায়, মেয়ের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতির অপরিহার্যতা সহীহ হাদীস হইতে প্রমাণিত নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কিয়াস করিয়াছেন। অভিভাবক ছাড়াই যখন ক্রয় বিক্রয় করারও তাহার অধিকার রহিয়াছে, তখন তাহার নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাহার

অধিকার অবশ্যই স্বীকার্য। যেসব হাদীসে অভিভাবকের অনুমতির শর্তের উল্লেখ রহিয়াছে, ইমাম আবূ হানীফার মতে তাহা কেবলমাত্র ক্রীতদাসী ও নাবালেগা মেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই পর্যায়ে সর্বশেষে উল্লেখ্য এই যে, নাবালেগা মেয়ের অভিভাবকরা তাহার বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিবাহ দিতে পারে। দিলে তাহা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জায়েয হইবে। নাবালেগা'র বিবাহ অবশ্য বাঞ্ছনীয় নয়। সর্বক্ষেত্রে তাহা শুভ পরিণতি আনিবে—সে দাবি করা যায় না।

(نبوی شرح مسلم، عمدة القاری شرح البخاری)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ فَتَاةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ زَوَّجَنِىْ اِبْنَ اَخِيْهِ يَرْفَعُ بِىْ خَسِيْسَتَهُ فَجَعَلَ الْاَمْرَ اِلَيْهَا فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَجَزْتُ مَا صَنَعَ اَبِىْ وَلٰكِنْ اَرَدْتُ اَنْ تُعَلِّمَ النِّسَاءَ اَنَّ لَيْسَ لِلْاٰبَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ.

(ابوداؤد، ابن ماجه، بیهقی، دارقطنی)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একটি যুবতী মেয়ে রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট আসিল। অতঃপর বলিলঃ ইয়া রাসূল! আমার পিতা আমাকে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট বিবাহ দিয়াছে। সে আমার দ্বারা তাহার নীচতা-হীনতাকে উচ্চ-উন্নত বানাইতেছে। নবী করীম (স) এই ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করার দায়িত্ব তাহার উপর ন্যাস্ত করিয়া দিলেন। তখন মেয়েটি বলিলঃ আমার পিতা যাহা করিয়াছে আমি উহা অক্ষুন্ন, অব্যাহত ও অপরিবর্তিত রাখিলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি মহিলাদিগকে এই কথা শিক্ষা দিবেন যে, এই ক্ষেত্রে আসলে পিতাগণের কোন কিছু করার ক্ষমতা নাই।

(আবূ দায়ুদ, মুসনাদে আহ্‌মাদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, দারে কুত্‌নী)

ব্যাখ্যা বায়হাকী ও দারে কুত্‌নী বলিয়াছেন, এই হাদীসটি 'মুরসাল'। অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদা। কিন্তু আবদুল্লাহ নিজে হযরত আয়েশা হইতে ইহা সরাসরি শুনিতে পান নাই। মাঝখানে একজন বর্ণনাকারী—অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) হইতে নিজে শুনিয়া যিনি ইহা প্রথম বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁর নাম অনুল্লেখিত। কিন্তু তবুও হাদীস হিসাবে ইহা সহীহ্। ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে ইহা সঠিক সনদে—আবদুল্লাহ তাঁহার পিতা বুরাইদা হইতে—হযরত আয়েশা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদ নির্ভুল ও সহীহ্।

হাদীসে উল্লেখিত মেয়েটির অভিযোগের সারমর্ম হইল, তাহার পিতা তাহাকে নিজের পছন্দ মত পাত্রের নিকট বিবাহ দিয়াছে, এই পাত্র হইতেছে পিতার ভাই-পুত্র। অর্থাৎ মেয়েটির চাচাতো ভাই। কিন্তু ছেলেটি ছিল অত্যন্ত হীন ও নীচ স্বভাব-চরিত্রের লোক। মেয়েটি তাহাকে আদৌ পছন্দ করিতে পারে নাই। স্বামী হিসাবে তাহাকে মানিয়া লইতে তাহার মন প্রস্তুত হইতে পারিতেছিল না। এইরূপ বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, হীন-নীচ স্বভাব-চরিত্রের ছেলে ভাল স্বভাব চরিত্রের মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে পাইলে সে হয়ত পরিণামে ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু মেয়েটি এই মতলবকে আদৌ সমর্থন করিতে পারে নাই। তাহার মতে ইহা অশোভন বিবাহ। সব কথা শুনিয়া নবী করীম (স) এই বিবাহ ব্যাপারে কিছু একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার মেয়েটিকেই দান করেন। অর্থাৎ বলেন, এই বিবাহ বহাল রাখা বা না রাখা ও ভাঙ্গিয়া দেওয়া মেয়েটির ইচ্ছাধীন। সে ইচ্ছা করিলে এই বিবাহ অস্বীকার করিতে ও ভাঙ্গিয়াও দিতে পারে। মেয়েটি বলিল, আমার পিতা যাহা করিয়াছে আমি তাহা খতম করিয়া দিতে

চাহিনা। পিতার অমর্যাদা হয় এমন কাজ আমি করিব না। কিন্তু ইহার মাধ্যমে নারীকূলের জন্য একটা নীতিমূলক শিক্ষা হইয়া যাওয়া উচিত। এই শিক্ষা আপনিই তাহাদিগকে দিবেন। সে শিক্ষাটি হইল, মেয়েদের বিবাহ শাদীর ব্যাপারে বাপদের নিজেদের ইচ্ছামত কিছু করার কোন অধিকারই নাই।

হাদীস এইখানেই শেষ। মেয়েটির এই প্রস্তাব ও অনুরোধের জওয়াবে নবী করীম (স) কি বলিলেন বা কি করিলেন, এখানে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই পর্যায়ের অন্যান্য বহু ঘটনা হইতেই একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই প্রস্তাবটি নবী করীম (স)-এর নিকট অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান হয় নাই। মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে পিতাদের মৌলিকভাবে যে কিছুই করার নাই, মেয়েটির এই কথাকে নবী করীম (স) প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করিয়া দেন নাই। উপরন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের নিজের মতের গুরুত্ব যে অনেক বেশী রাসূলে করীম (স) নিজে সেই গুরুত্ব দিয়াছেন, তাহা বহু সংখ্যক হাদীস ও হাদীসের উল্লেখিত ঘটনাবলী হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায়। বস্তুত বিবাহে মেয়ের নিজের মতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী। এই ব্যাপারে বাপদের তেমন কোন ক্ষমতা বা ইখতিয়ার ইসলামী শরীয়াতে দেওয়া হয় নাই। ইসলামের বিবাহ বিধানেই এই কথা স্বীকার্য ও ঘোষিত।

হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেনঃ

إِنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (نسائى)

এক ব্যক্তি তাহার কুমারী কন্যাকে বিবাহ দেয়, কিন্তু সে তাহার কন্যার নিকট হইতে এই ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করে নাই। পরে মেয়েটি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিবাহে তাহার অনুমতি নেওয়া হয় নাই এবং ইহাতে তাহার মতও নাই বলিয়া জানায়। নবী করীম (স) সমস্ত কথা শুনিয়া এই বিবাহ বাতিল করেন এবং উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। (নাসায়ী)

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা গেল, পূর্ণ বয়স্কা কুমারী মেয়ের মত ও অনুমতি ছাড়াই যদি পিতা-ও তাহার ইচ্ছামত বিবাহ দেয়, তবে মেয়ে ইচ্ছা করিলে এই বিবাহ বাতিল করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারে এবং সরকার তদন্ত করিয়া ব্যাপার সত্য দেখিতে পাইলে এই বিবাহ ভাঙিয়া উভয়কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে। তবে বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়ার এই ইখতিয়ার নাবালেগা মেয়ের বালেগ হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত সীমিত। সেই মুহূর্তে এই বিবাহের প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধতা না করিলে প্রমাণিত হইবে যে, সে এই বিবাহ মানিয়া লইয়াছে। তাই অতঃপর তাহা ভাঙিয়া দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

বিবাহে সাক্ষী গ্রহণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَغَايَا اللاَّتِىْ يُنْكِحْنَ اَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ স্বৈরিণী-ব্যভিচারিণীরাই নিজেদের বিবাহ কোনরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত নিজেরাই সম্পন্ন করিয়া থাকে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া এ সম্পর্কে বক্তব্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, এই হাদীসটি বহু কয়টি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কেবলমাত্র একটি সূত্রই সহীহ। সায়ীদ ইবনে আরুবা প্রমুখ এই হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিজের উক্তি (موقوف) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর কথা (مرفوع) হিসাবে নয়। তবে আবদুল আ'লা এই হাদীসটিকে রাসূলে করীমের কথা (مرفوع) হিসাবেই বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে গ্রহণযোগ্য হাদীস মনে করিয়াছেন। কেননা আবদুল আ'লা সিক্বাহ্ বর্ণনাকারী। এতদ্ব্যতীত এই হাদীসটি ভিন্নতর ভাষায় হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন, হযরত আনাস, হযরত মুয়ায ও হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরাইরা বর্ণিত হাদীসটির ভাষা এইঃ

لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَاِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِىْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. (ابن ماجه)

কোন মেয়ে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করিবে না। কেননা কেবলমাত্র ব্যভিচারিণীই নিজের বিবাহ নিজে সম্পন্ন করে।

এই শেষ বাক্যটির অর্থ, যে মেয়ে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করে, সেই ব্যাভিচারিণী।

ইমাম তিরমিযী আরও লিখিয়াছেন, নবী করীম (স)-এর সাহাবী এবং তাঁহাদের পর তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করিতেন। অর্থাৎ হাদীসটি তাঁহাদের নিকট গ্রহীত হইয়াছিল এবং এই হাদীসটির সত্যতায় তাঁহাদের মনে কোন আপত্তি ছিল না। এই হাদীসটিকে রাসূলে করীমের কথা হিসাবে তাঁহারা মানিয়া লইয়াছিলেন।

আর ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণিত হাদীসের ভাষা এইঃ

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. (مسند احمد)

অভিভাবক এবং দুইজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া বিবাহ হইতে পারে না।

অর্থাৎ অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হইলে তাহা শরীয়াত মুতাবিক বিবাহ হইবে না। আর শরীয়াত মুতাবিক বিবাহ না হইলে নারী-পুরুষের যৌন মিলন ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

দারে কুতনী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাররর ইহার একজন বর্ণনাকারী। কিন্তু সে মতরুক, তাহার বর্ণিত হাদীস পরিত্যাক্ত, অগ্রহণযোগ্য। ইমাম জায়লায়ী বলিয়াছেন, বিবাহে সাক্ষী-প্রমাণের অপরিহার্যতা পর্যায়ে বিভিন্ন শব্দ ও ভাষায় মোট এগারজন সাহাবী হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি এইঃ

لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ.

(ابن حبان، دار قطنى،الطبرانى فى الاوسط)

অভিভাবক ও দুইজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সুবিচারক সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হয় না। যে বিবাহ ইহা ছাড়া হইবে, তাহা বাতিল।

আর যে বিবাহ বাতিল, অশুদ্ধ, তাহার পর নারী-পুরুষের যৌন মিলন সুস্পষ্ট ব্যভিচার।

দারে কুতনী উদ্ধৃত অপর একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এই ভাষায়ঃ

لَابُدَّ فِى النِّكَاحِ مِنْ اَرْبَعَةٍ :اَلْوَلِىُّ وَالزَّوْجُ وَالشَّاهِدَيْنِ.

অভিভাবক, বর এবং দুইজন সাক্ষী—এই মোট চারজন ব্যক্তি বিবাহ অনুষ্ঠানে অপরিহার্য।

আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানীর মতে এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী—আবূ হাবীব নাফে ইবনে মায়সারাতা—مَجْهُول অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।

ইমাম শাফেয়ী হাসান হইতে 'মুরসাল' হিসাবে প্রথমোদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই হাদীসটির সনদ যদিও বিচ্ছিন্ন (مُنْقَطِع), তবুও অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদ এই হাদীসটি গ্রহণ করিয়াছেন।

হযরত আনাস ও হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীসের ভাষা এইরূপঃ

لَا نِكَاحَ اِلَّا بِاَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ. (بيهقى)

চার ব্যক্তি ছাড়া বিবাহ হয় না। তাহারা হইলঃ প্রস্তাবকারী, অর্থাৎ বিবাহেচ্ছু বর, অভিভাবক এবং দুইজন সাক্ষী।

এই হাদীসের সনদে মুগীরা ইবনে শু'বা একজন বর্ণনাকারী। ইমামা বুখারীর মতে সে مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ তাহার বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

হাদীসের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা তাইয়্যেবী বলিয়াছেন, প্রথমোক্ত হাদীসে যে بَيِّنَة -এর কথা বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ সাক্ষী। ইহা ছাড়া কেবল ব্যভিচারিণীরাই বিবাহ করে বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। এই ধরনের বিবাহ মূলত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর যৌন সঙ্গমের জন্য পারস্পরিক চুক্তি বিশেষ, ইহা বিবাহ নয়। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানীফাও এই কথাই বলিয়াছেন। ইহার অর্থ ولى বা অভিভাবকও হইতে পারে। তখন হাদীসের তাৎপর্য হইবে, অভিভাবকের মত অনুমতি ও উপস্থিতি ব্যতীত যে বিবাহ, তাহা কখনই শুভ, সুন্দর ও শোভন হইতে পারে না। সাক্ষী বা অভিভাবক ব্যতীত 'বিবাহে'র প্রতি রাসূলে করীম (স)-এর অত্যন্ত কঠোর মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই

ধরনের 'বিবাহ'কে তিনি 'বিবাহ' বলিয়া মানিয়া লইতেই প্রস্তুত নহেন। কেননা বাহ্যত উহা জ্বেনা বা ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাদীসে দুইজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর উপস্থিতির কথা জোরালোভাবে বলা হইয়াছে। এই সাক্ষীদ্বয় দুইজন পুরুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দুইজন পুরুষ পাওয়া না গেলে—বিশেষজ্ঞদের মতে—একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার উপস্থিতিতেও বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইস্‌হাক রাহওয়াই এই মত দিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, সাক্ষীদ্বয়কে অবশ্যই পুরুষ হইতে হইবে। পুরুষ সাক্ষী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ ও সহীহ হয় না।

'হেদায়া' গ্রন্থে বলা হইয়াছে, বিবাহ অনুষ্ঠানে সাক্ষী জরুরী। কেননা হাদীসে বলা হইয়াছে لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ 'একাধিক সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হইতে পারে না'। কিন্তু ইমাম মালিক বিবাহে সাক্ষীর শর্ত করেন নাই। শর্ত করিয়াছেন প্রচারের—জানান দেওয়ার। হানাফী ফিকাহর একটি মতে সাক্ষ্য দেওয়ার বা সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পুরুষ বা মেয়ে যে-কোন দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতেই বিবাহ হইতে পারে।

ইমাম শাওকানী এই পর্যায়ের সবকয়টি হাদীস উদ্ধৃত করার পর লিখিয়াছেনঃ

বিবাহে সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য। এই মত যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মত-ই যথার্থ। কেননা এই পর্যায়ে বর্ণিত হাদীস সমূহ পরস্পরের পরিপূরক ও সমর্থক। হাদীসে যে لَا نِكَاحَ বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ 'বিবাহ শুদ্ধ হয় না'। এই কথাটি স্পষ্ট জানাইয়া দেয় যে, বিবাহে সাক্ষ্য শর্তরূপে গণ্য। কেননা যাহা না হইলে কোন কিছু শুদ্ধ হয় না তাহা উহার শর্ত মনে করিতে হইবে।

এই সাক্ষীর বিশ্বস্ত ও ন্যায়বাদী-সত্যবাদী হওয়া পর্যায়ে দুইটি মত রহিয়াছে। কাসেমীয়া ও ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, ইহার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকৃতব্য। আর জায়দ ইবনে আলী, আহমদ ইবনে ঈসা ও ইমাম আবূ হানীফা ইহার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু শেষোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হযরত ইমাম ইবনে হুসাইন ও হযরত আয়েশা (রা) প্রমূখ সাহাবী বর্ণিত হাদীসে বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী সাক্ষীর উপস্থিতিকে জরুরী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

(نيل الاوطار، تحفة الاحوذى، تحفة الفقهاء، هداية)

বিবাহে মহরানা

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ فَأَجَازَهُ.

(ترمذی، ابن ماجه، مسند احمد)

আমের ইবনে রবীয়াতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ফজারা বংশের একটি মেয়ে এক জোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ করিল। তখন রাসূলে করীম (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি তোমার মনের ও তোমার ধন-সম্পদের দিক দিয়া দুইখানি জুতার বিনিময়ে বিবাহ করিতে রাযী হইতে পারিয়াছ? মেয়েটি বলিলঃ হ্যা, তখন নবী করীম (স) এই বিবাহকে বৈধ ঘোষণা করিলেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা একজোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ হওয়া ও স্বয়ং নবী করীম (স) কর্তৃক উহা বৈধ ঘোষিত হওয়ার কথা হাদীসটিতে বলা হইয়াছে। ইহা হইতে অনেকে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, অতীব নগণ্য-সামান্য মূল্যের জিনিসও বিবাহের 'মহরানা' হইতে পারে এবং এই ধরনের বিবাহ সম্পূর্ণ জায়েয। কিন্তু সনদের দিক দিয়া এই হাদীসটি যয়ীফ। অবশ্য ইমাম তিরমিযী ইহাকে 'সহীহ হাসান' বলিয়াছেন।

এই পর্যায়ে হযরত উমর, আবূ হুরাইরা, সহল ইবনে সায়াদ, আবূ সায়ীদ খুদরী, আনাস, আয়েশা, জাবির ও আবূ হাদ্‌রাদ আল-আসলামী প্রমুখ সাহাবী হইতে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত ও গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল ও বলিলঃ আমি আনসার বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করিয়াছি। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَ؟

কত দিয়া তুমি বিবাহ করিলে?

অর্থাৎ বিবাহে মহরানা কত ধার্য করিলে? লোকটি বলিলঃ চার আউকিয়া ('আউকিয়া'—তদানীন্তন আরব সমাজের একটা বিশেষ মুদ্রা পরিমাণ)

হযরত আনাসের বর্ণনায় বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর গায়ে হলুদ রঙ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কি? তিনি বলিলেনঃ

تَزَوَّجْتُ إِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

স্বর্ণের এক রত্তি পরিমাণের মহরানা দিয়া আমি সম্প্রতি একটি মেয়ে বিবাহ করিয়াছি।

নবী করীম (স) বলিলেন بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ 'আল্লাহ তোমার এই বিবাহে বরকত দান করুন'। স্বর্ণের উপরোক্ত পরিমাণের মূল্য তখনকার সময়ে ছিল পাঁচ দিরহাম; কিংবা এক দীনারের এক চতুর্থাংশ।

এই সব হাদীস ও এই ধরনের আরও বহু শত হাদীস হইতে জানা যায় যে, বিবাহে মহরানা ধার্য করিতে হইবে। মহরানা ব্যতীত বিবাহ সহীহ হইতে পারে না।

কুরআন মজীদে বিবাহে স্ত্রীর প্রাপ্য হিসাবে মহরানার উল্লেখ হইয়াছে বহু কয়টি আয়াতে। এই পর্যায়ে প্রথম উল্লেখ্য আয়াতটি এইঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً (النساء: ٢٤)

যে সব মেয়েলোক পরস্ত্রী—তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যে সব মেয়ে লোকের মালিক হইয়াছে তাহাদের ছাড়া—সকলেই হারাম। ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তোমাদের প্রতি লিখিয়া দেওয়া ফরমান। ইহাদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোক তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে এই শর্তে যে, তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে পাইতে চাহিবে পবিত্রতা রক্ষাকারী বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে, ব্যভিচারী রূপে নয়। পরন্তু তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের নিকট যৌন-সঙ্গম স্বাদ-আস্বাদন করিবে, তাহাদিগকে নির্ধারিত পরিমাণ 'পারিশ্রমিক' দাও। (আন-নিসা-২৪)

আয়াতে بِاَمْوَالِكُمْ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইবে ধন-মালের বিনিময়ে। এই ধন-মাল দিতে হইবে বিবাহে মহরানা স্বরূপ, কেবলমাত্র অর্থদানই নয়, নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরানা দেওয়াই বিধেয়। আয়াতের শেষের দিকে বলা হইয়াছেঃ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ইহাতে ধার্যকৃত মহরানা আদায় করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের এই আয়াতে মহরানাকে اجر। বলা হইয়াছে। কেননা উহা কার্যতঃ اَجْرُ الْاِسْتِمْتَاعِ 'স্ত্রী সঙ্গম স্বাদ-আস্বাদনের বিনিময় মূল্য'।

কিন্তু ইহা কিসের বিনিময় মূল্য? বলা হইয়াছে, ইহা স্ত্রীর যৌন অঙ্গ সম্ভোগের বিনিময় মূল্য। কেননা মুনাফা স্বরূপ যাহা পাওয়া যায় তাহাই মজুরী, পারিশ্রমিক বা اجر। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা স্ত্রী সঙ্গম হালাল হওয়ার বিনিময় মূল্য। অন্যরা বলিয়াছেন, স্ত্রীর সমস্ত দেহের বিনিময় মূল্য হইয়াছে তাহাকে দেওয়া মহরানা। আসলে স্ত্রীর দেহ মন ও যৌন অঙ্গ সম্ভোগ, স্বাদ গ্রহণ—এই সব কিছুর বিনিময় মূল্য এই মহরানা। (الجامع لاحكام القران للقرطبى)

আল্লামা আবূ বকর আল-জাসসাস লিখিয়াছেনঃ এই আয়াত অনুযায়ী বিবাহের আক্‌দ মুবাহ্‌ ও জায়েয হইবে স্ত্রী অঙ্গ ব্যবহারের বিনিময় মূল্য আদায় করিয়া দেওয়ার শর্তে। এবং তাহা কোন মাল-সম্পদ (kind) হইতে হইবে। ইহা হইতে দুইটি কথা জানা গেল। একটি এই যে, স্ত্রীর যৌন অঙ্গের বিনিময় মূল্য দেওয়া ওয়াজিব। যে জিনিসের বিনিময়ে স্ত্রীর যৌন অঙ্গের স্বাদ গ্রহণ হালাল হয় তাহা তাহাকে দিয়া দিতে হইবে। আর দ্বিতীয় কথা, মহরানা হইতে হইবে এমন যাহা জিনিস বা kind পর্যায়ে গণ্য হইতে পারে। যাহা মাল-সম্পদ নয়, তাহা মহরানা হইতে পারে না।

(احكام القران للجصاص)

দ্বিতীয় উল্লেখ্য আয়াত হইলঃ

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: ٤)

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মহরানা দিয়া দাও দেওয়ার মতই—আন্তরিকতা ও মনের সন্তুষ্টি সহকারে।

বস্তুত মহরানা আল্লাহ্র ধার্য করিয়া দেওয়া স্ত্রীর হক্ক। ইহা তাহার পাওনা। এই পাওনা তাহাকে পাইতেই হইবে। ইহা আদায় করিয়া দেওয়া ফরয। আদায় করিতে হইবে কুণ্ঠিত সংকুচিত মন-মানসিকতা লইয়া নয়, করিতে হইবে স্ব-ইচ্ছায়, সাগ্রহে ও আন্তরিক ইচ্ছা সহকারে।

হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-এর যখন বিবাহ হইল, তখন নবী করীম (স) হযরত আলীকে বলিলেন, اَعْطِهَا شَيْئًا 'তুমি ফাতিমাকে কিছু একটা দাও'। হযরত আলী (রা) বলিলেন مَاعِنْدِىْ شَيْئٌ 'দিতে পারি এমন কোন জিনিসই আমার নাই।' নবী করীম (স) বলিলেন فَاَيْنَ دَرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ। 'তোমার হিতমিয়া বর্মটি কোথায়'? অর্থাৎ সেই বর্মটি বিক্রয় করিয়া কিছু একটা লইয়া আস ফাতিমাকে দিবার জন্য।

ইহা হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইল, স্বামী স্ত্রীর মিলন হওয়ার পূর্বেই মহরানার একটা অংশ স্ত্রীকে দিয়া দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। হাদীসে যদিও স্পষ্ট বলা হয় নাই যে, অতঃপর হযরত আলী (রা) সেই বর্মটি বা উহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা কিছু নিয়ে মহরানা বাবদ দিয়াছিলেন কিনা; কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি বর্ণনা হইতে জানা যায়, বর্মটি তিনি বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য মহরানা বাবদ দিয়াছিলেন। (سبل السلام)

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে এই হাদীসটির বর্ণনা স্বয়ং হযরত আলী (রা) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলিলেনঃ আমি রাসূলে করীমের কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব দিবার কথা চিন্তা করিলাম। মনে মনে বলিলাম, আমার দিবার মত কিছুই নাই। তাহা হইলে কিভাবে হইতে পারে? পরে রাসূলে করীম (স)-এর সহিত আমার সম্পর্কের কথা চিন্তা করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব দিয়াই ফেলিলাম। তিনি বলিলেনঃ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْئٍ 'তোমার নিকট মহরানা বাবত দিবার মত কিছু আছে'? বলিলাম, না। বলিলেনঃ আমি যে তোমাকে অমুক দিন একটা বর্ম দিয়াছিলাম, সেটি কোথায়? বলিলাম সেটি আমার নিকট রহিয়াছে। বলিলেন, তুমি উহাই দিয়া দাও। (مسند احمد)

মোট কথা সব কয়টি হাদীস হইতে মহরানা দেওয়ার অপরিহার্যতা প্রমাণীত হয়।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَهَبُ لَكَ نَفْسِىْ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْئٍ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذْهَبْ اِلَى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ مَاوَجَدْتُّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرْ وَلَوْخَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا

إِزَارِيْ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ تَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

(مسلم، بخارى، مسند احمد، طبرانى)

হযরত সহল ইবনে সায়াদ সায়েদী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ একটি মেয়েলোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল এবং বলিলঃ ইয়া রাসূল। 'আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছি'। এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরে তাহার উপর-নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করিলেন। পরে রাসূলে করীম (স) তাঁহার মাথা উপরে তুলিলেন। অতঃপর মেয়েলোকটি লক্ষ্য করিল, নবী করীম (স) তাহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাইলেন না। পরে সে বসিয়া রহিল। এই সময় রাসূলের একজন সাহাবী দাঁড়াইয়া বলিলেনঃ ইয়া রাসূল। এই মেয়ে লোকটিতে আপনার যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে এই স্ত্রীলোকটিকে আমার নিকট বিবাহ দিন। তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেন, তোমার নিকট মহরানা দেওয়ার মত কিছু আছে কি? সাহাবী বলিলেনঃ আল্লাহ্র শপথ, 'হে রাসূল, আমার নিকট কিছুই নাই।' তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তোমার ঘরের লোকদের নিকট যাও এবং খুঁজিয়া দেখ, কোন জিনিস পাও কিনা! সাহাবী চলিয়া গেলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেনঃ হে রাসূল, আল্লাহ্র কছম, কিছুই নাই। তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ দেখ, লোহার একটা আঙটিও পাও কিনা। তিনি চলিয়া গেলেন, পরে ফিরিয় আসিলেন, বলিলেন, না, ইয়া রাসূল, একটা লোহার আঙটিও নাই। তবে আমার এই কাপড়খানা (তাঁহার চাদর) আছে, ইহার অর্ধেক মহরানা স্বরূপ তাহাকে দিতে পারি। রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তোমার এই কাপড়খানা লইয়া তুমি কি করিবে। ইহা যদি তুমি ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার স্ত্রীর ব্যবহারে ইহার কিছুই আসিবেনা। আবার সে যদি ইহা ব্যবহার করে তাহা হইলে তোমার গায়ে ইহার কোন অংশ থাকিবে না। তখন এই (সাহাবী) লোকটি বসিয়া রহিলেন। দীর্ঘসময় ধরিয়া বসিয়া থাকার পর তিনি দাঁড়াইলেন। রাসূলে করীম (স) তখন তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিলেন। তখন রাসূলে করীম (স) তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। ডাকার পর তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি কুরআন মজীদ কতটা শিখিয়াছ? বলিলেন, কুরআনের অমুক অমুক সূরা আমি আয়ত্ত করিয়াছি। তিনি তাহা গণিয়া দিলেন। রাসূল বলিলেনঃ তুমি কি ইহা বুঝিয়া অন্তর দিয়া পড়? বলিলেন, হ্যাঁ, তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ যাও, তুমি যতটা কুরআন শিখিয়াছ উহার বিনিময়ে তুমি এই মেয়ে লোকটির স্বামীত্ব লাভ করিলে।

(বুখারী, মুসলিম, দারে কুত্নী, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী)

ব্যাখ্যা এই দীর্ঘ হাদীসটিতে প্রধানত দেন-মোহর বা মহরানা সম্পর্কে আলোচিত হইলেও ইহার দীর্ঘ বিবরণ ও উহাতে উদ্ধৃত কথোপকথন হইতে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় জানা যায়। হাদীসের শুরুতে

বলা হইয়াছে, একটি মেয়েলোক রাসূলে করীম(স)-এর নিকট আসিল। হাদীসে মেয়েলোকটির নাম বলা হয় নাই। ইবনে হাজার আসকালানী বলিয়াছেন لَمْ أَقِفْ عَلَى اِسْمِهَا আমি তাহার নাম জানিতে পারি নাই। তখন রাসূলে করীম কোথায় ছিলেন? সুফিয়ান সওরীর বর্ণনা হইতে জানা যায়, وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ। তখন নবী করীম (স) মসজিদে আসীন ছিলেন। মেয়ে লোকটি বলিলঃ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِى 'আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছি।' অর্থাৎ সে যেন বলিলঃ أَتَزَوَّجُكَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ 'কোন রূপ বিনিময় ছাড়াই আমি আপনাকে বিবাহ করিব'। আর সোজা কথায় ইহার অর্থ, আপনি আমাকে বিবাহ করুন, কোন মহরানা আমাকে দিতে হইবে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, একজন মেয়ে রাসূলের নিকট বিবাহিতা হইবার উদ্দেশ্যে নিজেকে পেশ করিতে পারে—ইহা জায়েয। কুরআন মজীদে এই কথাই বলা হয়াছেঃ নিম্নোদ্ধৃত আয়াতেঃ

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

মু'মিন স্ত্রীলোক যদি নিজেকে নবীর জন্য উৎসর্গ করে যদি নবী তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে—একান্তভাবে তোমার জন্য হে নবী—অন্যান্য মু'মিন ছাড়া। (তবে তাহা জায়েয হইবে)।

এই আয়াত ও উপরোক্ত দীর্ঘ হাদীসই এইরূপ বিবাহ জায়েয হওয়ার অকাট্য দলীল এবং এই অনুযায়ী কোন মেয়ে যদি নিজেকে রাসূলে করীম (স)-এর সহিত বিবাহিতা হওয়ার জন্য পেশ করে ও রাসূলে করীম (স) মহরানা না দিয়াই বিবাহ করে তাহা হইলে তাহা তাঁহার জন্য হালাল হইবে। পরেও তাহাকে কোন মহরানা দেওয়া তাঁহার উপর ওয়াজিব হইবে না—না সঙ্গম হওয়ার কারণে না মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পর। কিন্তু এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স)-এর জন্য, অন্য কাহারও এইরূপ করার অধিকার নাই। অন্য কেহ এইরূপ করিলে—অর্থাৎ মহরানা ছাড়াই বিবাহ করিলে—মহরানা দেওয়া অবশ্যই ওয়াজিব হইবে।

নবী করীমের পক্ষে هبة 'হেবা' শব্দে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে দুইটি কথা আছে। একটি হইল কুরআন মজীদেই এইরূপ বলা হইয়াছে। এই হাদীসেও তাহাই বলা হইয়াছে। অতএব তাহা হইতে পারে। আর দ্বিতীয় হইল, 'হেবা' শব্দে বিবাহ সংঘটিত হয়না। বরং সত্য কথা এই যে, বিবাহ (تزويج বা نكاح) শব্দ বলা ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় না। রাসূলের উম্মতের লোকদের ব্যাপারেও তাহাই। এই শেষোক্ত দুইটি শব্দের যে কোন একটি ছাড়া বিবাহ হইতে পারে না। ইহা ইমাম শাফেয়ীর মত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিয়াছেনঃ

يَنْعَقِدُ نِكَاحُ كُلِّ أَحَدٍ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِى التَّمْلِيْكَ عَلَى التَّأْبِيْدِ

চিরন্তন স্বামীত্বের অধিকার পাওয়ার কথা বুঝায় যে শব্দেই, তাহা বলা হইলে যে-কোন দম্পতির বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে।

সুফিয়ান সওরী, আবূ সওর এবং মালিকী মাযহাবের বহু বিশেষজ্ঞ ইমাম শাফিয়ীর উপরোক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। ইহা কাযী ইয়াযের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ।

মেয়ে লোকটির উক্ত কথা বলার পর রাসূলে করীম (স) কি করিলেন? উপরোদ্ধৃত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ রাসূলে করীম (স) তাহার প্রতি তাকাইলেন। চোখ উপর হইতে নিচের দিকে নিয়া আসিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, যে মেয়েকে বিবাহ করার কথা-বার্তা ও প্রস্তাব হইবে তাহাকে

এইভাবে দেখা—যেভাবে রাসূলে করীম (স) মেয়েটিকে দেখিয়াছেন—সম্পূর্ণ জায়েয। ইমাম নববীর মতেঃ

فِيْهِ اِسْتِحْبَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ لِيَتَزَوَّجَهَا

কোন উন্নত চরিত্রবান আদর্শ ব্যক্তির নিকট নিজেকে বিবাহ করার প্রস্তাব একটি মেয়ের নিজেই পেশ করা পছন্দনীয় কাজ—এ কথার প্রমাণ ইহাতে রহিয়াছে।

বুখারীর বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا মেয়েটির ঐ কথা বলার পর রাসূলে করীম (স) কোন উত্তর দিলেন না। আর তাবারানীর বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

فَصَمَتَ ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَصَمَتَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ

রাসূলে করীম (স) চুপ করিয়া থাকিলেন। মেয়েটি নিজেকে আবার পেশ করিল। তখনও তিনি চুপ থাকিলেন। (হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত সহল বলেন) আমি নিজে মেয়েটিকে চিন্তান্বিতা অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম এবং দাঁড়াইয়া থাকিয়াও সে নিজেকে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট পেশ করিতেছিল। কিন্তু তিনি চুপ ও নির্বাক হইয়া রহিয়াছেন।

আর হাম্মাদ ইবনে জায়দের বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

اَنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ فَقَالَ مَالِىْ فِى النِّسَاءِ حَاجَةٌ

মেয়ে লোকটি নিজেকে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের জন্য উৎসর্গ করিল। রাসূলে করীম (স) বলিলেন, আমার কোন মেয়ে লোকের প্রয়োজন নাই।

এই দুই ধরনের বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বলা যায়, রাসূলে করীম (স) ইহা বলিয়াছিলেন সর্বশেষে। প্রথম দিকদিয়া তিনি নির্বাক ও লা-জওয়াবই রহিয়াছেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন, মেয়েটির প্রস্তাবের কোন জবাব না দিলেই সে বুঝিতে পারিবে যে, তাহাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার কোন ইচ্ছাই রাসূলে করীমের নাই। কিন্তু সে যখন বার বার একই কথা বলিয়া নিজেকে পেশ করিতে লাগিল, তখন সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন।

রাসূলে করীম (স)-এর অস্বীকৃতির পর দরবারে উপস্থিত একজন লোক দাঁড়াইয়া বলিলেনঃ ইয়া রাসূল, আপনার প্রয়োজন না থাকিলে মেয়ে লোকটিকে আমার নিকট বিবাহ দিন। লোকটি কে ছিলেন? ইবনে হাজার আসকালানী লিখিয়াছেন لم اقف على اسمه 'আমি এই লোকটির নাম জানিতে পারি নাই'। আর তাবারানীর বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

فقام رجل احسبه من الانصار

তখন একজন লোক দাঁড়াইল, হাদীস বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি মনে করি, লোকটি আনসার বংশের হইবেন। তবে তিনি যে একজন সাহাবী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাসূলে করীম (স) বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশকারী সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ মহরানা দেওয়ার মত

কোন জিনিস তোমার নিকট আছে কি? তিনি তখন কিছুই উপস্থিত করিতে পারিলেন না, তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ

দেখ, একটা লোহার আঙটিও জোগাড় করিতে পার কিনা।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মহরানা ব্যতীত কোন বিবাহই সংঘটিত হয় না। কেননা এই মহরানাই সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ মিটাইয়া দেয়। আর মেয়ে লোকটির জন্যও এই মহরানা ধার্য হওয়া মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপনের জন্য বিশেষ সহায়ক। কেননা নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরানার ভিত্তিতে বিবাহ হইলে স্বামী যদি তাহাকে সংগম-সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে সে সেই পরিমাণের মহরানার অর্ধেক লাভ করিতে পারিবে। আর ইহা তাহার ইদ্দাতকালীন ও অন্য স্বামী গ্রহণ পর্যন্তকার জন্য সম্বল হইবে। তবে আকদের সময় মহরানা নির্দিষ্ট না করা হইলেও বিবাহ শুদ্ধ হইবে। কুরআন মজীদেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً

(البقرة: ٢٣٧)

তোমরা যদি মহরানার কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিয়া এবং বিবাহের পর স্ত্রীকে স্পর্শ অর্থাৎ সঙ্গম করার পূর্বেই তাহাকে তালাক দাও, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই।

ইহা হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আকদের সময় মহরানা নির্দিষ্ট করা না হইলেও বিবাহ এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েয। অবশ্য আকদের সময় মহরানা ধার্য না হইলেও পরে ইহা ধার্য করা ওয়াজিব হইবে। কেননা মহরানা তো দিতে হইবেই। ইহা স্ত্রীর অধিকার।

মহরানা কখন ওয়াজিব হয়। আকদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, না স্ত্রী সঙ্গম হওয়ার পর? এই বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। ইমাম শাফিয়ীর দুইটি কথা এ বিষয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে নির্ভুলতম কথা হইল, স্ত্রী সঙ্গম সংঘটিত হইলেই মহরানা ওয়াজিব হইয়া যায়। উপরোক্ত আয়াত হইতে বাহ্যতঃ তাহাই মনে হয়।

আলোচ্য হাদীসের উপরোদ্ধৃত বাক্যাংশ হইতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মহরানার নির্দিষ্ট ও শরীয়াত কর্তৃক ধার্যকৃত কোন পরিমাণ নাই। উহা কম পরিমাণেরও হইতে পারে, হইতে পারে বেশী পরিমাণেরও। উভয়পক্ষ স্বামী ও স্ত্রী যে পরিমাণে পরস্পর সম্মত ও ঐক্যমত হইবে, তাহাতেই বিবাহ সহীহ্ হইবে। কেননা রাসূলে করীম (স) মহরানা হিসাবে একটা লোহার আঙটিও আনিতে বলিয়াছেন। আর লোহার আঙটি তো মূল্যের দিক দিয়া অতি নগণ্য। ইমাম শাফিয়ী এই মত দিয়াছেন এবং পূর্ব ও পরের অধিকাংশ আলেমই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন! রবীয়া, আবুজ-জানাদ, ইবনে আবূ জি'ব, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ, লাইসা ইবনে সায়াদ, সওরী, আওজায়ী, ইবনে আবূ লাইলা, দায়ূদ এবং অন্যান্য হাদীস ও ফিকাহ্বিদগণ এই কথাই সমর্থন করিয়াছেন। মালিকী মাযহাবের অনুসারী হাদীস ফিকাহবিদ ইবনে অহাবও এই কথাই বলিয়াছেন। কাযী ইয়ায বলিয়াছেন, হিজাজ, বাছরা, কূফা ও সীরিয়ার প্রখ্যাত আলেমগণের মাযহাব এই যে, স্বামী-স্ত্রী যে পরিমাণ মহরানায় পরস্পর সম্মত হইবে, তাহা কম হউক বেশী হউক এবং চাবুক, জুতা বা লোহার আংটি প্রভৃতি যাই হউক না কেন, তাহাতেই বিবাহ জায়েয হইবে। ইমাম মালিক বলিয়াছেন, মহরানার ন্যূনতম পরিমাণ হইল চার দীনার। এই পরিমাণ সম্পদ চুরি করিলে 'চুরি' সাব্যস্ত হয় ও দণ্ডযোগ্য অপরাধ রূপে গণ্য হয়। কাযী ইয়াযের মতে

ইহা ইমাম মালিকের একার মত। ইহাতে তাঁহার সমর্থক কেহ নাই। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সঙ্গীগণ বলিয়াছেনঃ أَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ 'মহরানা ন্যূনতম পরিমাণ হইল দশ দিরহাম'। ইহার কম পরিমাণের মহরানায় বিবাহ জায়েয নয়। ইবনে শাবরামাতা বলিয়াছেনঃ ন্যূন পরিমাণ মহরানা হইল পাঁচ দিরহাম। অবশ্য এই মত অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদদের মতের বিপরীত। বর্তমান আলোচ্য হাদীস হইতেও হানাফী মতের বিপরীত কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা এই সহীহ্ হাদীসটি প্রমাণিত হয় যে, একটা লোহার আঙটিও মহরানা হইতে পারে। আর একটা লোহার আংটির মূল্য যে অতি সামান্য তাহা সর্বজনবিদিত।

এই হাদীস হইতে একথা জানা যায় যে, স্ত্রীর মহরানা অনতিবিলম্বে তাহাকে দিয়া দেওয়া ভাল। হাদীসটিতে উদ্ধৃত বিবাহ-প্রার্থী সাহাবীর প্রায় প্রত্যেকটি কথার শুরুতে لا والله বলিয়া আল্লাহ্‌র শপথ উদ্ধৃত হইয়াছে। অথচ ইহা শপথ করিয়া কথা বলার স্থান নয় এবং উহার কোন প্রয়োজনও এখানে নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে ও প্রকৃত শপথের লক্ষ্য না থাকা সত্ত্বেও শপথ করিয়া কথা বলা সম্পূর্ণ নাজায়েয নয়। কিন্তু আসলেই ইহা পছন্দনীয় কাজ নয়। এই ঘটনার বিবরণ হইতে একথাও জানা যায় যে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরও বিবাহ করার অধিকার আছে। এজন্য সমাজ তথা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহাদের সহিত সহযোগিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। গরীব মানুষ বলিয়া বিবাহ করিবে না, কেবল ধনী ও সচ্ছল লোকেরাই বিবাহ সুখ ভোগ করিবে, ইহা আর যাহাই হউক, মানবিক নীতি হইতে পারে না। ইসলামী নীতিতো নয়-ই।

বিবাহ-প্রার্থী সাহাবী যখন বলিলেনঃ আমার কাপড় খানাই আছে। ইহার অর্ধেক তাহাকে মহরানা স্বরূপ দিতে পারি। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ 'তুমি এই কাপড় খানা দিয়া কি করিবে? তুমি ইহা পরিলে তোমার স্ত্রীর কোন কাজে লাগিবে না। আর সে পরিলে তোমার ব্যবহারের জন্য কোন অংশ থাকিবে না'। আসলে ইহা সাহাবীর কাজের পরিণতিতে যে অসুবিধা ও জটিলতা দেখা দিতে পারে—যে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা রহিয়াছে, ইহা তাহারই বিশ্লেষণ এবং সেই দিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ। বস্তুত প্রত্যেক জন-নেতা, সমাজ-পতি ও রাষ্ট্র প্রধানের ইহাই কর্তব্য।

সর্বশেষে মহরানা পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ

تَقْرَءُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ

তুমি কুরআনের যে সূরা কয়টির নাম করিলে তাহা কি মুখস্থ করিয়াছ ও হৃদয় দিয়া এইগুলির সংরক্ষণ করিতেছ?

কোন্ কোন্ সূরা তাঁহার মুখস্ত আছে, তাহার নাম এই বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় সূরা কয়টির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে সাহাবীর জবাব এই ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছেঃ نعم، سورة البقرة وسورة من المفصل হ্যাঁ, সূরা বাকারা ও আর একটি দীর্ঘ সূরা। আর আবূ দায়ূদ ও নাসায়ীতে হযরত আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ وسورة البقرة والتى تليها সেই লোক এই প্রশ্নের জবাবে যখন বলিলেন, হ্যাঁ, তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

اِذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

যাও, তুমি কুরআনের যতটা মুখস্থ ও সংরক্ষিত রাখিয়াছ, উহার বিনিময়েই তোমাকে এই মেয়েলোকটির স্বামীত্বের মালিক বানাইয়া দেওয়া হইল।

বুখারীর বর্ণনায় ইহার ভাষা হইলঃ مَلَّكْتُكَهَا 'আমি তোমাকে ইহার মালিক করিয়া দিলাম।' কিন্তু ইমাম দারে কুত্‌নী বলিয়াছেন, ইহা ভ্রমাত্মক। সহীহ্‌তম বর্ণনানুযায়ী শব্দটি হইবেঃ زَوَّجْتُكَهَا 'আমি

তোমাকে এই স্ত্রীলোকটির সহিত বিবাহ দিলাম।' অথবা 'তোমার নিকট স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ দিলাম।' এই দুইটিই হইতে পারে।

এই হাদীসের ভিত্তিতে এই মতও শরীয়াত সম্মত যে, কুরআন মজীদ শিক্ষা দেওয়াটাও অবস্থা বিশেষে বিবাহে স্ত্রীর মহরানা হইতে পারে এবং ইহাকে 'মহরানা' ধরিয়া বিবাহের আক্দ করা হইলে সে বিবাহ সহীহ্ হইবে। ইহা ইমাম শাফেয়ীর মত এবং তাঁহার মতে এই হাদীসের দলীল অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা দানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয। আতা, হাসান ইবনে সালেহ, মালিক ও ইস্হাক প্রমুখ ফিকাহবিদ্গণও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম জুহরী ও ইমাম আবূ হানীফা ইহা সমর্থন করেন নাই। আলোচ্য হাদীসটি এবংঃ

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ

তোমরা যে সব কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ কর, কুরআন তন্মধ্যে ইহার বেশী অধিকার সম্পন্ন।

অর্থাৎ শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ অবশ্যই জায়েয।

এই সহীহ্ হাদীসটি হইতেও কুরআন শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক লওয়া জায়েয প্রমাণিত হয়।
(نبوى، بلوغ الامانى، نيل الاوطار)

এই দীর্ঘ হাদীসটির কথা সংক্ষিপ্তভাবেও বর্ণিত হইয়াছে বিভিন্ন বর্ণনায়। একটি বর্ণনার ভাষা এইঃ

زَوَّجَ النَّبِيُّ صلعم رَجُلًا عَلٰى سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْئٌ

নবী করীম (স) একটি লোককে—যাহার নিকট কিছুই ছিল না—সূরা বাকারার বিনিময়ে বিবাহ দিলেন।

অপর একটি বর্ণনার ভাষা এইঃ

زَوَّجَ النَّبِيُّ صلعم رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِهِ امْرَاَةً عَلٰى سُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ جَعَلَهَا مَهْرًا وَاَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ عَلِّمْهَا

নবী করীম (স) তাঁহার একজন সাহাবীকে বিবাহ করাইয়াছিলেন একটি দীর্ঘ সূরার বিনিময়ে, উহাকে মহরানা স্বরূপ ধরিয়াছিলেন এবং মেয়েটিকে তাহার নিকট প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাকে তাহা শিক্ষা দাও।

বেশী ও বড় পরিমাণের মহরানা ধার্যকরণ

عَنْ اَبِى الْعَجْفَاءِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَلاَ لاَ تُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُوْمَةً فِى الدُّنْيَا اَوْ تَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ اَوْلاَ كُمْ بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهٖ وَلاَ اَنْكَحَ شَيْئًا مِّنْ بَنَاتِهٖ عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَةً. (ترمذى)

আবুল আজ্‌ফা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলিয়াছেনঃ তোমরা মেয়েদের মহরানা বেশী বেশী পরিমাণে ধার্য করিও না। কেননা বেশী পরিমাণে মহরানা ধার্য করাই যদি দুনিয়ায় অধিক সম্মানজনক হইত এবং ইহাই যদি আল্লাহ্‌র নিকট তাকওয়া প্রমাণকারী হইত, তাহা হইলে তোমাদের অপেক্ষা রাসূলে করীম (স)-ই এইরূপ করার অধিক উপযুক্ত ছিলেন। অথচ নবী করীম (স) তাঁহার স্ত্রীদের কেহকে বিবাহ করার সময় কিংবা তাঁহার কন্যাদের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ দেওয়ার সময় 'বারো আউকিয়া'র অধিক পরিমাণে মহরানা ধার্য করিয়াছেন বলিয়া আমি জানিনা। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা উপরে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা হযরত উমর ফারূকের কথা। তিনি প্রধান সাহাবীদের অন্যতম। সাহাবীর কথাও হাদীস, ইহা তাহার অকাট্য প্রমাণ। কেননা সাহাবীরা শরীয়াতের যে সব বিষয়ে কথা বলিয়াছেন তাহা সরাসরি রাসূলের কথার ভিত্তিতে বলিয়াছেন কিংবা রাসূলের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া বলিয়াছেন। এই হাদীসটিতেও তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সত্যতা প্রমাণের জন্য রাসূল (স)-এর 'বাস্তব আমল'কে ভিত্তি করিয়াছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) প্রথমতঃ বলিয়াছেনঃ 'তোমরা বিবাহে মেয়েদের জন্য খুব বেশী পরিমাণে মহরানা ধার্য করিও না'। কেন? তাহার প্রথম কারণ এই যে, বেশী পরিমাণে মহরানা ধার্য করা হইলেই কাহারও জন্য অত্যধিক সম্মান ও মর্যাদার কারণ হয় না। সেকাল হইতে একাল পর্যন্তকার লোকদের মধ্যে যাহারা নিজদিগকে শরীফ খান্দানের লোক বলিয়া অহমিকা বোধ করে, তাহাদের মধ্যে বেশী বেশী পরিমাণের মহরানা ধার্য করার প্রবণতা প্রকট হইয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহারা মনে করে, আমরা যেহেতু শরীফ খান্দান—তথা উচ্চ বংশের এবং বড় লোক, অতএব আমাদের ঘরের মেয়ে বিবাহ করিতে হইলে অধিক পরিমাণে মহরানা দিতে হইবে এবং ইহারাই যখন অন্য ঘর হইতে মেয়ে বিবাহ করিয়া লইয়া আসে তখনও খুব বেশী পরিমাণে মহরানা ধার্য করে ও দিতে স্বীকৃত হয়। কেননা তাহাদের মতে কম পরিমাণের মহরানা ধার্য করা হইলে শরাফতী প্রমাণিত হয় না। হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন, এই মনোভাব ভিত্তিহীন ও এই শরাফতীবোধ সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি দ্বিতীয়ত; বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা খোদাভীতির মাত্রাতিরিক্ততাও প্রমাণিত হয় না। আর এই উভয় কথার যুক্তি হিসাবে তিনি বলিয়াছেনঃ মানব সমাজে রাসূলে করীম (স)-ই সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। বেশী পরিমাণে মহরানা ধার্য করাই যদি অধিক মর্যাদা ও খান্দানী শরাফতীর লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে তিনি নিজে ইহা করিতেন। তিনি নিজে

যে সব বিবাহ করিয়াছেন তাহাতে বেশী পরিমাণ মহরানা দিতে রাযী হইতেন এবং তাঁহার কন্যাদের বিবাহেও বেশী বেশী মহরানা ধার্য করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি মোটামুটি ভাবে বারো আউকিয়া-৪৮০ দিরহামের অধিক পরিমাণ মহরানা কোন ক্ষেত্রেই ধার্য করেন নাই। এই পরিমাণটা খুবই সাধারণ, অতএব মহরানা ধার্য করার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের কর্তব্য রাসূলে করীম (স)-এর আমলকে অনুসরণ করা। এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি পরিবারিক জীবনে চরম ভাঙন ও বিপর্যয় আনিয়া দেয় অনিবার্যভাবে। আর যদি এক্ষেত্রে জবরদস্তি বা হঠকারিতা দেখানো হয়, তাহলে দাম্পত্য কলহ ও স্থায়ী অশান্তির কারণ হওয়া অবধারিত।

রাসূলে করীমের বেগম উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবার মহরানা ছিল চার হাজার দিরহাম, একথা ঠিক। কিন্তু এই পরিমাণ মহরানা রাসূলে করীম (স) নিজে দেন নাই, দিয়াছেন রাসূলে করীম (স)-এর পক্ষ হইতে আবিসিনীয়ার বাদশাহ নাজাশী। কাজেই ইহা হযরত উমর ফারুকের কথার আওতাবহির্ভূত। এই পরিমাণ মহরানা নবী করীম (স) কর্তৃক ধার্যকৃতও নয়। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلعم لِأَزْوَاجِهِ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ اُوْقِيَةً وَنَشًا وَهُوَ نِصْفُ اُوْقِيَةٍ فَتِلْكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهٰذَا اَصْدَاقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم. (مسلم، مسند احمد)

রাসূলে করীম (স) তাঁহার বেগমদের জন্য দেওয়া মহরানা ছিল বারো আউকিয়া ও অর্ধ আউকিয়া। আর ইহাতে মোট পাঁচ শত দিরহাম হয়। রাসূলে করীম (স)-এর দেওয়া মহরানা গড়ে ইহাই ছিল।

কিন্তু এই পরিমাণটাও মোটামুটিভাবে হযরত উমর (রা) কথিত মহরানা পরিমাণের অধিক নয়। বড় জোর এতটুকু বলা যায়, হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় যে অর্ধ আউকিয়ার কথা আছে, তাহা তিনি গণ্য করেন নাই। অতএব এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে কোনই বিরোধ বা বৈপরীত্য নাই। আর ইহাও হইতে পারে যে, হযরত উমর (রা) হয়ত উম্মে হাবীবা ও হযরত আয়েশার এই বর্ণনার কথা জানিতেন না। কিন্তু ইহাতে মৌলিক পার্থক্য এই জন্য নাই যে, তিনি তো রাসূলের দেওয়া মহরানা-পরিমাণের অধিক ধার্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন মাত্র এবং তাহা নিঃসন্দেহে যথার্থ।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا

এবং তোমরা দিয়াছ তোমাদের কোন এক স্ত্রীকে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ মহরানা স্বরূপ, তাহা হইল উহা হইতে একবিন্দুও ফিরাইয়া লইও না।

قنطار শব্দের অর্থ বিপুল সম্পদ।

ইহা হইতে বুঝা যায়, মহরানা স্বরূপ বিপুল ধন-সম্পদও দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে হযরত উমর (রা)-এর উপরোক্ত কথা কুরআনের এই কথার বিপরীত হয় না কি?

প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রশ্নই এক বর্ণনানুযায়ী হযরত উমর (রা)-এর উপরোক্ত ভাষণের পর পরই উত্থিত হইয়াছেঃ হযরত উমর (রা) যখনই উক্ত কথা বলিয়াছিলেন তখনই মজলিস হইতে একজন মহিলা দাঁড়াইয়া বলিলেনঃ

يَا عُمَرُ يُعْطِيْنَا اللّٰهُ وَتُحَرِّمُنَا ؟ اَلَيْسَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ؟

হে উমর! আল্লাহ্ (সুবাহানাহু) তা'আলা তো আমাদিগকে দিতেছেন আর আপনি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন? আল্লাহ্ সুবহান কি বলেন নাইঃ 'আর তোমরা কোন স্ত্রীকে যদি বিপুল ধন-সম্পদ দিয়া থাক, তাহা হইলে উহা হইতে কিছুই ফিরাইয়া লইও না'?

তখন হযরত উমর (রা) বলিলেনঃ أَصَابَتْ إِمْرَأَةٌ وَأَخْطَأَ عُمَرُ 'একটি মেয়ে লোক ঠিক বলিয়াছে আর উমার ভুল করিয়াছে'। অন্য বর্ণনার ভাষা হইলঃ إِمْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ 'মেয়েলোক ঠিক বলিয়াছে আর পুরুষ ভুল করিয়াছে। وَتَرَكَ الْإِنْكَارَ 'অতঃপর তিনি বেশী মহরানা ধার্য অস্বীকার করা পরিহার করিয়াছেন।'

এই বর্ণনাটি ইমাম কুরতুবী তাঁহার তফসীরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহা কোন্ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। উপরে তিরমিযী হইতে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে এই কথার উল্লেখ নাই। আবূ হাতিম আল বুস্তী তাঁহার সহীহ্ মুসনাদ গ্রন্থে এই আবুল আজফা হইতেই এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও কুরতুবী উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ নাই। ইবনে মাজাহ গ্রন্থেও আবুল আজফা হইতে বর্ণিত এই হাদীসই উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও মেয়ে লোকের আপত্তি করা ও হযরত উমরের ভুল (?) স্বীকার করা সংক্রান্ত বিবরণের কোনই উল্লেখ নাই।

সে যাহাই হউক, এই আয়াতের দৃষ্টিতেও হযরত উমরের কথার বাতুলতা প্রমাণিত হয় না। কেননা আয়াত হইতে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ স্ত্রীকে মহরানা স্বরূপ দেওয়া বড়জোর শুধু জায়েযই প্রমাণিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা করাই যে উত্তম ও মঙ্গলজনক, তাহা বুঝায় না। অথচ হযরত উমরের সমস্ত কথা উত্তম ও কল্যাণময় পরিমাণ সম্পর্কে, কতটা জায়েয আর কতটা নাজায়েয সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নাই।

অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেনঃ

لَا تَزِيْدُوْا فِىْ مُهُوْرِ النِّسَاءِ أَرْبَعِيْنَ أُوْقِيَةٍ فَمَنْ زَادَ أَلْقَيْتُ الزِّيَادَةَ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ

তোমরা স্ত্রীদের মহরানা চল্লিশ আউকিয়ার বেশী ধার্য করিও না। যদি কেহ বেশী ধার্য করে তাহা হইলে অতিরিক্ত অংশ আমি বায়তুল মালে জমা করিয়া দিব।

ইহাতে চল্লিশ আউকিয়া ন্যূন পরিমাণ বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বর্ণনাটি منقطع বিচ্ছিন্ন সনদ সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। অবশ্য মসরুক হইতে 'মুত্তাসিল' সূত্রে এই বর্ণনাটি-ই বর্ণিত হইয়াছে। মুহাদ্দিস সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন তাঁহার 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেনঃ

إِنَّ صَدَاقَ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا كَانَ أَرْبَعَ مِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ

হযরত ফাতিমার মহরানা ধার্য করা হইয়াছিল চার শত মিসকাল রৌপ্য।

কিন্তু ইবনুল হুমাম উল্লেখ করিয়াছেনঃ

إِنَّ صَدَاقَ فَاطِمَةَ كَانَ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ

হযরত ফাতিমা (রা)-এর মহরানা চার শত দিরহাম ছিল।

কাজেই প্রথমোক্ত কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে হযরত আলী (রা) ফাতিমার মহরানা বাবত তাহার একটি বর্ম দিয়াছিলেন। উহা বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া গিয়াছিল তাহাই ছিল হযরত ফাতিমার মহরানা। (مرقات، تحفة الاحوذى، تفسير القرطبى)

ন্যূন পরিমাণ মহরানা

ন্যূন পরিমাণ মহরানা সম্পর্কে বহু কয়টি হাদীস বর্ণিত ও গ্রন্থ সমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। একটি হাদীসঃ

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ مَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ দশ দিরহামের কমে কোন মহরানা নাই।

ব্যাখ্যা আল্লামা আবু বকর আল জাসসাস, হানাফী এই হাদীসের ভিত্তিতে বলিয়াছেন, মহরানার ন্যূনতম পরিমাণ দশ দিরহাম। দশ দিরহামের কম পরিমাণে মহরানা ধার্য হইলে বিবাহ সহীহ্ হইবে না। তিনি ইহার সমর্থনে উল্লেখ করিয়াছেনঃ

قَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ لاَ مَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

হযরত আলী (রা) বলিয়াছেনঃ দশ দিরহামের কমে কোন মহরানা নাই।

আল্লামা জাসসাস বলিয়াছেন, মহরানা আল্লাহ্র নির্ধারিত হক। কিন্তু উহার পরিমাণটা যে কি, তাহা ইজতিহাদের মাধ্যমে জানা যায় না। উহা জানার উপায় হইল শরীয়াতের জ্ঞান ও ইংগিত। আর ইহার পরিমাণ হইল দশ দিরহাম। এই বিষয়ে অন্তত এতটুকু বলা যায় যে, ইহা শরীয়াতের জ্ঞান ও ইংগিত হইতে জানা গিয়াছে। এইরূপ বলার দৃষ্টান্ত শরীয়াতেই রহিয়াছে। যেমন হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ হায়েযের ন্যূনতম মিয়াদ হইল তিন দিন এবং বেশীর পক্ষে দশ দিন। আর উস্মান ইবনে আবুল আচ আস-সাকাফী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিফাসের মিয়াদ বেশীর পক্ষে চল্লিশ দিন। আর ইহা শরীয়াতের জ্ঞান ও ইংগিত হইতে জানা গিয়াছে। কেননা এইরূপ কখনও চিন্তা ও কল্পনা প্রসূত হইতে পারে না। হযরত আলী (রা)-এর আর একটি বর্ণনা এই রূপঃ

اِذَا قَعَدَ فِىْ اٰخِرِ صَلاَتِهٖ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهٗ

নামাযের শেষে তাশাহ্হুদ পাঠ পরিমাণ সময় বসিয়া থাকিলেই নামায সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

বুঝা গেল, তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার ফরযটির এই সময় পরিমাণ শরীয়াতের জ্ঞান ও ইংগিত হইতে জানা গিয়াছে।

হানাফী মায্হাবের কেহ কেহ দশ দিরহাম মহরানা হওয়ার দলীল এই দিয়াছেন যে, স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ব্যবহার মুবাহ্ হইতে পারে কোন মাল-সম্পদের বিনিময়ে। ফলে এই ব্যাপারটি চোরের হাত কাটার সহিত সদৃশ হইয়া গেল। হাতও একটা অঙ্গ। উহার কর্তন মুবাহ্ হইতে পারে কোন মাল-সম্পদ চুরির কারণে। আর এই সম্পদের মূল্য পরিমাণ ন্যূন পক্ষে দশ দিরহাম। মহরানার ব্যাপারটিও এইরূপ। দ্বিতীয় কথা, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, স্ত্রীর যৌন অঙ্গ সম্ভোগ একজন পুরুষের জন্য মুবাহ্ হইতে পারে বিনিময় মূল্য দেওয়া হইলে। মতবিরোধ শুধু ন্যূনতম পরিমাণ লইয়া। কাজেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে এমন জ্ঞানের ভিত্তিতে যাহা শরীয়াত হইতে উৎসারিত। উহা মুবাহ্ হইবে না যতক্ষণ না উহা জায়েয হওয়ার কোন দলীল পাওয়া যাইবে। এই দলীল হইতেই জানা গিয়াছে দশ দিরহাম। এই পরিমাণটা সর্বসম্মত। এই পরিমাণের কমে মতভেদ রহিয়াছে। (احكام القران للجصاص)

কিন্তু মহরানার ন্যূনতম পরিমাণ পর্যায়ে হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের এই সব যুক্তি-জাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় যখন হাদীস বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হযরত আলী (রা) বর্ণিত এসব হাদীসের বিচার-বিবেচনা করা হয়। হযরত জাবির বর্ণিত যে হাদীসটি দারে কুত্নী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে,

তাহাতে বলা হইয়াছে لَامَهْرَ اَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ 'দশ দিরহামের কমে কোন মহরানা হইতে পারে না'। ইহাকে সনদের দিক দিয়া সহীহ্ মনে করা গেলেও ইহা সেই সব সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী যাহা হইতে ইহার কমেও মহরানা হইতে পারে বলিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু সনদের বিচারে এই হাদীসটি সহীহ্ নয়। কেননা ইহার সনদে মুবাশ্‌শির ইবনে উবাইদ ও হাজ্জাজ ইবনে আরতাত দুইজন বর্ণনাকারীই যয়ীফ। আর হাজ্জাজ 'তাদলীস'[১] করে বলিয়া প্রখ্যাত এবং মুবাশ্‌শির পরিত্যাক্ত—তাহার বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য। ইমাম দারে কুত্‌নী নিজেই ইহা বলিয়াছেন। ইমাম বুখারী বলিয়াছেনঃ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ[২]। ইমাম আহমাদ বলিয়াছেন, তাহার বর্ণিত অপরাপর বর্ণনা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আর হযরত আলী (রা)-এর উপরোদ্ধৃত কথাটি বায়হাকী গ্রন্থে উদ্ধৃত। ইহার সনদে রহিয়াছে দায়ূদ আল-উয়াদী, এই নামটি দুইজন লোককে বুঝায়। একজন দায়ূদ ইবনে জায়দ। সে সর্বসম্মতভাবে যয়ীফ। আর দ্বিতীয় জন দায়ূদ ইবনে আবদুল্লাহ। ইমাম আহমাদ তাহাকে সিকাহ্ ও বিশ্বাস্য বলিয়াছেন বটে; কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ীন হইতে তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন মত বর্ণিত হইয়াছে। বায়হাকী হযরত জাবির (রা) বর্ণিত কথাটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া দিয়াছেন وَهُوَ ضَعِيْفٌ ইহা যয়ীফ হাদীস। হযরত আলী (রা) হইতে উক্ত কথাটি অন্য একটা সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে আবূ খালেদ আল-ওয়াসেতী নামের একজন বর্ণনাকারী আছেন। কিন্তু ইহা একটি দুর্বল সূত্র। ইহাকে দলীল হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে না। যদি একথা বলা হয় যে, বহু কয়টি যয়ীফ হাদীসও মিলিত হইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই যয়ীফ হাদীসগুলি মিলিত হইয়াও এমন পর্যায়ে পৌঁছে না, যাহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে। (আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এই কথার জবাবে বলিয়াছেনঃ যয়ীফ হাদীস যদি এমন সূত্রে বর্ণিত হয় যাহা 'হাসান' হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে দলীল হিসাবে পেশ ও গ্রহণ করা যাইতে পারে) বিশেষত এই দুর্বল হাদীস সমূহের প্রতিপাদ্য যখন বুখারী মুসলিম বর্ণিত সহীহ্তম হাদীসেরও পরিপন্থী, তখনই এইগুলিকে গণনার যোগ্য মনে করা যায় না। দ্বিতীয়ত ন্যূনতম পরিমাণ পর্যায়ে আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ হইতেই ভিন্নতর কথা বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলিয়াছেন, পঞ্চাশ দিরহাম। নখ্য়ী বলিয়াছেন, চল্লিশ দিরহাম। ইবনে শাব্‌রামাতা বলিয়াছেন, পাঁচ দিরহাম। ইমাম বলিয়াছেন, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ....ইত্যাদি। সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন মাত্র দুই দিরহাম মহরানার বদলে। আর আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) মাত্র পাঁচ দিরহাম মহরানায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

কাজেই এই সব বিতর্কে না পড়িয়া সহজ ও সোজা মত এই হইতে পারে যে, বর ও কনে—বরপক্ষ ও কনে পক্ষের পারস্পরিক মতের ভিত্তিতে যে পরিমাণটাই ধার্য হইবে, তাহাই সঠিক মহরানা বিবেচিত হইবে। কয়েকজন প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ এই মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেনঃ

اَلْمَهْرُ عَلٰى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ

সংশ্লিষ্ট লোকেরা পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও শুভেচ্ছার ভিত্তিতে যে পরিমাণটা ধার্য করিবে, তাহাই সঠিক মহরানা।

আহমাদ ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী উদ্ধৃত ও আমের ইবনে রবীয়াতা বর্ণিত হাদীস হইতে দুই জুতাকে মহরানা ধার্য করিলেও বিবাহ সহীহ্ হয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

---

১. তাদলীস—. تدليس হাদীসের বর্ণনাকারী উপরের বর্ণনাকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার নিকট হাদীস শুনিতে পায় নাই, তাহা সত্ত্বেও তাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন ভুলবশতঃ এই কথা মনে করিয়া তাহার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা। অথবা তাহার নিকট হইতে কিছু শুনিয়াছে বটে; কিন্তু যাহা শুনিয়াছে তাহার পরিবর্তে অন্য কিছু তাহার সূত্রে বর্ণনা করা। হাদীস শাস্ত্রে ইহা অত্যন্ত কঠিন ঘৃণ্য কাজ। উস্তাদের নাম বা উপনাম কিংবা গুণ এমন ভাষায় উল্লেখ করা যাহাতে তাঁহাকে চিনিতে পারা না যায়, ইহাও তাদলীস। তবে ইহা প্রথম প্রকারের তুলনায় কতকটা হালকা ধরনের।

২. সিকাহ বর্ণনাকারী অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হাদীসের বিপরীত হাদীস বর্ণনা করে এবং একাকী অত্যন্ত যয়ীফ হাদীস বর্ণনা করিতে অভ্যস্থ।

বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَوَّالٍ وَبَنٰى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ. (ترمذى، مسلم، نسائى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) আমাকে শওয়াল মাসে বিবাহ করিয়াছেন এবং সেই শওয়াল মাসেই আমাকে লইয়া ঘর বাঁধিয়াছেন।

(তিরমিযী, মুসলিম, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ইমাম নববী লিখিয়াছেন, এই হাদীস হইতে জানা যায়, শওয়াল মাসে বিবাহ করা এবং সওয়াল মাসেই নববধু লইয়া বাসর ঘরে প্রবেশ করা উত্তম। যাহারা ইহাকে মুস্তাহাব মনে করেন, তাঁহারা এই হাদীসের ভিত্তিতেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

হযরত আয়েশার (রা) শওয়াল মাসে বিবাহ হওয়া এবং তাঁহাকে লইয়া বাসরঘর সাজানো হউক, ইহাই তিনি চাহিয়াছিলেন ও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ীই ইহা হইয়াছিল। তিনি এইরূপ করিয়া জাহিলিয়াতের সময়ের একটা কুসংস্কার চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। কেননা তখনকার সময়ে শওয়াল মাসে লোকেরা বিবাহ-শাদী করা অমংগলজনক মনে করিত। বিশেষ করিয়া এজন্যও যে, শওয়াল মাস হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস সমূহের একটি। আর হজ্জের মাস সমূহে বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠান করা সাধারণভাবেই ভাল মনে করা হইত না।

বস্তুত ইসলাম যাবতীয় ভিত্তিহীন কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। বিবাহ অনুষ্ঠান, বাসর-ঘর সাজানো ও নববধু লইয়া ঘর বাঁধা ইত্যাদির ব্যাপারে অশিক্ষিত মানুষ সর্বকালেই বিশেষ করিয়া সময়ের ব্যাপারে নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত থাকে। ইসলাম ইহা হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়াছে এবং জানাইয়া দিয়াছে যে, এই সব কাজ বছরের যে কোন দিনে যে কোন মাসে বা যে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইসলামে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য কোন লগ্ন নাই। লগ্ন না হইলে বিবাহ হইবে না এবং লগ্ন চল্লিয়া গেলে বিবাহ হইতে পারিবে না, ইহা কেবল মাত্র মুশরিকদের রীতি, তওহীদ বিশ্বাসীদের নয়। (تحفة الاحوذى، مرقات، نبوى)

বিবাহের খোত্‌বা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ، يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ ثُمَّ تَذْكُرُ حَاجَتَكَ. (مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، حاکم، بیهقی)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) আমাদিগকে 'প্রয়োজন সময়ের ভাষণ' শিক্ষা দিয়াছেন। তাহা এই যে, প্রথমে পড়িতে হইবে (মূলের তরজমা)ঃ 'সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্‌র জন্য তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহি। আমরা সকলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি আমাদের মন ও প্রবৃত্তির সমস্ত দুষ্কৃতি হইতে। আল্লাহ্‌ যাহাকে হেদায়েত দেন, তাহার ভ্রষ্টকারী কেহ নাই। আর তিনি-ই যাহাকে ভ্রষ্ট করেন, তাহার হেদায়েতকারী কেহ নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্‌ ছাড়া কেহ মা'বুদ নাই। আমি এই সাক্ষ্যও দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দাহ্‌ ও রাসূল। অতঃপর তিনটি আয়াত পরপর পড়িতে হইবে। (১) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেমন ভয় তাঁহাকে করা উচিত এবং তোমরা মুসলমান অবস্থা ছাড়া মৃত্যু মুখে পতিত হইও না। (২) হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রব্‌কে, যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তিসত্তা হইতে এবং তাহা হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জুড়ি। আর এই দুই জনের সম্মিলনের ফলে ছড়াইয়া দিয়াছেন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাঁহার দোহাই দিয়া তোমরা পরস্পরের নিকট কিছু চাও এবং রেহেমকে—আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহে তোমাদের পর্যবেক্ষক হইয়া আছেন। (৩) হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং বল সত্য যথার্থ কথা, তাহা হইলে তিনি তোমাদের কাজ কর্ম ভাল কল্যাণময় করিয়া দিবেন এবং তোমাদের

গুনাহ সমূহ মায়াফ করিয়া দিবেন। আর যে লোক আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, সে বিরাট সাফল্য লাভে ধন্য হয়। ইহা পড়ার পর তোমার প্রয়োজনের কথা বল।

(মুসনাদে আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দায়ূদ, নাসায়ী, হাকেম, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ইহা রাসূলে করীম (স)-এর শিক্ষা দেওয়া একটা ভাষণ। হাদীসের মূল ভাষায় ইহাকে خُطْبَةُ الْحَاجَةِ 'প্রয়োজনের ভাষণ' বলা হইয়াছে। বিবাহও মানব সমাজের একটা বিরাট প্রয়োজন। তাই হাদীসে উদ্ধৃত সমস্ত ভাষণটি বিবাহ অনুষ্ঠানকালে পাঠ করার স্থায়ী নিয়ম হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী শু'বা। তিনি আবূ ইস্হাকের নিকট হইতে এই হাদীসটি শুনিয়াছিলেন। তিনি আবূ ইস্হাককে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

هٰذِهِ الْقِصَّةُ فِىْ خُطْبَةِ النِّكَاحِ اَوْ فِىْ غَيْرِهَا ؟

এইসব কথা কি বিবাহ-ভাষণে বলিতে (বা পড়িতে) হইবে? না উহা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গেও পড়া যাইবে?

তিনি জবাবে বলিলেনঃ فِىْ كُلِّ حَاجَةٍ সর্বপ্রকার প্রয়োজন কালেই এই খোত্বা পড়া যাইতে পারে।

তিরমিযী'র বর্ণনায় ইহাকে বলা হইয়াছে اَلتَّشَهُّدُ —সাক্ষ্যদান। সে বর্ণনার শুরুতে বলা হইয়াছে; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলিয়াছেনঃ

عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَلتَّشَهُّدَ فِى الصَّلٰوةِ وَالتَّشَهُّدَ فِى الْحَاجَةِ

রাসূলে করীম (স) আমাদিগকে নামায পড়ার তাশাহ্হুদ এবং প্রয়োজনে পড়ার তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়াছেন।

অতঃপর নামাযের তাশাহ্হুদ হিসাবে আত্তাহিয়্যাতু উদ্ধৃত হইয়াছে এবং প্রয়োজনের তাশাহ্হুদ হিসাবে উপরোক্ত ভাষণটির উল্লেখ হইয়াছে। 'তাশাহ্হুদ' শব্দের অর্থ সাক্ষ্যদান। নামাযের আত্তাহিয়াতুতে এবং উপরোদ্ধৃত ভাষণে যেহেতু আল্লাহ্র তওহীদের ও রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, এই কারণে এই সমস্ত বর্ণনাকে 'তাশাহ্হুদ' বলা হইয়াছে।

বস্তুত ইহা বিবাহে 'ঈজাব' 'কবুল' হওয়াকালীন ভাষণ এবং এই ভাষণ রাসূলে করীম (স) শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব বিশেষ করিয়া বিবাহকালে ইহা পড়া বাঞ্ছনীয়। বায়হাকীর বর্ণনার শুরুতেই স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِّنَ النِّكَاحِ اَوْ غَيْرِ فَلْيَقُلْ الخ

তোমাদের কেহ যখন বিবাহ ইত্যাদি প্রয়োজনে ভাষণ দিতে ইচ্ছা করিবে তখন সে বলিবে

এই ভাষণে পরপর তিনটি আয়াত পড়ার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে ঈমানদার লোকদিগকে দুইটি কথা বলা হইয়াছে। একটি হইল, আল্লাহ্কে ভয় কর—যেমন ভয় আল্লাহ্কে করা উচিত। আল্লাহ্ই স্রষ্টা, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা, জীবন ও মৃত্যুদাতা, অতএব তাঁহাকে সর্বাধিক ভয় করা—প্রতি মুহূর্ত ভয় করিতে থাকা বাঞ্ছনীয়। আর দ্বিতীয় কথা হইল, তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মরিও না। 'মুসলিম' অর্থ বাস্তবভাবে আল্লাহ্র অনুগত, খোদার আইন-বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনকারী। আর মৃত্যু কখন আসিবে তাহা যেহেতু কাহারও জানা নাই। তাই সব সময়ই

আল্লাহ্র অনুগত হইয়া থাকা আবশ্যক, যেন যে মুহূর্তে মৃত্যু আসিবে, সে মুহূর্তে সে 'মুসলিম' হইয়া থাকিতে ও মরিতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে, প্রথমে আল্লাহ্কে ভয় করিতে বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, তিনিই প্রথমে একজন পুরুষ মানুষ বানাইয়া ও তাহা হইতেই তাহার স্ত্রী জুড়ি বানাইয়া মানব বংশের ধারা প্রবাহের সূচনা করিয়া দিয়াছেন এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এই ধারা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আয়াতটির শেষের দিকে পুনরায় আল্লাহ্কে ভয় করিতে বলার সঙ্গে সঙ্গে 'রেহেম' পারস্পরিক রক্ত সম্পর্ককেও ভয় করিতে ও উহার হক্ক আদায় করিতে, উহার মর্যাদা রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে।

তৃতীয় আয়াতটিতেও প্রথমে আল্লাহ্কে ভয় করিতে বলা হইয়াছে এবং জীবনের সমস্ত কাজ সুষ্ঠু সুন্দর ও নির্ভুল করার এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সত্য সঠিক কথা বলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, খোদা ও রাসূলের আনুগত্য করিলেই জীবনের সাফল্য সম্ভব।

এই আয়াত তিনটির মূল কথাগুলি বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিবাহকালীন ভাষণ প্রসঙ্গে এই তিনটি আয়াত পাঠ করিয়া শুনানো এবং বর ও মজলিসে উপস্থিত সমস্ত মানুষকে এই কথাগুলি বুঝাইয়া দেওয়ার গভীর তাৎপর্য এবং সুদূরপ্রসারী শুভ প্রভাব নিহিত রহিয়াছে। বিবাহ অর্থ নূতন পরিবারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। পরস্পর পূর্ব অপরিচিত, ভিন্ন ভিন্ন পরিবার পরিবেশের—পরস্পরের জন্য হারাম দুইটি নারী-পুরুষ এই বিবাহের মাধ্যমেই একত্রিত, পরস্পর পরিচিত, নিবিড় ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের জন্য হালাল হইয়া যায় এই বিবাহের মাধ্যমেই। এই সময় এই কথাগুলি যদি উভয়ের মনে দৃঢ়মূল করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উভয়ের পক্ষে একত্রিত জীবনে ইসলামী আদর্শ পুরাপুরি অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভব ও সহজ হইবে বলিয়া খুব-ই আশা করা যায়। ইসলামী আদর্শের উপর পরিবার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইহা জরুরী। (تحفة الاحوذى، بلوغ الامانى)

বিবাহে এই খোতবা পড়া কি? ইহা না পড়িলে কি বিবাহ হয় না? ইহার জবাবে প্রথমে বলিতে চাই, ফিকাহ্র খুঁটিনাটি প্রশ্ন না তুলিয়া সোজাসুজি চিন্তা করা দরকার, রাসূলে করীম (স) নিজে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন এবং পড়িয়াছেনও। আর ইহাতে যে সব কথা বলা হয়, তাহা মুসলিম নব দম্পতির পক্ষে খুবই প্রেরণাদায়ক ও উদ্বোধক। দ্বিতীয় বলিতে চাই, এই খোতবা পাঠ না করিলে বিবাহ শুদ্ধ হইবে না এমন কথা নয়। রাসূলে করীম (স)ও এই খোতবা ছাড়া বিবাহ পড়াইয়াছেন। বনু সুলাইম বংশের এক ব্যক্তি (নাম অজ্ঞাত) বলিয়াছেনঃ আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আবদুল মুত্তালিব কন্যা আমামাতাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন। فَانْكَحَنِىْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَشَهَّدَ তিনি আমার বিবাহ পড়াইলেন, কিন্তু তাহাতে তাশাহ্হুদ—বিবাহের খোত্‌বা—পড়িলেন না। এই হাদীসটি আবূ দায়ূদ ও বুখারীও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহার মূলসূত্র অজ্ঞাত। ইমাম শাওকানী বলিয়াছেন, মূল বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম জানা না গেলেও বিশেষ দোষ নাই। ইবনে হাজার আল-আসকালানী সহল ইবনে সায়াদ সায়েদীর হাদীস উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেনঃ

وَفِيْهِ اَنَّهُ لاَ يُشْتَرِطُ فِىْ صِحَّةِ الْعَقْدِ تَقَدُّمُ الْخُطْبَةِ

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রথমে খোত্‌বা পড়া বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

অবশ্য জাহেরী মতের ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেনঃ বিবাহের পূর্বে খোত্‌বা পাঠ ওয়াজিব। শাফেয়ী মাযহাবের আবূ আওয়ানাও এই মতই পোষণ করেন। তিনি তাঁহার হাদীস গ্রন্থে একটি শিরোনামা দিয়াছেন এই ভাষায় بَابُ وُجُوْبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ বিবাহের আক্‌দ হওয়ার সময় খোত্‌বা পড়া ওয়াজিব। (فتح البارى، تحفة الاحوذى، بلوغ الامانى)

ইমাম তিরমিযী উপরোদ্ধৃত হাদীসটি লেখার পর লিখিয়াছেনঃ

إِنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

খোতবা ছাড়াও বিবাহ জায়েয—সহীহ। সুফিয়ান সওরী প্রমুখ হাদীস ও ফিকাহবিদগণ এই মত দিয়াছেন। তাহা হইলে এই খোত্‌বা পাঠ মুস্তাহাব মনে করিতে হইবে। (نيل الاوطار)

বিবাহে মুবারকবাদ দেওয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَّاءَ اِنْسَانًا اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ.

(احمد، ترمذى، ابن خزيمة، ابن حبان، ابوداؤد)

হযরত আবূ হুরাইরাতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কোন লোক যখন বিবাহ করিত, তখন নবী করীম (স) সেই লোকের জন্য আন্তরিকভাবে পূর্ণ আনুকূল্য ও সুন্দর সুখের একত্রিত জীবনের জন্য দোয়া করিতেন এবং বলিতেনঃ আল্লাহ্ তোমাকে মুবারক করুন, তোমার উপর বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের দুইজনকে প্রকৃত মহা ও বিপুল কল্যাণের মাধ্যমে একত্রিত রাখুন।

(মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে খুজাইমা, আবূ দায়ূদ, ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা বিবাহ মানব জীবনের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহা যেমন একজনের জীবনের একটা নবতর অধ্যায়ের সূচনা তেমনি ইহা জীবনের ধারাবাহিকতায় একটি মৌলিক মোড়-ও। জীবনের অবিবাহিত অধ্যায় অতিক্রম করার পর ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ। এতদিন পর্যন্ত সে একক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিল। বিবাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই একক জীবনের অবসান হইয়া যৌথ—স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মিলিত জীবন সূচিত হইল। এখন আর সে একা নয়, তাহার হৃদয়-মন ও জীবনের প্রতিটি ব্যাপারের সহিত জড়িত হইয়াছে অন্য একটি মেয়ের জীবন। সে মেয়ে ভিন্ন পরিবার ও পরিবেশ হইতে আসিয়াছে। দুই জনেরই একক জীবন আলাদা আলাদা ধারায় চলিয়া আসিয়াছে। প্রায় সহসাই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত জীবন-নদী এখনই একত্রিত ও সমন্বিত হইয়াছে। এক্ষণে দুইজনের মধ্যে মন-মেজাজের মিল-মিশ ও পূর্ণ সামঞ্জস্য একান্তই অপরিহার্য। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে উভয়ের জীবন শান্তি সুখে মধুময় হইয়া চলিবে। আর যদি কোন একটি দিকেও একবিন্দু ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে চরম দুঃখ লাঞ্ছনা এবং পরিণতিতে দুইটি জীবনের চরম ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। যাহা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

এই অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক চেষ্টার ও সতর্কতার যেমন প্রয়োজন রহিয়াছে, তেমনি পরিপার্শ্বের বিশেষ করিয়া মুরব্বী শ্রেণীর লোকের আন্তরিক দোয়া ও শুভেচ্ছারও একান্তই প্রয়োজন।

বিশ্বমানবতার প্রকৃত কল্যাণকামী হযরত মুহাম্মাদ (স) এই ব্যাপারে যে নীতির প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা হইল, বিবাহের আক্দ হইয়া গেলেই মজলিসে উপস্থিত সকল লোকদের উচিত দম্পতির জন্য দোয়া করা, বর ও কনেকে মুবারক দেওয়া। আলোচ্য হাদীসে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

বলা হইয়াছে, কোন লোক বিবাহ করিলে ও তথায় নবী করীম (স) উপস্থিত থাকিলে তাৎক্ষণিকভাবে বরকে তিনি বর-কনের আনুকূল্যপূর্ণ জীবনের জন্য দোয়া করিতেন। আর মুখে বলিতেনঃ আল্লাহ তোমাকে মুবারক-বরকত ও কল্যাণপূর্ণ করুন, আল্লাহ্ তোমার উপর বরকত বর্ষণ করুন, পরম গভীর কল্যাণে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা একত্রিত রাখুন।

বস্তুত দোয়ার একটা দিক সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট। আর আল্লাহ্ এক মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণের জন্য অপর মুসলিম ভাইয়ের নিঃস্বার্থ দোয়া কবুল করেন। কেননা মানুষের জীবনের সব জটিলতা ও সমস্যার সমাধানকারী তো একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্ই দিতে পারেন কল্যাণ, সুখ ও শান্তি। আল্লাহ্ই যদি না দেন, তাহা হইলে তাহা পাওয়ার কোন আশাই করা যাইতে পারে না।

এই দোয়ার আর একটি দিক শুভেচ্ছা ও সহৃদয়তা। ইহার মূল্য ব্যক্তিগতভাবে বর ও কনের জন্য এবং সামষ্টিকভাবে গোটা সমাজের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

মূলত ইহা ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গীভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহা কার্যকর হওয়া একান্তই জরুরী এবং ইহার প্রতি একবিন্দু উপেক্ষা প্রদর্শন কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। বনু তামীম-এর এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, জাহিলিয়াতের যুগে বিবাহ হইয়া গেলে আমরা বরকে খুব বেশী পুত্র সন্তান হওয়ার জন্য আশির্বাদ করিতাম। কিন্তু রাসূলে করীম (স) উহার পরিবর্তে এই কথা বলিবার শিক্ষা দিয়েছেন যাহা এই হাদীসে বলা হইয়াছে। (سبل السلام شرح بلوغ المرام)

মুয়াত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থে জায়দ ইবনে আসলাম (রা) বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ...... فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ

তোমাদের কেহ যখন (কোন মেয়ে লোক) বিবাহ করিবে, তখন সেই মেয়ে লোকটির কপোল ধারণ করিবে এবং বরকতের জন্য দোয়া করিবে।

ইহা রাসূলে করীম (স)-এর একটা নির্দেশ বিশেষ। তবে এই নির্দেশ প্রধানত স্বামীর পক্ষেই পালনীয়। কেননা স্বামীর পক্ষেই স্ত্রীর কপোল স্পর্শ করা সম্ভব এবং তাহা সম্ভব প্রথম ফুলশয্যার রাত্রে। এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী লিখিয়াছেনঃ هُوَ أَدَبٌ حَسَنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ইসলামের বিশেষজ্ঞ মনীষীদের দৃষ্টিতে ইহা একটি অতীব উত্তম ও সুন্দর আচরণ এবং রীতি। নিকটাত্মীয় মহিলারাও কনেকে এইভাবে বরকতের দোয়া করিতে পারে।

জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা নব বিবাহিত দম্পতিকে বিবাহের সম্বর্ধনা জানাইয়া বলিতঃ 'الرِّفَاءُ وَالْبَنِيْنَ তোমার সুখ হউক, তোমার অনেক পুত্র সন্তান হউক।' কিন্তু নব দম্পতিকে সম্বর্ধনা জানাইবার এই ভাষা ও শব্দ ইসলামে পছন্দ ও গ্রহণ করা হয় নাই। বিশেষতঃ এই ভাষায় ও কথায় কেবলমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ার দোয়া করার রীতি রহিয়াছে। ইহাতে কন্যা সন্তানের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাবধারা প্রকাশিত হয়। আর ইহাই ছিল জাহিলিয়াতের যুগের বিশেষ ভাবধারা। এই কারণে এই বিদ্বেষাত্মক কথা ইসলাম পরিহার করিয়াছে এবং উহার পরিবর্তে ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন কথা বলার শিক্ষাদান করা হইয়াছে। নবী করীম (স) এই দোয়া করার শিক্ষা দিয়াছেনঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ

আল্লাহ্ তোমার জন্য এই বিবাহকে বরকত পূর্ণ করুক, তোমার উপর বরকত বর্ষিত হউক এবং আল্লাহ্ তোমাদের স্বামী-স্ত্রী দুইজনকে পরম ও বিপুল কল্যাণের মধ্যে একত্রিত করিয়া রাখুন।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস হইতে নব বিবাহিতা কন্যাকে সম্বর্ধনা জানাইবার ইসলামী পদ্ধতি জানা যায়। হাদীসটি হইলঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَتْنِيْ اُمِّيْ فَاَدْخَلَتْنِيْ الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ. (بخاری)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) আমাকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর আমার মা আমার নিকট আসিলেন ও আমাকে নির্দিষ্ট একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে ঘরের মধ্যে বহু সংখ্যক আনসার বংশীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ কল্যাণ ও বরকতের উপর প্রতিষ্ঠিত হউক এবং সুদীর্ঘকালীন কল্যাণ হউক।

ইহা হইতে জানা গেল যে, আনসার বংশীয় মহিলারা আরব জাহিলিয়াতে প্রচলিত বিবাহকালীন সংবর্ধনার কথা ও ভাষা পরিহার করিয়া রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী বিবাহকালীন সম্বর্ধনার কথা ও ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহা বলিতেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

একালে আমাদের সমাজে বিবাহকালীন সম্বর্ধনার ভাষা ও কথা এখনও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী চালু হয় নাই। ইসলামের পদ্ধতি হিসাবে তাহা চালু করা মুসলমানদের কর্তব্য। বর-কনেকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য ইহাপেক্ষা উত্তম ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা ও ভাষা—অন্য কিছুই হইতে পারে না।

হাদিয়া-তোহ্ফা ও দান জায়েয

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكِحَتْ عَلٰى صَدَاقٍ اَوْحِبَاءٍ اَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَاكَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ اَعْطِيَهُ وَاَحَقُّ مَايُكْرِمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ اِبْنَتُهُ وَاُخْتُهُ.

(ابوداؤد ،نسائى، ابن ماجه، مسند احمد، بيهقى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে মেয়েই কোন মহরানা কিংবা কোন দান বা অন্যান্য দ্রব্যাদির ভিত্তিতে বিবাহিত হইবে বিবাহ-বন্ধন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে, তাহা সবই সেই মেয়ের হইবে। আর যাহা বিবাহ বন্ধন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দেওয়া হইবে। তাহা সে পাইবে, যাহাকে সেই জিনিস দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তি তাহার কন্যা বা বোন হওয়ার কারণে সম্মানিত হইবার অধিক অধিকারী। আবূ দায়ূদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে যে বক্তব্য রাখা হইয়াছে তাহা মোটামুটিভাবে এই যে, কোন মেয়ের বিবাহের কথা-বার্তা পাকাপাকি হইয়া গেলে এবং তাহার মহরানাও নির্দিষ্ট হইলে তখন বর পক্ষ হইতে যাহা কিছু দেওয়া হইবে, তাহা মহরানা বাবদ হউক কিংবা নিছক দান হউক বা এই দান পর্যায়ের অন্য যে কোন জিনিসই দেওয়া হইবে, তাহা সবই সেই মেয়ে পাইবে, যে মেয়ের বিবাহের কথাবার্তা চূড়ান্ত হইয়াছে। ইহা বিবাহ বন্ধন হইয়া যাওয়ার পূর্বকার বিষয়ে কথা।

আর বিবাহের আক্দ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জামাতার পক্ষ হইতে শ্বশুর বাড়ীতে বিশেষ হাদিয়া তোহ্ফা যাহা আসিবে, তাহা সেই লোক পাইবে, যাহার যাহার জন্য আসিবে। অর্থাৎ বিবাহের আক্দ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাহারও সাথে যেহেতু পুরুষটির কোন আত্মীয়তা থাকে না, সম্পর্ক থাকে শুধু এতটুকু যে, এই মেয়েকে সে বিবাহ করিবে বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব বিবাহের আক্দ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে যদি কিছু হাদিয়া-তোহফা দেয় তবে তাহা সেই মেয়ের জন্যই দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এবং যাহা দেওয়া হইবে তাহা সে-ই পাইবে। অন্য কাহারও তাহাতে কোন অংশ নাই।

কিন্তু আক্দ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেই মেয়ে ছাড়াও মেয়ের বাবা বা মেয়ের ভাই বোনও জামাতার নিকট সম্মান বা হাদিয়া তোহ্ফা পাওয়ার অধিকারী হইয়া যায়। তখন কেবল স্ত্রীকেই সব কিছু দেওয়া উচিত নয়। বরং মেয়ে যে পিতার সন্তান সে পিতাও সম্মান পাওয়ার যোগ্য। যে ভাইর সে বোন, কিংবা যে বোনের সে বোন, সেও হাদিয়া তোহফা পাইতে পারে। জামাতার উচিত তাহাদিগকেও হাদিয়া তোহফা দিয়া সম্মানিত করা। উমর ইবনে আবদুল আজীজ, সওরী, আবূ উবাইদ, মালিক প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ বলিয়াছেন, বিবাহের আক্দ হওয়ার পূর্বেও যদি কাহারও জন্য কোন হাদিয়া-তোহ্ফা প্রস্তাবিত বরের পক্ষ হইতে আসে তবে তাহা গ্রহণ

করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ জায়েয হইবে। ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, আক্দ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কনে ছাড়া অন্য কাহারও নামে হাদীয়া-তোহ্ফা বরপক্ষ হইতে আসিলে এই নাম নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য হইবে না। মূলত ইহা স্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের সহিত ভাল সম্পর্ক রক্ষা করার পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর পথ-নির্দেশ। এই রূপ হাদিয়া-তোহ্ফা দিলে স্ত্রী এবং তাঁহার পিতা বা ভাই কনে ও বরের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হইবে ইহাই স্বাভাবিক। এইরূপ হাদিয়া তোহ্ফা গ্রহণ করা তাহাদের জন্য হালাল। ইহা কোন নিষিদ্ধ রসম নয়। (بلوغ الامانى، نيل الاوطار)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِىْ خَمِيْلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ اُدُمٍ حَشْوُهَا لِيْفُ الْاِذْخِرِ. (مسند احمد)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) হযরত ফাতিমা (রা) কে বড় পাড়ওয়ালা চাদর, পানি পাত্র, এমন বালিশ বা উপাধান যাহার উপরের খোলটা চামড়া দিয়া তৈরী এবং ভিতরে সুগন্ধি যুক্ত ঘাষ ভর্তি থাকে—বিবাহের জেহায বা যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলেন। (মুসনাদে আহ্মাদ)

ব্যাখ্যা বিবাহ হওয়ার পর কন্যা যখন পিতার বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া স্বামীর বাড়ি চলিয়া যাইতে থাকে, তখন পিতার কর্তব্য হইল মেয়েকে কিছু প্রাথমিক প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ও গার্হস্থ্য সর সামাদি সংগে দিয়া দেওয়া। নবী করীম (স) তাহার কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-কে এই পর্যায়ে কিছু জিনিস দিয়াছিলেন। উপরোক্ত হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর দেওয়া কয়েকটি জিনিসের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। সে জিনিসগুলি হইলঃ একখানি মোটা পাড়ওয়ালা চাদর, একটি পানি-পাত্র এবং বালিশ বা উপাধান।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا زَوَّجَ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهَا بِخَمِيْلَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ اُدُمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَرَّتَيْنِ. (نسائى، ابن ماجه، مسند احمد، حاكم)

রাসূলে করীম (স) যখন হযরত ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ দিলেন, তখন তাঁহার সহিত একটি চাদর, সুগন্ধিযুক্ত ঘাষ ভর্তি চামড়ার খোলের বালিশ, একটি যাঁতা, পানির একটি পাত্র এবং দুইটি পাঁকা মাটির পাত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই বর্ণনায় দুইটি বেশী জিনিসের উল্লেখ আছে। একটি হইল যাঁতা, যাহাতে গম বা চাল বা ডাল পেষা হয়। আর ইহা ছাড়া দুইটি মাটির পাত্র, সম্ভবত রান্না-বান্না করার জন্য।

হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) যখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেনঃ

اَمَا اِنِّىْ لَا اَنْقُصُكِ مِمَّا اَعْطَيْتُ اَخَوَاتِكِ رَحَيَيْنِ وَجَرَّةً وَمِرْفَقَةً مِنْ اُدُمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ

তোমার অন্যান্য দ্বীনী বোনদিগকে যাহা যাহা দেওয়া হইয়াছে আমি তোমাকে তাহা হইতে কিছু মাত্র কম দিব না। আর তাহা হইলঃ যাঁতা, মাটির তৈরী পাত্র এবং ঘাষভর্তি চামড়ার খোলের তৈরী বালিশ।

এই বর্ণনা কয়টি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, দান-জেহাযে চমৎকারিত্ব, চাকচিক্য ও উচ্চমানের বিলাসিতা করা রাসূলে করীম (স)-এর নীতি নয়। তিনি তদানীন্তন সমাজ ও জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী মাঝা মাঝি ধরনের জেহেয দিয়াছিলেন।

কিন্তু এই পর্যায়ে দুইটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথম কথা হইল, রাসূলে করীম (স) এই যাহা কিছু দ্রব্য সামগ্রী দিয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র হযরত ফাতিমা (রা) রুখসত করার বা তুলিয়া দেওয়ার সময়। তাহার কারণও ছিল এবং সে কারণটি এই যে, মদীনা শহরে হযরত আলী (রা)-এর নিজস্ব কোন ঘর-বাড়ি ছিল না। তিনি অর্থশালী লোকও ছিলেন না। বিবাহের পূর্বে তিনি স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে বসবাস করিতেন। বিবাহের পর একটি বাড়ি ভাড়ায় লইয়া তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-কে তুলিয়া নিয়াছিলেন। এই নূতন ঘর বাসোপযোগী বানাইবার জন্যই নবী করীম (স) নিজ হইতে এই জিনিসগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ছিল গার্হস্থ্য জীবনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ মাত্র। ইহা যৌতুক দেওয়ার কোন রসম পালন নয়।

দ্বিতীয়ত নবী করীম (স) হযরত ফাতিমা (রা) ছাড়া তাঁহার অন্যান্য কোন কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার সময় এই ধরনের কোন জিনিসই কিন্তু দেন নাই। কেননা তাহার দ্বিতীয় জামাতা হযরত উসমান (রা) অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত ফাতিমা (রা) কে রাসূলে করীম (স) কর্তৃক কিছু গার্হস্থ্য দ্রব্য দেওয়া হইতে বড়জোর শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, কন্যার বিবাহ কালে কন্যার নূতন ঘর-সংসার চালু করার উদ্দেশ্যে ও প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ স্বরূপ কোন জিনিস সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ হইলে এবং পিতা তাহা সহজে ও কোনরূপ ঋণের বোঝা মাথায় চাপাইয়া লওয়া ছাড়াই দিতে সক্ষম হইলে তাহা দেওয়া জায়েয হইবে। কিন্তু ইহাকে বাধ্যতামূলক রসম হিসাবে চালু করা ও পালন করা আর যাহাই হউক রাসূলে করীম (স)-এর 'সুন্নাত' হইতে পারে না। বর্তমানে মুসলিম সমাজে যে কঠিন যৌতুক প্রথা চাপিয়া বসিয়াছে ইহাকে একটি অবাঞ্ছিত অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই 'রসম' সোজাসুজি প্রতিবেশী মুশরিক হিন্দু সমাজ থেকেই যে আমদানী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বস্তুত দান জেহেয (আজ কালকার যৌতুক) দাবি করিয়া বা চাপ প্রয়োগ করিয়া আদায় করার জিনিস নয়। কন্যাপক্ষ মেয়ের স্বামীর ঘর করিতে যাওয়ার সময় প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজনীয় কোন জিনিস দেওয়াকেই 'জেহেয' বলা হয়।। ইহা পিতার ইচ্ছা, কন্যা-বাৎসল্য ও ক্ষমতা সামর্থ্য অনুপাতেই হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে নিজের ও বর পক্ষের সামাজিক মান-মর্যাদার দিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আসলে ইহা দ্বারা বর ও বরপক্ষের লোকজনকে খুশী করিয়া দেওয়াও একটা লক্ষ্য। তাহাদের সহিত সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় ও গাঢ় করিয়া তোলা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের যৌতুক জোগাড় করিতে গিয়া পিতাকে যদি জমি বা অন্য কোন বিত্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে বা বিক্রয় করিয়া দিতে অথবা ঋণ গ্রহণ করিতে হয় কিংবা বিরাট মূল্যের জেহেয দিতে অক্ষম বলিয়া কোন পিতার কন্যাকে আইবুড়ো ও অবিবাহিতা হইয়া থাকিতে হয়, তবে তাহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। সামাজিক বদ রসমের প্রাবল্যের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তাহাই হইতে দেখা যায়। এই বদরসম যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, মানবতার পক্ষে ততই মঙ্গল।

বস্তুত শরীয়াতের বিচারে এইরূপ বদ রসম সম্পূর্ণ হারাম। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِاِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ. (مسلم، نسائى)

পুরুষটির জন্য একটি শয্যা, তাহার স্ত্রীর জন্য একটি শয্যা, তৃতীয় শয্যা অতিথি-মেহমানের জন্য। আর ইহার উপর চতুর্থ একটি থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই শয়তানের জন্য।

বস্তুত একটি নব দম্পতির জন্য শয্যার দিক দিয়া ইহাই ন্যূনতম প্রয়োজনের মান। ইমাম নববী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ

ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা কিছু হইবে, তাহা সংগ্রহ করা বড় মানুষী, বাহাদুরী, গৌরব-অহংকার প্রদর্শন এবং দুনিয়ার চাকচিক্য ও জাঁকজমকের উপকরণ মাত্র। আর যাহা এই পর্যায়ের প্রয়োজনাতিরিক্ত হইবে, তাহাই শয়তানের প্ররোচনার ফসল মাত্র। কেননা প্রয়োজনাতিরিক্ত বিলাস সামগ্রী দেখিয়া শয়তান সন্তুষ্ট হয়। সেই ইহার প্ররোচনা দেয়, ইহার সৌন্দর্য প্রচার করে এবং এই কাজে সহযোগিতা করে।

কাহারও কাহারও মতে রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত কথার বাহ্যিক অর্থই গ্রহণীয়। ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজ-শয্যা ও দ্রব্য সরঞ্জাম পুঞ্জীভূত হইয়া থাকিলে তাহা প্রকৃতপক্ষেই শয়তানের ব্যবহারে আসে। যেমন অন্য হাদীসে বলা হইয়াছে, রাত্রিকালে ঘরের মালিক আল্লাহ্র যিকির না করিলে সে ঘরে শয়তানের বসতি হয়। হাদীসে স্বামী ও স্ত্রীর জন্য দুইটি শয্যার কথা বলিয়া ঘরের লোকসংখ্যানুপাতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি সাধনের প্রয়োজন সম্প্রসারিত হওয়ার দিকেই ইংগিত করা হইয়াছে। এই কথায় এদিকেও ইশারা হইতে পারে যে, স্বামী স্ত্রী যদি এক শয্যায় রাত্রি যাপন না করে, ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় থাকে, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই। এক শয্যায় একত্রে থাকা জরুরী নয় বলিয়াও কেহ কেহ এই হাদীসের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই হাদীসের ভিত্তিতে এইরূপ মত প্রকাশ অত্যন্ত দুর্বল কথা। আসলে এই হাদীসের প্রয়োজন হিসাবে আলাদা শয্যার কথা বলা হইয়াছে। আর একজনের অসুখ বিসুখ হইলে যে এই প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দেয় তাহা সকলেই জানেন। স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করা শরীয়াতের দিক দিয়া ওয়াজিব না হইলেও অন্য এক দলীলের ভিত্তিতে ইহাই সঠিক কাজ। আর তাহা হইল, স্বতন্ত্র শয্যায় শয়নের বিশেষ কোন কারণ না হইলে স্বামী-স্ত্রীর একই শয্যায় রাত্রি যাপন বাঞ্ছনীয় এবং উত্তম। রাসূলে করীম (স) তাহাই করিয়াছেন চিরকাল। তিনি ইহাকে স্ত্রীর হক্ক মনে করিয়াই তাহার সঙ্গে সব সময় একই শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আর একই শয্যায় একত্রে শয়ন করিলেই যে স্বামী-স্ত্রী সঙ্গম হইবে বা হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

অলীমা'র দাওয়াত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (بخاری، ترمذی)

হযরত আনাস ইবেন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহে সোনালী হলুদের চিহ্ন লাগানো ছিল। ইহা দেখিয়া নবী করীম (স) তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে তিনি জানাইলেন যে, তিনি সম্প্রতি আপনার বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তাহাকে কত মহরানা দিলে? তিনি বলিলেনঃ এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ। রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ অলীমা'র দাওয়াত কর—একটি ছাগী দিয়া হইলেও।

(বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা হাদীসটি মোটামুটি তিনটি কথা আলোচনা সাপেক্ষ। প্রথম, সোনালী হলুদের চিহ্ন গায়ে থাকা; দুই, মহরানার পরিমাণ এবং তিন, অলীমা করার নির্দেশ।

এই হাদীসটির মূল ভাষা হইলঃ وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ তাহার দেহে হলুদের চিহ্ন ছিল। অপর এক বর্ণনায় এই স্থলের শব্দ হইলঃ وَ بِهِ رَدْعُ زَعْفَرَانَ অর্থাৎ তাঁহার গায়ে জাফরানের রঙ মাখা ছিল। অন্য একটি বর্ণনায় এখানকার ভাষা হইল وَضَرُ صُفْرَةٍ অর্থাৎ এক প্রকার সুগন্ধি মাখা ছিল। আর একটি বর্ণনার ভাষা এইঃ فَرَأَى عَلَيْهِ بَشَاشَةَ الْعُرُوسِ 'নবী করীম (স) তাঁহার চোখে-মুখে নব বিবাহের হাসি-খুশী ও উৎফুল্লতা দেখিতে পাইলেন। আর তিরমিযীর ভাষা হইলঃ راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة 'নবী করীম (স) আবদুর রহমান ইবনে আউফের (দেহে বা কাপড়ে) হলুদ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। হলুদ চিহ্ন বা জাফ্‌রান মাখা দেখার তাৎপর্য হইল, তাহার শরীরে জাফ্‌রান মাখা কাপড়—যাহা সাধারণত নব বিবাহিত ব্যক্তিরা পরিয়া থাকে—পরিহিত ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেনঃ

إِنَّ مَنْ كَانَ يَنْكِحُ فِي الْإِسْلَامِ يَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِصُفْرَةٍ عَلَامَةَ الْعُرُوسِ وَالسُّرُورِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ بَشَاشَةُ الْعُرُوسِ

যে মুসলমানই বিবাহ করিবে সে যেন সোনালী হলুদ বর্ণ মাখা কাপড় পড়ে। ইহা নব বিবাহ ও তজ্জনিত আনন্দ উৎফুল্লতার বাহ্য লক্ষণ হইবে। তোমরা কি হাদীসের এই বাক্যটি দেখিতে পাওনা, যাহাতে বলা হইয়াছেঃ 'তাঁহার চোখে-মুখে নববিবাহের উৎফুল্লতা প্রতিভাত ছিল।

কেহ কেহ বলিয়াছেনঃ 'নব বিবাহিত ব্যক্তি এই ধরনের কাপড় পরিবে এই উদ্দেশ্যে, যেন লোকেরা তাহার অলীমা'র অনুষ্ঠান করায় ও নব গঠিত পরিবারের ব্যয় বহনে সাহায্য করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ

أَحْسَنُ الْأَلْوَانِ كُلِّهَا الصُّفْرَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ

সমস্ত রঙের মধ্যে সর্বোত্তম রঙ হইল সোনালী হলুদ বর্ণ। কেননা কুরআন মজীদেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ হলুদবর্ণ—উহার রঙ অত্যুজ্জ্বল। উহা দ্রষ্টা ও দর্শককে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করিয়া দেয়।

কুরআনের এ আয়াতটি সূরা আল-বাকারা'র ৬৯ আয়াতাংশ। ইহাতে বলা কথার ভঙ্গী হইতে জানা যায়, মানসিক আনন্দ লাভ হয় হলুদ বা ঘিয়ের রঙে। এই কারণে নবী করীম (স)ও এই রঙটি খুবই পছন্দ করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে নবী করীম (স)-এর পছন্দনীয় রঙ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। জবাবে তিনি বলিয়াছিলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ فَانَا اَصْبِغُ بِهَا وَاُحِبُّهَا

নবী করীম (স) সোনালী হলুদ রঙ মাখিতেন। আমিও উহা মাখি এবং এই রঙ আমি ভালবাসি, পছন্দ করি।

ইবনে আবদুল বার্ জুহরী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ

اِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوْا يَتَخَلَّقُوْنَ وَلَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সোনালী হলুদ রঙ মাখিতেন এবং তাহাতে তাঁহারা কোন দোষ দেখিতে পাইতেন না।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বর্তমানকালে বিবাহের প্রক্কালে বর-কনের গাত্রে হলুদ মাখার যে সাধারণ ও ব্যাপক রেওয়াজ রহিয়াছে তাহা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসা রীতি এবং তাহাতে শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন দোষ নাই।

দায়ূদী বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁহার শ্মশ্রু সোনালী হলুদ বর্ণে রঙীন করিয়া রাখিতেন। ফলে তাঁহার কাপড়-পোষাক এই রঙে রঙীন হইয়া যাইত।

হযরত উমর (রা) বলিয়াছেনঃ

اِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَئٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْهَا وَاَنَّهُ كَانَ يَصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى الْعِمَامَةَ

আমি নবী করীম (স)-কে দেখিয়াছি, তিনি এই রঙ মাখিতেন এবং ইহার অপেক্ষা অন্য কোন রঙ তাঁহার অধিক প্রিয় ও পছন্দ ছিল না। তিনি তাঁহার সমস্ত কাপড়—এমন কি তাঁহার পাগড়ীও এই রঙে রঙীন করিয়া রাখিতেন।

আসলে ইহা জাফরানী রঙ সম্পর্কে কথা। উহা ছাড়া আর যে রঙে কোন গন্ধ নাই তাহা মাখা জায়েয হওয়ায় কোন মত-বিরোধ নাই। (شرح الزرقانى على الموطا)

অবশ্য ইবনে সুফিয়ান বলিয়াছেনঃ সোনালী হলুদ বর্ণ কাপড়ে লাগানো জায়েয, দেহে লাগানো জায়েয নয়। ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও তাঁহাদের সঙ্গী-সাগরিদগণ কাপড়ে বা দাড়িতে জাফরানী রঙ ব্যবহার মকরূহ্ মনে করিতেন। তাঁহাদের দলীল হইল হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

পুরুষ মানুষকে জাফরানী রঙ লাগাইতে নবী করীম (স) নিষেধ করিয়াছেন।

প্রখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাকারী আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী লিখিয়াছেনঃ হাদীসের এই বাক্যটির অর্থ হইলঃ

اَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهٖ اَثَرٌ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهٖ مِنْ طِيْبِ الْعُرُوْسِ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের (রা) অবয়বে নব বিবাহ সংক্রান্ত সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহৃত জাফরানের চিহ্ন লাগিয়া ছিল।

অর্থাৎ তিনি এই জাফরানী রঙ নিজে ইচ্ছা করিয়া লাগান নাই। কেননা পুরুষদের এই রঙ ব্যবহার সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর স্পষ্ট নিষেধ সহীহ্ বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে خلوق হলুদবর্ণ সম্বলিত সুগন্ধি ব্যবহারও পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ। কেননা ইহা মেয়েদের ভূষণ। আর পুরুষদিগকে মেয়েদের সহিত সাদৃশ্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে ইহাই আলোচ্য হাদীসের সঠিক তাৎপর্য। কাযী ইয়ায ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এইরূপ অর্থ গ্রহণে এক মত নহেন।

কাযী ইয়ায বলিয়াছেন, বলা হইয়াছে, বরের জন্য এই রঙ ব্যবহার করা জায়েয। আবূ উবাইদ উল্লেখ করিয়াছেনঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُرَخِّصُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ الشَّابِّ اَيَّامَ عُرْسِهٖ

সাহাবায়ে কিরাম (রা) যুবকদের বিবাহ উৎসব কালে এই রঙ ব্যবহার করা জায়েয বলিয়া ঘোষণা করিতেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) আনসার বংশের যে মেয়েটি বিবাহ করিয়াছিলেন, জুবাইর উল্লেখ করিয়াছেন, সে মেয়েটি আবুল হাসান ইবনে রাফে'র কন্যা। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেন كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا ইহার অর্থঃ كَمْ اَعْطَيْتَ صَدَاقَهَا 'তাহাকে মহরানা বাবদ কত দিয়াছ'? জওয়াবে তিনি বলিয়াছিলেনঃ عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنَ الذَّهَبِ 'একদানা ওজনের স্বর্ণ'। মূল কথা একই, ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের পার্থক্য মাত্র। 'একদানা পরিমাণ' বা 'একদানা ওজনের স্বর্ণ' কতটুকু? ইমাম খাত্তাবী বলিয়াছেনঃ نَوَاةٌ এমন একটা ওজন বা পরিমাণ বুঝায় যাহা তদানীন্তন সমাজের সকলেরই জানা ছিল এবং ইহা কাহারও নিকট অপরিচিত ছিলনা। উহার মূল্য পরিমাণ ছিল পাঁচ দিরহাম। ইহাই অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত। তবে ইমাম তিরমিযীর বর্ণনা মতে একদানা পরিমাণ স্বর্ণের ওজন হইল তিন দিরহাম ও এক দিরহামের এক তৃতীয়াংশ। আর ইসহাক বাহ্ওয়াই বলিয়াছেন, ইহার ওজন পাঁচ দিরহাম ও

এক দিরহামের এক তৃতীয়াংশ। বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণের মূল্যে যে পার্থক্য হইয়াছে, তাহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে এই সব কথায়।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল, বিবাহে মহরানা একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কে কত মহরানা ধার্য করিয়াছে বা দিয়াছে তাহাই পারস্পরিক জিজ্ঞাস্য বিষয়। সমাজ প্রধান হিসাবে রাসূলে করীম (সা)-এরও ইহা একটি দায়িত্ব ছিল।

রাসূলে করীম (স) হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর তাঁহাকে নির্দেশ দিলেনঃ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ অলীমা কর—অলীমার জিয়াফতের ব্যবস্থা কর একটি ছাগী দ্বারা হইলেও।

'অলীমা' কাহাকে বলে? আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ

اَلْوَلِيْمَةُ اِسْمٌ لِلطَّعَامِ الَّذِىْ يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ

বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় যে খাবার বা জিয়াফতের আয়োজন ও অনুষ্ঠান করা হয়, তাহারই নাম 'অলীমা'।

ইব্নুল আসীর বলিয়াছেনঃ

اِنَّ الْوَلِيْمَةَ هِىَ الطَّعَامُ فِى الْعُرْسِ خَاصَّةً

বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ খাবার ও জিয়াফতকেই অলীমা বলা হয়।

আল্লামা আজহারী বলিয়াছেন وَلِيْمَة শব্দের মূল হইল اَلْوَلْمُ—ইহার অর্থ اَلْجَمْعُ—'একত্রিত ও সমবেত হওয়া'। এইরূপ নাম করণের কারণ হইলঃ لِاَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَجْتَمِعَانِ 'কেননা স্বামী-স্ত্রী দুইজন একত্রিত হয়'—এই উপলক্ষেই এই জিয়াফতের ব্যবস্থা করা হয়। এই জন্যই ইহার নাম 'অলীমা'।

বস্তুত বিবাহ উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া কিংবা বিবাহান্তে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে দাওয়াত করিয়া খাওয়ানোর জন্য রাসূলে করীম (স) এই নির্দেশ দিয়াছেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ أَعْرَسْتَ 'তুমি কি বিবাহ করিয়াছ'? বলিলেনঃ نَعَمْ 'হ্যাঁ'। জিজ্ঞাসা করিলেনঃ أَوْلَمْتَ 'তুমি কি অলীমা করিয়াছ'? বলিলেনঃ 'না'।

فَرَمَى اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

তখন রাসূলে করীম (সা) একদানা পরিমাণ স্বর্ণ তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেনঃ অলীমা কর—যদি একটি ছাগী দ্বারাও তাহা হয়।

কথার ধরন হইতেই স্পষ্ট হয় যে, একটি ছাগীদ্বারা অলীমার জিয়াফত খাওয়ানো কমসে-কম নিয়ম। অর্থাৎ বেশী কিছু করিতে না পারিলেও অন্তত একটি ছাগী যবেহ্ করিয়া অলীমা খাওয়াইতে হইবে। আর নবী করীম (স) যে একটি স্বর্ণ দানা তাহাকে দিলেন, ইহার তাৎপর্য এই যে, বর বা তাহার অভিভাবক নিজস্ব ব্যয়ে যদি অলীমার জিয়াফতের ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সমাজের লোকদের—অন্ততঃ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মুরব্বী, সমাজপতি সর্বশেষ অবস্থায় সরকারের কর্তব্য হইল তাহার সাহায্য করা। নবী করীম (স) ইহারই পথ-নির্দেশ করিয়াছেন বাস্তব আদর্শ সংস্থাপন করিয়া।

হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেনঃ

مَا أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ نِّسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (بخارى)

রাসূলে করীম (স) তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে জয়নবের বিবাহে যে অলীমা করিয়াছেন সেইরূপ অলীমা অন্য কোন স্ত্রীর বিবাহে করেন নাই। তখন তিনি একটি ছাগী যবেহ্ করিয়া অলীমা করিয়াছেন।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে, হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেনঃ লোকদেরকে আহবান করার জন্য রাসূলে করীম (স) আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে পেট ভরিয়া গোশ্ত রুটি খাওয়াইয়াছিলেন।

বুখারী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

أَوْلَمَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ

নবী করীম (স) তাঁহার কোন কোন স্ত্রীর বিবাহে দুই সের যব-এর রুটি খাওয়ার অলীমা করিয়াছেন।

রাসূলে করীম (স) তাঁহার কোন কোন স্ত্রীকে অধিক মর্যাদা দেওয়ার জন্যই অলীমা খাওয়ানোর এইরূপ পার্থক্য করিয়াছেন, তাহা নয়। বরং বিভিন্ন সময়ের বিবাহ কালে রাসূলে করীম (স)-এর আর্থিক সামর্থ্য কখনও সংকীর্ণ ছিল এবং কখনও প্রশস্ত ছিল, এই কারণেই এই রূপ হইয়াছে।

হযরত বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

مَا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ. (مسند احمد)

হযরত আলী (রা) যখন হযরত ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তখন নবী করীম (স) বলিয়াছিলেনঃ বিবাহে অলীমা করা একান্ত আবশ্যক।

ইবনে হাজার আল আসকালানী বলিয়াছেনঃ প্রথমে উদ্ধৃত মূল হাদীসটির সনদে কোন দোষ নাই। আর এই হাদীসটি একথাও প্রমাণ করে যে, অলীমা করা ওয়াজিব। অবশ্য ইবনে বাত্তাল বলিয়াছেন, অলীমা করাকে কেহ ওয়াজিব বলিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু তিনি জানেন না বলিয়াই তাহা ওয়াজিব হইবে না, এমন কথা নয়। কাহারও অজ্ঞতা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ প্রমাণ করে না। অহ্শী ইবনে হারব্-এর মরফু' হাদীসের ভাষা এইরূপ (طبرانى) اَلْوَلِيْمَةُ حَقٌّ অলীমা সত্য—সপ্রমাণিত। ইহার সহিত বিভিন্ন লোকের হক জড়িত। বস্তুত বিবাহ একটা সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠান। এই সময় বর পক্ষের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এবং কনে পক্ষের নিকটাত্মীয় ও আপনজনের হক বা অধিকার হয় বর পক্ষের নিকট হইতে জিয়াফত খাওয়ার আহবান পাওয়ার। এই হক বা অধিকার অবশ্যই পুরণীয়, পালনীয়। কিন্তু ইবনে বাত্তাল এই হাদীসেরও ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হাদীসের শব্দ حَقٌّ অর্থ 'বাতিল নয়—ভিত্তিহীন নয়'। আর যাহা বাতিল বা ভিত্তিহীন নয়, তাহা বড়জোর 'মুস্তাহাব' হইতে পারে। তাই উহাকে سُنَّةٌ فَضِيْلَةٌ 'একটি মর্যাদাশীল সুন্নাত' বা

'রাসূলের একটি সম্মানযোগ্য রীতি' বলা যাইতে পারে, ওয়াজিব নয়। উপরন্তু উহা সম্প্রতি সৃষ্ট একটি আনন্দমূলক ঘটনা সংশ্লিষ্ট জিয়াফত। ফলে ইহা অন্যান্য সাধারণ দাওয়াত-জিয়াফতের মতই একটি কাজ। (আল মুগ্নী-ইবনে কুদামাহ্) আর ইহা করার জন্য যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পালন করা 'মুস্তাহাব' মাত্র—ওয়াজিব নয়। আর রাসূলে করীম (স)-এর কথা وَلَوْ بِشَاةٍ 'একটি ছাগী দিয়া হইলেও'—ছাগী জবেহ করিয়া অলীমা করা যে ওয়াজিব নয়, ইহা তো সর্ববাদী সম্মত কথা। তবে জমহুর আলেমদের মতে ইহা 'সুন্নাতে মুয়াক্কিদাহ'।

কিন্তু ইহাও সর্বশেষ কথা নয়, কেননা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর উদ্ধৃতি অনুযায়ী, শাফেয়ী মাযহাবের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে ইহা ওয়াজিব। কেননা নবী করীম (স) হযরত আবদুর রহমানকে ইহা করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। আর হযরত আবদুর রহমানকে একটি ছাগী যবেহ করিয়া হইলেও অলীমা করার নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার অর্থ এই নয় যে, অলীমার দাওয়াতে ইহার অধিক কিছু করা যাইবে না। হযরত আবদুর রহমানের আর্থিক অবস্থার বিচারে ইহা ছিল তাঁহার সামর্থের সর্বনিম্ন পরিমাণ ব্যয়। অবশ্য কাহারও কাহারও মতে সদ্য হিজরাতকারী সাহাবীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা বরং সংকটের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এইরূপ বলা হইয়াছে। উত্তরকালে সাহাবীদের আর্থিক অবস্থায় যখন প্রশস্ততা আসে, তখন অলীমা'র ব্যয়-পরিমাণেও প্রশস্ততা আসে।

(عمدة القارى، فتح البارى، تحفة الاحوذى، معالم السنن مشرح الزرقانى على الموطا۔)

অলীমা'র সময়

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ اَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِىْ سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ.

(ترمذی،ابوداؤد، ابن ماجه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ প্রথম দিনের দাওয়াত সত্য, দ্বিতীয় দিনের দাওয়াত সুন্নাত, তৃতীয় দিনের দাওয়াত প্রদর্শনমূলক। আর যে লোক দান ও বদান্যতা ইত্যাদি করিয়া নিজেকে বিখ্যাত করিতে বা গৌরব অহংকার প্রকাশ করিতে চাহিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাকে মিথ্যুক প্রদর্শনকারী লোকদের মধ্যে প্রখ্যাত করিবেন। (তিরমিযী, আবূ দায়ূদ, ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, এই হাদীসটি কেবলমাত্র জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ্র সূত্রেই মরফূ'। ইবনে হাজার আল-আসকালানী বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত হাদীসকে দলীলরূপে গ্রহণ করা যায় না। ইহা ছাড়াও তিনি ইহা আতা'র নিকট শুনিয়াছিলেন এমন সময় যখন তাঁহার স্মৃতি শক্তি প্রখরতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার বর্ণিত হাদীস দলীলরূপে গ্রহণ করিতে এই জন্যই আপত্তি উঠিয়াছে। কিন্তু এই পর্যায়ে ইহাই একক হাদীস নয়। ইহার সমর্থক شَوَاهد আরও হাদীস রহিয়াছে। ফলে এই একই বিষয়ে বর্ণিত বহু কয়টি হাদীসের সমষ্টি একথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এই সব হাদীসের মূল কথা ও প্রতিপাদ্য মোটেই অমূলক ও ভিত্তিহীন নয়। ইহার একটি ভিত্তি থাকা এবং রাসূলে করীম (স) এইরূপ কথা বলিয়াছেন, এইরূপ বিশ্বাস করার যৌক্তিকতা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায়না—ইহাও হাদীস শাস্ত্রেরই সর্বজন স্বীকৃত নীতি।

হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, প্রথম দিনের জিয়াফত হক্। অর্থাৎ একান্তভাবে প্রমাণিত, অনিবার্য কর্তব্য, জরুরী ভিত্তিতে পালনীয়। এক কথায় ওয়াজিব। প্রথম দিন বলিতে বিবাহ হওয়ার দিন। যাঁহারা মনে করেন, অলীমা করা ওয়াজিব বা অন্তত সুন্নাতে মুয়াক্কিদাহ্, ইহা তাহাদের মত। তাঁহারা রাসূলে করীম (স)-এর এই কথা হইতে বুঝিয়াছেন যে, অলীমা করা ওয়াজিব। ইহা তরক করা নিতান্তই অন্যায় ও দোষনীয়। ইহা না করিলে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। যদিও সেজন্য শাস্তি হওয়াটা অনিবার্য বা অবধারিত নয়। আল্লামা আইনী লিখিয়াছেনঃ অলীমা করার উপযুক্ত সময় সম্পর্কে প্রাচীন কাল হইতেই শরীয়াতবিদ্দের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহা কখন করিতে হইবে? বিবাহের আক্দ হওয়ার সময়? কিংবা উহার পর-পরই? অথবা প্রথম মিলন বা বাসর ঘর অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন? না উহার পর অথবা বিবাহের আক্দ হওয়ার সময় হইতে স্বামী-স্ত্রী মিলন ও প্রথম বাসর ঘর উদ্‌যাপনের দিন পর্যন্ত অলীমা করার সময়টি বিস্তীর্ণ ও সম্প্রসারিত—ইহার মধ্যে যে কোন সময় করিলেই চলিবে? ইমাম নববীও এই মত-বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। কাযী ইয়ায বলিয়াছেন, মালিকী মাযহাব মতে স্বামী-স্ত্রী মিলন সংঘটিত হওয়ার পর এই দাওয়াত হওয়া

মুস্তাহাব—অর্থাৎ ইহাই পছন্দনীয় সময়। এই মালিকী মযহাবের অনেকে আবার বিবাহের আকদ্ হওয়ার সময়টিই ঠিক সময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে হুবাইবের মতে হয় আকদ্ হওয়ার সময় করিতে হইবে, নতুবা করিতে হইবে মিলন হওয়ার পর। অন্যত্র বলা হইয়াছে, মিলনের পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ই করা যাইতে পারে। আল্লামা মা-অর্দি বলিয়াছেন, মিলন-সময়ই ঠিক সময়। হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَعلم عُرُوْسًا بِزَيْنَبَ فَدَعَى الْقَوْمَ

রাসূলে করীম (স) জয়নাবের সঙ্গে বাসর রাত্রি উদযাপন করার পর সকাল বেলা লোকদের দাওয়াত করিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায়, অলীমা মিলন হওয়ার পর অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বর্তমান মুসলিম সমাজের রেওয়াজ হইল, বর যাত্রীরা কন্যার পিত্রালয়ে গমন করে কনেকে তুলিয়া আনার জন্য। সেখানে কন্যা পক্ষ হইতে বর পক্ষকে জিয়াফত দেওয়া হয়। পরে কনেকে বাড়ীতে লইয়া আসার দিন কিংবা উহার পর ২-৩ দিনের মধ্যে প্রথম সুযোগেই বর পক্ষ অলীমা'র জিয়াফত করে, ইহা সর্বদিক দিয়া শরীয়াত সম্মত কাজ।

দ্বিতীয় দিনের জিয়াফত সুন্নাত। আবূ দায়ূদে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হইলঃ اَلْوَلِيْمَةُ اَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِىْ مَعْرُوْفٌ বিবাহ উপলক্ষে প্রথম দিনের জিয়াফতটাই অলীমা, দ্বিতীয় দিনের খাওয়ানোটা চলতি রীতি'। অর্থাৎ ইহাতে কোন দোষ নাই। আর তৃতীয় দিনের জিয়াফত খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যমূলক। লোকেরা জানিতে পারে যে, অমুকের বিবাহে পর পর তিন দিন পর্যন্ত লোকদিগকে খাওয়ানো হইয়াছে। সে যে একজন বড় ও নামকরা দানশীল, লোকদিগকে খুব খাওয়ায়, এই সুনাম ও সুখ্যাতি চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে, এই খাওয়ানো ঠিক সেই উদ্দেশ্যে এবং এই উদ্দেশ্য ছাড়া তিন দিন ধরিয়া খাওয়ানোর কোন কারণ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহাকে এই শাস্তিই দিবেন যে, সে মিথ্যাবাদী ও খ্যাতি লোভী বলিয়া চিহ্নিত হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা লোকদিগকে জানাইয়া দিবেন যে, এইলোকটি রিয়াকার, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও সুনাম পাওয়ার অসৎ মতলবে কাজ করিয়াছে—লোকদিগকে খাওয়াইয়াছে। ইহার ফলে লোকদের নিকট সে অকথ্যভাবে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইবে। আল্লামা তাইয়্যেবী বলিয়াছেনঃ

اِذَا اَحْدَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِعَبْدٍ نِعْمَةً حَقٌّ لَهُ اَنْ تُحْدِثَ شُكْرًا وَاسْتَحَبَّ ذٰلِكَ فِى الثَّانِىْ جَبْرًا لِمَا يَقَعُ مِنَ النُّقْصَانِ فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ فَاِنَّ السُّنَّةَ مُكَمِّلَةٌ لِلْوَاجِبِ وَاَمَّا الْيَوْمُ الثَّالِثُ فَلَيْسَ اِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً

আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাহাকেও নিয়ামত দান স্বরূপ ধন-ঐশ্বর্য দেন, তবে সেজন্য তাহার প্রকাশ হওয়া উচিত আল্লাহ্র শোকর স্বরূপ। দ্বিতীয় দিনের খাওয়ানো দ্বারা প্রথম দিনের খাওয়ানোর যে অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। আর সুন্নাত তো সব সময় ওয়াজিবের পূর্ণতা বিধায়ক—পরিপূরক। অতঃপর তৃতীয় দিনেও খাওয়ানো হইলে তাহা নিতান্তই রিয়াকারীমূলক ও খ্যাতিলাভের মতলব প্রসূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব প্রথম দিনে যাহাদিগকে আহবান করা হইবে, তাহাদের সে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। দ্বিতীয় দিনেরও দাওয়াত হইলে তাহা রক্ষা করা সুন্নাত। কিন্তু তৃতীয় দিনেও সে দাওয়াত হইলে তাহা কবুল করা শুধু মকরূহ নয়—হারাম।

মুল্লা আলী আল-কারী লিখিয়াছেন, মালিকী মাযহাবের লোকদের অলীমার দাওয়াত ক্রমাগত সাত দিন পর্যন্ত কবুল করা মুস্তাহাব। কিন্তু আলোচ্য হাদীস এই কথার প্রতিবাদ করে। এই উক্তি সম্পর্কে বক্তব্য হইল, মালিকী মাযহাবের লোকদের এই মতটি নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়। হাফসা বিন্‌তে শিরীন বলিয়াছেনঃ

لَمَّا تَزَوَّجَ اَبِىْ دَعَا الصَّحَابَةَ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَنْصَارِ دَعَا اُبَىَّ اِبْنَ كَعْبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَغَيْرَهُمَا فَكَانَ اَبِىْ صَائِمًا فَلَمَّا طَعِمُوْا دَعَا اَبِىْ وَاَثْنٰى.

(بيهقى، ابن ابى شيبه)

আমার পিতা যখন বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সাতদিন পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) কে জিয়াফত খাওয়াইয়াছেন। যে দিন আনসারগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, সে দিন হযরত উবাই ইবনে কায়াব ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) কে আহবান করিলেন। এইদিন আমার পিতা রোযাদার ছিলেন। উপস্থিত লোকেরা যখন খাওয়া দাওয়া সমাপ্ত করিলেন, তখন আমার পিতা দোয়া করিলেন ও আল্লাহ্‌র হামদ-সানা করিলেন।

আবদুর রাজ্জাক উদ্ধৃত এই বর্ণনাটিতে তিন দিনের পরিবর্তে সাত দিনের উল্লেখ হইয়াছে। সম্ভবত এই বর্ণনাটিই মালিকী মাযহাবের লোকদের উপরোক্ত মতের ভিত্তি। (ফতহুল বারী) ইমাম বুখারীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বুখারী শরীফে এ পর্যায়ের হাদীস সমূহের শিরোনামায় দিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

بَابُ حَقِّ اِجَابَةِ الْوَلِيْمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ اَوْلَمَ بِسَبْعَةِ اَيَّامٍ وَنَحْوَهُ

অলীমার দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য এবং সাত দিন বা এই রকম সময় পর্যন্ত অলীমা করা সম্পর্কিত অধ্যায়।

সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, অলীমা একদিন করা হইবে কি দুইদিন এমন নির্দিষ্ট করা কোন কথা নবী করীম (স) বলেন নাই। ইহাতে আলোচ্য হাদীসটির যায়ীফ হওয়ার ইংগিত থাকিলেও যেহেতু এই পর্যায়ে বহু কয়টি হাদীস বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই জন্য উহার কোন না কোন ভিত্তি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরা আমল করেন। কাযী ইয়ায বলিয়াছেন, অলীমার জিয়াফত খাওয়ানো এক সপ্তাহকাল চলাটা অপছন্দনীয় নয়। অবশ্য ইহা কেবলমাত্র বিপুল ঐশ্বর্যশালী লোকদের পক্ষেই সম্ভব। তবে সেজন্য অনেকে এই শর্তের উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই সাতদিন পর্যন্ত একই লোকদিগকে না খাওয়াইয়া প্রত্যেক দিন নূতন নূতন লোককে খাওয়াইতে হইবে। একবার যাহারা খাইয়াছে, তাহাদিগকে বার বার খাওয়ানো চলিবে না। আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী আমরা তৃতীয় ও উহার পরবর্তী দিনগুলিতে খাওয়ানো নিষিদ্ধ বলিব শুধু তখন, যদি ইহা অকারণ করা হইবে এবং কেবলমাত্র সুনাম সুখ্যাতি লাভই ইহার উদ্দেশ্য হইবে এবং তাহা যদি হয় বর পক্ষের প্রকৃত আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও—ঋণ করিয়া বা জমি বন্ধক দিয়া ইত্যাদি। (فتح البارى، عمدة القارى، مرقات، نيل الاوطار، تحفة الاحوذى)

অলীমার দাওয়াত কবুল করা

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِئْتُوا الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيتُمْ.

(ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদিগকে যখন দাওয়াত করা হইবে, তখন তোমরা সে দাওয়াতে উপস্থিত হও। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা তিরমিযী উদ্ধৃত এই হাদীসটির মোটামুট অর্থ এই যে, কোন দাওয়াত পাওয়া মাত্র তাহা কবুল করা এবং সেই অনুযায়ী দাওয়াতকারী কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে কিংবা তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে কোন দাওয়াতের কথা নির্দিষ্ট করা না হইলেও ইমাম নববী বলিয়াছেন, এই হাদীসে খাওয়ার দাওয়াতের কথা বলা হইয়াছে। এই কারণে হাদীসবিদ্গণ বলিয়াছেনঃ

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّهُ يَجِبُ الْاِجَابَةُ اِلٰى كُلِّ دَعْوَةٍ مِّنْ عُرْسٍ وَغَيْرِهِ

প্রত্যেক প্রকারের দাওয়াতই কবুল করা ও তদানুযায়ী উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব—তাহা বিবাহের দাওয়াত হউক বা অন্য কিছু, এই হাদীসটি-ই এই কথার দলীল।

মুসলিম শরীফে এই হাদীসটির ভাষা হইলঃ

তোমাদের কেহ যখন অলীমা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হবে, তাহার উচিত তাহাতে উপস্থিত হওয়া।

শাফেয়ী মাযহাবের কোন কোন লোক এই হাদীসের ভিত্তিতেই এই মত গ্রহণ ও প্রকাশ করিয়াছেন যে, দাওয়াত মাত্রই কবুল করা ওয়াজিব, তাহা বিবাহের উপলক্ষে খাওয়ার দাওয়াত হউক কি অন্য কিছুর। ইবনে হাজামের মতে জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীনেরও ইহাই মত। হযরত ইবনে উমর (রা) একজন লোককে খাওয়ার দাওয়াত করিলেন। তিনি বলিলেন اَعْفِنِىْ 'আমাকে মাফ করুন'। ইহা শুনিয়া হযরত ইবনে উমর বলিলেনঃ لَاعَافِيَةَ لَكَ مِنْ هٰذَا فَقُمْ 'না ইহা হইতে আপনার জন্য কোন ক্ষমা নাই—উঠুন, চলুন'। ইবনে সাফওয়ান হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রা) কে দাওয়াত করিলেন। তিনি বলিলেনঃ اِنْ لَمْ تُعْفِنِىْ جِئْتُهُ 'আমাকে আপনি যদি ক্ষমা না-ই করেন, তাহা হইলে আসিব'। অলীমার দাওয়াত সম্পর্কে এই কথা। কিন্তু অলীমার দাওয়াত ছাড়া অন্যান্য দাওয়াতে কবুল করা ও উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব নয় বলিয়া মালিকী, হানাফী, হাম্বলী ও জমহুর শাফেয়ীগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম সারখসী এই ব্যাপারে চূড়ান্ত মত দিয়াছেন এই বলিয়া যে, ইহাতে ইজমা হইয়াছে। ইমাম শাফেয়ীর কথা হইলঃ اِتْيَانُ دَعْوَةِ الْوَلِيْمَةِ حَقٌّ 'অলীমার দাওয়াত গ্রহণ ও তাহাতে উপস্থিত অবশ্য কর্তব্য'। আর অলিমা বলিতে সাধারণত বিবাহের দাওয়াতকেই বুঝায়। আর সাধারণভাবে যে জিয়াফতেই লোকদেরকে আহবান করা হয়, তাহাই অলীমা। কাজেই উহা প্রত্যাখ্যান করা ও উহাতে

না যাওয়ার অধিকার কাহারও নাই। যদি কেহ তাহা প্রত্যাখ্যান করে তবে সে গুনাহগার হইবে কিনা তাহা অবশ্য স্পষ্টভাবে জানা যায় নাই। কিন্তু অলীমার দাওয়াত সম্পর্কে একথা পরিষ্কার যে, তাহা কবুল না করিলে গুনাহগার হইতে হইবে। আর অলীমা বলিলেই তাহা বিবাহ উপলক্ষে খাওয়া বুঝাইবে। ইহা একটি সাধারণ কথা।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ تُدْعٰى لَهَا الاَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ. (بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যে অলীমার দাওয়াতে বাছিয়া বাছিয়া কেবলমাত্র ধনী লোকদিগকে আহবান করা হয় এবং গরীব লোকদিগকে আহবান করা হয় না, সে অলীমার খাবার নিকৃষ্টতম খাবার। আর যে লোক অলীমার দাওয়াত কবুল করে না ও উহাতে যায় না, সে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলেরই নাফরমানী করে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে মোট দুইটি কথা বলা হইয়াছে। একটি হইল অলীমার খাওয়ায় লোকদিগকে দাওয়াত করার নীতি কি হইবে এবং দ্বিতীয় অলীমার দাওয়াত কবুল করা সম্পর্কে।

প্রথম পর্যায়ে বলা হইয়াছে, যে অলীমার জিয়াফতে বাছিয়া বাছিয়া কেবলমাত্র ধনী ও সচ্ছল অবস্থার লোকদিগকে আহবান করা হয়, গরীব লোকদিগকে দাওয়াত করা হয় না, গরীব লোকদের পক্ষে সেখানে 'প্রবেশ নিষেধ', সে অলীমায় যত মূল্যবান খাবারেরই ব্যবস্থা করা হউক না কেন, তাহা নিকৃষ্টতম খাবার। ইহার কারণ এই যে, একেতো ইহা জাহিলিয়াতের রসম ও রেওয়াজ। ইসলামের পূর্বে তদানীন্তন আরব সমাজে এই প্রচলন ছিল যে, ধনী লোকেরা বিরাট-বিরাট ও অতিশয় জাঁকজমক পূর্ণ বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠান করিত এবং অলীমার দাওয়াতে কেবলমাত্র ধনী লোকদিগকেই শরীক হওয়ার জন্য আহবান করা হইত। গরীব লোকদিগকে আদৌ দাওয়াত করা হইত না। এইভাবে কেবল ধনী লোকদিগকে খাওয়ানো ও গরীব লোকদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখা অতিশয় হীন মানসিকতার লক্ষণ। ইহা মানবতার প্রতি চরম অবমাননাও বটে। ইসলাম এই মানসিকতার মূলোৎপাটন করিয়াছে এবং এইরূপ কেবল ধনীদের জন্য অলীমার অনুষ্ঠান করাকে হারাম করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ নীতির দ্বারা নির্বিশেষ শ্রেণীহীন মানব সমাজকে সরাসরি দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এক শ্রেণীর লোক শুধু ধনী। আর এক শ্রেণীর লোক সর্বহারা—গরীব। ধনী শ্রেণীর লোকেরা যাবতীয় আনন্দ-উৎসব নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। তাহাতে সর্বহারা শ্রেণীর লোকদের প্রবেশানুমতি নাই। আর সর্বহারা শ্রেণীর লোকদের পক্ষে যেহেতু এই ধরনের জাঁকজমক পূর্ণ আনন্দ অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয় না, এই কারণে এরূপ শ্রেণী কেন্দ্রিক দাওয়াত অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের মধ্যে খুব তীব্র হইয়া দেখা দেয়। তাহারা স্বাভাবিকভাবেই মনে করিতে শুরু করে, আমরা বুঝি মানুষ নহি। আমাদেরই সম্মুখে এতবড় অলীমার জিয়াফতের অনুষ্ঠান হইয়া গেল। অথচ তাহাতে আমাদিগকে দাওয়াত দেওয়া হইল না কেবলমাত্র এই কারণ যে, আমরা গরীব। ফলে তাহাদের হৃদয়-মনে যে ক্ষোভ দেখা দেয়, তাহাই বিক্ষোভের উদ্ভব করে এবং বিক্ষোভের ও বঞ্চনা-অনুভূতির ফলে তীব্র আক্রোশ ও প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে। ইহার দরুন যে সামষ্টিক অশান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহাকেই বলা হয় শ্রেণী বিদ্বেষ। ইহারই অনিবার্য পরিণতি শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রেণী সংঘর্ষ। আর যে সমাজে একবার এই শ্রেণী বিদ্বেষ ও শ্রেণী সংগ্রাম সূচিত হয়, সে সমাজে চরম ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দেওয়া অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই প্রেক্ষিতেই নিম্নোদ্ধৃত হাদীসটির তাৎপর্য অনুধাবনীয়ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى اِلَيْهِ الشَّبْعَانُ وَ يُحْبَسُ عَنْهُ الْجَيْعَانُ (الطبرانى)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ যে অলীমায় কেবলমাত্র পেট ভরা পরিতৃপ্ত লোকদিগকেই খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় এবং অভুক্ত ক্ষুধার্ত লোকদিগকে তাহাতে শরীক হইতে বাধাগ্রস্ত করা হয়, সেই খাবার অত্যন্ত খারাপ ধরনের—নিকৃষ্টতম খাবার।

বস্তুত মূল খাবারে তো কোন খারাবী বা দোষ প্রবেশ করে নাই। আসল দোষ হইল লোকদিগকে খাওয়ানোর এই নিয়ম ও দৃষ্টিভঙ্গীতে। কেননা ইহা বিদ্বেষমূলক ও বিভেদকারী রসম। তেলা মাথায় তেল ঢালার ও তেলহীন মাথাকে তেল বঞ্চিত রাখার দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গী মানবতার জন্য কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না। দূর অতীত কাল হইতে বর্তমান এবং বর্তমান হইতে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এই হীন ও বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা ও দৃষ্টি ভঙ্গীর বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রাম অভিযান অব্যাহত, অবিশ্রান্ত ও শাশ্বত। কাজেই শুধু অলীমারই নয়, সর্বপ্রকারের দাওয়াতেই ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত দেওয়া কর্তব্য। কেহ সচ্ছল ও ধনী, আর কেহ গরীব কেবল মাত্র এই কারণে প্রথমোক্তদের দাওয়াত দেওয়া ও শেষোক্তদের দাওয়াত না দেওয়ার নীতি বর্বর জাহিলিয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় বলা হইয়াছে, অলীমা'র দাওয়াত পাইলে তাহা কবুল করা ও সে দাওয়াত অনুযায়ী উপস্থিত হওয়া একান্তই কর্তব্য। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসের ভাষা অত্যন্ত তীব্র ও কঠোর। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ দাওয়াত পাইয়া যে তাহা কবুল করে না ও উপস্থিত হয় না, সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করে। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (স) এই সব দাওয়াতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। আর সে কার্যত উহা পালন করে নাই, দাওয়াতে উপস্থিত না হইয়া সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ অমান্য করিয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায়, অলীমা'র দাওয়াত কবুল করা—কথা ও বাস্তব উভয় দিক দিয়াই ওয়াজিব। عصيان. 'নাফরমানী' শব্দটি কেবল ওয়াজিব তরক করা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ওয়াজিব কাজ করা না হইলেই বলা যায়, নাফরমানী করা হইয়াছে। আর ইবনে আবদুল বার্, কাযী ইয়ায ও নববী প্রমুখ হাদীসবিশারদ মনীষীগণ ইহার ওয়াজিব হওয়া বিষয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পর্যায়ের আর একটি হাদীসঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَّأْتِيْهَا وَيُدْعٰى اِلَيْهَا مَنْ يَّاْبَاهَا وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ. (مسلم)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে অলীমার জিয়াফতে সেই লোকদিগকে আসিতে নিষেধ করা যাহারা এই ধরনের দাওয়াতে সাধারণত আসিতে অভ্যস্থ—আসে এবং আহবান জানানো হয় সেই লোকদিগকে, যাহারা উহা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে। আর যে লোক দাওয়াত কবুল করে না, দাওয়াতে উপস্থিত হয় না, সে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করে।

এই হাদীসটি 'মরফূ-মুত্তাসিল' অর্থাৎ রাসূলে করীম (স) এর কথা, সাহাবী কতৃক বর্ণিত এবং সনদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন, সুরক্ষিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বিবাহের অলীমা ও অন্যান্য সকল প্রকারের দাওয়াতই কবুল করিতেন এবং অনেক সময় তিনি রোযাদার হইয়াও তাহাতে উপস্থিত হইতেন। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ (ابوداؤد)

দাওয়াতে উপস্থিত তো হইবে। তাহার পর রোযাদার না হইলে সে খাইবে, আর রোযাদার হইলে যুগল দম্পতির জন্য সে দোয়া করিবে। (نيل الاوطار، تحفة الاحوذى)

স্ত্রীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর দোয়া

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ اَوْ اِشْتَرٰى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَاِذَا اشْتَرٰى الْبَعِيْرَ فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهٖ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. (موطأ مالك)

জায়দ ইবনে আসলাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যখন বিবাহ করে কিংবা কোন দাসী ক্রয় করে তখন (তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের কালে) তাহার মাথার অগ্রভাগের উপর হাত রাখা ও বরকতের জন্য দোয়া করা তাহার কর্তব্য। আর তোমাদের কেহ যখন কোন উট (গরু বা মহিষ) খরীদ করে, তখন উহার চুটে'র উপর হাত রাখিয়া শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাওয়া উচিত। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

ব্যাখ্যা হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালিক হইতে গ্রহীত। জায়দ ইবনে আসলাম সাহাবী নহেন। তিনি একজন তাবেয়ী। তাবেয়ী লোকের সরাসরিভাবে রাসূলের কথা বর্ণনা করা ও যে সাহাবী রাসূলের নিকট এই কথাটি প্রথম শুনিয়াছিলেন তাঁহার নাম উল্লেখ না করাকে اِرْسَال বলা হয় ও এই হাদীসকে বলা হয় مُرْسَل। এই হিসাবে উপরোদ্ধৃত হাদীসটি 'মুরসাল'। ইবনে আবদুল বার্ বলিয়াছেন, আম্বাসা ইবনে আবদুর রহমানও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এই হাদীসের প্রথম বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হিসাবে তাঁহার বর্ণনার সনদ 'মুত্তাছিল'(متصل)। তবে আম্বাসা যয়ীফ বর্ণনাকারী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবূ লাস্আল-খাজায়ী হইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহার ভাষা ইহা হইতে কিছুটা ভিন্নতর। ইবনে মাজাহ উদ্ধৃত 'আমর ইবনে শুয়াইব—তাঁহার পিতা হইতে—তাহার দাদা হইতে—এই সনদে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে اَوْ اِشْتَرٰى جَارِيَةً-এর স্থলে اَوْخَادِمًا উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই কথার অপর একটি বর্ণনার ভাষা এইরূপঃ

اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً اَوِاشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيُسَمِّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

(بخاری، ابوداؤد، ابن ماجه)

তোমাদের কেহ যখন স্ত্রী গ্রহণ (বিবাহ) করে, কিংবা কোন সেবক (দাস) ক্রয় (নিয়োগ) করে, তখন যেন সে তাহার মাথার অগ্রভাগে হাত রাখিয়া মহান আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিয়া বরকতের জন্য দোয়া করে। এই সময় যেন সে বলে, হে আল্লাহ্ আমি ইহার অনিষ্ট দুষ্কৃতি ও যে স্বভাব-প্রকৃতি দিয়া তুমি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছ উহার অনিষ্ঠ ও ক্ষতি হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহি।

রীতি অনুযায়ী একটা হইল ইজাব-কবুল—বিবাহের আক্‌দ। আর একটা হইল স্ত্রীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার। আলোচ্য হাদীসে যে দোয়া করিতে বলা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই স্ত্রীর সহিত নিবিড় নিভৃত একাকীত্বে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ই হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।

বরকতের দোয়া অর্থ, স্ত্রীর কপালের উচ্চ-অগ্রভাগের উপর হাত রাখিয়া এইরূপ দোয়া করাঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهَا وَبَارِكْ عَلَيْهَا

হে আল্লাহ্! আমার জন্য এই স্ত্রীতে বরকত দাও এবং উহার উপরও বরকত বর্ষণ কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনায় দোয়ার ভাষা এইঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. (ابن ماجه،ابوداؤد)

হে আমাদের আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ইহার সার্বিক কল্যাণ পাইতে চাহি এবং তুমি যে মৌল প্রকৃতির উপর উহাকে সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করি। আর আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাহি ইহার সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অনিষ্টকারিতা হইতে এবং তুমি তাহাকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করিয়াছ উহার ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে।

আর যখন উষ্ট্র (গরু, ছাগল, মহিষ) ইত্যাদি খরীদ করিবে, তখন উহার পৃষ্ঠদেশের উচ্চ স্থানে হাত রাখিয়া শয়তানের শয়তানী প্রভাব হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাওয়া উচিত। এই পানাহ্ চাওয়ার কাজটি হইবে তখন যখন খরীদ করা হইয়া যাইবে ও মালিক জন্তুটি ক্রয়কারীর হাতে হস্তান্তরিত করিয়া দিবে। ইহার কারণ এই যে, জন্তু-জানোয়ারের উপর শয়তানের অনেকটা কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র নাম ও 'আয়ূযুবিল্লাহ' উচ্চারিত হয়, তখন শয়তান পালাইয়া যায়। হযরত ইবনে উমরের বর্ণনামতে এইখানেও পূর্বোদ্ধৃত দোয়া পাঠ করিতে বলা হইয়াছে।

বস্তুত স্ত্রীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে উক্তরূপ দোয়া করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা স্ত্রীর কারণেই সাধারণত দাম্পত্য জীবন সুখেরও হয়, হয় দুঃখেরও। অথচ এই স্ত্রীকে লইয়া সারাটি জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। পরবর্তী বংশের ধারা তাহার গর্ভজাত সন্তান হইতেই অগ্রসর হইতে থাকে। সেই বংশের ভাল বা মন্দ হওয়া অনেকখানি স্ত্রীর উপরই নির্ভর করে। (شرح الزرقانى)

নব দম্পতির প্রথম সাক্ষাৎ ও নিভৃত একাকীত্বে প্রথম মিলনকালে নফল নামায পড়ার কথাও একটি হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে। আবূ উমাইদের মুক্ত দাস আবূ সায়ীদ একজন তাবেয়ী। তিনি বলিয়াছেনঃ আমি বিবাহ করিলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবূ যার গিফারী ও হুযাইফা (রা) প্রমুখ সাহাবীগণকে আহবান করিলাম। তখন তাঁহারা আমাকে বলিলেনঃ

اِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِ اللّٰهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهَا ثُمَّ شَانُكَ وَشَانُ اَهْلِكَ. (المصنف ابن شيبه)

তোমার নিভৃত ঘরে তোমার স্ত্রী যখন প্রবেশ করিবে, তখন তুমি দুই রাক্‌আত নামায পড়িবে। অতঃপর তোমার ঘরে যাহা প্রবেশ করিয়াছে উহার কল্যাণ আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর এং উহার

অনিষ্ট হইতে তাঁহার নিকট পানাহ্ চাও। তাহার পর তুমি ও তোমার স্ত্রীর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে।

মনে রাখা আবশ্যক, এই বক্তব্যটি স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর নয়, ইহা সাহাবীগণের কথা। এই হাদীসটির সনদ সহীহ্ বলা হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلٰى زَوْجِهَا يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَتَقُوْمُ مِنْ خَلْفِهِ فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ اَهْلِىْ وَبَارِكْ لِاَهْلِىْ فِىَّ اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْهُمْ مِنِّىْ وَارْزُقْنِىْ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِىْ خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ فِىْ خَيْرٍ.

(ابن ابى شيبه، طبرانى)

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ স্ত্রী যখন তাহার স্বামীর নিভৃত কক্ষে প্রথম প্রবেশ করিবে, তখন স্বামী দাঁড়াইবে এবং স্ত্রী তাহার পিছনে দাঁড়াইবে। অতঃপর দুইজনেই একত্রে দুই রাক্আত (নফল) নামায পড়িবে। আর এই বলিয়া দোয়া করিবে; হে আমাদের আল্লাহ্! আমার পরিবারবর্গে আমাকে বরকত দাও এবং আমাকে বরকত দাও আমার পরিবারবর্গের জন্য। হে আল্লাহ্! আমার মাধ্যমে তুমি তাহাদিগকে রিযিক দাও, আর আমাকে রিযিক দাও তাহাদের মাধ্যমে। হে আল্লাহ্! আমাদিগকে তুমি যতক্ষণ একত্রিত রাখিবে, কল্যাণের মধ্যে রাখিও। আর যখন তুমিই বিচ্ছিন্ন করিবে, তখনও কল্যাণের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন করিও। (ইবনে আবূ শাইবাহ্, তাবারানী)

মুহাদ্দিসদের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ্।

এই পর্যায়ে আরও একটি কথা স্মরণীয়। আর তাহা হইল, স্ত্রীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে কনে যেমন সুসজ্জিত থাকে, অনুরূপভাবে পুরুষটিরও উচিত বর হিসাবে যথা সম্ভব সুসজ্জিত হইয়া কনের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া। এই বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি উক্তি উল্লেখ্য। তিনি বলিয়াছেনঃ

اِنِّىْ لَا تَزَيَّنُ لِاَمْرَأَتِىْ كَمَا تَتَزَيَّنُ لِىْ وَمَا اُحِبُّ اَنْ اَسْتَنْظِفَ كُلَّ حَقِّىَ الَّذِىْ لِىْ عَلَيْهَا فَتَسْتَوْجِبُ حَقَّهَا الَّذِىْ لَهَا عَلَىَّ.

(القرطبى)

আমি অবশ্যই আমার স্ত্রীর (সন্তুষ্টির) জন্য সুসাজে সজ্জিত হইব যেমন সে আমার (সন্তুষ্টির) জন্য সুসাজে সজ্জিত হইয়াছে। উপরন্তু তাহার উপর আমার যা কিছু অধিকার আছে তাহা সবই সম্পূর্ণরূপে আমি আদায় করিয়া লইতে চাহি। তাহা হইলে সেও আমার নিকট হইতে তাহার পাওনা সম্পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিয়া লইবে। (কুরতুবী)

নারী প্রকৃতির রহস্য

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِىْ جَارَهُ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلْعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. (بخارى،مسلم،نسائى)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন নবী করীম (স) হইতে, তিনি বলিয়াছেনঃ যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, সে যেন তাহার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় আর তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও। কেননা তাহারা পাঁজড়ের হাড় হইতে সৃষ্ট। আর পাঁজড়ের হাড়ের উচ্চ দিকটাই বেশী বাঁকা। তুমি যদি উহাকে সোজা করিতে যাও, তাহা হইলে উহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। আর উহাকে যদি এমনিই ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে উহা চিরকাল বাঁকা-ই থাকিবে। অতএব তোমরা মেয়েদের প্রতি কল্যাণকামী হও। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে সাধারণভাবে স্ত্রীলোকদের কল্যাণ কামনার কথা বিশেষ তাকীদ সহকারে বলা হইয়াছে, বলা হইয়াছে প্রতিবেশীকে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়ার কথা এবং সর্বোপরি ইহাতে নারী-প্রকৃতি সম্পর্কে এক গভীর সুক্ষ্ম তত্ত্ব কথা বলা হইয়াছে। কথাগুলি বিস্তারিত বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

হাদীসটির সূচনাতেই বলা হইয়াছে, যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সে যেন তাহার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। অন্য কথায় সৃষ্টিলোকের সূচনা কিরূপে হইল, মানুষ কিভাবে অস্তিত্ব ও জীবন লাভ করিল এ বিষয়ে ইসলামের দেওয়া আকীদা বিশ্বাস করিলে সে কখনও প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে পারে না। কেননা, ইসলামের ঘোষণা হইল, কিছুই ছিল না, এক আল্লাহ্ ছাড়া। তিনিই প্রথম নিজ ইচ্ছা ও কুদরাতে এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষকেও তিনিই জীবন ও অস্তিত্ব দিয়াছেন। আর মানুষ হিসাবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একই বংশজাত সন্তান রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সামাজিক জীব হিসাবে। সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতে মানুষ নানা দিকদিয়াই বাধ্য। অতএব মানুষের পাশে মানুষের অবস্থান এক স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ব্যাপার। তাহা সম্ভব হইতে পারে কেবল তখন যদি পাশাপাশি বসবাসকারী লোকেরা পরস্পরকে কোনরূপ কষ্ট ও যন্ত্রণা না দেয়। যদি দেয়, তাহা হইলে ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনিতে পারে নাই। কেননা যদি আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীকে আল্লাহ্র সৃষ্ট ও একই মানব বংশজাত মনে করিয়া তাহাকে ভাই বলিয়া বুকে জড়াইয়া রাখিত, তাহাকে জ্বালা যন্ত্রণা দেওয়ার কোন কাজই সে করিতে পারিত না। তবে প্রতিবেশীকে জ্বালা

যন্ত্রণা দেয় এমন মুসলমান ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ কাফির হইয়া গিয়াছে, এইরূপ ফতোয়া দেওয়া বোধ হয় এই হাদীসের উদ্দেশ্য নয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, এইরূপ ব্যক্তি নিজেকে ঈমানদার দাবি করিলে বুঝিতে হইবে, তাহার যথার্থ বা পূর্ণ ঈমান নাই। ইহা অবশ্য এক ধরনের আকায়েদের ব্যাপার। কিন্তু রাসূলে করীম (স)-এর কথার ভঙ্গী ও ধরন বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে হয় যে, প্রতিবেশীকে জ্বালা যন্ত্রণা দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারটির সহিত ব্যক্তির আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। তাহা না হইলে রাসূলে করীম (স) এইরূপ ভঙ্গীতে কথাটি বলিতেন না। প্রতিবেশীকে জ্বালা যন্ত্রণা দেওয়া সম্পূর্ণ বেঈমানীর কাজ। ইহা পরবর্তী কথার ভূমিকায় মনে করা যাইতে পারে। কেননা পুরুষের জন্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য স্বামী সর্বাধিক নিকটবর্তী প্রতিবেশী। সেই কারণেই ইহার পরবর্তী সব কথাই স্ত্রীলোক সম্পর্ক বলা হইয়াছে। প্রথম কথা, اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ইহার একটি অর্থ, স্ত্রী লোকদের কল্যাণ চাওয়ার ব্যাপারে, হে পুরুষেরা—তোমারা পরস্পরকে উপদেশ দাও। কিন্তু বায়জাবী বলিয়াছেন, এই বাক্যাংশে অর্থঃ

اُوْصِيْكُمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَاقْبَلُوْا وَصِيَّتِىْ فِيْهِنَّ

আমি তোমাদিগকে স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে ভাল উপদেশ দিতেছি, তোমরা তাহাদের ব্যাপারে আমার দেওয়া এই অসিয়াত কবুল কর।

আর তাইয়্যেবী বলিয়াছেনঃ এই বাক্যটির অর্থঃ

اُطْلُبُوا الْوَصِيَّةَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ فِىْ حَقِّهِنَّ بِخَيْرٍ

স্ত্রীলোকদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে তোমরা নিজেদের নিকট হইতেই সৎপরামর্শ লাভ করিতে চেষ্টা কর।

আবার কেহ কেহ এই বাক্যটির অর্থ করিয়াছেনঃ اُطْلُبُوا الْوَصِيَّةَ مِنَ الْمَرِيْضِ لِلنِّسَاءِ 'তোমরা রোগাক্রান্ত মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীদের ব্যাপারে অসীয়াত বা উইল পাইতে চাও।' অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তি তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীদের জন্য অসীয়াত করিয়া যাইতে বল, তাহাকে এই জন্য উদ্বুদ্ধ কর। কেননা স্ত্রীলোকেরা নাজুক, দুর্বল, অসহায়। সহসা স্বামীর মৃত্যু হইয়া গেলে তাহারা অকূল পাথারে পড়িয়া যাইতে পারে ও নানাভাবে তাহাদিগকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেওয়ার ও জীবিকা পাওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র শুরু হইয়া যাইতে পারে।

ইহার আরও একটি অর্থ লিখা হইয়াছে। তাহা হইলঃ

اِقْبَلُوْا وَصِيَّتِىْ فِيْهِنَّ وَاعْمَلُوْا بِهَا وَاصْبِرُوْا عَلَيْهِنَّ وَارْفُقُوْا بِهِنَّ وَاَحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ

তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আমার দেওয়া উপদেশ ও নসীহত গ্রহণ কর, সেই অনুযায়ী আমল কর। তাহাদের ব্যাপারে মোটেই তাড়াহুড়া করিবে না—বিশেষ ধৈর্য তিতিক্ষা ও অপেক্ষা-প্রতীক্ষা অবলম্বন করিও। তাহাদের সহিত খুবই সহৃদয়তাপূর্ণ দয়ার্দ্র এবং নম্র-মসৃণ ব্যবহার গ্রহণ করিবে। আর তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পামূলক আচরণ করিও।

ইহার পর হাদীসে স্ত্রীলোকদের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এ পর্যন্ত বলা কথার কারণ ও যৌক্তিকতা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে। এই পর্যায়ের কথা দুইটি ভাগে বিভক্ত। উহার প্রথম ভাগে বলা হইয়াছেঃ

فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلاَهُ

কেননা স্ত্রীলোক পাঁজড়ের হাড় হইতে সৃষ্টি। আর পাঁজড়ের হাড়ের উপরিভাগটাই অধিক বাঁকা।

অন্য কথায় স্ত্রীলোককে পাঁজড়ের অধিক বাঁকা হাড় দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর অধিক বাঁকা হাঁড়টি হইতেছে সর্বোচ্চের হাড়খানি। এখানে প্রশ্ন উঠে, স্ত্রী লোকদিগকে পাঁজড়ের অধিক বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হইয়াছে রাসূলের এই কথাটির ব্যাখ্যা কি? প্রকৃতই কি পাঁজড়ের অধিক বাঁকা হাড় দিয়া স্ত্রীলোকদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে? (তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে সে হাড় কাহার?) না এই কথাটি দৃষ্টান্তমূলক বা রূপক? স্ত্রীলোকদের স্বভাব প্রকৃতি সাধারণত যে বক্রতা, হঠকারিতা, জিদ ও অনমণীয়তা দেখা যায়, ভাঙ্গিয়া যায়, তবু নতি স্বীকার করে না—এই কথাটি পাঁজড়ের বাঁকা হাড়ের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন? কুরআন হাদীস বিশেষজ্ঞ লোকদের নিকট হইতে এই উভয় পর্যায়ের কথা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেন, হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষেই স্ত্রীলোকদিগকে পাঁজড়ের বাঁকা হাড় দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহার ইতিহাস এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়া যখন জান্নাতে থাকিতে দিলেন, তখন তিনি একাকীত্ব ও সঙ্গীহীনতার কারণে অস্থির চিত্ত হইয়া পড়েন। তিনি নিরুপায় হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট স্বীয় নিঃসঙ্গতার অভিযোগ করেন। পরে তিনি যখন ঘুমাইলেন, তখন স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দরী রমনী দেখিতে পান। নিদ্রাভঙ্গ হইলে জাগ্রতাবস্থায় তিনি তাঁহার পার্শ্বে সেই স্বপ্নে দেখা রমনীকেই বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কে? বলিলেনঃ আমি হাওয়া। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেনঃ لِتَسْكُنَ اِلَىَّ وَ اَسْكُنَ اِلَيْكَ "এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি আমার নিকট শান্তি সুখ স্থিতি লাভ করিবে। আর আমি শান্তি সুখ স্থিতি লাভ করিব তোমার নিকট।"

এই পর্যায়ে তাবেয়ী আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ اٰدَمَ 'হযরত হাওয়া হযরত আদমের পাঁজড়ের হাড় দিয়া সৃষ্ট হইয়াছেন।' আল্লামা জাওহারী বলিয়াছেন; হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে পাঁজড়ের যে হাড় দিয়া উহার নাম اَلْوَاهِنَةُ সর্বনিম্ন হাড়। মুজাহিদ বলিয়াছেনঃ নারীকে নারী বলা হইয়াছে এই কারণে যে, তাহাকে নর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর সে নর ব্যক্তি হইল আদম। মুকাতিল ইবনে সুলাইমান বলিয়াছেনঃ হযরত আদম জান্নাতে কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলেন। তখন তাঁহার ডান পার্শ্বের পাঁজড়ের ছোট হাড়খানি দিয়া হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। এই হাড়খানিকে বলা হয় قُصَيْرٌ। কিন্তু আদম কোনরূপ ব্যথা যন্ত্রণা অনুভব করেন নাই। কেননা তিনি যদি ব্যথাই পাইতেন, তাহা হইলে পুরুষরা স্ত্রীলোকদিগকে কক্ষণই ভালবাসিতে পারিতেন না।

রুবাই ইবনে আনাস বলিয়াছেনঃ হযরত হাওয়া হযরত আদমের (সৃষ্টির পর উদ্বৃত্ত) মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন। তিনি তাঁহার এই কথার দলীল হিসাবে কুরআনের এই আয়াতটি পেশ করিয়াছেনঃ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ 'সেই আল্লাহ্ই তোমাদিগকে মৃত্তিকা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন'। 'তোমাদিগকে' বলিতে পুরুষ ও নারীর সব মানুষই বুঝায়। কিন্তু এই মত সমর্থনীয় নয়। কেননা কুরআন মজীদেরই ঘোষণাঃ

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

সেই আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক মাত্র 'প্রাণী' হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই একটি মাত্র প্রাণী হইতেই তাহার জুড়িকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এ আয়াতে 'একটি মাত্র প্রাণী' হইলেন হযরত আদম এবং তাঁহার জুড়ি বলিতে হযরত হাওয়াকে বুঝানো হইয়াছে। হাওয়াকে সৃষ্টি করা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী হইল خَلَقَ مِنْهَا সেই একটি মাত্র প্রাণী হইতেই (হাওয়াকে) সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হিসাবে রাসূলে করীম (স) আলোচ্য হাদীসের বাণীটুকু কুরআনের এই আয়াতেরই ব্যাখ্যা বলিতে হইবে।

এই ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রাসূলে করীমের আলোচ্য কথাটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হইয়া যায়। ইহা ছাড়া ইহাকে দৃষ্টান্তমূলক কথা মনে করিলেও কোন দোষ নাই। বরং বলিতে হইবে, নারী প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য ইহাপেক্ষা সুন্দর পূর্ণাঙ্গ যথার্থ দৃষ্টান্ত আর কিছু হইতে পারে না। নারী প্রকৃতির বক্রতা বুঝাইবার জন্য ضلع পাঁজড়ের হাড়ের শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা পাঁজড়ের হাড় যে বাঁকা—উহার অগ্রভাগ বেশী বাঁকা, তাহাতো সর্বজনবিদিত। ইহার অর্থঃ

خُلِقْنَ خَلْقًا فِيهِ اِعْوِجَاجٌ فَكَأَنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ اَصْلٍ مُعَوَّجٍ فَلَا يَتَهَيَّأُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِنَّ اِلَّا بِمُدَارَاتِهِنَّ وَالصَّبْرِ عَلَى اِعْوِجَاجِهِنَّ

স্ত্রীলোক এমন এক প্রকৃতিতে সৃষ্ট হইয়াছে যে, সেই মূল সৃষ্টি-প্রকৃতিতেই বক্রতা নিহিত হইয়া আছে। অন্য কথায়, তাহারা বাঁকা মৌল উপাদান দ্বারাই সৃষ্ট। কাজেই উহা দ্বারা কাজ লইতে ও উপকৃত হইতে হইলে তাহারা প্রকৃতিগতভাবে যেমন আছে তেমন রাখিয়া ও তাহা পুরাপুরি পর্যবেক্ষণাধীন রাখিয়া উহাকে প্রয়োগ ও নিয়োগ করিতে হইবে এবং তাহাদের স্বভাবগত বক্রতার ব্যাপারে পুরাপুরি ধৈর্য অবলম্বন করিতে হইবে।

এই প্রেক্ষিতেই দ্বিতীয় ভাগের কথা অনুধাবনীয়। বলা হইয়াছেঃ

فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ

তুমি যদি এই বক্রতাকে সোজা করিতে যাও বা চেষ্টা কর তাহা হইলে তুমি উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর যদি যেমন আছে, তেমনই থাকিতে দাও, তাহা হইলে উহা চিরকালই বাঁকা থাকিবে। এই বাঁকা অবস্থায়ই তোমরা কাজ করিয়া যাইবে।

কথাটি স্পষ্ট। সাধারণত বলা হয়, 'স্বভাব যায় না মইলে'। কয়লার কৃষ্ণত্ব উহার আসল প্রকৃতিগত। সহস্র লক্ষবার ধুইলেও উহা কখনই সাদা বা ধলা হইবে না। রাসূলে করীম (স) এই জন্যই বলিয়াছেনঃ তোমরা যদি শুনিতে পাও একটি পাহাড় স্থানান্তরিত হইয়াছে, তবে তাহা বিশ্বাস করিতে পার। কিন্তু কাহারও স্বভাব বা প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে শুনিতে পাইলে তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিও না।

এতদসত্ত্বেও উহাকে সোজা ও ঋজু করিতে চাহিলে উহার অনিবার্য পরিণতি হইবে উহার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাওয়া। ইহাও পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তেরই জের। চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাওয়া অর্থ তালাক ও চিরবিচ্ছিন্নতার উদ্ভব হওয়া। ইহা ছাড়া অন্য কোন পরিণতি হইতে পারে না নারী প্রকৃতিকে সোজা ও ঋজু করিতে চেষ্টা করার। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত এই হাদীসটির ভাষা হইতে উহা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠে। হাদীসটি এইঃ

فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ اِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

তুমি যদি তাহা দ্বারা সুখ লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাকে তাহার এই স্বভাবগত বক্রতা সহকারেই তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে। আর তুমি যদি এই বক্রতাকে সোজা ও ঋজু করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি তাহাকে চূর্ণ করিয়া দিবে। আর তাহার চূর্ণতা হইল তাহাকে তালাক দিয়া দেওয়া।

অর্থাৎ তোমার সেই চেষ্টা ব্যর্থ ও অসফল হওয়ার কারণে তোমার মন এতই বিরক্ত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে যে, শেষ পর্যন্ত তুমি তাহাকে তালাক না দিয়া পারিবে না।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ مُلاَطِفَةُ النِّسَاءِ وَالْاِحْسَانُ اِلَيْهِنَّ وَالصَّبْرُ عَلٰى عِوَجِ اَخْلاَقِهِنَّ وَاِجْمَالُ ضُعْفِ عُقُوْلِهِنَّ وَكَرَاهَةُ طَلاَقِهِنَّ بِلاَ سَبَبٍ وَاَنَّهُ لاَ يُطْمَعُ بِاسْتِقَامَتِهَا

স্ত্রীলোকদের সহিত সহৃদয়তা ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা, তাহাদের প্রতি কল্যাণময় আচরণ গ্রহণ করা—দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, তাহাদের স্বভাব-চরিত্রের বক্রতার জন্য 'সবর' করা—তাহা দেখিয়া ধৈর্য হারাইয়া না ফেলা, তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধির দুর্বলতা বরদাশ্‌ত করার জন্য স্বামীগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাওয়া হইয়াছে এই হাদীসে এবং বিনা কারণে তাহাদিগকে তালাক দেওয়ার প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, তাহাদের স্বভাবগত বক্রতাকে সোজা করিতে চাওয়া ও চেষ্টা করা উচিত নয়।

ইহাই হাদীসটির সারকথা ও মূল শিক্ষা।

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস স্মরণীয়। হাদীসটি এইঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ. (مسلم، مسند احمد)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ কোন ঈমানদার পুরুষ কোন ঈমানদার মেয়ের প্রতি কোন সর্বাত্মক ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। কেননা সে মেয়েলোকটির চরিত্রের একটি দিক যদি তাহার পছন্দ না-ই হয়, তবুও তাহার চরিত্রের অপর একটি দিক নিশ্চয়ই এমন যাহাতে সে অবশ্যই সন্তুষ্ট হইতে পারিবে। (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা কোন মানুষই নিরংকুশ ও অবিমিশ্রভাবে মন্দ ও ঘৃণ্য হইতে পারে না। তাহার মধ্যে অনেকগুলি খারাপ দিক থাকিলেও কোন কোন দিক নিশ্চয়ই এমন থাকিবে যাহা ভাল বলিয়া মনে করা যাইবে ও পছন্দ হইবে। ইহা সাধারণ লোক-চরিত্র সম্পর্কিত কথা। কিন্তু আলোচ্য হাদীসটির বিশেষ প্রয়োগ হইল স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক জীবনের ক্ষেত্রে। স্বামী হয়ত স্ত্রীর চরিত্রের কোন একটি দিক খুব খারাপ দেখিতে পাইল। আর এমনি চট্‌ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল, এ ভাল নয়, এই স্ত্রী লইয়া ঘর করা যাইবে না, ইহাকে লইয়া আমার জীবন সুখময় হইবে না। আর এই মনোভাবের দরুন তখন-তখনই তাহাকে তালাক দিয়া বসিল। ইহা বস্তুতই শুধু অনুচিতই নয়, ইহা জুলুম, ইহা মানবতার অপমান। কেননা সে যখন ঈমানদার—স্বামী কিংবা স্ত্রী—তখন তাহার মধ্যে মন্দ দিক দুই-একটা থাকিলেও অনেকগুলি দিক তাহার নিশ্চয়ই ভাল থাকিবে। ইহাই স্বাভাবিক। ফলে একদিক দিয়া স্ত্রী কিংবা স্বামী অপছন্দ হইলেও এবং উহার দরুন জীবন অচল ও বিড়ম্বনাময় মনে হইলেও অন্য অনেক

কয়টি দিক দিয়া জীবন মাধুর্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। বিশেষত সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা দুই যুবক-যুবতী যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নূতনভাবে জীবন যাপন করিতে শুরু করে, তখন পরস্পরের ব্যাপারে এইরূপ অবস্থা দেখা দেওয়া—বিশেষ করিয়া বিবাহের পর-পরই ও দাম্পত্য জীবনের সূচনায়ই—কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, অসম্ভবও নয়। তাই নবী করীম (স)-এর এই বাণী এবং এই দৃষ্টিতে ইহার মূল্য অসামান্য। এ কথাটির প্রয়োগ এখানেও যে, স্ত্রীর গায়ের চামড়া উজ্জ্বল কান্তিপূর্ণ নয় দেখিয়া স্বামী যদি হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তবে তাহার চিন্তা করা উচিত যে, হইতে পারে ইহার চামড়া সুশ্রী বা সুন্দর নয়, কিন্তু ইহার হৃদয়-অন্তর ও স্বভাব-চরিত্র তো সুন্দর হইতে পারে; ভাল ভাল গুণ, যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা তাহার থাকিতে পারে। অতএব মনে তাহার প্রতি কোন স্থায়ী বিদ্বেষ ও বিরূপভাব পোষণ করা এবং ইহার ফলে তাহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়া কোন বুদ্ধিমান লোকের কাজ হইতে পারে না। কুরআন মজীদে ঠিক এই কথাটিই বলা হইয়াছে, এই ভাষায়ঃ

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (النساء: ١٩)

তোমরা যদি (তোমাদের) স্ত্রীদের অপছন্দই করিয়া বস, তাহা হইলে নিশ্চিত জানিও, এটা খুবই সম্ভব যে, তোমরা হয়ত কোন একটি জিনিস অপছন্দ করিতেছ, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাতেই বিপুল কল্যাণ রাখিয়া দিয়াছেন।

আল্লামা কুরতুবী এই আয়াতটির তফসীরে উপরোক্ত হাদীসটিই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, এই আয়াতটির তাফসীর যেমন এই হাদীসটির দ্বারা স্পষ্ট হয়, তেমনি এই হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্য এই আয়াতটি অবশ্যই স্মার্তব্য। কুরআন ও হাদীস যে কতখানি ওতোপ্রোত ও পরস্পর জড়িত, তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

(الجامع لاحكام القران للقرطبى، نيل الاوطار)

অতএব নারী জাতির কল্যাণ কামনায় ব্রতী হওয়া সকলেরই কর্তব্য। এই কল্যাণ কামনা প্রসঙ্গে যে সব উপদেশ নসীহত দেওয়া হইয়াছে, তাহা মনে-প্রাণে কবুল করা উচিত। স্ত্রী জাতির এই স্বাভাবিক বক্রতার কথা মনে রাখিয়া দাম্পত্য জীবন শুরু করিলে বিপর্যয় এড়াইয়া নিয়া সুন্দর সহজ ও মধুময় জীবন যাপন সম্ভবপর হইবে। কেননা নারী প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্য ধারণাও না থাকার দরুন স্বামীর দিক হইতে এমন সব আচরণ হয়, যাহার পর বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া পড়ে। অথচ তাহা কখনই কাম্য হইতে পারে না। (عمدة القارى)

এই হাদীসটির আলোকে মানব-প্রকৃতি সহ বিশ্বপ্রকৃতি খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মহান সৃষ্টিকর্তা এই বিশ্বলোককে—ইহার প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকেও একটি কঠিন নিয়মের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেকটি বস্তুকেই দিয়াছেন একটা একান্ত নিজস্ব ও স্বতন্ত্র প্রকৃতি। সে প্রকৃতি সমূলে পরিবর্তন করার সাধ্য কেহরই নাই। বাহ্যিক দিকদিয়া কিছুটা পরিবর্তন আনা সম্ভব হইলেও ইহতে পারে। লবনের লবনাক্ততা ও মধুর তীব্র মিষ্টতা বদলানো যায় না। বদলাইলে তখন লবন লবন থাকিবে না, মধু উহার মাধুর্য হারাইয়া ফেলিবে।

মানুষও একটি মৌলিক প্রকৃতিতে সৃষ্ট। ইহা সাধারণ সর্বমানুষের ক্ষেত্রে। কিন্তু সেই মানুষতো জন্মগতভাবেই দুই লিঙ্গে বিভক্ত পুরুষ ও নারী। পুরুষ তাহার নিজস্ব প্রকৃতি লইয়াই বাঁচিতে পারে। বাঁচিতে পারে, দায়িত্ব পালন করিতে পারে পুরুষ হিসাবে। তাহার পৌরুষ নিঃশেষ করিয়া নারী প্রকৃতিতে সজ্জিত করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে নারীও একটা বিশেষ ও একান্ত নিজস্ব প্রকৃতিতে নারী। তাহার নারীত্ব উৎপাটিত করিয়া তাহাকে পৌরুষে সুশোভিত করিতে চাওয়া শুধু ভুলই নয়, প্রকৃতি পরিপন্থী কাজ। আর প্রকৃতি পরিপন্থী কাজ কখনই সফল হইতে পারে না। এই কথা যেমন পুরুষকে মনে রাখিতে হইবে, তেমনি মনে রাখিতে হইবে নারীকেও। অতএব পুরুষকে পুরুষোচিত কাজ করিবার এবং নারীকে নারীজনোচিত কাজ করিতে দিতে হইবে সমাজ গঠন ও সামাজিক শৃংখলা স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য। অন্যথায় বিপর্যয় অবধারিত হইয়া পড়িবে।

যৌন মিলনের প্রাক্কালীন দোয়া

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتٰى اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنْ قَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ. (ترمذى، بخارى، مسلم، مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যখন তাহার স্ত্রীর নিকট যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে আসে, তখন সে যেন বলেঃ হে আমাদের আল্লাহ্, শয়তানকে আমাদের হইতে দূরে সরাইয়া দাও এবং তুমি আমাদেরকে যে সন্তান রিযিক হিসাবে দান করিবে, তাহার হইতেও শয়তানকে দূরে সরাইয়া রাখ। এই দোয়ার পর যৌন মিলনের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন সন্তান দেন, তাহা হইলে শয়তান তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। (তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা হাদীসটির প্রথম বাক্যের অংশ اِذَا اَتٰى اَهْلَهُ অর্থঃ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّجَامِعَ 'যখন স্ত্রী সঙ্গম করার সংকল্প করিবে ও সেজন্য প্রস্তুত হইবে'। অর্থাৎ উহা শুরু করার পূর্বে রাসূলের শিখানো এই দোয়াটি পাঠ করিবে। মুসলিম ও আবূ দায়ূদের বর্ণনার ভাষা হইতেছে اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاْتِىَ اَهْلَهُ 'যখন স্ত্রীর নিকট সঙ্গম উদ্দেশ্যে যাইবার ইচ্ছা করিবে'। এই বাক্যটি এই পর্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের ব্যাখ্যাকারী। আর সে ব্যাখ্যা এই যে, সঙ্গম কার্য করার সময় নয়, উহার ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণের সময় এই দোয়া পড়িতে হইবে। যেমন কুরআন মজীদের আয়াত وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ 'তুমি যখন কুরআন পড় তখন আয়ূযুবিল্লাহ বল'—ইহার অর্থ হইল, যখন তুমি কুরআন পড়ার ইচ্ছা করিবে বা পড়িতে শুরু করিবে, তখন শুরু করার পূর্বেই আয়ূযুবিল্লাহ বলিবে। হাদীসের এই কথাটিও তেমনি।

হাদীসের বক্তব্য হইল, স্ত্রী সঙ্গম শুরু করার পূর্বে এই দোয়া পড়িলে সঙ্গমের পর যে সন্তান হইবে, শয়তান তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই কথা বলার বিশেষ কারণ এই যে, সন্তান জন্ম হওয়ার পর হইতেই শয়তান তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে, তাহাকে নিজের অনুসারী ও 'চেলা' বানাইবার জন্য চেষ্টা শুরু করিয়া দেয়। কিন্তু এই সন্তানের জন্ম হইয়াছে যে স্বামী-স্ত্রীর যৌন সঙ্গমের ফলে তাহারা যদি উহার পূর্বে এই দোয়া পাঠ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সন্তানের উপর শয়তানের কোন প্রভাব পড়িবে না। সে নেক আমলকারী হইতে পারিবে তাহার নেক আমল করার পথে শয়তান বাধা দান করিতে পারিবে না। মুসলিম শরীফ ও মুসনাদে আহমাদের উদ্ধৃত হাদীসে এখানকার ভাষা হইলঃ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ শয়তান তাহার উপর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না।

আর বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনার ভাষা হইলঃ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ اَبَدًا 'শয়তান কক্ষণ-ই তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না'। 'শয়তান তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না,' এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য কি? ক্ষতি বলিতে কোন্ ধরনের ক্ষতি বুঝানো হইয়াছে? ইহা কি সাধারণ অর্থে? না ইহা বিশেষ কোন ক্ষতির প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে? এই পর্যায়ে হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণ বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন। সেই

সব কিছু মিলাইয়া একত্র করিয়া বলিলে বলা যায়, এইরূপ সঙ্গম কার্যের ফলে জন্ম নেওয়া সন্তানের কোনরূপ ক্ষতিই শয়তান করিতে পারিবে না। না দৈহিক দিক দিয়া, না মানসিক দিক দিয়া, না দ্বীন পালনের দিক দিয়া। অতএব সব পিতা-মাতা—অর্থাৎ সব স্বামী-স্ত্রীরই ইহা কাম্য হওয়া উচিত।

এই দোয়া পাঠ করার পর অনুষ্ঠিত যৌন মিলনের ফলে যে সন্তান হয়, সে সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া যায় যাহাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের চ্যালেঞ্জের জওয়াবে বলিয়াছেনঃ

إِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (الحجر: ٤٢)

আমার বান্দাহ যাহারা, তাহাদের উপর—হে শয়তান তোমার কোন কর্তৃত্ব চলিবে না।

এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় অপর একটি বর্ণনা হইতে। বর্ণনাটি হাসান হইতে বর্ণিত। উহাতে বলা হইয়াছেঃ

فَكَانَتْ يُرْجٰى إِنْ حَمَلَتْ بِهٖ أَنْ يَّكُوْنَ وَلَدًا صَالِحًا (مصنف عبد الرزاق)

এই দোয়া পড়ার পর অনুষ্ঠিত সঙ্গম কার্যের ফলে স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে নেক্কার সন্তান পাওয়ার আশা করা যায়।

এই বর্ণনাটি 'মুরসাল'। কেননা হাসান তো তাবেয়ী। তাহা সত্ত্বেও ইহা নবী করীম (স)-এর কথা নয়—কেহ নিজে চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন, এমন কথা মনে করার কোনই কারণ নাই।

কিন্তু এই দোয়া পাঠের পর ভূমিষ্ঠ সন্তান মা'সুম বা নির্দোষ-নিষ্পাপ হইবে, এমন কথা কিন্তু কোন হাদীসেই বলা হয় নাই, কেননা 'মা'সুম' হওয়ার গুণ কেবল মাত্র নবী-রাসূলগণের। ইহার অধিকার আর কাহারও নাই। নবী-রাসূলগণ মহান আল্লাহ্র পূর্ণ সংরক্ষণ পাইয়া থাকেন। এই কারণে তাঁহারা মানুষ হইয়াও সর্বপ্রকারের গুনাহ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। কিন্তু মানুষ—সে যত বড় ওলী-দরবেশ-পীর হউক না কেন, তাহা নয়।

ইহা হইতে আরও স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, সকল কাজের শুরুতেই যেমন 'বিসমিল্লাহ' বলিতে হইবে, তেমনি স্ত্রী সঙ্গম হওয়ার পূর্বেও ইহা বলা মুস্তাহাব। (تحفة الاحوذى، سبل السلام)

হাদীসে সন্তানকে রিযিক বলা হইয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্ মানুষকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহা সবই তাঁহার দেওয়া রিযিক। মানুষের যাহা কিছুই আছে, তাহা সবই আল্লাহ্র দেওয়া এবং তাহা সবই আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সন্তানও আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক মাত্র। এই রিযিক লাভের উদ্দেশ্য লইয়াই স্ত্রীসঙ্গমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কুরআন মজীদে স্ত্রীকে স্বামীর জন্য ক্ষেত বিশেষ বলা হইয়াছে। চাষী যেমন ফসল ফলাইবার ও ফসল পাওয়ার উদ্দেশ্য লইয়াই জমি চাষ করে, ফসল পাওয়া ছাড়া জমি চাষের মূলে তাহার আর কোন উদ্দেশ্যেই থাকে না। চাষ করিবে, হাড় ভাঙা পরিশ্রম করিবে, অথচ ক্ষেতে ফসল ফলিবে না, চাষী তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। স্বামীরও ঠিক সেই উদ্দেশ্য লইয়াই অর্থাৎ সন্তান পাওয়ার উদ্দেশ্য লইয়া সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া উচিত এবং সন্তান পাওয়া গেলে তাহাকে আল্লাহ্র রিযিক হিসাবেই সাদরে গ্রহণ করা উচিত। এই সন্তানের প্রতি কোনরূপ অনীহা উপেক্ষা বা অসন্তুষ্টি আল্লাহ্র রিযিক দানেরই অবমাননা এবং তাহা আল্লাহ্ কখনই বরদাশত করেন না।

ঋতুবতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُوَا كِلُوْنَهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ فَسَأَلَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَىْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ. (مسلم)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ ইয়াহুদী সমাজে মেয়েলোক যখন ঋতুবতী হয়, তখন তাহারা তাহাদের সহিত একত্রে খাওয়া-দাওয়াও করে না এবং যৌন সঙ্গমও করে না। ইহা জানিয়া নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সময় কুরআন মজীদের এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ 'লোকেরা তোমাকে ঋতুবতী স্ত্রীলোকদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, ইহা একটা রোগ বিশেষ। অতএব তোমরা ঋতুবতী স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাক। নবী করীম (স) নিজে এই প্রসঙ্গে বলিলেনঃ শুধু যৌনসঙ্গম ছাড়া অন্যসব কিছুই করিতে পার। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা স্ত্রীর ঋতু বা হায়য হইলে তাহার সহিত কিরূপ আচরণ কতটা গ্রহণ করা যাইতে পারে, সে সম্পর্কে এই হাদীসে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। প্রথম কথা, ঋতুবতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা যাইবে না। ইহা হাদীসের কথা নয়। ইহা কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের আয়াতে ঋতুবতী স্ত্রী সম্পর্কে বলা হইয়াছে فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ 'ঋতু অবস্থায় পতিত স্ত্রীকে বর্জন বা পরিহার কর।' কিন্তু পরিহার বা বর্জনের ধরন কি এবং সীমা কতদূর, তাহা কুরআন হইতে জানা যায় না—কুরআনে তাহা বলা হয় নাই। তাহা হাদীস হইতে জানা যায়। এই কারণে আলোচ্য হাদীসটি কুরআনের এ আয়াতটির যথার্থ ব্যাখ্যাও। কুরআনের সঠিক অর্থ হাদীসের সাহায্য ব্যতীত যথাযথভাবে বোঝা যায় না, আলোচ্য হাদীসটি এই কথার অকাট্য দলীলও।

তদানীন্তন আরবের ইয়াহুদী সমাজের রীতি এই ছিল যে, তাহারা ঋতুবতী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বয়কট করিত। তাহাদের সহিত একত্রে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা ও একসঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করা পর্যন্ত তাহারা বাদ দিয়া চলিত। শুধু তাহাই নয়, আবূ দায়ূদের বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ اَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ 'ঋতুবতী স্ত্রীকে তাহারা ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিত'। এ বিষয়ে মুসলমানদের করণীয় কি, সাহাবায়ে কিরাম তাহাই জানিতে চাহিয়াছিলেন রাসূলে করীম (স)-এর নিকট। ইহার প্রথম জবাব কুরআন মজীদের আয়াত। আয়াতটিতে প্রথমে ঋতু বা হায়যকে রোগ বা কষ্ট বা আবর্জনা ময়লা পংকিলতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং পরে এই ঋতুবতী মেয়েলোক সম্পর্কে বলা হইয়াছে فَاعْتَزِلُوْا অর্থাৎ عَزل কর। এখানে এই عَزل অর্থ দুই মিলিত জিনিসের সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা কি ইয়াহুদীদের মত করিতে হইবে? ইহার জবাব কুরআনে নাই। আলোচ্য হাদীসটিতে ইহারই জবাবে নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَىْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ 'যৌন সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছুই কর।'

আবূ দায়ূদের বর্ণনার ভাষা এইঃ

فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّؤَاكِلُوْهُنَّ وَيُشَارِبُوْهُنَّ وَاَنْ يَّكُوْنُوْا فِى الْبُيُوْتِ مَعَهُنَّ وَاَنْ يَّفْعَلُوْا كُلَّ شَىْءٍ مَا خَلاَ النِّكَاحَ. (احكام القران لابن العربى)

রাসূলে করীম (স) বলিলেন, তোমরা তাহাদের সহিত ঘরে একত্র বসবাস কর, মেলা-মেশা কর, ছোয়া ছুয়ি কর, ধরাধরি কর, কোলাকুলি কর এবং যৌন সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছুই কর।

এই সব কিছুরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই হাদীসটিরই অপর এক উদ্ধৃতিতে। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ

রাসূলে করীম (স) সাহাবায়ে কিরাম (রা)কে নির্দেশ দিলেন যে, ঋতুবতী স্ত্রীদের সহিত একত্রে পানাহার করিবে, তাহাদের সহিত একই ঘরে বসবাস করিবে এবং যৌন সঙ্গম ছাড়া তাহাদের সহিত আর সব কিছুই করিবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يَضْطَجِعُ مَعِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِىْ وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ

আমি হায়য অবস্থায় থাকিলেও নবী করীম (স) আমার সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করিতেন। আমাদের দুইজনের মাঝে শুধু একখানি কাপড়েরই ব্যবধান থাকিত।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَنْ تَأْتَزِرَ فِىْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

রাসূলে করীম (স)-এর বেগমগণের মধ্যে কেহ ঋতুবতী হইলে তিনি তাঁহাকে হায়যের স্থানে শক্ত করিয়া কাপড় বাঁধিতে বলিতেন এবং তাহাকে লইয়া একত্রে শয়ন করিতেন।

হাদীসের শব্দ يُبَاشِرُهُنَّ হইতে বোঝা যায় যে, এই অবস্থায় স্ত্রীর সহিত কেবলমাত্র সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছুই করা যাইতে পারে।

হারেস কন্যা হযরত মায়মুনা ও উমর ফারুক কন্যা হযরত হাফসা (রা)-রাসূলের দুই বেগম হযরত ইবনে আব্বাসের মুক্তি দেওয়া দাসী বদ্‌রাকে হযরত ইবনে আব্বাসের স্ত্রীর নিকট কোন কাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সে আসিয়া দেখিল, তাহার বিছানা হযরত ইবনে আব্বাসের বিছানা হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে হযরত ইবনে আব্বাসের বেগম বলিলেনঃ اِذَا طَمِثْتُ اَعْتَزِلُ فِرَاشِىْ 'আমি ঋতুবতী হইলে আমার বিছানা আমি আলাদা করিয়া লই ও স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করি।' এই কথা যখন রাসূলের বেগমদ্বয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট বলিয়া পাঠাইলেনঃ

تَقُوْلُ اُمُّكَ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ وَاِنَّهَا حَائِضٌ وَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اِلاَّ ثَوْبٌ مَا يُجَاوِزُ الرُّكْبَتَيْنِ

'তোমার মা'১ বলিতেছেন, তুমি কি রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত পালন হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছ? রাসূলে করীম (স)-এর নিয়ম তো এই ছিল যে, তাঁহার বেগমদের মধ্যে কেহ ঋতুবতী হইলে তিনি তাঁহার সহিত একত্রে শয়ন করিতেন এবং এই দুইজনের মধ্যে একখানা কাপড় ছাড়া পার্থক্য বা বিভেদকারী আর কিছুই থাকিত না। অবশ্য পরণের সেই কাপড় কখনও হাঁটুর উপর উঠিত না।

রাসূলে করীম (স) এক প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলেনঃ

لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُهُ بِأَعْلَاهَا

ঋতুবতী স্ত্রী তাহার পরনের কাপড় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইবে। অতঃপর উপর দিয়া যাহা কিছু করিতে চায় করিতে পারে।

ঋতুবতী স্ত্রীর প্রতি ইয়াহুদীদের আচরণ অমানবিক। আর খৃস্টানদের আচরণ সীমালংঘনকারী—তাহারা যৌন সঙ্গম পর্যন্ত করিত এই অবস্থায়ও। কিন্তু ইসলাম এই সীমালংঘনমূলক আচরণের মাঝে মধ্যম নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

এই সবের ভিত্তিতে জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত হইলঃ

جَوَازُ الْاِسْتِمْتَاعِ بِمَا فَوْقَ الْإِزَارِ دُوْنَ مَا تَحْتَهُ

কাপড়ের উপর দিয়া যত পার সুখ সম্ভোগ ও আনন্দ লাভ কর। কাপড়ের নীচে যাইবে না।

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফেয়ীও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(احكام القران لابن العربى، تفسير القرطبى، بذل المجهود، مرقات)

নারীদের ব্যাপারে সতর্কবাণী

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ. (مسلم)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হযরত নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ পৃথিবী সুমিষ্ট-সুস্বাদু সবুজ-সতেজ। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে এই পৃথিবীতে তাঁহার খলীফা বানাইয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি যেন দেখিতে পারেন তোমরা কিরূপ ও কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা ভয় কর পৃথিবী, ভয় কর নারীদের। কেননা বনী ইসরাইলীদের সমাজে যে প্রথম বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল এই নারীদের লইয়া।

(মুসলিম, বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা এই পৃথিবী সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করা উচিত, পৃথিবীতে মানুষের স্থান 'পজিশন' কি এবং এই পৃথিবীতে মানুষের কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত, উপরোক্ত হাদীসটির মূল বক্তব্য সেই পর্যায়ের। দুনিয়া বাস্তবতার দৃষ্টিতে মানবজীবনে কি রূপ লইয়া দেখা দেয়, এখানে মানুষের জীবনের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং কিরূপ সতর্কতার সহিত এখানে মানুষের জীবন যাপন করা উচিত তাহাই মৌলিকভাবে বলা হইয়াছে এই হাদীসটিতে।

প্রথমতঃ রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, দুনিয়াটা সুমিষ্ট শ্যামল সবুজ সতেজ। মানুষের নিকট ইহা চিরকালই লোভনীয় ও আকর্ষণীয় হইয়া দেখা দেয়। বৈষয়িক সুখ-শান্তি ও স্বাদ সুমিষ্ট ফলের মতই। উহা যেমন মানুষকে প্রলুব্ধ করে, তেমনি উহা মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণও করে অত্যন্ত তীব্রভাবে। মানুষ স্বভাবতই এই সব পাওয়ার জন্য আকুল ও উদগ্র হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ইহা যতই আকর্ষণীয় ও লোভনীয় হউক-না-কেন, উহার আয়ুষ্কাল খুবই সীমাবদ্ধ। খুব অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যায়। ইহাতে স্থায়ীত্ব বলিতে কিছুই নাই। ইহা নয় শাশ্বত বা চিরস্থায়ী। কিন্তু ইহার ক্ষণস্থায়ীত্ব ও প্রতিমুহূর্ত তিলে তিলে অবক্ষয়মানতা মানুষ সাধারণত বুঝিতে পারে না, উপলব্ধীও করিতে পারে না। ফলে মানুষ এক মায়া মরীচিকার পিছনে পাগলপারা হইয়া ছুটিতে থাকে। আর ইহার পরিণাম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কখনই ভাল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এই পৃথিবীর বুকে খলীফার মর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। 'খলীফা' বলা হয় তাহাকে যে প্রকৃত মালিক বা কর্তা হয় না, হয় আসল মালিক ও কর্তার প্রতিনিধি। আসল মালিক ও কর্তার যাবতীয় কাজের কর্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব তাহার উপরই অর্পিত হয়। কিন্তু সে কর্তৃত্ব সে নিজ ইচ্ছামত চালাইতে পারে না, প্রকৃত মালিকের দেওয়া আইন-বিধান ও নিয়ম-নীতি অনুসরণের ভিত্তিতেই সে এই কাজ করিতে বাধ্য। বস্তুত মানুষও এই দুনিয়ার আসল মালিক ও কর্তা নয়। আসল মালিক ও কর্তা মহান আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি মানুষকে এই দুনিয়া পরিচালনার যেমন অধিকার ও সুযোগ দিয়াছেন, তেমনি দিয়াছেন সেই অধিকার

ও সুযোগ ব্যবহারের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক আইন ও বিধান। এই হিসাবেই মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফা। কুরআন মজীদেও আল্লাহ্ তা'আলার মানব-সৃষ্টি পূর্বের ঘোষণা উল্লেখ করা হইয়াছে এই ভাষায় إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 'আমি দুনিয়ায় খলীফা বানাব।'

এই ঘোষণানুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষই ব্যক্তিগতভাবে এবং সমস্ত মানুষ সামষ্টিকভাবে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফাহ্। এই খিলাফত এই দিক দিয়াও যে, প্রত্যেক যুগের মানুষ তাহাদের পূর্ববর্তী যুগের স্থলাভিষিক্ত। আর সামষ্টিকভাবে গোটা মানব জাতি তাহাদের পূর্ববর্তী পৃথিবী-অধিবাসীদের—তাহারা যাহারাই হউক না কেন—স্থলাভিষিক্ত। এই স্থলাভিষিক্ততার মধ্যে এই কথাটিও নিহিত রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের পরবর্তী কালের লোকদের জন্য নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। তখন তাহাদের পরবর্তী লোকেরা তাহাদের স্থানে হইবে আল্লাহ্র খলীফা। এই দুনিয়ায় সর্বযুগের মানুষের প্রকৃত অবস্থান কোথায়, তাহা বুঝাইবার জন্য রাসূলে করীম (স)-এর এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে মানুষের আসল অবস্থানের কথা বলার পর রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ মানুষকে এইভাবে খলীফা বানাইবার মূলে আল্লাহ্ তা'আলার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, তিনি বাস্তবভাবে দেখিতে চাহেন, মানুষেরা কি রকমের কাজ করে—ব্যক্তি হিসাবে এবং সামষ্টিকভাবে। কুরআন মজীদে এই পর্যায়ে বলা হইয়াছেঃ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (ملك : ١)

সেই মহান আল্লাহ্ই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তোমাদের মধ্যে উত্তম কাজ কে করে, তাহা পরীক্ষা করিবেন।

এই পরীক্ষায় সঠিকভাবে উত্তীর্ণ হইবার জন্য আহবান জানাইয়া রাসূলে করীম (স) মানুষকে দুনিয়া এবং নারী সমাজ সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বলিয়াছেন। দুনিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কতাবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন এই জন্য যে, দুনিয়া বাস্তবিকই এমন একটি স্থান যেখানে মানুষ নিজেদের প্রকৃত অবস্থানের কথা ভুলিয়া গিয়া অবাঞ্ছনীয় ও মারাত্মক ধরনের কাজ কর্মে লিপ্ত হইতে পারে। আর এই দুনিয়ায় মানুষের বিভ্রান্তির সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হইতে পারে নারী। কেননা দুনিয়ায় পুরুষের জন্য সর্বাধিক তীব্র আকর্ষণীয় হইতেছে নারী, আর নারীর জন্য পুরুষ। এই আকর্ষণ নারী ও পুরুষকে অবৈধ সংসর্গ ও সংস্পর্শে প্রবৃত্ত করে এবং উভয় উভয়ের নিকট হইতে সর্বাধিক স্বাদ গ্রহণে লালায়িত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই অবস্থাটা মানুষের জন্য কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না। আর ইহা যে কল্যাণকর হইতে পারে না, বনী ইসরাইলীদের বিপর্যয়ের ইতিহাসই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। রাসূলে করীম (স) তাঁহার নারী সংক্রান্ত সতর্কীকরণের যুক্তি হিসাবে সেই ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেনঃ বনী ইসরাইলীরা যে কঠিন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, নারীই ছিল উহার প্রথম কারণ। সেই সমাজের নারীরা তাহাদের পুরুষদেরকে প্রথমে অবৈধ সংসর্গে প্রলুব্ধ করে। তাহার পরই গোটা সমাজের যে পতন ও বিপর্যয় শুরু হয়, তাহারই পরিণতিতে তাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক চরমভাবে অভিশপ্ত হয়। বস্তুত যে সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মিলনের নিয়ন্ত্রণহীন সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, সে সমাজের সর্বাত্মক পতন ও বিপর্যয় কেহই রোধ করিতে পারে না। সমাজ জীবনে সুস্থতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই হাদীসটি দিগদর্শনের কাজ করে। রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি আরও গুরুত্ব সহকারে বলা হইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায়।

সায়ীদ ইবনে জায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

(بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه)

আমার পরে লোকদের মধ্যে পুরুষদের জন্য সর্বাধিক বিপদ মেয়েদের হইতে আসার আশংকাবোধ করিতেছি।

এই হাদীসের فتنة শব্দের অর্থ পরীক্ষার মাধ্যম। ইহার আর এক অর্থ বিপদ, মুছীবত, বিপর্যয়। এই বিপদ-মুছীবত-বিপর্যয়ও পরীক্ষারই উদ্দেশ্যে। বস্তুত নারীরা পুরুষের ঈমান ও চরিত্রের ব্যাপারে একটা বিরাট পরীক্ষা-মাধ্যম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদের স্বভাব প্রকৃতিতেই নারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ সংরক্ষিত করিয়াছেন। এই আকর্ষণের দরুন পুরুষরা জ্বেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে পারে যেমন, তেমনই তাহাদের জন্য পুরুষরা মারা-মারি কাটাকাটি বা পারস্পরিক কঠিন শত্রুতায় লিপ্ত হইতে পারে—হইয়া থাকে। অন্তত নারীরা যে পুরুষদেরকে দুনিয়ার দিকে অধিক আকৃষ্ট করিতে ও হালাল-হারাম নির্বিচারে অর্থ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত করিতে পারে—করিতে থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। আর মানুষের জন্য ইহাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদ আর কিছু হইতে পারে না। রাসূলে করীম (স)-এর কথা بعدى 'আমার পর'—ইহার অর্থ, আমি দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত এই ব্যাপারে জনগণকে সর্বোতভাবে সাবধান ও সতর্ক রাখিয়াছি। ফলে নারীকেন্দ্রিক সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপর্যয় অনেকাংশে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই 'কারণ' কি একটি চিরস্থায়ী ব্যাপার? এবং ইহা কি সর্বাধিক ক্ষতিকর বিষয়? এই ক্ষতিকর 'কারণ' কি মানুষকে অনেক বেশী ক্ষতির মধ্যে ফেলিবে? এইরূপ আশংকা রাসূলে করীম (স) দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার সময়ও অনুভব করিতেছিলেন। বস্তুত সেই তীব্র আশংকাবোধই প্রকাশিত হইয়াছে রাসূলে করীম(স)-এর এই কথাটি হইতে।

হাফেজ ইবনুল হাজার আল-আসকালানী লিখিয়াছেনঃ

اِنَّ الْفِتْنَةَ بِالنِّسَاءِ اَشَدُّ مِنَ الْفِتْنَةِ بِغَيْرِهِنَّ

অন্যান্য জিনিসের দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয়ের তুলনায় নারীদের সৃষ্ট বিপর্যয় অনেক কঠিন মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী হইয়া থাকে।

কুরআনে মজীদে নৈতিক সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ সমূহের উল্লেখ প্রসঙ্গে এই নারীদের প্রতি যৌন আকর্ষণকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ

নারী আকর্ষণের প্রেম মানুষের জন্য সাধারণভাবে বেশী চাকচিক্যপূর্ণ বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে সব কারণে বিপর্যয় ঘটে, তাহার মধ্যে নারীই হইতেছে আসল কারণ।

চিন্তাবিদ বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেনঃ

اَلنِّسَاءُ شَرٌّ كُلُّهُنَّ وَاَشَرُّ مَا فِيْهِنَّ عَدَمُ الْاِسْتِغْنَاءِ عَنْهُنَّ

নারীর সবটাই বিপর্যয়ের কারণ। আর তাহাতে অধিক খারাপ দিকটি হইল এই যে, তাহাদিগকে এড়াইয়া চলা খুবই অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

নারীদের বিবেক-বুদ্ধির স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতা এবং দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে কম দারিত্বের কারণে বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে তাহারা কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হইয়া থাকে।

(نبوی، تحفة الاحوذی، فتح الباری)

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক পার্থক্য সংরক্ষণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.

(بخاری، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجه، مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) পুরুষদের সহিত সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীদের এবং স্ত্রী লোকদের সহিত সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষদের উপর অভিশাপ করিয়াছেন।

(বুখারী, তিরমিযী, আবূ দায়ূদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা ইবনে জরীর তাবারী এই হাদীসের ভিত্তিতে লিখিয়াছেনঃ পোষাক ও নারীদের জন্য নির্দিষ্ট অলংকারাদী ব্যবহারের দিক দিয়া স্ত্রীলোকদের সহিত পুরুষদের সাদৃশ্য করণ সম্পূর্ণ হারাম। স্ত্রীলোকদের পক্ষেও জায়েয নয় এই সব দিক দিয়া পুরুষদের সহিত সাদৃশ্য করা। এই সাদৃশ্য করার অর্থ, যে সব পোষাক ও অলংকারাদি কেবলমাত্র মেয়েরাই সাধারণত ব্যবহার করে তাহা পুরুষদের ব্যবহার করা, অনুরূপভাবে যেসব পোষাক ও ভূষণ সাধারণত পুরুষরা ব্যবহার করে তাহা স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করা জায়েয নয়। ইবনুল হাজার আসকালানী বলিয়াছেনঃ কেবলমাত্র পোষাক পরিচ্ছদের দিক দিয়াই এই সাদৃশ্য নিষিদ্ধ নয়। চলন-বলনেও একের পক্ষে অপরের সহিত সাদৃশ্য করা—মেয়েদের পুরুষদের মত চলাফিরা করা, কথা বলা এবং পুরুষদের মেয়েদের মত চলাফিরা করা, কথা বলা অবাঞ্ছনীয়। এক কথায় বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুই লিঙ্গে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যাহাদিগকে পুরুষ বানাইয়াছেন, তাহারা যদি স্ত্রী লোকদের ন্যায় চলন বলন ভূষণ পরিচ্ছদ গ্রহণ করে, অথবা যদি ইহার বিপারীতটা হয়—স্ত্রী লোকেরা যদি পুরুষদের চলন-বলন-ভূষণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহা আল্লাহ্র সৃষ্টির উপর একটা বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই হয় না। স্পষ্ট মনে হয়, সে স্ত্রী বা পুরুষ হইয়া কিছু মাত্র সন্তুষ্ট নয়। সে বিপরীতটা হইবার কামনা-বাসনা পোষণ করে। ইহা আল্লাহ্র প্রতি চরম না-শোকরিয়াও বটে। আর এই ধরনের নারী পুরুষদের উপর রাসূলে করীম (স)-এর অভিশাপ বর্ষণের মৌল কারণও ইহাই। ইহারা আল্লাহর রহমত পাইতে পারে না। অভিশাপ বর্ষণের তাৎপর্যও ইহাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীসের ভাষা এইঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

(بخاری، ابوداؤد، ترمذی)

রাসূলে করীম (স) পুরুষ মুখান্নাস ও পুরুষালী স্ত্রীলোকদের উপর অভিশাপ দিয়াছেন।

'মুখান্নাস' বলা হয় পোষাক অলংকার, রং, কণ্ঠস্বর, রূপ-আকৃতি, কথা-বার্তা, সর্বপ্রকার চলাফিরা, উঠাবসা, গতি-বিধি প্রভৃতির দিক দিয়া যেসব পুরুষ নারীদের সহিত একাকার হয় তাহাদিগকে।

এইরূপ করা পুরুষদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা ইহাতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি লক্ষ্যের চরম বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়। আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টি লক্ষ্যের বিকৃতি ও পরিবর্তন স্বভাব-নীতির বিরুদ্ধতা এবং স্বভাব নীতির বিরুদ্ধতা যে কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ যে সব পুরুষ জন্মগতভাবেই কোন কোন মেয়েলী গুণের ধারক হয় এবং স্ব-চেষ্টায় এমন কোন গুণ গ্রহণ করে না, তাদের ব্যাপারে রাসূলে করীম (স)-এর এই বাণী প্রযোজ্য নয়। যাহারা নিজেরা ইচ্ছা করিয়া এইরূপ করে কেবল মাত্র তাহাদের সম্পর্কেই এই কথা। আর ইহাই নিষিদ্ধ। এই লোকদের উপরই অভিশাপ বর্ষণ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে যে সব মেয়েলোক জন্মগতভাবেই কোন-না-কোন পুরুষালি গুণের অধিকারী এবং তাহা স্বইচ্ছা ও স্বচেষ্টার কোন সংযোগ নাই, তাহারাও অভিশপ্ত হইবে না। দ্বিতীয় যে সব মহিলা পুরুষদের মতই দৃঢ় প্রত্যয় ও জ্ঞান বিবেক শক্তির অধিকারী, সাহসী, তাহাদের প্রতিও এই অভিশাপ হয় নাই। কেননা এই গুণ মেয়েদের জন্যও প্রশংসনীয়। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে সাধারণত বলা হইত كَانَتْ رَجُلَةَ الرَّأْيِ 'তিনি পুরুষদের ন্যায় দৃঢ় মত ও বিবেচনা শক্তির অধিকারী।'

এক কথায় বলা যায়, নারী ও পুরুষের মাঝে যে স্বাভাবিক পার্থক্য, তাহা কাহারও পক্ষে কোন দিক দিয়াই লংঘন করা উচিত নয়। এ পর্যায়ে কৃত্রিমভাবে যাহাই করা হইবে, তাহাই অন্যায় ও অপরাধ হইবে।

ইসলামে নারী ও পুরুষের মাঝে এই পার্থক্য রক্ষার জন্য এক দিকে যেমন পর্দার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তেমনি আচার-আচরণ, কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সুগন্ধি ব্যবহারের দিক দিয়াও এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ. (ترمذى)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ পুরুষদের সুগন্ধি এমন হইবে যাহার ঘ্রাণ প্রকাশমান; কিন্তু উহার বর্ণ প্রচ্ছন্ন। আর মেয়ে লোকদের সুগন্ধি তাহা যাহার বর্ণ প্রকাশমান ও ঘ্রাণ প্রচ্ছন্ন। (তিরমিযী)

অর্থাৎ পুরুষরা সুগন্ধির জন্য যে জিনিস ব্যবহার করিবে, তাহার বর্ণ প্রকাশমান হইবে না। যেমন গোলাপ জল, মিশ্‌ক-আম্বর, কর্পূর, আতর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মেয়ে লোকেরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে জিনিস ব্যবহার করিবে তাহার বর্ণ প্রকাশমান হইবে; কিন্তু উহার গন্ধ প্রকাশমান হইবে না, যেমন জাফরান, আলতা ইত্যাদি। হাদীস বিশারদগণ বলিয়াছেনঃ

طِيْبُ النِّسَاءِ عَلٰى مَا اِذَا اَرَادَتْ اَنْ تَخْرُجَ فَاَمَّا اِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَتْ

মহিলাদের সুগন্ধি ও সৌন্দর্যবৃদ্ধিমূলক দ্রব্যাদি সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীসে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক সেই প্রসঙ্গে প্রযোজ্য, যখন তাহারা ঘর হইতে বাহির হইবে। কিন্তু তাহারা যখন ঘরে ও স্বামীর নিকট থাকিবে, তখন তাহারা যে কোন সুগন্ধি ব্যবহার করিতে পারে। উহার ঘ্রাণ প্রকাশমান হইলেও কোন দোষ হইবে না।

এই পর্যায়ে হযরত ইমরান ইবনে হুচাইন (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَخَيْرُ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

পুরুষদের জন্য উত্তম সুগন্ধি হইল যাহার ঘ্রাণ প্রকাশমান ও বর্ণ প্রচ্ছন্ন এবং স্ত্রী লোকদের জন্য উত্তম সুগন্ধি হইল যাহার বর্ণ প্রকাশমান ও ঘ্রাণ প্রচ্ছন্ন।

এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর কথা কেবল মাত্র ভাল মন্দ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইহাপেক্ষাও কঠিন ও কঠোর। হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا.

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

প্রতিটি চক্ষুই ব্যভিচারী। কোন স্ত্রী লোক যখন সুঘ্রাণ ব্যবহার করিয়া পুরুষদের সমাবেশে যায়, তখন সে ইহা ....ইহা।

'প্রতিটি চক্ষুই ব্যভিচারী' অর্থ যে দৃষ্টিই ভিন্ মেয়ে লোক বা পুরুষ লোকের উপর যৌন কামনা মিশ্রিত হইয়া পতিত হইবে, তাহাই ব্যভিচারে লিপ্ত মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ যৌন কামনা মিশ্রিত দৃষ্টি কখনও ভিন্ন মেয়ে পুরুষের উপর পতিত হওয়া উচিত নয়। এই ধরনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া অনিবার্য হইয়া পড়ে বিশেষ করিয়া তখন যখন কোন মেয়ে লোক তীব্র ঘ্রাণযুক্ত কোন সুগন্ধি বা সাজ-সয্যা ব্যবহার করিয়া পুরুষদের সমাবেশে উপস্থিত হয়। তখন ইহা প্রথমে ভিন্ মেয়ে পরুষের কামনা-পংকিল দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। পরে ইহা ব্যভিচারের দ্বার উন্মুক্ত করে। কেননা এই সুঘ্রাণ পুরুষদের মনে যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে অনিবার্যভাবে। তখন শুধু দৃষ্টি বিনিময় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না। এক কথায় দৃষ্টির ব্যভিচার কার্যত ব্যভিচার ঘটাইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই ইহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। (نبوی، تحفة الاحوذی)

বস্তুত পুরুষ পুরুষই, নারী নয়। আর নারী নারীই, পুরুষ নয়। এ কথা চূড়ান্তভাবে সত্য। ইহার বিপরীত সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ইহাদের মধ্যে দেহগত মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহা জন্মগত। তাহাদের স্বাভাবিক কাজ কর্মও মৌলিক পার্থক্য পূর্ণ। প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব বিশেষত্ব রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় পুরুষ যদি নারীজনোচিত কাজ করে, পোষাক পরে, কিংবা নারী করে পুরুষজনোচিত, তাহা হইলে চরম সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য হইয়া পড়িবে। নারী তাহার নারীত্ব ও নারীর সুকোমল গুণাবলী হারাইয়া ফেলিবে, পুরুষ তাহার পৌরুষের বিশেষত্ব হইতে অবশ্যই বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। উভয়ই নিজ নিজ মৌল সত্তা সংক্রান্ত বিশেষত্ব ও গৌরবের আসন হইতে বিচ্যুত হইবে।

এই কারণে নবী করীম (স) সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

إِنَّهُ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبِسُ لِبْسَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبِسُ لِبْسَ الرَّجُلِ. (ابوداؤد، مسند احمد)

যে পুরুষ মেয়ে লোকের পোষাক পরিধান করিল এবং যে মেয়েলোক পুরুষের পোষাক পরিধান করিল, নবী করীম (স) এই উভয়ের উপর অভিসম্পাত করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, বলিয়াছেনঃ

لَعَنَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَرَجِّلَةِ مِنَ النِّسَاءِ

রাসূলে করীম (স) পুরুষের বেশ ধারণকারী মেয়েলোকের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স হইতে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একটা গলাবদ্ধ পরিহিত একটি মেয়েলোক দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন, মেয়েটি পুরুষের মত চলিতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, من هذة এ কে? সে জওয়াবে বলিলঃ আমি উম্মে সায়ীদ বিনতে আবূ জিহল। তখন তিনি বলিয়াছেনঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

যে মেয়েলোক পুরুষ সদৃশ হইবে, সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়।

যে সব মেয়েলোক পুরুষালি চরিত্র ও ভূষণ অবলম্বন করিবে, তাহাদিগকে নবী করীম (স) ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিতে বলিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন নপুংষককে রাসূলে করীম (স)-এর সামনে উপস্থিত করা হইল। সে তাহার দুই হাতও হেনার রঙে রঙীন বানাইয়া লইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ এই ব্যক্তির অবস্থা কি? লোকেরা বলিলেনঃ সে নারীদের সহিত সাদৃশ্য রক্ষা করিতেছে। তখন নবী করীম (স) তাহাকে নির্বাসিত করিবার আদেশ করিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাসূল, আপনি লোকটিকে হত্যা করাইলেন না কেন? জওয়াবে বলিলেন, নামাযী লোকদের হত্যা করার জন্য আমি আদিষ্ট হই নাই।

রাসূলে করীম (স) হযরত উসামা ইবনে জায়দ (রা) কে মিশরের কিবতীদের বয়নে তৈরী একটি পোষাক উপঢৌকন দিয়াছিলেন। উসামা তাহা তাঁহার স্ত্রীকে দিয়াছিলেন। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কিবতীদের সেই (আমার দেওয়া) কাপড় পরিতেছনা কেন? উসামা ইবনে জায়দ বললেন, হে রাসূল! আমি তো সে পোষাক আমার স্ত্রীকে পরাইয়া দিয়াছি। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

مُرْهَا اَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غَلَالَةً فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَصِفَ حُجْمَ عِظَامِهَا

তুমি তোমার স্ত্রীকে সেই কাপড়ের নীচে আর একটা কাপড় (পেটিকোট) পরিতে বলিবে কেননা আমি ভয় পাইতেছি, ও কাপড় এতই পাতলা যে, উহা পরিলেও তোমার স্ত্রীর অস্থির মজ্জা পর্যন্ত বাহির হইতে দেখা যাইবে।

অপর একটি বর্ণনায় হাদীসটির ভাষা হইলঃ

مُرْ اِمْرَأَتَكَ تَجْعَلْ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَايَصِفُهَا

তোমার স্ত্রীকে বল, সে যেন সে কাপড়ের নীচে আর একটি কাপড় পরে, যাহাতে ভিতরের অঙ্গ প্রতঙ্গ দেখা যাইবে না।

ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেন, এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মেয়েদের উচিত তাহার কাপড় দ্বারা দেহকে এমনভাবে আবৃত করা, যেন উহা ছাপাইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃশ্যমান হইয়া না উঠে। পুরুষদের আটোশাটো পোশাক এই পর্যায়েই পড়ে। তাহা এতই টাইট হয় যে উহা পরা সত্ত্বেও অংগ প্রত্যংগ বাহিরে প্রকাশমান হইয়া পড়ে।

মোট কথা, পুরুষ সর্বদিক দিয়া পুরুষ থাকিবে, মেয়েলোক সর্বদিক দিয়া মেয়েলোক থাকিবে ইহাই ইসলামী শরীয়াতের বিধান। ইহার ব্যতিক্রম সমাজে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (نيل الاوطار، يسئلك عن الدين والحياة)

লজ্জাস্থান আবৃত রাখার তাকীদ

عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَانَاْتِىْ مِنْهَا وَمَانَذَرُقَالَ اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ فَاِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَّا يَرَاهَا اَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا قُلْتُ فَاِذَا كَانَ اَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَحَقُّ اَنْ يَّسْتَحْيَامِنْهُ.

(بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجة)

বহজ ইবনে হাকীম হইতে, তহার পিতা হইতে, তাঁহার দাদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, বলিয়াছেন, আমি বলিলামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থান সমূহের মধ্যে কতটা আমরা আবৃত রাখিব আর কতটা ছাড়িয়া দিব? রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তোমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ কর। তবে তোমার স্ত্রী কিংবা তোমার দক্ষিণ হাতের মালিকানাভুক্তদের ব্যাপারে এই সংরক্ষণ থাকিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকেরা যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকে তখন কি করিতে হইবে? বলিলেনঃ যদি পার যে, কেহ কাহারও লজ্জাস্থান দেখিবে না, তাহা হইলে কক্ষণই দেখিবে না। বলিলামঃ আমাদের কেহ যখন একান্ত একাকী থাকে, তখনকার জন্য কি হুকুম? বলিলেনঃ তখন তো আল্লাহ্ তা'আলা বেশী অধিকার সম্পন্ন এই জন্য যে, তাঁহার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করিতে হইবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দায়ূদ, ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ইমাম তিরমিযীর ভাষায় বহজ ইবনে হাকীম বলিয়াছেনঃ 'আমার পিতা (হাকীম) আমার দাদার নিকট হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বহজ-এর দাদা এই হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং নিজেই রাসূলে করীম (স)-এর সহিত কথা বলিয়াছেন, যাহার বিবরণই এই হাদীস। তাঁহার নাম মুয়াবীয়া ইবনে হীদা (রা)।

হাদীসের শব্দ اَلْعَوْرَات শব্দটি عَوْرَةٌ এর বহুবচন। মানব দেহের যে অঙ্গের উলংগ হইয়া পড়া লজ্জাকর, তাহাই عَوْرَةٌ বা লজ্জাস্থান। ইহা পুরুষে নারীতে পার্থক্য রহিয়াছে। নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষ দেহের লজ্জাস্থান এবং স্বাধীনা নারীর মুখ মণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ছাড়া সমগ্র দেহই লজ্জাস্থান। মানবদেহের এই লজ্জাস্থান অবশ্যই আবৃত রাখিতে হইবে। নামাযে যেমন তেমনি নামাযের বাহিরেও সব সময়ই ইহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

আমাদের দেহের কোন্ কোন্ অংশ আবৃত রাখিব আর কোন্ কোন্ অংশের আবরণ মুক্ত করিতে পারিব, এই জিজ্ঞাসার জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তোমার লজ্জাস্থান—নাভী হইতে

হাঁটু পর্যন্তকার অঙ্গ সমূহের আবরণ রক্ষা কর। কিন্তু তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে এই নির্দেশ নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হইয়াছেঃ পুরুষ লোকেরা যখন একটি স্থানে পরস্পর একত্রিত হয় ও মিলিয়া-মিশিয়া থাকে, নিজেদের স্থান ত্যাগ করে না, তখন সেই লোকদের পক্ষে লজ্জাস্থান আবৃত রাখা ও পূর্ণ মাত্রার পর্দা পালন সম্ভবপর হয় না। অনেক সময় পরিধানের কাপড়ের সংকীর্ণতা বা জীর্ণ-শীর্ণতার দরুন; কিংবা প্রয়োজন দেখা দেওয়ার দরুন ইহা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তখন আমরা লজ্জাস্থান আবৃত রাখার ব্যাপারে কি করিতে পারি? ইহার জওয়াবে রাসূলে করীম (স) যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ, তখনও যদি পার তাহা হইলে কেহ স্বীয় লজ্জাস্থান অন্যকে দেখাইবে না। অর্থাৎ বহুলোকের একস্থানে একত্রিত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া থাকা অবস্থায়ও লজ্জাস্থান আবৃত রাখা ও উহার কোন অংশ অন্যকে না দেখানোর জন্য সতর্ক থাকিবে ও সাধ্যমত চেষ্টা চালাইবে।

রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি দুইটি বর্ণনায় দুই রকম উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু দুইটির মূল বক্তব্য তাহাই যাহা বলা হইল।

তৃতীয় প্রশ্ন হইল, মানুষ যখন একান্ত নিভৃতে নিঃসংগ একাকী থাকে তখন কি করিতে হইবে? অর্থাৎ তখন তো আর লজ্জা নিবারণের কোন কারণ থাকে না। তাহার লজ্জাস্থান দেখিতে পারে এমন কেহই কোথায়ও থাকে না। তখন এ ব্যাপারে খুব একটা সতর্কতার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না? ইহার জওয়াবে রাসূলে করীম (স) যাহা বলিয়াছেন; তাহার তাৎপর্য হইলঃ মানুষ নিভৃত একাকীত্বে নিঃসঙ্গ হইয়া থাকিলেও এবং দ্বিতীয় কোন লোক নিকটে না থাকিলেও মহান আল্লাহ্ তথায় উপস্থিত থাকেন। কাজেই তাঁহার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করা তো অধিক প্রয়োজন। আল্লাহ্র ব্যাপারে এই লজ্জাবোধ—লজ্জাস্থান তাঁহার অগোচরে ও তাঁহার হইতে গোপন রাখার দিক দিয়া নয়। কেননা তাহা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। এই লজ্জাবোধ থাকিতে হইবে লজ্জাস্থান আবৃত রাখার খোদায়ী নির্দেশ পালনের দিক দিয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লজ্জাস্থান আবৃত রাখার যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা লোকদের ভয়ে পালন করা উচিত নয়, পালন করা উচিত আল্লাহ্কে ভয় করিয়া। তাই কেহ নিকটে-কাছে না থাকিলেও আল্লাহ্ তো থাকেন এবং দেখেন। তাই তখনও—সেই নিভৃত একাকীত্বেও—উলংগ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তখন তাহা করা হইলে কোন লোক হয়ত লজ্জাস্থান অনাবৃত রাখার এই অপরাধ দেখিতে পায় না; কিন্তু আল্লাহ্ তো দেখিতে পান যে, লোকটি একাকীত্বের সুযোগে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিয়াছে। এই সময় বরং মানুষের উচিত আল্লাহ্কে অধিক লজ্জা করা—আল্লাহ্র নির্দেশ অধিক পালন করা। বস্তুত খোদার প্রতি মানুষের এই যে ভীতি ও লজ্জাবোধ, ইহাই ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তি। রাসূলে করীম (স) নানাভাবে নানা সময়ে ভিন্ন প্রসঙ্গের কথার মাধ্যমেও মানুষের মধ্যে এই ভিত্তিটিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে ও সুদৃঢ় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

লজ্জাস্থান আবৃত রাখার আদেশে দুইটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রাখা হইয়াছে। একটি হইল স্ত্রী ও নিজ মালিকানাধীন ক্রীতদাসী। এই ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া সঙ্গম কালে পরস্পরের যৌন অংগ দর্শন নিষিদ্ধ করা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহা সম্পূর্ণ হারাম। অতএব একজন পুরুষ যেমন অপর পুরুষের লজ্জাস্থান দেখিতে পারে না, তেমনি একজন মেয়েলোকও পারে না অপর মেয়েলোকের লজ্জাস্থান দেখিতে।

উপরোক্ত হাদীসটি হইতে একথাও জানা যায় যে, নিতান্ত নিভৃত নির্জনের একাকীত্বকালেও উলংগ হওয়া জায়েয নয়। অবশ্য ইমাম বুখারী হযরত মূসা ও হযরত আইউব (আ)-এর ঘটনার উল্লেখ করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গোসল করার সময় নিভৃত একাকীত্বে উলংগ হওয়া জায়েয। কেননা এই দুইজন নবীর এইরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে এবং আমরা তাঁহাদের মানিয়া চলার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। যতক্ষণ না বিশেষ কোন কাজের নিষেধ আমাদের শরীয়াতে আসিয়াছ। নবী করীম (স) নিজেই

তাঁহাদের নিভৃত একাকীত্বে উলংগ হইয়া গোসল করার কথা বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহা করিতে নিষেধ করেন নাই। ফলে এই ব্যাপারে উভয় শরীয়াতের অভিন্নতাই প্রমাণিত হয়। যদি আমাদের জন্য তাহা নাজায়েয হইত, তবে নবী করীম (স) তাহা সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া দিতেন। এই দৃষ্টিতে ইসলামী শরীয়াতে একটি ফর্মূলা রচিত হইয়াছে এই ভাষায়ঃ

شَرَعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَالَمْ يَنْسَخْ

আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের শরীয়াত আমাদেরও শরীয়াত যতক্ষণ না তাহা রহিত হইয়া যায়।

তবে ইমাম বুখারীর মতে উলংগ হওয়া জায়েয হইলেও উত্তম নয়। উলংগ না হওয়াই উত্তম আচরণ।

কিন্তু ইমাম বুখারীর এই মত সহীহ হাদীসের বিপরীত বলিয়া মনে হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّىْ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَّا يُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ. (ترمذى)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমরা উলংগ হওয়া হইতে নিজদিগকে দূরে রাখ। কেননা তোমাদের সহিত এমন সব লোক রহিয়াছে যাহারা তোমাদের হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে পায়খানা করা ও স্ত্রীর সহিত সঙ্গম অবস্থা এই নিষেধের বাহিরে। অতএব তোমাদের সেই সঙ্গীদের ব্যাপারে তোমরা লজ্জাবোধ করিবে এবং তাহাদিগকে সম্মান দিবে।

অর্থাৎ নিভৃত একাকীত্বেও উলংগ হইবে না। তবে কেবলমাত্র পায়খানা পেশাব করা ও স্ত্রী সঙ্গম কালে ইহার ব্যতিক্রম করার অনুমতি রহিয়াছে।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِى الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

(مسلم، ابوداؤد، ترمذى)

একজন পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের উপর দৃষ্টি দিবে না, একজন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান দেখিবে না। অনুরূপ ভাবে একজন পুরুষ অপর পুরুষের নিকট এক কাপড়ে এবং একজন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের নিকট এক কাপড়ে যাইবে না।

এক কাপড়ে যাওয়া, অর্থ দেহের লজ্জাস্থান সম্পূর্ণ আবৃত না করিয়া যাওয়া, এমন ভাবে যাওয়া যাহাতে লজ্জাস্থানের কোন অংশ উলংগ হইয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(فتح البارى، نيل الاوطار، تحفة الاحوذى)

স্বামী-স্ত্রীর গোপন কার্য প্রকাশ না করা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ شَرِّالنَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا .

(مسند احمد، مسلم)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ্র নিকট কিয়ামতের দিন মান-মর্যাদার দিক দিয়া নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইবে সেই পুরুষ, যে স্ত্রীর সহিত মিলন ও সঙ্গম করে এবং স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে সঙ্গম সুখ উপভোগ করে। অতঃপর ইহার গোপন কথা প্রকাশ ও প্রচার করিয়া দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম)

ব্যাখ্যা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক অতীব গোপনীয় ব্যাপার। ইহা প্রকাশ্যে লোক চক্ষুর সম্মুখে কখনও সাধিত হইতে পারে না, হওয়া শোভন ও বাঞ্ছনীয় নয়। শুধু তাহাই নয়, সম্ভবত লোকদের সম্মুখে এই কার্য সাধিত হইলে তাহাতে বাঞ্ছিত চূড়ান্ত সুখ লাভ করাও সম্ভবপর নয়। তাই ইহা সম্পূর্ণ গোপনে সাধিত হইতে হইবে। শুধু তাহাই নয়। ইহা সাধিত হইতে হইবে এমনভাবে, যাহাতে অন্য কেহ টেরও না পায়। বস্তুত স্বামী-স্ত্রী মিলনের সমস্ত মাধুর্য ও পবিত্রতা সম্পূর্ণরূপে এই গোপনীয়তায়ই নিহিত।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক লীলা খেলা গোপনে সাধিত হওয়ার পর স্বামী বা স্ত্রী যদি উহার তত্ত্ব রহস্য অন্যদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার মত নির্লজ্জতা—অতএব নিতান্ত পশু শোভন কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। কেননা তাহাতে সেই গোপনীয়তার সমস্ত পবিত্রতা ও মাধুর্য ইহাতে নিঃশেষ হইয়া যায়।

এই পর্যায়ে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهٖ فَقَالَ مَجَالِسَكُمْ هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ اِذَا اَتٰى اَهْلَهٗ اَغْلَقَ بَابَهٗ وَاَرْخٰى سِتْرَهٗ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ بِاَهْلِىْ كَذَا وَفَعَلْتُ بِاَهْلِىْ كَذَا - فَسَكَتُوْا فَاَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟ فَجَاءَتْ فَتَاةٌ لِعَابٌ عَلٰى اِحْدٰى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِيَرَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ كَلَامَهَا فَقَالَتْ اَىْ وَاللّٰهِ اِنَّهُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ وَاِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثُوْنَ فَقَالَ

هَلْ تَدْرُوْنَ مَامِثْلُ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ اِنَّ مِثْلَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِىَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ.

(مسند احمد، ابوداؤد، نسائ، ترمذى)

রাসূলে করীম (স) একদা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মুখ ফিরাইয়া বসিলেন এবং বলিলেনঃ তোমরা সকলে নিজ নিজ আসনে বসিয়া থাক। তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন পুরুষ আছে, যে তাহার স্ত্রীর নিকট আসে, ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয় এবং পর্দা ঝুলাইয়া দেয়---অতঃপর বাহির হইয়া বলিতে শুরু করে, 'আমি আমার স্ত্রীর সহিত এই এই করিয়াছি।' 'আমি আমার স্ত্রীর সহিত এই-এই করিয়াছি? সাহাবীগণ এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ চুপ করিয়া থাকিলেন। ইহার পর নবী করীম (স) মহিলাদের দিকে আগাইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যে এই রূপ বলিয়া বেড়ায়? তখন একজন যুবতী তাহার এক হাঁটুর উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া বসিল, যেন রাসূলে করীম (স) তাহাকে দেখিতে পান ও তাহার কথা শুনিতে পারেন। অতঃপর সে বলিলঃ আল্লাহ্‌র কছম, এই পুরুষেরা এইরূপ নিশ্চয়ই বলে এবং এই মেয়েরাও এইরূপ বলিয়া বেড়ায়। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ এই রূপ যাহারা করে তাহাদিগকে কিসের সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা কি তোমরা জান? এইরূপ কাজ যে যে করে তাহাকে পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তানী বলিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের একজন অপর জনের সহিত রাজপথে মিলিত হয় ও নিজের যৌন প্রয়োজন স্বীয় সঙ্গী হইতে পূরণ করিয়া লয়। আর লোকেরা সব উহার দিকে চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া থাকে ও কাজ হইতে দেখিতে পারে।

(মুসনাদে আহমাদ, আবূ দায়ূদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তানের প্রকাশ্যে রাজপথে যৌন প্রয়োজন পূরণ করার যে দৃষ্টান্তটি রাসূলে করীম (স) দিয়াছেন তাহা সেই স্বামী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত যাহারা গোপনে যৌন প্রয়োজন পূরণের পর অনুষ্ঠিত লীলা খেলার কথা লোকদের নিকট বলিয়া বেড়ায়। এই হাদীসটিতে যে মজলিসের উল্লেখ রহিয়াছে, সম্ভবত তাহা কোন নামাযের পরবর্তী মজলিস। রাসূলের যুগে মেয়ে পুরুষ উভয়ই মসজিদে নামাযের জামায়াতে শরীক হইতেন যদিও তাহাদের স্থান হইত ভিন্ন ভিন্ন। উভয় শ্রেণীর লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করার পর রাসূলে করীম (স) যে কথা গুলি বলিয়াছিলেন, তাহা উভয়ই শুনিতে পাইতেছিল। কেননা ইহাদের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী ছিল না।

শেষোক্ত হাদীস হইতে ইহাও জানা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইবার সময় ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া লওয়া উচিত, যেন হঠাৎ করিয়া কেহ ঘরে প্রবেশ করিয়া না বসে। সেই সঙ্গে ভিতর হইতে পর্দাও ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত। যেন বাহির হইতে কেহ চেষ্টা করিলেও যৌন মিলন কার্য প্রত্যক্ষ করিতে না পারে।

এই দুইটি হাদীস হইতেই অকাট্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যৌন মিলন সক্রান্ত ঘটনাবলীর বিবরণ অন্য লোকদের নিকট বর্ণনা করা ও উহার প্রচার করা ঠিক তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে যৌন কর্ম করার মত ব্যাপার এবং এই কাজ যাহারা করে, তাহারা নিকৃষ্টতম লোক। বস্তুত এইরূপ হীন জঘন্য ও বীভৎস কাজ আর কিছু হইতে পারে না। ইহা নিতান্তই শয়তানের মত নির্লজ্জ কাজ। এই কাজটি যদি খুব ছোট মানের খারাপ হইত, তাহা হইলে এই কাজ যাহারা করে তাহাদিগকে রাসূলে করীম (স) নিশ্চয়ই شَرُّ النَّاسِ 'নিকৃষ্টতম' বলিয়া অভিহিত করিতেন না।

লোকদের দেখাইয়া যৌন কার্য সমাধা করাও অনুরূপভাবে নিকৃষ্টতম ও জঘন্যতম কাজ। ইহার হারাম হওয়ার একবিন্দু সন্দেহ নাই।

হযরত আবূ সায়ীদ বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীসটিতে কেলর পুরুষ বা স্বামীকেই নিকৃষ্টতম লোক বলা হইয়াছে। স্ত্রীলোক সম্পর্কে উহাতে কিছুই বলা হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, এই ধরনের কাজ প্রধানত পুরুষদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। আর স্ত্রী লোকদের তুলনায় পুরুষরা যে একটু বেশী নির্লজ্জ, তাহা তো সকলেরই জানা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, স্ত্রী সঙ্গম সুখের ব্যাপার সমূহ—যাহা স্বামীতে-স্ত্রীতে ঘটিয়া থাকে তাহা—স্ত্রী যেরূপ আচরণ করে, যে সব কথা বলে ও কাজ করে, তাহার যে অবস্থা দেখা দেয় সেই সবের বর্ণনা দেওয়াই হারাম। শুধু স্ত্রী সঙ্গমের কথা উল্লেখ করিলে তাহা হারাম হইবে না। তবে তাহা মকরূহ অবশ্যই হইবে। কেননা ইহা মানুষের শালীনতা বিরোধী। ইহার বর্ণনা অর্থহীনও বটে। আর অর্থহীন নিষ্ফল কথা বলা পরিহার করা ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ

যে লোক আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তাহার উচিত ভাল ও কল্যাণময় কথা বলা। আর তাহা না বলিলে বা বলিতে না পারিলে তাহার চুপ করিয়া থাকা উচিত।

তবে ইহার উল্লেখ যদি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে কোন কারণে, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ করায় কোন দোষ নাই। যেমন স্ত্রী যদি স্বামীর যৌন সঙ্গমকে অস্বীকার করে বা বলে যে, সে ইহাতে অক্ষম, ইত্যাদি কারণে ইহার উল্লেখের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। স্বয়ং নবী করীম (স)-ও বলিয়াছেনঃ اِنِّىْ لَاَ فْعَلُهُ اَنَا وَهٰذِهِ 'হ্যাঁ, আমি নিজেই এই কাজ করি, আর সেও করে। তিনি হযরত আবূ তালহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ اَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ 'তুমি কি রাত্রিবেলা স্ত্রীর সহিত যৌন মিলন করিয়াছ।' ইত্যাদি। তবে নিছক উল্লেখ এককথা, আর উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিবরণ দেওয়া বা রসময় কাহিনী বানাইয়া বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথমটি সম্পূর্ণ হারাম নয়, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ হারাম। (نيل الاوطار)

এইরূপ নিষেধ বাণীর মূল উদ্দেশ্য হইল, পরিবেশকে পবিত্র ও যৌন পংকিলতা মুক্ত রাখা। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে ইসলামী সমাজে নগ্নতা ও অশ্লীলতা সব সময়ই বর্জনীয়। নারী পুরুষের উচ্ছৃংখল চলা ফিরা, অবাধ মেলা-মেশা পথে-ঘাটে, পার্কে, বিপনীতে, ক্লাবে, থিয়েটারে এবং পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে যৌন আবেদন উদ্বোধনমূলক কোন অনুষ্ঠান প্রচার এই কারণে সম্পূর্ণ নিষেধ।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تَطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ. (ابوداؤد، نسائى)

হযরত মুয়াবীয়া আল কুশাইরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি বলিলাম, ইয়া রাসূল! আমাদের উপর আমাদের একজনের স্ত্রীর কি কি অধিকার রহিয়াছে? জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি যখন খাইবে তখন তাহাকেও খাওয়াইবে, তুমি যখন পরিবে তখন তাহাকেও পরিতে দিবে। আর মুখের উপর মারিবে না। তাহাকে কটুরূঢ় অশ্লীল কথা বলিবে না এবং ঘরের ভিতরে ছাড়া তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিবে না।

(আবূ দায়ূদ ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার কি এই প্রশ্নের জওয়াবে নবী করীম (স) এখানে মোট পাঁচটি কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা খাবার দেওয়া, দ্বিতীয় পরার কাপড়-জামা দেওয়া, তৃতীয় মুখের উপর না মারা, চতুর্থ কটুরূঢ় অশ্লীল কথা না বলা এবং পঞ্চম ঘর ছাড়া অন্য কোথায়ও তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন না করা।

রাসূলে করীম (স)-এর এই কথা কয়টি অতীব মৌলিক ও নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের। কেননা এই কাজ কয়টি যথাযথ না হইলে স্ত্রীর জীবন মান রক্ষা করাই সম্ভব হইতে পারে না। যেমন খাওয়া পরা। খাওয়া মানুষের জীবন বাঁচাইয়া রাখার জন্য অপরিহার্য। খাবার জোটানো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। রাসূলের কথার ধরণ تَطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ 'তুমি যখন খাইবে তখন তাহাকেও খাইতে দিবে।' অর্থাৎ তুমি নিজের খাবার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীরও খাবার জোটানো তোমার কর্তব্য। তুমি যখন অবিবাহিত ছিলে তখন হয়ত তোমার পারিবারিক দায়িত্ব কিছুই ছিল না। তখন হয়ত তুমি একা নিজের খাবার জুটাইবার জন্যই চিন্তান্বিত হইতে। কিন্তু বিবাহ করার পর তোমার খাবারের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তোমার স্ত্রীর খাবার জোটানোর দায়িত্ব। ইহাতে আরও দুইটি কথা নিহিত আছে। একটি হইল, তুমি যাহা খাইবে স্ত্রীকেও তাহাই খাইতে দিবে। তোমার খাওয়া দাওয়ার যে মান, তোমার স্ত্রীর খাওয়া-দাওয়ার মানও তাহাই হইতে হইবে। তাহার কোন অংশে কম হইতে পারিবে না। এমনও হইতে পারিবে না যে, তুমি ভাল খাইবে আর স্ত্রীকে নিকৃষ্ট মানের খাবার দিবে বা তাহা খাইতে বাধ্য করিবে। কিংবা যাহা রান্না হইবে তাহা তুমি একাই সব খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে, আর স্ত্রীকে অভুক্তা থাকিতে বাধ্য করিবে। সম্ভবত এই কথাটাও ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে খাবার খাইবে। বস্তুত এক সঙ্গে তথা একপাত্রে খাবার খাওয়া দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য ও ভালবাসার গভীরতা সৃষ্টির জন্য বিশেষ সহায়ক। দ্বিতীয়ঃ تَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ তুমি নিজে যখন জামা-কাপড় পরিবে, স্ত্রীকেও তখন জামা-কাপড় পরিতে দিবে। পোষাক-পরিচ্ছদ তোমার একারই প্রয়োজন নয়, উহা তোমার স্ত্রীর-ও প্রয়োজন। পোশাক তো সাধারণ ভাবে সব মানুষেরই লজ্জা

নিবারণের একমাত্র উপায়। কিন্তু শুধু তাহাই নয়। তোমার সামর্থ্যানুযায়ী যে মানের পোশাক তুমি নিজে পরিবে স্ত্রীকেও সেই মানের কাপড় পরিতে দিবে। তুমি যদি বেশী মূল্যের ও অতীব উত্তম মানের পোশাক গ্রহণ কর; আর স্ত্রীকে যেমন-তেমন কাপড় পরিতে দাও, তাহা হইলে তাহা যেমন মানবিক নয়, তেমনি দাম্পত্য জীবনের পক্ষে শান্তি-সম্প্রীতি সৃষ্টিরও অনুকূল হইতে পারে না। সেই সঙ্গে একথার প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, তুমি যখন একটা নূতন পোশাক কিনিবে, তোমার স্ত্রীর জন্যও তখন নূতন কাপড় ক্রয় করিবে। ইহাতে স্ত্রীর মন রক্ষার ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব পালিত হইবে। সেই সঙ্গে স্ত্রীও তোমার প্রতি অধিক আস্থা সম্পন্না ও শ্রদ্ধাশীলা হইবে। খাওয়া-পড়া সংক্রান্ত রাসূলে করীম (স)-এর এই নির্দেশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের তিনটি আয়াত স্মরণীয়। একটি আয়াত এইঃ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ١٢٣)

যাহারা জন্য সন্তান—অর্থাৎ স্বামী—তাহার কর্তব্য স্ত্রীদের জন্য প্রচলিত নিয়মে, মধ্যম মান অনুযায়ী খোরাক ও পোশাকের ব্যবস্থা করা।

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

(البقرة: ١٣٦)

সচ্ছল অবস্থাশালী স্বামীর কর্তব্য তাহার সামর্থ্যানুযায়ী পরিবার বর্গের জন্য ব্যয় করা এবং দরিদ্র-অভাবগ্রস্থের কর্তব্য তাহার সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করা। কিন্তু এই উভয় অবস্থায়ই প্রচলিত মান অনুযায়ী খোরাক-পোশাক দিতে হইবে। আর ইহা সদাচারী লোকদের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

তৃতীয় আয়াতঃ

لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا (الطلاق: ٧)

সচ্ছল অবস্থাশালী ব্যক্তি পরিবার বর্গের জন্য ব্যয় করিবে তাহার সচ্ছলতা অনুপাতে। আর যাহার রিযিক পরিমিত, স্বল্প, সে যেন আল্লাহ্‌র দেওয়া জিনিস হইতে সেই অনুপাতে ব্যয় করে। আল্লাহ্ কাহাকেও তাঁহার দেওয়া পরিমাণের অধিক ব্যয় করার দায়িত্ব দেন না।

হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

স্ত্রীদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা তোমাদের—অর্থাৎ স্বামীদের দায়িত্ব।

এই পর্যায়ের অপর একটি হাদীসের ভাষা হইলঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ اَخَذَ عَنِ اللّٰهِ اَدَبًا حَسَنًا اِذَا هُوَ وَسَّعَ عَلَيْهِ وَسَّعَ وَاِذَا هُوَ قَتَرَ عَلَيْهِ قَتَرَ

'মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে একটা উত্তম নিয়ম ও আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইল, আল্লাহ্ যখন তাহাতে প্রশস্ততা বিপুলতা দেন, সেও (ব্যয়ের ক্ষেত্রে) প্রশস্ততা অবলম্বন করে। আর যখন তিনি তাহাকে সংকীর্ণতা—অভাব ও দারিদ্রে—ফেলেন, তখন সেও সংকীর্ণতার মধ্য দিয়াই চলে।

রাসূলে করীমের অপর একটি বাণী হইলঃ

وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوا لَهُنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার তোমাদের উপর এই যে, তোমরা তাহাদের খোরাক পোশাক জোগাইবার ব্যাপারে বিশেষ আন্তরিকতা পোষণ করিবে—যতবেশী ভাল করা সম্ভব তাহা করিবে।

তৃতীয় বলা হইয়াছেঃ وَلَاتَضْرِبِ الْوَجْهَ মুখের উপর—মুখ মণ্ডলের উপর কখনও মারিবেনা। শুধু মুখ মণ্ডলের উপর মারিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তাহা হইলে কি দেহের অন্যান্য অংশের উপর মারা যাইতে পারে.....মূলত স্ত্রীকে মারার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কেননা স্ত্রীকে মার ধর করিবে, এই উদ্দেশ্যে তো আর কেহ বিবাহ করে না। কিন্তু তবুও স্ত্রীকে অবস্থা ও কারণ বিশেষ কিছুটা মারধর করার অধিকার ইসলামে স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেন? কোন্ অবস্থায় ও কোন্ বিশেষ কারণে? স্ত্রীকে মারিবার অনুমতি স্বামীকে কুরআন মজীদেই দেওয়া হইয়াছে। এই পর্যায়ের সম্পূর্ণ আয়াতটি সম্মুখে রাখিলেই ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে এবং পাওয়া যাইবে আমাদের এইমাত্র উত্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলির সঠিক জওয়াব। আয়াতটি এইঃ

وَاللَّاتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

(النساء: ٣٤)

যে সব স্ত্রীদের স্বামীর আনুগত্য হইতে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত আশংকা বোধ করিবে, তাহাদিগকে তোমরা উপদেশ দিবে, শয্যায় তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে এবং তাহাদিগকে মারিবে।

স্বামী-স্ত্রীর মিলিত সংসারের কর্ণধার ও প্রধান পরিচালক হইল স্বামী। আর স্ত্রী সর্বব্যাপারে স্বামীর সহিত সহযোগিতা ও আনুকূল্য করিবে, ইহাই স্ত্রীর কর্তব্য। কিন্তু স্বামীকে এই মর্যাদা দিতে স্ত্রী যদি প্রস্তুত না হয়, সে যদি ক্রমাগত স্বামীর সহিত অবাধ্যতা করিতে থাকে, স্বামীর প্রবর্তিত পারিবারিক নিয়ম শৃংখলা ভংগ করে, এই বিষয়ে স্বামীর দেওয়া যুক্তিসংগত ও শরীয়াত সম্মত আদেশ-নিষেধ লংঘন করে, স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করার পরিবর্তে ক্রামগত ঘৃণাই করিতে থাকে। তাহা হইলে স্বামীর মন কিছুতেই সুস্থির থাকিতে পারে না। তাহাকে তো দাম্পত্য শৃংখলা ও সংসার সংস্থাকে রক্ষা করিতেই হইবে। তাহা হইলে তখন সে কি করিবে? উপরোক্ত আয়াতে তাহার জন্য সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আয়াতে বলা হইয়াছে, স্ত্রীর এই বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা দেখিয়া তুমি নীরব দর্শক হইয়া থাকিও না। তোমার দায়িত্ব পালনার্থে তোমাকে পুরাপুরি কর্তব্য করিতে হইবে। আর তাহা হইল, সর্বপ্রথম স্ত্রীকে বুঝাইবে, উপদেশ দিবে, নছীহত করিবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধানের কথা তাহাকে স্মরণ করিাইয়া জানাইয়া দিবে। দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থিতি স্থায়ীত্ব রক্ষার্থে স্বামীর ন্যায়-সংগত সব কজেই তাহাকে পূর্ণ আনুকূল্য ও আনুগত্য দিতে হইবে—দেওয়া কর্তব্য এবং এই ক্ষেত্রে স্বামীর প্রাধান্য মানিয়া চলা তাহার জন্য দ্বীনী ফরয, একথা সবিস্তারে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে। যদি ইহাতেও সে নরম ও অনুগত না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় কর্মপন্থা রূপে বলা হইয়াছেঃ

وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

রাত্রিকালীন শয্যা গ্রহণে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর'।

শয্যায় সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ, ঘুমাইবে একই শয্যায়—যেমন তোমাদের সাধারণ নিয়ম; কিন্তু শয্যায় শুইয়া স্ত্রীর সহিত কোন সম্পর্ক স্থাপন করিবে না। তাহার দিকে ফিরিয়া নয়, পিঠ ফিরাইয়া ঘুমাইবে। আর তাহার সহিত শৃংগার ও সঙ্গম করিবে না। শয্যায় দূরত্ব রক্ষা করিয়া থাকিবে। কেননা এইরূপ করা হইলে স্ত্রীর হৃদয়মনে স্বামীর প্রতি যদি একবিন্দু ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে সে তাহার স্বামীর এই অনীহা ও বিতৃষ্ণার কারণ দূর করিতে ও তাহার সহিত মীমাংসা করিয়া ফেলিতে আগ্রহান্বিত হইবে। আর ইহাতেও যদি তাহার অনমণীয়তা দূরীভূত না হয় তাহা হইলে শেষ উপায় হিসাবে তাহাকে মারিবে। এই মার হয়ত স্ত্রীকে পথে আনিতে অনেক সাহায্য করিবে। বিদ্রোহী অসহযোগী ও অনমনীয় স্ত্রীকে পথে আনার ইহাই ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার উপায় ও পদ্ধতি। ইহার কারণ এই যে, বিদ্রোহাত্মক ভাবধারা লক্ষ্য করিয়া যদি এই পন্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে তো হয় তাহাকে তখনই তালাক দিতে হয়, না হয় স্ত্রীকে বিনা তালাকেই বাপের বাড়ি বা অন্যত্র পাঠাইয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু ইহার কোনটাই ইসলাম সম্মত নয়। ইসলামের কাম্যও ইহা নয়। পরিবার সংস্থার অক্ষুণ্নতা ও শান্তি-সম্প্রীতি ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই ইসলাম এই ক্রমিক পদ্ধতি পেশ করিয়াছে।

কিন্তু স্ত্রীকে মারিবার এই অনুমতি নিরংকুশ বা শর্তহীন নয়। প্রথমতঃ এই মারটা হইবে ضَرْبُ الْاَدَبِ আদব ও নিয়ম শৃংখলা শিক্ষা প্রদান উদ্দেশ্যে দেওয়া অকঠিন অশক্ত মার। আর وَهُوَ الَّذِى لَا غَيْرُ مُبَرِّحٍ يَكْسِرُ عَظْمًا وَلَا لِيَسِيْنَ جَارِحَةً 'এই মার না হাড় ভাঙিবে, না কোন জখম করিবে।' কেননা এস্থলে মারাটাই আসল লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হইতেছে স্ত্রীকে সংশোধন করা। আলোচ্য হাদীসে তাই বলা হইয়াছেঃ মুখের উপর মারিবে না। অর্থাৎ কোন সময় স্ত্রীকে পথে আনার জন্য অন্যান্য সব উপায় ব্যর্থ হওয়ার পর যদি এই পর্যন্ত পৌছিতেই হয় এবং ইহা ছাড়া আর কোন উপায়ই হাতে না থাকে, তাহা হইলে সর্বশেষ উপায় হিসাবে স্ত্রীকে মারিতে পার। কিন্তু সে মারের কোন আঘাত যেন মুখমণ্ডলের উপর না পরে। কেননা মুখমন্ডল মানব দেহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইহাতে নাক, চোখ, কপোল, মুখ, দাঁত ইত্যাদি অত্যন্ত নাজুক প্রত্যংগ রহিয়াছে। মুখে মারিলে ইহার যে কোন একটা আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে। আর তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত বীভৎস ব্যাপার হইয়া দাড়াইবে। (تفسير القرطبى)

ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেন, চারটি কারণে স্ত্রীকে মারার স্বামীর অধিকার আছে। তাহা হইল (১) স্ত্রীর সাজ-সজ্জা পরিহার করা—অথচ স্বামী তাহা চাহে, (২) সঙ্গমে আহবান করার পর বিনা কারণে অস্বীকৃতি (৩) নামায না পড়া (হাদীসের কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী) (৪) স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ঘরের বাহিরে যাতায়াত।

ইমাম মুহাম্মাদ বলিয়াছেন, নামায তরক করিলে, অপবিত্রতার হায়যের গোসল না করিলে স্ত্রীকে মারার স্বামীর কোন অধিকার নাই। (فتوى قاضيخان)

ইসলাম স্বামীকে অধিকার দিয়াছে স্ত্রীকে মার ধর করার। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ও পারিবারিক রীতি-নীতি এই ব্যাপারে জনমনে বিশেষ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইবার ও জনগণকে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বানাইবার জন্য এই ব্যাপারটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত পক্ষে বিভ্রান্তির কিছুই নাই। উপরন্তু এই ব্যবস্থাকে বর্বরতা বলারও কোন যৌক্তিকতা নাই। কেননা আধুনিক মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছে। আধুনিক মনস্তত্ত্বের পারদর্শীগণ বলিয়াছেনঃ কোন কোন মানসিক রোগ এমন থাকিতে পারে যাহাতে দৈহিক শাস্তি দান ছাড়া রোগীর চিকিৎসার অন্য কোন পন্থাই কার্যকর হয় না। কোন কোন স্ত্রীলোক মার না খাওয়া পর্যন্ত পথে আসে না, বশ মানেনা। অনেক পুরুষও এমন রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। তখন স্ত্রীকেই উহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় এবং এই উপায়েই তাহাকে শায়েস্তা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। ফলে ইসলামের এই পথ-নির্দেশ কিছু মাত্র বিস্ময়কর বা আপত্তিকর হইতে পারে না।

হাদীসের চতুর্থ কথাঃ ولاتقبح, ইহার অর্থ, স্ত্রীকে খারাপ রূঢ় অশ্লীল ও নির্মম কথা বলিও না, তাহাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিওনা, মন্দ বলিও না। অশালীন, অসৌজন্য মূলক ও অপমানকর কথা বলিও না। قبحك الله আল্লাহ্ তোমাকে মন্দ বা ধ্বংস করুন বলিও না। ইত্যাদি ধরনের কথাবার্তা পারিবারিক জীবনের সব পবিত্রতা ও মাধুর্যকে বিনষ্ট করে।

বস্তুত স্ত্রীও যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, তাহারও আত্মমর্যাদা আছে, আছে আত্মমর্যাদা বোধ, বরং অনেক পুরুষের অপেক্ষাও অনেক বেশী ও তীব্র, সে কথা অনেক স্বামীই বেমালুম ভুলে যায়। স্ত্রীকে দাসী-বান্দী কিংবা জন্তু-জানোয়ার ও ইতরপ্রাণী মনে করা বর্বর ঘোঁড়া প্রকৃতির লোকদের স্বভাব। ইহা যেমন ঘৃণ্য, তেমনি পারস্পরিক পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে হুমকি স্বরূপ। তাই ইহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। পরস্পরের মর্যাদা-স্বাতন্ত্র্যের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া কথা-বার্তা বলা একান্তই আবশ্যক। ইহাও ইসলামেরই একটা বিশেষ অবদান।

উদ্ধৃত হাদীসে রাসূলে করীম (স) এর পঞ্চম ও শেষ কথাটি হইল, স্ত্রীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিও না। তাহাকে শাসন করার উদ্দেশ্যে কোন পর্যায়ে যদি তাহাকে যে শাসনই করিতে হয়, তাহা ঘরের মধ্যে রাখিয়াই করিবে। সাধারণত দেখা যায়,স্বামী একটু অসন্তুষ্ট হইলেই ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে গলা ধাক্কা দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয় কিংবা স্ত্রীর বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেয়। ইহা নিতান্তই মুর্খতামূলক, নিতান্তই বর্বরতা। ইহার অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়। (معالم السنن، بذل المجهود، مرقات)

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ اَنْ تَجِئَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ. (بخارى)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন হযরত নবী করীম (স) হইতে।. নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ স্বামী যখন তাহার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আসিবার জন্য আহবান জানাইবে তখন যদি সে আসিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা স্বামী যখন তাহার স্ত্রীকে তাহার নিজের শয্যায় আসিবার জন্য আহবান জানায় ইহা ইংগিত মূলক কথা। ইহার অর্থ, স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট সঙ্গম ইচ্ছা প্রকাশ করে ও সে জন্য ডাবে, এই সময় স্ত্রী যদি অস্বীকৃতি জানায়, স্বামীর ইচ্ছাপূরণে প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সেই স্ত্রীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকেন। ফেরেশতাগণ অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকেন, তাহার কারণ হইল, স্বামীর ইচ্ছাপূরণ করা স্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিবাহিত জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ইহা অন্যতম। কিন্তু স্ত্রী অস্বীকৃতিতে এই কর্তব্যও পালন হয় না এবং এই উদ্দেশ্যও ব্যাহত ও ক্ষুণ্ন হয়। আসলে যৌন সঙ্গম যদিও স্বামী স্ত্রী উভয়েরই যুগপৎ বাসনা ও ইচ্ছার ব্যাপার আর এক জনের ইচ্ছা জাগিলে সেই সময় অন্যজনও ইচ্ছুক হইবে, এমন কোন কথাও নাই। কিন্তু তবুও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্যের মধ্যে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যে, একে অপরের বাসনা চরিতার্থ করিবে। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরুষদের ইচ্ছা অনেক সময় অদম্য হইয়া থাকে এবং উহার চরিতার্থতা হইয়া পড়ে অপরিহার্য। কাজেই তাহার ইচ্ছা পূরণে স্ত্রীর বাধ্য ও প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইহা পরস্পরের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষা বা কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত থাকার ব্যাপার। দাম্পত্য জীবনের একজনের জন্য অপর জনের কষ্ট স্বীকার—অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গম কার্যে প্রবৃত্ত ও প্রস্তুত হওয়া এবং এই ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা করা গভীর দাম্পত্য প্রেম ও মনের ঐকান্তিক দরদ ও

সহানুভূতির ব্যাপারও। কিন্তু কোন কারণ ব্যতীতই স্ত্রী যদি স্বামীর আহবানকে অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে স্বামীর মন স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত ও অনাসক্ত হইয়া পড়িতে পারে। আর ইহা দাম্পত্য জীবনের স্থায়ীত্বের পক্ষে মারাত্মক। এমনকি, অনেক সময় ইহার দরুনই স্বামী স্ত্রীকে হঠাৎ রাগের বশবর্তী হইয়া তালাক পর্যন্ত দিয়া বসিতে পারে। সে অন্য স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিতে পর্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িতে পারে। শুরু হইতে এই পরিণতি পর্যন্ত প্রত্যেকটি ব্যাপারই অবাঞ্ছিত এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিরও কারণ। স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষণ হওয়ার কারণও ইহাই। বলা বাহুল্য, 'অভিশাপ' কথাটি তীব্র ক্ষোভ ও রোষ বুঝায়। আর যে ফেরেশতাদের আনুকূল্য ও সহযোগিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে জরুরী, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া যাওয়া চরম দুর্ভাগ্যের কারণ। حَتّٰى تُصْبِحَ সকাল বেলা হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ ফেরেশতাদের এই অভিশাপ বর্ষণ সকাল হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই কথা দ্বারা বুঝা যায়, সকাল বেলা হইলেই ফেরেশতা তাহাদের অভিশাপ বর্ষণ বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। সারারাত্রি ধরিয়া অভিশাপ বর্ষণ করা ও সকাল বেলা হইলেই রাত্রির অবসান হইলেই উহারও অবসান হইয়া যাওয়ার এই কথাটি সাধারণ রীতি অনুযায়ীই বলা হইয়াছে। কেননা স্বামী স্ত্রীকে সঙ্গম কাজের জন্য সাধারণত রাত্রি বেলাই আহবান করিয়া থাকে। দিনের বেলা ইহার সুযোগ সব স্বামীর জন্য সব সময় হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতাদের অভিশাপ—ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ সেই রাত্রিকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না, উহা থাকে সমগ্র রাত্রি ও দিন ব্যাপী। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি বর্ণনা হইতে এই কথা স্পষ্ট ও অধিক সমর্থিত হইয়াছে। সে বর্ণনাটির ভাষা এইঃ রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَأَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهَا فَتَأْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا. (مسلم)

যাঁহার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ তাহার শপথ, যে লোকই তাহার স্ত্রীকে তাহার শয্যায় আহবান জানাইবে, কিন্তু সে আহবানে সাড়া দিতে স্ত্রী অস্বীকৃত হইবে, তাহার প্রতিই আকাশ লোকে অবস্থানকারী ক্ষুব্ধ-অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবে—যতক্ষণ না সেই স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে। (মুসলিম)

এই হাদীসটির শেষ শব্দ حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا অর্থ যতক্ষণ না সেই স্বামী তাহার (স্ত্রীর) প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশলোকে অবস্থানকারী আল্লাহ্র ফেরেশতাগণও তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট থাকিবেন। ইহাতে ঘটনার রাত্রি পর্যন্তই সে ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি সীমাবদ্ধ থাকার কথা নাই, স্বামীর সন্তুষ্টি লাভ করা পর্যন্ত সে ক্ষোভের সীমা বলা হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, রাত্রির প্রথম বা মধ্যম প্রহরে স্বামীর আহবানে সাড়া না দেওয়ার ফলে স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতাদের ক্ষোভ সূচিত হইল। আর শেষ প্রহরে সাড়া দেওয়ার ফলে সে ক্ষোভের অবসান হইয়া গেল। ইহা এতদাপেক্ষাও দীর্ঘায়িত ও বিলম্বিত হইতে পারে। ইহা কতক্ষণ বা কতদিন থাকিবে তাহা নির্ভর করে শুধু স্বামীর ডাকে স্ত্রীর সাড়া দেওয়ার উপরই নহে, বরং স্বামীর সন্তুষ্টি পুনর্বহাল হওয়ার উপর।

হযরত জাবির (রা) হইতে মরফু (স্বয়ং রাসূলের কথা—সে পর্যন্ত সনদ সহ) হাদীস বর্ণিত হইয়াছে নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلٰوةٌ وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوْ وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتّٰى يَرْضٰى.

(ابن خزيمه، ابن حبان)

তিনজন লোকের নামায কবুল হয় না ও কোন নেক আমল উর্ধ্বলোকে উত্থিত হয় না। তাহারা হইলঃ পলাতক ক্রীতদাস—যতক্ষণ না সে ফিরিয়া আসে, নেশাপানে অস্থির মস্তিষ্ক—যতক্ষণ না সে পূর্ণ সুস্থতা পায় এবং সেই স্ত্রীলোক যাহার স্বামী তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট—যতক্ষণ না সে স্বামী সন্তুষ্ট হয়।

এই হাদীসটিতে বলা কথা অধিকতর কঠোর ও ভয়-উদ্দীপক। কেননা মুসলমানের প্রধান ইবাদত নামায যদি আল্লাহ্‌র নিকট কবুলই না হয় আর এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নেক আমলও যদি আল্লাহ্‌র নিকট স্বীকৃতি না পায়—নেক আমল হিসাবে যদি আমল নামায় লিপিবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহাপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতি তাহার পক্ষে আর কি হইতে পারে।

এই হাদীসটিতেও মেয়েলোকটির দুর্ভাগ্য যে রাত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, তাহা বলা হয় নাই। বরং ইহা দিন রাত্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

হযরত আবূ হুরাইরা হইতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত এই পর্যায়ের হাদীসটিও এখানে উল্লেখ্য। তাহা এইঃ হযরত আবূ হুরাইরা বলিয়াছেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَلْمَسُوْفَةَ وَالْمُغْلِسَةَ اَمَّا الْمَسُوْفَةُ فَهِىَ الْمَرْأَةُ الَّتِىْ اِذَا اَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ سَوْفَ وَالْمُغْلِسَةُ هِىَ الَّتِىْ اِذَا اَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ اِنِّىْ حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ. (كتاب النساء - ابن الجوزى)

স্বামী সঙ্গম উদ্দেশ্যে আহবান করিলে যে স্ত্রী বলেঃ হ্যাঁ, শীঘ্রই হইবে, আর যে বলে যে, আমি ঋতুবতী—অথচ সে ঋতুবতী নয়, এই দুইজন স্ত্রীলোকের প্রতি রাসূলে করীম (স) অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন।

ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, মুসলমান গুনাহগার ব্যক্তিকে ভয় দেখাইয়া হেদায়েতের পথে আনিবার উদ্দেশ্যে অভিশাপ দেওয়া জায়েয। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে ইহা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে কাহাকেও দূরে লইয়া যাওয়া ও উহা হইতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়। ইহা হইবে তাহাকে হেদায়েতের দিকে ফিরাইয়া আনা ও তওবা করিতে রাযী করানোর উদ্দেশ্যে।

(نيل الاوطار، فتح البارى)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ একটি মেয়েলোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিলঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

হে রাসূল! স্ত্রীর উপর স্বামীর কি কি অধিকার আছে?

জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ

لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَاِنْ كَانَتْ عَلٰى ظَهْرِ قَتَبٍ. (ابن ابى شيبه)

স্ত্রী তাহার স্বামীকে তাহার ইচ্ছা পূরণ হইতে নিষেধ করিবে না, যদি তাহা অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ সহকারেও হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় এই হাদীসটি ভাষা এইঃ

لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ تَنُّوْرٍ. (الطبرانى)

সে তাহার স্বামীকে তাহার ইচ্ছা পূরণ হইতে বিরত রাখিবে না—যদি তাহার (স্ত্রীর) চুলার উপর রান্না কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়ও হয়।

আর তাল্‌ক ইবনে আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ.

(ترمذى، نسائى، بزار)

স্বামী যদি তাহার যৌন প্রয়োজন পূরণার্থে তাহার স্ত্রীকে ডাকে, তাহা হইলে তাহার চলিয়া আসা উচিত—যদিও সে চুলার কাছে রান্না কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকা অবস্থায়ও হয়। ইহাতে যদি স্বামীর কোন মাল-সম্পদ নষ্ট হইয়া যায়, তবুও তাহার পরোয়া করা চলিবে না। কেননা স্বামীর ক্রোধের উদ্রেক করা অপেক্ষা কিছু জিনিস নষ্ট হওয়া অনেক সহজ।

ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষণের কথাটি এই আলোকে বুঝিতে হইবে যে, ফেরেশতারা খোদানুগত বান্দাহদের জন্য দোয়া করেন যখন তাহারা খোদানুগত্যমূলক কাজে নিমগ্ন থাকে। আর পাপী নাফরমান লোকদের জন্য বদ্‌দোয়া করিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা নাফরমানী ও পাপ কাজে লিপ্ত থাকে। ইহাই তাঁহাদের কাজ।

ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষণ এবং হযরত আবূ হুরাইরা বর্ণিত অপর হাদীস অনুযায়ী রাসূলে করীম (স)-এর অভিশাপ বর্ষণ হইতে একথা বুঝা যায় যে, মুসলমান ব্যক্তি যখন নাফরমানী করিতে শুরু করে তখন তাহাকে ভীত সতর্ক ও উহা হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা জায়েয। আর যদি নাফরমানী করিয়াই বসে, তাহা হইলে তাহাকে তওবা ও হেদায়েতের পথ অবলম্বনের আহবান জানাইতে হইবে এবং ইহা যাহাতে সে করে সেজন্য তাহার অনুকূলে দোয়া করিতে হইবে। (عمدة القارى)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত এই পর্যায়ের অপর একটি হাদীসের ভাষা হইলঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تَرْجِعَ. (بخارى،مسلم)

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করিয়া রাত্রি যাপন করে, তাহা হইলে ফেরেশতাগণ তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকে—যতক্ষণ না সে ফিরিয়া আসে।

অর্থাৎ স্ত্রী নিজের ইচ্ছা ও নিজের বশবর্তী হইয়া যদি স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করে, স্বামীর শয্যা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র শয্যা গ্রহণ করিয়া রাত্রি যাপন করে, তবে তাহার উপর ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষণ চলে যতক্ষণ না সে স্বামীর শয্যায় প্রত্যাবর্তন করে। আর স্বামীই যদি নিজের ইচ্ছা ও স্ত্রীর কোন অপরাধের কারণ ব্যতীত স্ত্রীর শয্যাত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবে তাহাতে স্ত্রীর উপর অভিশাপ পড়িবে না। ইহা হইতে জানা যায়, ফেরেশতাগণ গুনাহগার লোকদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকেন।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইঁহারা কোন্ ফেরেশতা? রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ফেরেশতা, না অন্যরা?

ইহার জওয়াবে বলা যাইতে পারে, এই দুইটি কথারই সম্ভাব্যতা আছে। তবে এই কাজে নিযুক্তি কিছু সংখ্যক ফেরেশতাও হইতে পারেন।

আসল কথা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের বহু প্রকারের ও বহু ধরনের কাজে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেই কিংবা বিশেষ একটি বিভাগে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকিতে পারেন।

এই হাদীস হইতে বুঝা যায়, স্বামীর সহিত সহযোগিতা করা স্ত্রীর কর্তব্য। সেই সেই কাজ করিতে সতত চেষ্টিত হওয়া উচিত যে যে কাজে স্বামী সন্তুষ্ট হয়—যদি তাহা শরীয়াত বিরোধী না হয়। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরুষদের সঙ্গম ইচ্ছা অদমনীয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাহা চরিতার্থ না হইলে অনেক সময় এই ইচ্ছা পুরুষদিগকে পাপের পথে ঠেলিয়া দিতে পারে। এই কারণে রাসূলে করীম (স) স্ত্রীদিগকে স্বামীদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য আহবান জানাইয়াছেন। এই সব হাদীসের মাধ্যমে। (عمد القارى، فتح البارى)

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস স্মরণীয়ঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. (ترمذى)

হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রী এমন অবস্থায় রাত্রি যাপন ও অতিবাহিত করে যে, তাহার স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযী)

হাদীসটি হইতে বুঝা যায়, একজন স্ত্রীলোকের বেহেশত লাভ যে সব জিনিসের উপর নির্ভরশীল; কিংবা যে সব আমলের দৌলতে একজন স্ত্রী বেহেশত লাভ করিবে, স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা ও তাহার প্রতি স্বামীর খুশী থাকা তাহার মধ্যে একটি। এই হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, যে স্ত্রী রাত্রি যাপন করে এমন অবস্থায় যে, তাহার প্রতি তাহার স্বামী সন্তুষ্ট—এই রাত্রি যাপন বিশেষ কোন রাত্রি নিশ্চয়ই নয়। বরং বিবাহিত জীবনের প্রতিটি রাত্র অর্থাৎ স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা বা অসন্তুষ্ট হইলে তাহাকে সেই অবস্থায় থাকিতে দেওয়া, তাহার অসন্তুষ্টি দূর করিয়া সন্তুষ্টির উদ্রেক করিতে চেষ্টা না করা ও বেপরোয়া হইয়া নিশ্চিন্ত রাত্রি যাপন করা স্ত্রীর জান্নাতে যাওয়ার অনুকূল হইতে পারে না।

ইবনে মাজাহ গ্রন্থেও এই হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে উহাতে بَاتَتْ অর্থ এর স্থান مَاتَتْ শব্দ বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ মৃত্যুবরণ করিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, স্ত্রীর মৃত্যুকালে স্বামী যদি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে বেহেশত লাভ করিবে। এই দুইটি বর্ণনা হইতে একই কথা জানিতে পারা যায়। আর তাহা হইল, বিবাহিত জীবনে স্বামীকে সব সময় সুখী ও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা এবং কখনই অসন্তুষ্ট না করা—অসন্তুষ্ট হইলে তাহার অসন্তুষ্টি দূর করিয়া দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। শুধু মৃত্যু কালীন সন্তুষ্টির জন্যও প্রয়োজন সারাটি দাম্পত্য জীবন ভরিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা। যে স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরোয়া করে না, তাহার পক্ষে বেহেশতে যাওয়া কঠিন।

কেননা সে হয়ত আল্লাহ্র হক্ আদায় করিয়াছে; কিন্তু স্বামীর হক্ অগ্রাহ্য করিয়াছে। অথচ স্বামীর হক্ হক্কুল ইবাদ। হক্কুল ইবাদ আদায় না করিলে হক্কুল্লাহও আদায় হয় না। পরিণামে উহার কোন মূল্যই হইবে না। (تحفة الاحوذى)

স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلَا تَأْذَنْ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَّفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ اَمْرِهٖ فَاِنَّهٗ يُؤَدِّىْ اِلَيْهِ شَطْرَهٗ. (بخارى، مسلم، نسائى، ابوداؤد، ترمذى، ابن حبان)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ স্বামী নিকটে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাহার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর রোযা রাখা জায়েয নয়। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাহার ঘরে স্ত্রী কাহাকেও প্রবেশের অনুমতি দিবে না। অনুমতি দেওয়া তাহার জন্য জায়েয নয়। আর স্বামীর নির্দেশ ছাড়াই স্ত্রী যে যে ব্যয় করিবে, উহার অর্ধেক স্বামীর প্রতি প্রত্যর্পিত হইবে। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে স্ত্রীর জন্য তিনটি বিধান দেওয়া হইয়াছে। প্রথম 'স্বামীর নিকটে উপস্থিত থাকার সময় তাহার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখিতে পারিবে না। রাখিলে তাহা তাহার জন্য হালাল হইবে না'।

ইহার দুইটি কথা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। একটি স্বামীর বিনা অনুমতিতে রোজা রাখিতে পারিবে না বলিতে বুঝাইয়াছে নফল রোযা। ফরয রোযা রাখা স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। এমন কি, স্বামী নিষেধ করিলেও—কোন বিশেষ কারণ ছাড়া ফরয রোযা রাখিতে হইবে। কেননা ইহা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। স্বামীর কথা শুনা ও পালন করা কর্তব্য আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করার পরে, তাঁহার নাফরমানী করিয়া নয়। এই রূপ অবস্থা হইলে স্ত্রী স্পষ্ট কণ্ঠে স্বামীকে বলিয়া দিবে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দী, তোমার নহি।

দ্বিতীয় কথা, স্বামী উপস্থিত থাকার সময় বা অবস্থায়ও অর্থাৎ স্বামী বাড়িতে ও নিকটে উপস্থিত থাকাকালে যে কোন সময় সে তাহাকে সংগমের জন্য আহবান করিতে পারে এবং তাহা করিলে সে আহবানে তাহাকে সাড়া দিতে হইবে। কিন্তু রোযাদার হইলে তাহা সম্ভব হইবে না। এই কারণে স্বামীর বিনানুমতিতে রোযা রাখা স্ত্রীর জন্য জায়েয নয়। তবে পূর্বে অনুমতি লইয়া নফল রোযা রাখিলে সাধারণতঃই আশা করা যায় যে, দিনের বেলা রোযা থাকা অবস্থায় রোযা ভংগকারী কোন কাজে সে নিশ্চয়ই আহবান জানাইবে না।

আবূ দায়ূদে এই হাদীসটির ভাষা এই রূপঃ

لَا تَصُوْمَنَّ اِمْرَاَةٌ يَوْمًا سِوٰى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

রমযান মাস ব্যতীত স্বামীর উপস্থিতিতে তাহার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী কক্ষণই কস্মিনকালেও রোযা রাখিবে না।

আর তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা হইলঃ

لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

রমযান মাস ছাড়া কোন একটি দিনও স্বামীর উপস্থিত থাকা সময়ে তাহার অনুমতি ব্যতীত কোন স্ত্রী রোযা রাখিবে না।

'স্বামী উপস্থিত থাকা সময়ে' বলিয়া এই সুযোগ বাহির করা হইয়াছে যে, স্বামী বাড়িতে উপস্থিত না থাকিলে—বাহিরে সফরে চলিয়া গিয়া থাকিলে তখন নফল রোযা রাখা সম্পূর্ণ জায়েয এবং তাহাতে স্বামীর অনুমতি লওয়ার কোন প্রয়োজন হইবে না। কেননা স্বামী বাহিরে চলিয়া গিয়া থাকিলে তখন দিনের বেলা ফিরিয়া আসিয়াই সঙ্গম কাজে ডাকিবে না। ইহার সম্ভাবনাও থাকে না।

হাদীস ব্যাখ্যাকারী আল্লামা কিরমানী বলিয়াছেনঃ এখানে রোযা রাখিতে যে নিষেধ করা হইয়াছ ইহা হইতে উহা অর্থাৎ স্বামীর উপস্থিতিতে তাহার অনুমতি না লইয়া নফল রোযা রাখা হারাম হইয়া গিয়াছে। ইমাম নববী বলিয়াছেনঃ ইহা মাকরূহ। বিনানুমতিতে কোন স্ত্রী যদি রোযা রাখেই তবে এই রোযা সহীহ-হইবে। তবে সে গুনাহগার হইবে। আর মুহাল্লাব বলিয়াছেন, এই নিষেধে মাকরূহ তানজীহ প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণ হারাম করিয়া দেওয়া হয় নাই। পছন্দ করা হয় নাই এইটুকুই মাত্র। এতদসত্ত্বেও রোযা রাখা হইলে তাহাতে গুনাহগার হওয়ার কোন কারণ নাই।

দ্বিতীয় বিধান, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরে কোন লোককে আসিবার অনুমতি দেওয়া সম্পর্কে হাদীসের ভাষা হইলঃ وَلاَ تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও তাহার স্বামীর ঘরে আসার অনুমতি দিবে না, কোন পুরুষকে তো নয়ই, তাহার স্বামী যে মেয়েলোকের আসা পছন্দ করে না, সেই মেয়ে লোককেও নয়। কেননা এইরূপ করা হইলে স্বামীর মনে মন্দ ধারণা ও খারাপ সন্দেহ সৃষ্টি হইতে পারে এবং স্বামীর মনে অপমান বোধ জাগিতে পারে। আর তাহা হইলে দাম্পত্য জীবনে চরম ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এখানকার ভাষা হইল وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ 'স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকা কালে তাহার অনুমতি ছাড়া'। কিন্তু এখানেও স্বামী উপস্থিত থাকার কথাটা অবান্তর ও অর্থহীন মনে হয়। কেননা ইহার দরুন অর্থ দাঁড়ায় এই যে, স্বামীর উপস্থিতিতে তাহার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও ঘরে আসিতে দেওয়া নিষেধ আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাহার অনুমতি ব্যতীরেকে কাহাকেও ঘরে আসিতে দেওয়া জায়েয। অথচ ইহা মোটেই যথার্থ কথা নয়। স্বামীর উপস্থিতিতে কাহাকেও আসিতে দিলে যতটা অন্যায় হওয়ার আশংকা স্বামীর অনুপস্থিতিতে কাহাকেও আসিতে দিলে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী অন্যায়—অনেক বেশী সন্দেহের কারণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। স্বামী যদি জানিতে পারে—জানিতে পারা খুবই স্বাভাবিক যে, অমুককে তাহার উপস্থিতিতে ঘরে প্রবেশ করিতে দেয় না; কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিকালে খুব আসিতে দেয়, তাহা হইলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়, তাহা বুঝিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এই কারণে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাহার অনুপস্থিতি কালে তো কাহাকেও ঘরে আসিতে দেওয়া উচিত নয়—এই সময় তো আরও বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেননা যে ঘরে বাড়ীর মালিক অনুপস্থিত, সে ঘরে ভিন্ পুরুষের প্রবেশ করার নিষেধ কুরআন মজীদে এবং সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সেই প্রয়োজন যাহার, অনুমতিক্রমে তাহার প্রবেশ করা ও প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া মাত্র চলিয়া যাওয়ায় কোন দোষ নাই। এইরূপ সাময়িক ও আকস্মিক কারণে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলে স্বামীর বিমানুমতিতে হইলেও কোন দোষ হইবে না। কেননা নিতান্ত ও আকস্মিক কাজের প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করার দরকার হইয়া পড়িয়াছে বিধায় ইহার পূর্বে অনুমতি লওয়া তো সম্ভবপর নয়।

আর তৃতীয় কথা, স্বামীর আদেশ কিংবা স্বামীর কাজ ছাড়া অপর কোন কাজে অর্থ ব্যয় করিলে অর্থাৎ কোন দান খয়রাত করিলে তাহার অর্ধেক সওয়াব স্বামীকে দেওয়া হইবে। এই কথাটির সঠিক তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় হযরত আবূ হুরাইরা বর্ণিত অপর একটি হাদীস হইতে। তাহা এইঃ

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ

স্ত্রী যদি স্বামীর উপার্জন হইতে কিছু দান-সাদকা নিজস্বভাবেও স্বামীর আদেশ ব্যতিরেকে করে, তাহা হইলে স্বামী উহার অর্ধেক সওয়াব পাইবে।

ইহা হইতে একথা স্পষ্ট হয় যে, স্বামীর উপার্জনের উপর স্ত্রীর যথেষ্ট অধিকার আছে। অধিকার আছে তাহা হইতে তাহার অনুমতি ব্যতীতই দান-সাদকা করার। সে দান-সাদকার সওয়াব কেবল স্ত্রীই পাইবে না, পাইবে না কেবল স্বামীই। বরং উভয়ই আধা-আধি হারে পাইবে। স্বামী পাইবে এই জন্য যে, উহা তাহারই উপার্জন। আর স্ত্রী পাইবে এই জন্য যে, সে উহা দান করিল। আবূ দায়ূদের বর্ণনার ভাষা হইলঃ

فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ

স্ত্রী এই দান-সাদকার সওয়াবের অর্ধেক পাইবে।

কিন্তু ইমাম খাত্তাবী হাদীসের يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন ব্যয় করা সম্পদের দৃষ্টিতে। স্ত্রী যদি স্বামীর আদেশ ব্যতীত মূল কর্তব্যের অধিক মাত্রায় ব্যয় করিয়া বসে, তবে উহার অর্ধেক পরিমাণ ক্ষতি পূরণ করিতে ও তাহা স্বামীকে আদায় করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। কেননা উহা অতিরিক্ত ব্যয় রূপে গণ্য। আল্লামা কিরমানী বলিয়াছেন, স্ত্রী যদি স্বামীর ধন-মাল হইতে তাহার অনুমতি ব্যতীত যথা নিয়মে ও প্রচলিত পরিমাণের অধিক নিজের জন্যও ব্যয় করে তাহা হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত যাহা করিবে তাহা স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে সে বাধ্য হইবে। এই কারণে যে, তাহার জন্য যাহা নির্দিষ্ট তাহার অপেক্ষা বেশী খরচ করিয়া বসিয়াছে। تلويح গ্রন্থকার বলিয়াছেন يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ র অর্থ দান-সাদকার সওয়াব যতটা দাতা স্ত্রী পাইবে ততটাই পাইবে তাহার স্বামী। সওয়াব পাওয়ার ক্ষেত্রে দুইজন আধা-আধি ভাগে সমান পাইবে। ইহর দলীল হইল; নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اَلدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

ন্যায় পথ প্রদর্শকও ন্যায় কাজের কর্মীর মতই সওয়াব পাওয়ার অধিকারী।

ইহা হইতে সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে স্বামীতে স্ত্রীতে পূর্ণ সাম্য ও সমতা বুঝা যায়। দানটি স্বামীর ধন-মাল হইতে হইলেও দান করার পথটাতো স্ত্রী-ই দেখাইয়াছে।

ইবনুল মুরাবিত বলিয়াছেনঃ হাদীসের এই কথাগুলিতে সেই ব্যয় সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যাহা প্রচলিত ব্যয়ের বহির্ভূত—সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত। মুয়াবীয়ার স্ত্রী হিন্দার ব্যাপারে রাসূলে করীম (স) এই ফয়সালাই দিয়াছিলেন। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

إِنَّ لِلْخَازِنِ فِيمَا أَنْفَقَ أَجْرًا وَلِلزَّوْجَةِ أَجْرًا يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ

খাজাঞ্জী বা ক্যাশ রক্ষাকারী যাহা যাহা ব্যয় করিবে তাহাতে সে একটা সওয়াব পাইবে। স্ত্রীর জন্যও এই রূপ সওয়াব রহিয়াছে। তবে তাহা প্রচলিত নিয়মে ও পরিমাণে হইতে হইবে

এই অর্ধেক সওয়াব তাহারই যাহা দান করার প্রচলিত নিয়মে স্ত্রীর অধিকার রহিয়াছে। কিরমানী ইহাও বলিয়াছেন যে, বুখারী বর্ণিত অপর একটি হাদীস এই কথার পরিপন্থী। সে হাদীসটি এইঃ

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ

স্ত্রী যদি স্বামীর উপার্জন হইতে তাহার আদেশ ব্যতীতই ব্যয় বা দান করে তাহা হইলে সেই স্বামী উহার অর্ধেক সওয়াব পাইবে।

ইহার কারণ এই যে, স্ত্রী নিজে যে পরিমাণ ব্যয় করার অধিকারী, স্বামীর মালে উহার সহিত দান করা জিনিস সংমিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে তাহাতে দুইটি অংশ দুই জনের আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ইহার বিপরীত কথা এই বলা যায় যে, তাহা যদি হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও স্ত্রী যে অতিরিক্ত পরিমাণ ব্যয় করিয়াছে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না—যদিও স্বামী তাহার এই ব্যয়ে সন্তুষ্ট বা রাযী না হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যায় ইহা প্রমাণিত হয় না। হযরত ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা) হইতে যুগপৎ ভাবে বর্ণিত হাদীস এইঃ রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَا تَتَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ. (ابن الجوزى)

স্ত্রী স্বামীর ঘর হইতে তাহার অনুমতি ব্যতীত কোন দান-সাদকাই করিবে না। যদি করে, তাহা হইলে উহার সওয়াব স্বামী পাইবে, আর স্ত্রীর উপর গুনাহের বোঝা চাপিবে। অনুরূপভাবে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত একটি দিনও নফল রোযা রাখিবে না। যদি রাখে তবে সে গুনাহগার হইবে। রোযার কোন শুভ ফলই সে পাইবে না।

আর হযরত আবূ হুরাইরা বর্ণিত অপর একটি হাদীস হইলঃ

إِنَّهُ سُئِلَ الْمَرْأَةُ تَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَأَمَّا مِنْ مَالِهِ فَلَا -

স্ত্রী স্বামীর ধন-মাল হইতে দান-সাদকা করিবে কিনা এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, না। তবে তাহার জন্য দেওয়া বরাদ্ধকৃত সম্পদ হইতে করিতে পারে। তাহা করিলে উহার সওয়াব স্বামী-স্ত্রী দুইজনের মধ্যে বিভক্ত হইবে। কিন্তু স্বামীর মাল হইতে স্ত্রী কিছুই ব্যয় করিবে না।

শেষে উদ্ধৃত করা এসব হাদীসের আলোকে প্রথমোদ্ধৃত হাদীসটির সঠিক তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। (عمدة القارى)

স্ত্রীর পক্ষে উত্তম ব্যক্তি

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. (ترمذی، ابن ماجه، مسند احمد)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ মু'মিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই লোক, যে লোক চরিত্রের দিকদিয়া তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর তোমাদের যে সব লোক তাহাদের স্ত্রীদের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণকর, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও কল্যাণময় লোক তাহারাই।

(তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে দুইটি কথা বলা হইয়াছে। প্রথম কথায় ঈমান ও চরিত্রের সম্পর্কের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কথাটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যায়ের। এই দুইটি কথার মধ্যে বাহ্যতঃ কোন সম্পর্ক আছে মনে না হইলেও মূলত এই দুইটির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রথম কথাটি হইলঃ চরিত্রের বিচারে যে লোক সর্বোত্তম—সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী যে লোক, ঈমানের পূর্ণত্বের দিকদিয়া সেই লোক সর্বাধিক অগ্রসর—সেই অন্যান্যদের তুলনায় অধিক পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী। ইহার কারণ এই যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান সর্বোত্তম চরিত্র সৃষ্টি করে। সর্বোত্তম চরিত্র পূর্ণাঙ্গ ঈমানের ফসল। পূর্ণাঙ্গ ঈমান যেখানে বর্তমান, সর্বোত্তম চরিত্র সেখানে অবশ্যম্ভাবী। কাহারও চরিত্র মন্দ বা ত্রুটিযুক্ত দেখিতে পাইলে নিঃসন্দেহে বোঝা যাইতে পারে যে, তাহার ঈমানে ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা পূর্ণাঙ্গ নয়। আর এই পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও উন্নত উত্তম চরিত্রই নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কল্যাণ কামনা ও মঙ্গল সাধনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এই তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই রাসূলে করীম (স)-এর দ্বিতীয় কথাটি অনুধাবনীয়।

তাই হইল, তোমাদের মধ্যে যে সব লোক তাহাদের স্ত্রীদের প্রতি অধিক কল্যাণকামী ও মংগলকারী, তাহারাই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম লোক। ইহার কারণ হইল, পূর্ণাঙ্গ ঈমান মানুষকে সর্বাধিক চরিত্রবান বানায়। সর্বাধিক উত্তম চরিত্রের একটা বিশেষ বাস্তব প্রতিফলন ঘটে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কল্যাণ সাধনে। আর মানব সমাজের দুর্বলতম অংশ হইল নারী সমাজ। কাজেই তাহাদের কল্যাণ কামনায় ও মংগল সাধনে সেই ঈমান ও উন্নত চরিত্রের তাকীদে অধিকতর তীব্র সচেষ্টা ও সদা তৎপর হওয়া স্বাভাবিক। অন্য কথায় নারীগণকে দুর্বল ভাবিয়া তাহাদের প্রতি যাহারা অসদাচরণ করে, দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন নিষ্পেষণ চালায়, তাহারা পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার নয়। পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার নয় বলিয়াই তাহারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী নয়, নয় ভাল মানুষ। বরং তাহারা নরাধম, পাষন্ড।

এই পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীস উল্লেখ্য। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. (ترمذی)

তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে লোক উত্তম ও অধিক কল্যাণ সাধক তাহার পরিবার বর্গের জন্য। আর আমি তোমাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে আমার পরিবার বর্গের জন্য অধিক কল্যাণকামী ও মঙ্গল সাধক।

ইহা হইতেও স্পষ্ট জানা গেল যে, কল্যাণের মর্যাদা ও উহাতে অভিষিক্ত হওয়া সম্ভব তাহার পক্ষে, যে লোক নিজ পরিবার বর্গের প্রতি অন্যান্যের তুলনায় অধিক কল্যাণবহ। কেননা ব্যক্তির নিকট হইতে হাসি খুশী, উত্তম চরিত্র, আচার-আচরণ, দয়া-সহানুভূতি, কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ প্রতিরোধ ইত্যাদি পাওয়ার অন্যান্যদের তুলনায় বেশী অধিকারী হইতেছে তাহার পরিবারবর্গ। কাজেই কেহ যদি এইরূপ হয় তবে সেই যে সকল মানুষের তুলনায় অতীব উত্তম ব্যক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে—সে তুলনামূলকভাবে অধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি হইবে। বস্তুত বহু মানুষই এই আবর্তের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এমন দেখা যায়, একটি লোক তাহার পরিবার বর্গের ব্যাপারে নিকৃষ্ট আচার-আচরণ অবলম্বন করিতেছে। নিকৃষ্ট চরিত্র ও অধিক লোভী বা কৃপণ হওয়ার প্রমাণ দিতেছে; কিন্তু বাহিরের লোকদের সহিত তাহার আচার আচরণ অতিশয় মধুর, কল্যাণবহ। হাসিমুখে তাহাদিগকে বরণ করিতেছে, কথা বার্তা বলিতেছে ও আদর অপ্যায়ন করিতেছে। এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত মানুষত্ব ও কল্যাণ বঞ্চিত, পথ ভ্রষ্ট। (نيل الاوطار)

বস্তুত রাসূলে করীম (স) এই সব বাণীর মাধ্যমে যে আদর্শ সমাজ গঠন করিতে সচেষ্ট ছিলেন, সেখানে নারী জাতি সর্বদিক দিয়াই সুখী ও মর্যাদাবতী এবং পুরুষ ও নারীর বৈধ দাম্পত্য জীবন কেন্দ্রিক পরিবার ইসলামে অধিকতর গুরুত্বের অধিকারী। রাসূলে করীম (স) আদর্শ ও উন্নত সমাজ গঠনে জন্য উহার পূর্বে আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ পরিবার গঠন এবং উহারও পূর্বে আদর্শ ঈমানদার চরিত্রবান ব্যক্তি—পুরুষ ও নারী তৈরী করার বাস্তব প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত হাদীস সমূহ এই পর্যায়েরই পবিত্র ভাবধারায় সমন্বিত।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى اَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ فَقَالَ اَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلَّا اَنْ يَاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِلَّا اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَاْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. (ترمذی، ابن ماجه)

সুলাইমান ইবনে আমর ইবনুল আহ্ওয়াচ্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার পিতা আমর ইবনুল আহওয়াচ্ (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ও শরীক ছিলেন। সেই সময়ে এক ভাষণ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স) সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর অনেক ওয়ায ও নছীহত করিলেন। এই ভাষণেই তিনি বলিলেনঃ লোকগণ! সাবধান হও। নারীদের প্রতি তোমরা কল্যাণকামী হও এবং তাহাদের কল্যাণ প্রসঙ্গে যে নছীহত করিতেছি তাহা কবুল কর। মনে রাখিও, অবস্থা এই যে, তাহারা তোমাদের হাতে বাঁধা। তোমরা তাহাদের নিকট হইতে উহা ছাড়া আর কিছুই পাইবার অধিকারী নও। তবে যদি তাহারা কোন রূপ স্পষ্ট প্রকট নির্লজ্জতার কাজ করে তাহা হইলে—। যদি তাহারা এইরূপ কিছু করে, তাহা হইলে শয্যায় তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর। আর শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে মার—তবে জঘন্য ও বীভৎস ধরনের নয়। ইহার পর তাহারা যদি তোমাদের অনুগত হয়, তাহা হইলে তাহাদের ব্যাপারে একবিন্দু সীমালংঘন করিবে না। তোমরা জানিয়া রাখ, তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের উপর অধিকার আছে। আর তোমাদের স্ত্রীদেরও অধিকার আছে তোমাদের উপর। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যে অধিকার আছে, তাহা এই যে, তোমরা যাহাদিগকে অপছন্দ কর তাহারা তোমাদের শয্যা মাড়াইবে না। অনুরূপভাবে যাহাদিগকে তোমরা পছন্দ কর না, তাহাদিগকে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিবে না। আরও জানিয়া লও, তোমাদের উপর তাহাদের অধিকার হইল, তাহাদের খাওয়া ও পরার ব্যাপারে তাহাদের প্রতি তোমরা অধিক মাত্রায় মহানুভবতা ও অনুগ্রহ মূলক আচরণ গ্রহণ করিবে।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা এই দীর্ঘ হাদীসটির আসল বক্তব্য সুস্পষ্ট। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত এতৎসংক্রান্ত হাদীস সমূহের প্রেক্ষিতে ইহার তাৎপর্য অনুধাবন করিতে হইবে।

এই হাদীসটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে রাসূলে করীম (স)-এর বিদায় হজ্জে দেওয়া ভাষণের অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ইহাতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক অধিকারের কথা একই সঙ্গে বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই হাদীসটিতে স্ত্রীদের প্রতি গ্রহণীয় আচরণ পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাও উদ্ধৃত হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) এই পর্যায়ের কথা, শুরু করিয়াছেন এই বলিয়াঃ

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

এই কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে—নারী প্রকৃতির রহস্য—আলোচনায় পেশ করা হইয়াছে।

কিন্তু এই বাক্য হইতে একথা স্পষ্ট হয় যে, রাসূলে করীম (স) অতঃপর যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সবই বলিয়াছেন নারী সমাজের সঠিক মর্যাদা নির্ধারণ এবং তাহাদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে।

নারীদের মর্যাদা বুঝাইবার জন্য প্রথমেই বলিয়াছেনঃ হে পুরুষরা! তাহারা তোমাদের নিকট বাঁধা পড়িয়াছে। তোমরা এতদ্ব্যতীত আর কোন কারণেই তাহাদের প্রতি কড়া শাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা তাহাদের গায়ে হাত দিতে পার না যে, তাহারা কোন প্রকাশ্য অসদাচরণ ও নির্লজ্জতা মূলক কাজ করিয়া বসিবে। অর্থাৎ তাহারা তোমাদের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এবং অসহায় ও অক্ষম দুর্বল পাইয়া তোমরা তাহাদের প্রতি কোন রূপ খারাপ ব্যবহার করিতে পারনা। কেননা তাহারাও মানুষ এবং তাহাদের আত্মমর্যাদা ও সম্মান রহিয়াছে। সাধারণভাবে তাহারা তোমাদের প্রতি অতীব উত্তম মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ পাইবার অধিকারী। তবে যদি কোন সময় তাহারা কোন নির্লজ্জতামূলক অশ্লীল কাজ করিয়া বসে; তবেই তোমরা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী, তাহার পূর্বে নয়। আর তেমন কোন কাজ করিলে (কি কি কাজ করিলে তাহা ইতিপূর্বে এক হাদীসের ব্যাখ্যায় সবিস্তারে বলা হইয়াছে।) তোমরা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

এই পর্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের কাজ হইল, শয্যা বা বিছানায় স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর সর্বশেষ নিরূপায়ের উপায় হিসাবে তাহাদিগকে কিছুটা হালকা ধরনের দৈহিক শাসন দান। এ সম্পর্কে ব্যবহৃত শব্দ হইল غَيْرُ مُبَرِّحٍ ইহার অর্থঃ غَيْرُ شَاقٍّ 'অতীব কষ্ট দায়ক, সহ্যাতীত ও কঠোর নয় এমন। ইহার ফলে তাহারা যদি পথে আসে ও তোমাদের অনুগত হয়, তাহা হইলে পূর্বের সেই ব্যাপারের জের হিসাবে অতঃপর তাহাদের সহিত একবিন্দু খারাপ ব্যবহার করিতে পারিবে না। পারিবে না কোনরূপ রুঢ় কড়া কথা বলিতে বা দৈহিক কষ্ট ও পীড়ন দিতে।

ইহার পর পারস্পরিক অধিকারের কথা বলা হইয়াছে। এক বাক্যেই এই পারস্পরিক অধিকারের কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাক্যের প্রথম অংশে বলা হইয়াছে, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার আছে এবং দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে, তোমাদের উপরও তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার আছে। যেহেতু এই কথাগুলি বলা শুরু হইয়াছিল পুরুষদের সম্বোধন করিয়া। আর ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষরাই সমাজে ও পরিবারের প্রধান। সামাজিক ও পারিবারিক ভাল মন্দের জন্য প্রধানত পুরুষরাই দায়ী। পুরুষরা যেমন ভাল করিতে পারে তেমনি পারে মন্দ করিতেও। রাসূলে করীম (স) তাঁহার ইসলামী সমাজ ও পরিবার গঠনের জন্য দেওয়া নীতি ও আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য পুরুষদিগকেই দায়িত্বশীল বানাইয়া দিলেন এই ভাষণে।

স্ত্রীদের উপর পুরুষদের অধিকার পর্যায়ে এই হাদীসে মাত্র দুইটি মৌলিক কথা বলা হইয়াছে। প্রথম فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ইহার অর্থঃ 'কোন ভিন্ পুরুষকে তাহাদের সহিত কথা বলিতে দিবে না।' বস্তুত তদানীন্তন আরব সমাজে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী সব পুরুষ সব মেয়েলোকের সহিতই

অবাধে কথা বলিত। ইহাতে সেই স্ত্রীদের স্বামীরা কোন দোষ দেখিতে না এবং ইহাতে তাহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয় জাগিত না। ইহা পর্দা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা। যাহা আরব জাহিলিয়াতের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। বাক্যটির শব্দ وَطِئَ الْفِرَاشِ অর্থ 'ব্যভিচার নয়'। কেননা তাহা তো চিরন্তন হারাম। তাহাতে مَنْ تَكْرَهُوْنَ 'যাহাকে তোমরা পছন্দ কর না—অপছন্দ কর'—এই কথার তো কোন প্রশ্ন উঠে না। ইহার সঠিক অর্থ হইল, স্বামী পছন্দ করে না এমন কোন পুরুষ বা মেয়ে লোককে ঘরে প্রবেশ করিতে, ঘরে আসিয়া বিছানায় বসিতে ও কথাবার্তা বলার অনুমতি দিবে না। সে পুরুষ মহররম হইলেও না। তবে স্বামী নারাজ হইবে না বা আপত্তি করিবে না এমন মুহররম পুরুষ সম্পর্কে কোন নিষেধ নাই। পরবর্তী বাক্যটি ইহারই ব্যাখ্যা দেয়।

আর স্বামীদের উপর স্ত্রীদের অধিকার পর্যায়ে এখানে শুধু একটি কথাই বলা হইয়াছে। তাহা হইল, খাওয়া পরার ব্যাপারে তাহাদের প্রতি শুভ ও উদার আচরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

বস্তুত যেখানে যাহা কিছু অধিকার, সেখানেই তাহার সেই পরিমাণ কর্তব্য। অনুরূপ ভাবে যেখানে যাহার যতটা কর্তব্য, সেখানেই তাহার ততটা অধিকার। ইহা আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান কর্তৃক নিজস্ব ভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত হইলেও মূলত ইহা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তক প্রচারিত। তাহা উক্ত কথা হইতেই সুন্দর ভাবে প্রতিভাত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলিম শরীফে নবী করীম (স)-এর ভাষণের এই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে এই ভাষায়ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ اَلاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র বাণী ও বিধানের ভিত্তিতে গ্রহণ করিয়াছ এবং তাহাদের স্ত্রী অঙ্গ হালাল পাইয়াছ আল্লাহ্‌রই বিধান অনুযায়ী। আর তাহাদের উপর তোমাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাহারা তোমাদের শয্যাকে এমন কাহারও দ্বারা দলিত হইতে দিবে না যাহাদিগকে তোমরা অপছন্দ কর। তাহারা যদি তাহা করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে মারিতে পার অ-তীব্র অ-কঠোর হালকা মার। কিন্তু সর্বাবস্থায় প্রচলিত মানে ও নিয়মে তাহাদের খোরাক-পোশাক বাসস্থান অর্থাৎ রিযিক দেওয়া তোমাদের কর্তব্য ও তোমাদের উপর তাহাদের হক—অধিকার।

বর্ণনাটির এই ভাষায় প্রথম দুইটি বাক্য অভিনব ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ। তাহা হইল, পুরুষরা স্ত্রীদের গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র কালেমার ভিত্তিতে এবং তাহাদের স্ত্রী অঙ্গ নিজেদের জন্য হালাল বানাইয়া লয় কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী। বস্তুত পুরুষরা—স্বামীরা—এই কথা বিস্মৃত না হইলে স্ত্রীদের অধিকার হরণ ও তাহাদের মান-মর্যাদার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিত না। আল্লাহ্‌র ভয়ে তাহাদের হৃদয়-মন সদা কম্পিত থাকাই হইত স্বাভাবিক।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نِسَاءُنَا مَانَأْتِىْ مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ قَالَ إِئْتِ حَرْثَكَ أَنّٰى شِئْتَ وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسِهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَقْبَحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ. (ابوداؤد)

হযরত মুয়াবীয়া আল কুশাইরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন; আমি বলিলাম, হে রাসূল আমাদের স্ত্রীদের কোন্ অংশ আমরা ব্যবহার করিব, আর কোন্ অংশ ছাড়িয়া দিব? জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তোমার ক্ষেতে যে ভাবে ও যেদিক দিয়াই ইচ্ছাকর আসিতে ও ব্যবহার করিতে পার। তাহাকেও খাইতে দিবে যখন তুমি খাইবে, তাহাকে পরিতে দিবে যখন তুমি পরিবে। আর তাহার মুখমণ্ডল কুৎসিত বীভৎস করিবে না, মারিবে না। (আবূ দায়ূদ)

ব্যাখ্যা এই হাদীসটি বর্ণনাকারী হযরত মুয়াবীয়া আল কুশাইরী হইতে বর্ণিত। এই পর্যায়েরই আরও একটি হাদীস ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে উদ্ধৃত হাদীসটিতে সাহাবীর প্রশ্ন ছিল স্ত্রীর কোন্ অঙ্গ যৌন উদ্দেশ্য পূরণার্থে ব্যবহার করিব এবং কোন্ অংশ নয়। সেই সম্পর্কে রাসূল করীম (স) প্রশ্নের জওয়াবে যাহা বলার তাহাতো বলিয়াছেনই। সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের কথাও বলিয়া দিয়াছেন। বস্তুত রাসূলে করীম (স)-এর কথা বলার ধরণই ছিল এই। তিনি শুধু জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জওয়াব দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, প্রসঙ্গত আরও যাহা বলার এবং প্রশ্নকারীর মনস্তত্ত্বের প্রেক্ষিতে ও আনুসঙ্গিক দায়িত্ব হিসাবে যাহা বলা তিনি জরুরী মনে করিতেন তাহাও তিনি বলিয়া দিতেন।

সাহাবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন শুধু একটি কথাঃ স্ত্রীর কোন্ অঙ্গ যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিব, আর কোন্ অঙ্গ ব্যবহার করিব না? জওয়াবে নবী করীম (স) বলিলেনঃ স্ত্রীর যৌন অঙ্গই তোমার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত। এই ক্ষেতে চাষাবাদ করা ও সেই চাষাবাদের ফলে উহা হইতে ফসল পাইতে চাওয়া ও ফসল যাহা হয় তাহা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করাই কৃষকের কাজ। স্ত্রীর যৌন অঙ্গে চাষাবাদ করার জন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম বা পদ্ধতি নাই। কৃষকের নিকট ক্ষেতই হয় আসল লক্ষ্য। নির্দিষ্ট ক্ষেত ছাড়া সে অন্যত্র লাঙ্গল চালায় না, পরিশ্রম করে না। স্বামীর নিকট স্ত্রীর যৌন অঙ্গও ঠিক অনুরূপ সন্তানের ফসল ফলাইবার ক্ষেত বিশেষ। রাসূলে করীম (স) এই কথাটিতে কুরআন মজীদের ভাষা হুবহু অনুসৃত ও প্রতিফলিত হইয়াছে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (البقرة: ٢٢٣)

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত। তোমরা তোমাদের সেই ক্ষেতে গমন কর যেভাবে যে দিক দিয়াই তোমরা ইচ্ছা কর।

অর্থাৎ স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ছাড়া তাহার দেহের অন্য কোন অঙ্গ যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়—নয় স্বাভাবিক। ইহা ছিল সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়। আর ইহা নিছক

স্বামীর অধিকার ও ভোগ সম্ভোগ সম্পর্কিত বিষয়। কিন্তু রাসূলে করীম (স) এই কথাটুকু বলিয়া ও স্বামীর অধিকারের কথাটুকু জানাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না। তিনি সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের কথাও বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন এবং বলিলেনঃ স্ত্রীর খাওয়া পরা যথাযথ জোগাইয়া দেওয়া স্বামীর প্রধান কর্তব্য। ইহার প্রতি কোনরূপ উপেক্ষা অবহেলা প্রদর্শন এবং কেবল নিজের অধিকারটুকু যেমন ইচ্ছা আদায় করিয়া লওয়া মানবিক ও মানবোচিত কাজ হইতে পারে না। অধিকার আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কর্তব্যটুকুও যথাযথ পালন করিতে হইবে।

এই সঙ্গে আবূ দায়ূদ উদ্ধৃত ও হযরত মুয়াবীয়া আল-কুশাইরী বর্ণিত অপর একটি বর্ণনাও উল্লেখ্য। হাদীসটি এইঃ

اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا تَقُوْلُ فِىْ نِسَائِنَا قَالَ اَطْعِمُوْهُنَّ مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُنَّ مِمَّا تَكْسُوْنَ وَلاَ تَضْرِبُوْهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوْهُنَّ

আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিলাম এবং তাঁহাকে বলিলামঃ আপনি আমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বলিলেনঃ তোমরা তাহাদিগকে খাইতে দিবে যাহা তোমরা খাও তাহা হইতে, তাহাদিগকে পরিতে দিবে যাহা কিছু তোমরা পরিধান কর তাহা হইতে। আর তাহাদিগকে কখনও মারধর করিবে না এবং তাহাদিগকে কখনও কুৎসিত ও বীভৎস করিবে না।

মুসনাদে আহমাদ, আবূ দায়ূদ ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এই হাদীসটির ভাষা এই রূপঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَلَهُ رَجُلٌ مَاحَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ تُطْعِمُهَا اِذَا طَعَمْتَ وَتُكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَتَهْجُرْ اِلاَّفِى الْبَيْتِ

নবী করীম (স)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, স্বামীর উপর স্ত্রীর কি অধিকার? তিনি বলিলেনঃ তুমি তাহাকে খাওয়াইবে যখন তুমি খাইবে, তাহাকে পোশাক পরিতে দিবে যেমন তুমি পরিধান করিবে। মুখমণ্ডলের উপর আঘাত হানিবে না, কুৎসিতও করিবে না, অশ্লীল গাল-মন্দ করিবে না এবং ঘরের মধ্যে ছাড়া তাহাকে ত্যাগ করিবে না—তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না।

স্ত্রীর খাওয়া-পরা প্রয়োজন ও মান অনুযায়ী সংগ্রহ ও পরিবেশন করা স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ইহা স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রীদের আদব-কায়দা শিক্ষাদান ও শরীয়াত পালন করিয়া চলিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে যদি কখনও কিছুটা প্রহরও করিতে হয়, তবুও সে মার-এ মুখ মন্ডলের উপর কোন রূপ আঘাত হানিতে পারিবে না। স্ত্রীর প্রতি কোন রূপ সন্দেহ বা অসন্তুষ্টির উদ্রেক হইলে শয্যাতেই তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা যাইবে। অর্থাৎ ঘুমাইবে যথারীতি একই শয্যায়; কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিবে না। স্ত্রীকে শাসন করার ইহা একটা বিশেষ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি। তাহাকে ত্যাগ করিতে হইলে করিবে ঘরের মধ্যেই, ঘরের বাহিরে নয়, উপরোক্ত কথাটির তাৎপর্য ইহাই। ক্রোধান্ধ হইয়া না নিজে ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে, না স্ত্রীকে ঘরের বাহিরে যাইতে বাধ্য করিবে। স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য ইহাই সর্বশেষ পদ্ধতি। ইহার ওপাশে স্বামীর আর কিছু করিবার নাই।

একটি বর্ণনা হইতে অবশ্য জানা যায়, নবী করীম (স) তাঁহার বেগমদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহার মসজিদ সন্নিহিত হুজরায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

আলোচ্য মূল হাদীসে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের কর্তব্যের কথা সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে বলা হইয়াছে। ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেনঃ স্ত্রীর খাওয়া-পরা ও যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব—একান্তই কর্তব্য। ইহার কোন উচ্চ সীমা নির্ধারিত নয়। ইহা করিতে হইবে প্রচলিত নিয়মে ও প্রচলিত মান অনুযায়ী, করিতে হইবে স্বামীর আর্থিক সামর্থ্যানুপাতে। রাসূলে করীম (স) ইহা স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকাররূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। স্বামী বাড়ীতে উপস্থিত থাকুক, আর না-ই থাকুক, সর্বাবস্থায়ই ইহার ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। ইহা যদি যথা সময়ে স্বামী না করে, তবে ইহা স্ত্রীর নিকট তাহার ঋণ রূপে গণ্য হইবে ও স্ত্রীকে আদায় করিয়া দেওয়া স্বামীর কর্তব্য হইবে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই কর্তব্য অন্যান্য কর্তব্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যপূরণীয়। স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীর এইসব পাওয়া অধিকার অন্যান্য অধিকারের মতই। স্বামীর অনুপস্থিতির দরুন সরকার কর্তৃক ইহা ধার্য হউক আর না-ই হউক, আদায় করার বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য সুচিত হইবে না; ইহা স্ত্রীর পাওনা, অতএব যে ভাবেই হউক স্বামীকে ইহা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

অন্যান্য হাদীসে কেবল মুখমন্ডলের উপর মারিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর উপরোক্ত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ তাহাদিগকে মারিও না, মারধর করিও না। ইহা সাধারণ নিয়ম। সাধারণ অবস্থায় স্ত্রীকে কথায় কথায় মারধর করার কোন অধিকার স্বামীর নাই। ইহা নিতান্তই অমানুষিক। আর অন্যান্য হাদীসে বিশেষ অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। সে বিশেষ অবস্থা হইল, শরীয়াতের দেওয়া অধিকারে যে যে কারণে স্ত্রীকে হালকা ধরনের মার-ধর করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা। কিন্তু স্ত্রীকে অশ্লীল ভাষায় গলাগাল করা যাইবে না কক্ষণই—কোন অবস্থায়ই। এই হাদীসে সাধারণ পুরুষ প্রকৃতির ক্রটির প্রতি ইংগিত রহিয়াছে। তাহা হইল, স্ত্রীর উপর নিজের পাওনাটুকু পুরোমাত্রায় আদায় করিয়া লওয়া; কিন্তু তাহার প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালনে অবহেলা করা। হাদীসটিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেবল নিজের পাওনার কথা ভাবিলে চলিবে না, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের কথাও মনে রাখিতে হইবে।

(نيل الاوطار، معالم السنن، تفسير القرطبى)

বিদেশ হইতে আগত স্বামীর গৃহে প্রবেশের নিয়ম

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ مِّنْ خَلْفِيْ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ مَا إِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ. (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী করীম (স) সঙ্গে একটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমরা যখন যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলাম ও মদীনার নিকটে পৌঁছিয়া গেলাম, তখন একটি মন্থর গতির জন্তুযানে সওয়ার হইয়া আমি তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে লাগিলাম। তখন পিছন হইতে আর একজন জন্তুযান আরোহী লোক আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। তখন আমি তাহার দিকে ফিরিলাম। সহসা দেখিলাম, আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। তখন তিনি আমাকে বলিলেনঃ কি ব্যাপার! তুমি খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছ কেন? আমি জওয়াবে বলিলামঃ আমি নব বিবাহিত, খুব অল্পদিন হয় বিবাহ করিয়াছি, তাই। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কুমারী মেয়ে বিবাহ করিয়াছ, না পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা মেয়ে? বলিলাম, পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা মেয়ে। তিনি বলিলেনঃ কুমারী মেয়ে বিবাহ করিলে না কেন? তাহা হইলে তুমি তাহার সহিত খেলা করিতে এবং সে তোমার সহিত খেলা করিত? হযরত জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমরা অগ্রসর হইলাম এবং মদীনায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিলাম। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক। রাত্র হইলে অর্থাৎ এশার নামাযের সময় হইলে তখন প্রবেশ করিও। যেন বিস্রস্ত চুলধারী স্ত্রী চুল আচড়াইয়া লইতে পারে ও দীর্ঘদিন স্বামী বঞ্চিতা স্ত্রী পরিচ্ছন্নতা লাভ করিতে পারে। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দায়ূদ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা এই দীর্ঘ হাদীসটিতে বহু দিন বাহিরে ও বিদেশে অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া আসা স্বামী স্ত্রীর নিকট যাওয়ার সৌহার্দ ও সৌহৃদ্য বৃদ্ধি কারী পন্থা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হাদীসটি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর জবানীতে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

হযরত জাবির (রা) বিবাহ করার পর কিছু দিনের মধ্যে যুদ্ধে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা ইসলামের জন্য সাহাবায়ে কেরামের অসাধারণ ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। নব বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়া যুদ্ধে গমন করা সাধারণত খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়। বস্তুত সাহাবীদের এইরূপ বিরাট ত্যাগ ও অতুলনীয় ধৈর্য সহিষ্ণুতার ফলেই দ্বীন ইসলাম দুনিয়ায় বিজয়ী ও

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গী সাথী এই রূপ দৃষ্টান্ত-হীন ত্যাগ তিতিক্ষার গুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার মিশন এত অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারিয়াছিল।

যুদ্ধ শেষে সকলের সঙ্গে হযরত জাবিরও যখন গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন,তখন স্বভাবতই তিনি অনতিবিলম্বে ঘরে পৌছিয়া যাইবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইলেন। কেননা তাঁহার নব বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতিও তাঁহার কর্তব্য রহিয়াছে, সে দিকে তিনি কিছুমাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। বিশেষত ইহা হইতেও বৃহত্তর কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়া তো ফিরিয়া আসিলেনই। কাজেই এখন আর বিলম্ব করা উচিত নয় বরং যতশীঘ্র সম্ভব স্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। এই জন্য তিনি দ্রুত গতিতে জন্তুযান চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই তাড়াহুড়া দেখিয়া রাসূলে করীম (স)-এর মনে প্রশ্ন জাগিয়া ছিল। তাই এই তাড়াহুড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জওয়াবে বলিলেনঃ 'আমি বিবাহ করিয়াছি খুব বেশী দিন হয় নাই। ইহার পরই আমাকে এই যুদ্ধে গমন করিতে হইয়াছিল। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কুমারী মেয়ে বিবাহ করিয়াছ না এমন মেয়ে পূর্বে যাহার স্বামী ছিল? উত্তরে তিনি দ্বিতীয় ধরনের মেয়ে বিবাহ করার কথা জানাইলেন। এই সময় নবী করীম (স) বলিলেন, 'তুমি কোন কুমারী মেয়ে কেন বিবাহ করিলে না? তাহা যদি করিতে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে লইয়া খেলা করিতে পারিতে এবং সেও তোমাকে লইয়া খেলা করিতে পারিত।' এই খেলা করার অর্থ কি? পূর্বে স্বামীপ্রাপ্ত মেয়ে বিবাহ করিলে তাহার সহিত খেলা করা যায় না? রাসূলে করীম (স)-এর এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, অবিবাহিত পুরুষের উচিত কুমারী মেয়ে বিবাহ করা। কুমারী মেয়ে বিবাহ করিলে তাহার নিকট স্বামী যে সুখ শান্তি ও প্রেম মাধুর্য লাভ করিতে পারে তাহা পূর্বে স্বামীপ্রাপ্ত বিধবা বা তালাক দেওয়া মেয়ে বিবাহ করিলে তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কুমার ছেলে ও কুমারী মেয়ে জীবনের শুরুতে যখন প্রথমবার মিলিত হয়, তখন তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে আনন্দ ও আন্তরিক শান্তি সুখ লাভ করিতে পারে। তাহা পূর্বে স্বামী প্রাপ্ত মেয়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে না। এই দুই জনার মধ্যে হৃদয় মনের গভীরতর সম্পর্ক ঐকান্তিকতা ও নিবিড় একাত্মতা সংস্থাপিত হওয়াও অনেক ক্ষেত্রে সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে। বিশেষত এই জন্যও যে, এহেন স্ত্রী তখন পূর্ববর্তী স্বামীর কথা এবং তাহার সহিত অতিবাহিত দিন গুলির স্মৃতিচারণ করিতে ও এই দুই জন স্বামীর মাঝে তুলনা করিতে বাধ্য হয়। এই তুলনায় দ্বিতীয় স্বামী যদি কোন একটি দিক দিয়াও প্রথম স্বামীর তুলনায় নগণ্য ও হীন প্রমাণিত হয়, তাহা ছাড়া প্রথম স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রেম ও তীব্র আকর্ষণও থাকিতে পারে, তাহাকে হারাইয়া তাহার মনে দুঃখ ও ক্ষোভও থাকিতে পারে। তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই দ্বিতীয় স্বামীকে গভীর ভাবে ভালবাসা দান সম্ভব নাও হইতে পারে। শুধু তাহাই নয়, তাহার মনে যে হতাশা ব্যর্থতা ও খুঁতখুঁত ভাব দেখা দিবে, তাহা কেহই রোধ করিতে পারে না। ফলে এই স্বামীর জন্য তাহার ভালবাসা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ স্বামীর মনেও দ্বিধা-সংকোচ দেখা দেওয়া বিচিত্র নয় এই জন্য যে, আজ সে যাহাকে স্ত্রীরূপে পাইয়াছে, সে পূর্বে অন্য একজনের স্ত্রী ছিল। ছিল তাহার ভোগের পাত্রী। সে এই দেহ লইয়া অনেক খেলা খেলিয়াছে। এই কারণে সে যে গভীরতর আন্তরিকতা দিয়া একজন কুমারী মেয়েকে গ্রহণ করিতে পারিত এই স্ত্রীকে সেরূপ গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। সম্ভবত এই কারণেই নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَشَدُّ حُبًّا وَأَقَلُّ خِبًّا

তোমাদের উচিত কুমারী মেয়ে বিবাহ করা। কেননা তাহারাই অধিক তীব্র ও গভীরভাবে স্বামীকে ভাল বাসিতে পারে এবং প্রতারণা ও ধোঁকা বাজিতেও তাহারা কম পটু হয়।

বস্তুত একবার যে মেয়ে বিবাহিতা হইয়াছে, সে তো স্ত্রীত্বের প্রশিক্ষণ পাইয়াছে, সে যদি এমন কোন ছেলেকে স্বামীরূপে পায় যাহার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই, তাহাকে সে

সহজেই প্রতারিত করিতে পারে। এই সব কারণেই রাসূলে করীম (স)-এর পক্ষে এ ধরনের কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল এবং ইহা যে শ্বাশত—দাম্পত্য রহস্যের গভীরতর তত্ত্ব এবং এই রূপ বলা যে অন্য কোন সমাজ-দার্শনিক বা সমাজ-সংস্কারকের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, বিধবা বা তালাক প্রাপ্ত মেয়েদের বিবাহই হইবে না। না, তাহাদের বিবাহ অবশ্যই হইবে এবং তাহা অনুরূপ কোন পুরুষের সঙ্গে সহজেই হইতে পারে।

হাদীসটির শেষ ভাগে বিদেশাগত স্বামীর গৃহ প্রবেশ সম্পর্কে হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে। সে হেদায়েত এই যে, বিদেশগামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দেওয়ার পর ঘরের স্ত্রীদের কিছুটা অবকাশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়; যেন তাহাদের স্বামীকে সাদরে বরণ করিয়া লইবার জন্য মানসিক ও বাহ্যিকে উভয় দিকদিয়া প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে।

এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, স্বামী বিদেশে চলিয়া গেলেও বেশী দিন বিদেশে থাকিলে গৃহ বধুরা এই সময় নিজেদের দেহ ও সাজ-সজ্জার ব্যাপারে স্বভাবতই উদাসীন হইয়া পড়ে। কেননা স্ত্রীদের সাজ-সজ্জা প্রধানত স্বামীদের সুখী করার জন্য। সেই স্বামীরাই যখন বাড়ীতে অনুপস্থিত, তখন হয়ত তাহারা গৃহের কাজকর্মে বেশী মনোযোগী হইয়া থাকে। হয়ত এই সময় তাহারা পরিচ্ছন্ন কাপড় পড়ে না। মাথার চুলও আচড়ায় না। এই কারণে স্বামীর বাড়ীতে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পর ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ করিয়া গৃহে প্রবেশ করা উচিত নয়। প্রত্যাবর্তনের খবর আগাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার পরও কিছুটা সময় তাহাদের প্রস্তুতির জন্য দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

হাদীসে বলা হইয়াছে, যেন স্ত্রীরা মাথার বিস্রস্ত চুল আচড়াইয়া লইতে পারে ও নাভির নিম্নদেশ পরিষ্কার ও লোমশূণ্য করিয়া লইতে পারে। ইহা যেমন স্বামীদের জন্য জরুরী, তেমিন জরুরী স্ত্রীদের জন্যও। এই কথা দ্বারা প্রকারান্তরে একথাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দীর্ঘদিন পর স্বামী যখন গৃহে ফিরিয়া আসে, তখন তাহাকে সাদর সম্বর্ধনা করা ও তাহার জন্য গৃহে ও নিজের দেহে পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালানো স্ত্রীর কর্তব্যভুক্ত। এইরূপ হইলে দাম্পত্য জীবনের সুখ ও সম্প্রীতি এতই গভীর হইবে, যাহা অন্যভাবে হইতে পারে না। (تحفة الاحوذى، عمدة القارى)

নিস্ফল স্ত্রী সঙ্গম

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْعَلَى أَوْلاَدِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ.

(مسند احمد، مسلم)

হযরত উসামা ইবনে জায়দ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একটি লোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল ও বলিলঃ আমি আমার স্ত্রীর সহিত 'নিস্ফল সঙ্গম' করিয়া থাকি। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি এই রূপ কর কেন? লোকটি বলিলঃ আমি আমার স্ত্রীর সন্তান—কিংবা সন্তানগুলির—জন্য ভয় পাইতেছি। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ ইহা যদি ক্ষতিকর হইত তাহা হইল পারস্যবাসী ও রোমবাসীদেরও ক্ষতি করিত।

(মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম)

ব্যাখ্যা যে বিষয়টি লইয়া এই হাদীস, তাহা হইল عزل[১] 'স্ত্রী সঙ্গম করার শেষ প্রান্তে শুক্র নিক্রমণের পূর্বেই পুংলিঙ্গ বাহিরে টানিয়া লওয়া। তদানীন্তন আরব জাহানে এই কাজ করার প্রচলন ছিল। বহু সাহাবীও ইহা করিতেন। ইহা করা হইত শুধু এই ভয়ে যে, শুক্র স্ত্রী অঙ্গের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা জরায়ুতে গমন করিয়া গর্ভের সঞ্চার হইতে পারে। সন্তান যাহাতে না হইতে পারে, তাহাই হইল এই কাজের মূল প্রেরণা। কিন্তু সন্তান না হইবে কেন? ইহার জওয়াবে বলা যায়, ইহার নানাবিধ কারণ ছিল। কোন স্ত্রীর হয়ত খুব ঘন ঘন সন্তান হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বামীর ইচ্ছা, বেশী সময় ফাঁক দিয়া সন্তান হউক। তাই এক সন্তানের জন্মের পর হয়ত ইহা করিতে শুরু করিল। কোন কোন স্বামী মনে করিত, একদুগ্ধ পোষ্য সন্তানের অবস্থিতিতে আবার গর্ভের সঞ্চার হইলে এই সন্তানের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে যেমন আলোচ্য হাদীসে বলা হইয়াছে, সন্তানের ক্ষতি হওয়ার আশংকায় পিতা এইরূপ করিত। তদানীন্তন আরব সমাজে ক্রীতদাসীর সহিত সঙ্গম করার ব্যাপক রেওয়াজ ছিল। অনেকে ক্রীতদাসীর সহিত এইরূপ করিত এই ভয়ে যে, গর্ভে সন্তান জন্মিলে সে 'উম্মে ওলাদ' 'সন্তানের মা' হইয়া যাইবে। আর সন্তানের মাকে বিক্রয় করা যাইবে না। দাস-প্রথা ভিত্তিক তদানীন্তন অর্থনীতির বিচারে ইহা একটা বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইত। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণিত ও বুখারী মুসলিম উদ্ধৃত হাদীসে এই কথাই বলা হইয়াছে।

কারণ যাহাই হউক, عزل অর্থাৎ যৌন মিলনের শেষভাগে শুক্রকীট স্ত্রী অঙ্গের অভ্যন্তরে যাহাতে প্রবিষ্ট হইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে উহা নিক্রমনের পূর্বেই পুরুষাঙ্গ বাহিরে টানিয়া লওয়া। ইহা এক প্রাকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া। আধুনিক বিজ্ঞান এই উদ্দেশ্যে অনেক যন্ত্র, উপায় প্রক্রিয়া ও অনেক ঔষধ ইত্যাদি আবিস্কার করিয়াছে। একালে এই সবের দ্বারা যাহা করিতে চাওয়া হয়, তাহা মোটামুটি

---

১. عزل শব্দের ইংরেজী করা হইয়াছেঃ - Coitusinterruptus: স্বেচ্ছাপূর্বক রতিক্রিয়ায় ক্ষান্তি।

তাহাই। যাহা প্রাচীন কালের লোকেরা এই (عزل) প্রক্রিয়ার সাহায্যে করিত। আর তাহা হইল স্ত্রীগর্ভে সন্তানের সঞ্চার না হওয়া। এই কারণে মূল হাদীসের عزل শব্দের অনুবাদ করিয়াছে নিষ্ফল যৌন সঙ্গম—যে সঙ্গমে সন্তান হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হইল, ইহা করা ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

ইসলামী শরীয়াতে ইহা জায়েয় কিনা, সে বিষয়ে কুরআন মজীদ হইতে কোন স্পষ্ট কথা জানা যায় নাই। তবে এই পর্যায়ের হাদীসে বহু কথাই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর বহু কথা ও উক্তি সাহাবীগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা প্রথমে রাসূলে করীম (স)-এর সেই উক্তি সমূহ যতটা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে—এক সঙ্গে পর পর সাজাইয়া পেশ করিব। অতঃপর উহার আইনগত দিক (ফিকাহ্) সম্পর্কে বক্তব্য রাখিব।

হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেনঃ

كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ. (بخاری، مسلم)

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় 'আজল' করিতেছিলাম। আর কুরআনও নাযিল হইতেছিল। (বুখারী, মুসলিম)

তাঁহার আর একটি উক্তি হইলঃ

كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَلَمْ يَنْهَانَا. (مسلم)

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে 'আজল' করিতেছিলাম এই খবর তাঁহার নিকট পৌছিয়াছিল। কিন্তু তিনি আমাদিগকে তাহা করিতে নিষেধ করেন নাই। (মুসলিম)

হযরত জাবিরের অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে, একটি লোক নবী করীম (স)-কে বলিলেন, 'আমার একটি দাসী আছে। সে আমাদের সেবার কাজ করে এবং খেজুর ফসল কাটাইর কাজে সাহায্য করে। আর আমি তাহার সহিত সঙ্গমও করি। কিন্তু তাহার গর্ভ হউক ইহা আমি পছন্দ করি না। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ

اِعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَاْتِيْهَا مَاقُدِّرَلَهَا. (مسند احمد، مسلم،ابوداؤد)

তুমি তাহার সহিত 'আজল' কর—যদি তুমি চাও। তবে জানিয়া রাখ, তাহার জন্য যে সন্তান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা তাহার হইবেই। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, আবূ দায়ূদ)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলিয়াছেনঃ আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সহিত বনুল-মুস্তালিকের যুদ্ধে বাহির হইয়া গেলাম। সেখানে আমরা কিছু সংখ্যক স্ত্রী বন্দী লাভ করিলাম। আমরা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া স্ত্রী সঙ্গমের ইচ্ছা আমাদের মধ্যে প্রবল হইয়া দেখা দিল। কিন্তু ইহাতে আমরা 'আজল' করা সমীচীন মনে করিলাম। এই বিষয়ে আমরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। জওয়াবে তিনি আমাদিগকে বলিলেনঃ

مَا عَلَيْكُمْ اِنْ لَّاتَفْعَلُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ كَتَبَ مَا هُوَ خَالِقٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(بخاری، مسلم)

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করিবেন তাহাতো তিনি লিখিয়াই রাখিয়াছেন, কাজেই তোমরা যদি ইহা (عزل) না কর, তাহা হইলে তোমাদের কি অসুবিধা হইবে?
(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী হইতে আরও বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

ইয়াহুদীরা বলে, 'আজল' ছোট আকারের নরহত্যা। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ

كَذِبَتْ يَهُوْدُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَوْ اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدٌ اَنْ يَصْرِفَهُ.

(مسند احمد، ابوداؤد)

ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলিয়াছে। মহান আল্লাহ্ যদি কোন কিছু সৃষ্টি করিতেই চাহেন তাহা হইলে উহার প্রতিরোধ করার-সাধ্য কাহারও নাই। (মুসনাদে আহমাদ, আবূ দায়ূদ)

আবূ সায়ীদ খুদরী অপর এক হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَزْلِ اَنْتَ تَخْلُقُهُ اَنْتَ تَرْزُقُهُ اَقِرَّهُ قَرَارَهُ فَاِنَّمَا ذٰلِكَ الْقَدْرُ. (مسند احمد)

রাসূলে করীম (স) 'আজল' সম্পর্কে বলিয়াছনঃ 'তুমি কি মানুষ সৃষ্টি কর? তুমি কি সন্তানকে রিযিক দাও?...উহাকে (গর্ভে) যথাস্থানেই অক্ষত রাখ ও থাকিতে দাও। মূলত ইহা তকদীর—আল্লাহ্র নির্ধারিত প্রকল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

জুযামা বিনতে ওহাব আল-আসাদীয়া বলিয়াছেনঃ আমি কিছু সংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে লোকেরা তাঁহার নিকট 'আজল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জওয়াবে তিনি বলিয়াছেনঃ

ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِىُّ وَهِىَ وَاِذَاالْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (مسند احمد، مسلم)

উহা গোপন নরহত্যা। আর ইহার কথাই বলা হইয়াছে কুরআনের এই আয়াতে (যাহা অর্থ)ঃ বিনাদোষে নিহত সন্তানকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলিয়াছেনঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَنْ يَّعْزِلَ عَنِ الْحُرَّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا. (مسند احمد، ابن ماجه)

রাসূলে করীম (স) স্বাধীনা (ক্রীতদাসী নয় এমন) স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার সহিত 'আজল' করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

'আজল' (عزل) সম্পর্কে উদ্ধৃত বহু সংখ্যক হাদীসের মধ্য হইতে বেশ কয়েকটি হাদীস উপরে উদ্ধৃত করা হইল। এই হাদীসটির প্রমাণ্যতা সম্পর্কে বলা যায়, হযরত আবূ সায়ীদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি তিরমিযী ও নাসায়ী গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী বলিয়াছেন, ইহার বর্ণনাকারীগণ সিকাহ-বিশ্বাস্য। আর মাজমাউজ্জাওয়ায়িদ গ্রন্থেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। বাজ্জার ইহা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ইহার একজন বর্ণনাকারী মূসা ইবনে অরদান। তিনি

সিকাহ। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে যয়ীফ বলিয়াছেন। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ সিকাহ। হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম তাহাভী দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, উহা মনসুখ—বাতিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইবনে হাজাম ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের সনদে ইবনে লাহ্ইয়া একজন বর্ণনাকারী। তাঁহার সম্পর্কে অনেক আপত্তি জানানো হইয়াছে, যাহা সর্বজনবিধিদ। আবদুর রাজ্জাক ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনাটি এ ভাষায় উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ

نَهٰى عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا

স্বাধীনা স্ত্রীর সহিত তাহার অনুমতি ছাড়া 'আজল' করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) নিজে তাঁহার ক্রীতদাসীর সহিত 'আজল' করিতেন বলিয়া ইবনে আবূ শাইবা বর্ণনা করিয়াছেন। বায়হাকীও এইরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইবনে আব্বাস সম্পর্কে।

এই পর্যায়ে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

اِنَّ الرَّجُلَ سَأَلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ الْمَاءَ الَّذِىْ يَكُوْنُ مِنْهُ الْوَلَدُ اَهْرَقْتَهُ عَلٰى صَخْرَةٍ لَاَخْرَجَ اللّٰهُ مِنْهَا وَلَدًا.

(مسند احمد، بزار، ابن حبان)

এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট 'আজল' করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবী করীম (স) বলিলেনঃ যে শুক্র হইতে সন্তান হইবে উহা যদি তুমি প্রস্তর খন্ডের উপরও নিক্ষেপ কর, তাহা হইলেও আল্লাহ্ তা'আলা উহা হইতে একটা সন্তান বাহির করিয়া আনিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ, বাজ্জার, ইবনে হাব্বান)

হযরত জাবির (রা)-এর কথাঃ "আমরা 'আজল' করিতে ছিলাম, তখন কুরআন নাযিল হইতেছিল" বাক্যটি হইতে বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছে যে, এই কাজ নিষিদ্ধ বা হারাম নয়। যদি তাহা হারাম হইত, তাহা হইলে হয় রাসূলে করীম (স) নিজে না হয় স্বয়ং আল্লাহ্র ওহীর মাধ্যমে ইহা নিষেধ করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। তবে উপরোদ্ধৃত হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী রাসূলে করীম (স)-এর নিষেধ না করার কথায় একটা ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। তাহা এই যে, যে সময়ে হযরত জাবির (রা) উক্ত উক্তিটি করিয়াছেন, সেই সময় পর্যন্ত রাসূলে করীম (স) 'আজল' করিতে নিষেধ করেন নাই, একথা সত্য। কিন্তু তাহার পর নিষেধ করেন নাই, এমন কথা তো উহাতে বলা হয় নাই। আর সেই সময় পর্যন্ত নিষেধ না করার তো অনেক কারণই থাকিতে পারে। হয়ত তখন পর্যন্ত তিনি উহার ব্যাপকতা ও তীব্রতা অনুভব করেন নাই। হইতে পারে, তখন পর্যন্ত তিনি এই বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন জ্ঞান—কোন পথনির্দেশ পান নাই বলিয়াই নিষেধ করেন নাই। হযরত জাবির (রা) এই সব দিকে ইংগিত করিয়া কথাটি বলেন নাই এবং তাঁহার বর্ণিত কথাটুকু হইতেও এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। ইসলামী আইনের মূলনীতি নির্ধারকগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন, কোন সাহাবী যখন রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে কোন কাজ করা বা না-করার কথা উল্লেখ করেন, তখন বুঝিতে হইবে, ইহা 'মরফূ' হাদীসের সমতুল্য। কেননা এইরূপ কথা হইতে বাহ্যতঃ ইহাই বুঝা যায় যে, নবী করীম (স) উহা জানিতেন এবং তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন কিংবা করেন নাই। বিশেষত এই কারণেও যে, সাহাবীগণ বারে বারে নানা বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম জানিবার জন্য রাসূল (স)-এর নিকট সওয়াল

করিতেন, ইহা তো জানা কথা-ই। শুধু তাহাই নয়, বহু কয়টি বর্ণনা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, নবী করীম (স) সাহাবীদের এই 'আজল' সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত ছিলেন। হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসঃ

كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَالِكَ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَانَا. (مسلم)

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় আজল করিতাম ইহার সংবাদ নবী করীম (স)-এর নিকট পৌঁছিল, কিন্তু তিনি আমাদিগকে নিষেধ করেন নাই। (মুসলিম)

হযরত জাবির বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) জনৈক সাহাবীকে 'আজল' করার অনুমতি দিয়া বলিয়াছেনঃ

اَعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ

তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রীতদাসীর সহিত 'আজল' করিতে পার।

কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ কথা নয়, হাদীসটি এই কথাটুকু দ্বারাই শেষ করা হয় নাই। বরং ইহার পরই এই কথা রহিয়াছেঃ

فَاِنَّهٗ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

তবে মনে রাখিও, উহার জন্য যে কয়টি সন্তান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা তাহার অবশ্যই হইবে।

এই সম্পূর্ণ কথা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নবী করীম (স) সন্তান হওয়া বন্ধ করার পর্যায়ে 'আজল' করাকে সম্পূর্ণ নিস্ফল ও অর্থহীন মনে করিতেন। আর এই জন্য যদি তিনি 'আজল' করিতে নিষেধ না-ও করিয়া থাকেন, তাহাতে কিছুই যায় আসে না।

'আজল' করার অনুমতি দান সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদীসের শেষ কথা হইল উক্ত সাহাবীই কিছু দিন পর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি যে দাসীটির সহিত 'আজল' করার অনুমতি চাহিয়াছিলাম, সে গর্ভবতী হইয়াছে। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ قَدْ اَخْبَرْتُكَ আমি তো তোমাকে সেকথা পূর্বেই বলিয়াছিলাম। বস্তুত বাস্তবতার দৃষ্টিতেও প্রমাণিত হইল যে, 'আজল' সন্তান হওয়া বন্ধ করিতে পারে না।

'আজল' সম্পর্কিত হাদীসে এখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। এই পর্যায়ের আরও হাদীস রহিয়াছে।[১]

একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স) 'আজল' সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াবে বলিয়াছেনঃ

مَا عَلَيْكُمْ اِنْ لَّا تَفْعَلُوْا

তোমরা যদি ইহা না কর তাহা হইলে তোমাদের কি অসুবিধা হয়?

বুখারী শরীফে এই বাক্যটির ভাষা হইলঃ

لَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوْا

'না, এই কাজ না করাই তো তোমাদের কর্তব্য।

১. আধুনিক যৌন বিজ্ঞানেও বলা হইয়াছে যে, সমস্ত শুক্রকীট হইতে সন্তান হয় না এবং একটি শুক্রকীট কোনভাবে গর্ভধারে পৌঁছিতে পারিলেই তাহাতেই গর্ভ হইতে পারে এবং টেস্ট টিউবের সন্তান এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

ই... শিরীন বলিয়াছেনঃ هٰذَا اَقْرَبُ اِلَى النَّهْىِ 'রাসূলের উক্ত কথাটি প্রায় নিষেধ পর্যায়ের।'

আর হাসান বসরী বলিয়াছেনঃ

وَاللّٰهِ لَكَانَ هٰذَا زَجْرًا

আল্লাহর শপথ, 'আজল' কাজের ব্যাপারে ইহা রাসূলে করীম (স)-এর তীব্র হুশিয়ারী—হুমকি ও ধমক মাত্র। অর্থাৎ কঠোর ভাষায় নিষেধ।

আল্লামা কুরতুবী বলিয়াছেন, এই মনীষীগণ হাদীসের لا —না কথাটি হইতে স্পষ্ট নিষেধই বুঝিয়াছেন। সাহাবীগণ যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে لا —না বলার অর্থ হইল, সেই কাজটি জায়েয নয়। তিনি সে কাজ করিতে সাহাবীগণকে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি যেন বলিয়াছেনঃ

لَا تَعْزِلُوْا وَعَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَفْعَلُوْا

তোমরা 'আজল' করিও না। 'আজল' না করাই তোমাদের কর্তব্য।

এই শেষের বাক্যাংশ প্রথম কথার না-র তাকীদ হিসাবেই বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর উক্ত কথাটির অর্থঃ

لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَفْعَلُوْا

এই কাজ যদি তোমরা না কর। তাহা হইলে তোমাদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হইবে না।

কেননা সন্তান না হওয়ার উদ্দেশ্যে 'আজল' করিলে তাহাতে কোন ফায়দাই পাওয়া যাইবে না। যেহেতু সন্তান হওয়া 'আজল' দ্বারা বন্ধ করা সম্ভব নহে।

তিরমিযী শরীফে এই পর্যায়ে আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছেঃ একদা রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে আজল সম্পর্কে কথা উঠিলে নবী করীম (স) বলিলেনঃ

لِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَّخْلُوْقَةٌ اِلَّا اللّٰهُ خَالِقُهَا

তোমাদের কোন লোক এই কাজ করিবে কেন! কেননা সৃষ্টি হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সব প্রাণী বা মানব সত্তাকেই আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করিবেন।

ইবনে আবূ উমর এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) 'আজল' প্রসঙ্গে لا يَفْعَلُ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ তোমাদের কেহ এই কাজ করিবে না, বলেন নাই। ইহার অর্থ, উক্ত হাদীসটিতে 'আজল' করাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেন নাই। হ্যাঁ, নিষেধ করেন নাই, এ কথা ঠিক। কিন্তু উহার অনুমতিও দেন নাই।

উক্ত হাদীসটি বলার সময় পর্যন্ত তিনি 'আজল' করিতে স্পষ্টভাষায় নিষেধ করেন নাই বটে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই কাজ যে তিনি সম্পূর্ণ অপছন্দ করিয়াছেন—কিছুমাত্র ভালো মনে করেন নাই

১. যে সব আলেম নামধারী লোক হযরত জাবির (রা) বর্ণিত কথার ভিত্তিতে 'আজল' করা জায়েয বলিয়া ফতোয়া দেয়, তাহারা ধোঁকাবাজ, হাদীস সম্পর্কে তাহাদের কোন ইল্‌ম নাই। শরীয়াত সম্পর্কে তাহাদের এক বিন্দু ধারণা নাই। তাহারা মানবতার দুষমন।

তাহাতেও সন্দেহ নাই। বরং প্রথম দিকের কথা সমূহ থেকে মনে হয়, তিনি মনে করিবেন যে, এই কাজটি সম্পূর্ণ অর্থহীন, নিষ্ফল। উহা করিয়া নারীর গর্ভে সন্তানের অস্তিত্ব গড়িয়া উঠাকে কোন ক্রমেই বন্ধ করা যাইবে না। তাহাতে তাঁহার একবিন্দু সন্দেহ ছিল না। ইহা নিতান্তই অর্থহীন ও নিষ্ফল কাজ।

ইবনে হাব্বান আহমাদ ও বাজ্জার হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, একব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট 'আজল' সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ যে শুক্রে সন্তান হইবে, তাহা প্রস্তার খন্ডের উপর নিক্ষেপ করিলেও তাহা হইতে আল্লাহ্ অবশ্যই সন্তান সৃষ্টি করিবেন।

তাবারানী ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এবং 'আল-আওসাত' ইবনে মাসউদ (রা) হইতে উপরোক্ত কথার সমর্থক হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সব হাদীস হইতে নিঃসন্দেহে ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভ নিরোধ কাজে "আজল" সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল। উহা জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন প্রক্রিয়া হিসাবে সেকালেও কার্যকর ছিল না, একালেও হইতে পারে না। বরং উহা করিয়া নিজেকে ও নিজের স্ত্রীকে যৌন সঙ্গমের চূড়ান্ত স্বাদ গ্রহণের অধিকার হইতে নিতান্তই অকারণ বঞ্চিত করা হয়। এই 'আজল'কে জায়েয প্রমাণ করিয়া যাহারা একালের জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বৈধ বা শরীয়াত সম্মত প্রমাণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছে, তাহারা অমানুষ, মিথ্যাবাদী ও সুস্পষ্ট ধোঁকাবাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাসূলে করীম (সা)-এর কথা, 'আজল' না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই, ইহার সহজ অর্থ, 'আজল' করিলে নিশ্চয়ই ক্ষতি আছে। বুঝা গেল, 'আজল' করিলে ক্ষতি হওয়া সুনিশ্চিত। কেননা এই কাজ করিলে কোন ক্ষতি নাই বলিবার ইচ্ছা থাকিলে তিনি বলিতেনঃ

لَا عَلَيْكُمْ اَنْ تَفْعَلُوْا

না তোমাদের কর্তব্য এই যে, তোমরা ইহা কর। অথবা (ইহার অর্থ) ইহা করিলে তোমাদের কোন ক্ষতির আশংকা নাই।

কিন্তু নবী করীম (স) কথাটি এভাবে ও এভাষায় বলেন নাই। অতএব হাদীস সমূহের এই বিশ্লেষণ হইতে বুঝা গেল, নবী করীম (স) এই কাজ সমর্থন করেন নাই।

ইবনে আবদুল বার বলিয়াছেন, শরীয়াত বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, স্বাধীনা স্ত্রীর সহিত এইরূপ করা তাহার অনুমতি ব্যতীত জায়েয নয়। কেননা স্বামীর সহিত সঙ্গম কাজের চূড়ান্ত তৃপ্তি লাভ তাহার অধিকার। এই অধিকার যথাযথ না পাইলে সে ইহার দাবি জানাইতে পারে। কিন্তু সঙ্গম বলিতে যাহা বুঝায় 'আজল' করা হইলে তাহা হয় না। ইবনে হুরাইরা বলিয়াছেন, এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শাফেয়ী মাযহাবের মতের একটা উদ্ধৃতি ভিন্নতর হইলেও উহার সুস্পষ্ট ঘোষণা হইল, স্বাধীনা স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া এই কাজ করা আদৌ জায়েয নয়। কোন ক্রীতদাসী যদি বিবাহিতা স্ত্রী হয় তাহা হইলে তাহার ব্যাপারেও একই কথা।

যে হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলিতেছে, ইহা হইতে কেহকে عزل জায়েয প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে। তিরমিযী গ্রন্থেও এই হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে রাসূল (স)-এর কথাটির ভাষা এইঃ

كَذَبَتِ الْيَهُوْدُ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ رَدَّهُ

ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলিয়াছে। আল্লাহ যদি সৃষ্টিই করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহা রদ্ করার ক্ষমতা কাহারও নাই।

ইহা হইতে বুঝা যায়, নবী করীম (স) 'আজল' কাজটিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, নিষ্ফল ও অর্থহীন মনে করিয়াছেন। 'আজল' করিলে সন্তান হয় না বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা মিথ্যাবাদী। উহা করা হইলে কাহাকেও হত্যাও করা হয়না। কিন্তু উহা করা হইলেও আল্লাহ্র সৃষ্টি-ইচ্ছা কক্ষণই প্রতিহত হইবে না। আজলও করা হইবে। গর্ভেরও সঞ্চার হইবে, সন্তানও জন্মগ্রহণ করিবে। তাহা কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না।

কিন্তু এই কথাটিরও প্রতিবাদ হইয়াছে হযরত জুযামা বর্ণিত হাদীসে। তাহাতে নবী করীম (স) নিজে বলিয়াছেন ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ عزل 'কাজটি গোপন নরহত্যা বিশেষ'। দেখা যায়, নবী করীম (স)-এর উক্তিতে 'কোথায়ও অনুমতি আছে কোথায়ও না করিলে দোষ নাই' আছে। কোথায়ও তুমি কি সৃষ্টি কর—তুমিকি রিযিক দাওঃ বলিয়া ধমক আছে। আর কোথায়ও উহাকে স্পষ্টভাষায় গোপন নরহত্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর নরহত্যা—তাহা যে ভাবেই হউক—সম্পূর্ণ হারাম, ইহা তো কুরআনের স্পষ্ট অকাট্য ঘোষণা।

এই বিভিন্ন কথার মধ্যে কেহ কেহ সামঞ্জস্য ও সংগতি বা সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, 'আজল' করা মাকরূহ তানজীহ। বায়হাকী এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ জুযামা'র এই হাদীসটিকে যয়ীফ বলিতে চাহিয়াছেন শুধু এই কারণে যে, ইহা অধিক সংখ্যক বর্ণনার বিপরীত কথা। কিন্তু এই ভাবে নিতান্ত অমূলক ধারণার ভিত্তিতে সহীহ হাদীসকে রদ্ ও প্রত্যাখ্যান করার নীতি হাদীস শাস্ত্রবিশারদদের নিকট আদৌ সমর্থনীয় নয়। জুযামা বর্ণিত হাদীসটি যে সম্পূর্ণ সহীহ্ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইবনে হাজার আল-আসকালানী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর যাহারা ইহাকে মনসূখ বা বাতিল বলিয়াছেন, তাহারা হাদীসের তারীখ জানেন না। অতএব তাঁহাদের এই রূপ উক্তি গ্রহণীয় নয়। জুযামা বর্ণিত হাদীসটিকে অনেক বিশেষজ্ঞই অগ্রাধিকার দিয়াছেন কেননা উহা সহীহ হাদীস। উহার বিপরীত কথা প্রমাণিত হয় যে সব হাদীস হইতে, সনদের দিক দিয়া তাহাতেই বরং কোন না কোন ক্রটি রহিয়াছে।

আল্লামা ইবনে হাজাম এই বিভিন্ন ধরনের হাদীসের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য বলিয়াছেনঃ জুযামা বর্ণিত হাদীসটি অনুযায়ী আমল করিতে হইবে। কেননা উহার বিপরীত কথার হাদীস সমূহ হইতে বড়জোর এতটুকু জানা যায় যে, উহা মূলত মুবাহ। ইহা প্রথম দিকের কথা। কিন্তু জুযামা বর্ণিত হাদীস আসিয়া উহাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন যদি কেহ দাবি করে যে, প্রথমে নিষেধ করা হইয়াছিল, পরে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তবে এই কথা প্রমাণের জন্য তাহার উচিত অকাট্য দলীল পেশ করা। কিন্তু তাহা কেহ করিতে পারে না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, নবী করীম (স) 'আজল' করাকে الْوَأْدُ الْخَفِيُّ 'গোপন হত্যা' বলিয়াছেন। ইহা একটা দৃষ্টান্ত মূলক কথা। ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, ইহা করা সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু ইহা যে শরীয়াতের মূল লক্ষ্যকে ভুলিয়া যাওয়ার পরিণতি, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম এই পর্যায়ে বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) ইয়াহুদীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন এই কথায় যে, তাহাদের ধারণা ছিল 'আজল' করিলে গর্ভের সঞ্চার হয় না। ইহা বস্তুতঃই মিথ্যা কথা। কেননা ইহা করিলেও গর্ভ হওয়া সম্ভব। একথা স্বয়ং নবী করীম (স) অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলিয়াছেন। তাঁহার কথার তাৎপর্য হইল, ইয়াহুদীরা যে মনে করিয়াছে, 'আজল' করিলে সন্তান জন্মিবে না ইহা সম্পূর্ণ অসত্য। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এতদসত্ত্বেও সন্তান গর্ভে আসিবে ও জন্ম হইবে। আর তিনি যদি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে উহা করা গোপন হত্যা হইবে না।

হযতর জুযামা'র হাদীসে 'আজল'কে গোপন হত্যা বলা হইয়াছে এই কারণে যে, স্বামী 'আজল' করে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার ভয়ে, এই কথা মনে করিয়া যে, ইহা করা হইলে সন্তান জন্মিবে না। স্বামী-স্ত্রী সঙ্গম হইবে যথারীতি এবং যৌন স্বাদ উভয়েরই আস্বাদন হইবে (যদিও চূড়ান্ত স্বাদ গ্রহণ হইবে না)

অথচ সন্তান হইবে না। ইহার চাইতে সুখের বিষয় আর কি আছে! আর এই মানসিকতাই সন্তান হত্যার নামান্তর মাত্র। তবে পার্থক্য এই যে, প্রকাশ্য নর হত্যার পিছনে থাকে ইচ্ছা সংকল্প ও বাস্তব পদক্ষেপ। আর 'আজল'-এ থাকে শুধু ইচ্ছা সংকল্প ও সামান্য কাজ। ইহার ফলে অতি গোপন পন্থায় সন্তান হওয়ার পথ বন্ধ করাই তাহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের কারণেই উহাকে হাদীসে 'গোপন হত্যা' (اَلْوَأْدُ الْخَفِيُّ) বলা হইয়াছে। বস্তুত হাদীস সমূহের এইরূপ সমন্বয় অত্যান্ত যুক্তিযুক্ত।

মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বান হযরত জুযামার বর্ণিত এই হাদীসটির ভিত্তিতে 'আজল' করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর ইহার ফলে যে স্বামী-স্ত্রী সঙ্গমের চূড়ান্ত তৃপ্তি লাভ হয় না এবং ইহা আল্লাহ্র নিয়ামত হইতে এক প্রকারের বঞ্চনা, উপরন্তু ইহা আত্মবঞ্চনা যেমন, স্ত্রীকেও বঞ্চিত করা হয় তেমনই, ইহাতেও কোনই সন্দেহ নাই। (بلوغ الامانى ، نيل الاوطار)

উদ্ধৃত হাদীস সমূহ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে 'আজল' করার অনুমতি সংক্রান্ত হাদীস কেবলমাত্র একজন সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি হইতেছেন হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)। আর এই কাজের নিষেধ স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে নয়জন সাহাবী হইতে। এই কথা হইতেও বিষয়টি সম্পর্কে শরীয়াতের মূল লক্ষ্য প্রতিভাত হইয়া উঠে।

'আজল' সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজম বলিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ হারাম। তিনি দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন ইমাম মুসলিম বর্ণিত নবী করীম (স)-এর উক্তি ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ 'উহা গোপন হত্যা কাণ্ড বিশেষ'। তিনি আরও কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার সনদ সূত্র নবী করীম (স) পর্যন্ত পৌঁছায় নাই, যাহা সাহাবীগণের উক্তিরূপে বর্ণিত। নাফে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) 'আজল' করিতেন না। তিনি বলিয়াছেনঃ

لَوْ عَلِمْتُ اَبَدًا مِّنْ وَلَدِىْ يَعْزِلُ لَنَكَلْتُهُ

আমার কোন সন্তান 'আজল' করে, জানিতে পারিলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিব।

হাজ্জাজ ইবনুল মিনহাল হইতে বর্ণিত হযরত আলী (রা) 'আজল' করাকে মাকরূহ (মাকরূহ তাহরীমী) মনে করিতেন।

হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসঃ 'আমরা আজল করিতেছিলাম' অথচ তখন কুরআন নাযিল হইতেছিল' সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজম বলিয়াছেন, ইহা মনসুখ—বাতিল।[১] আর হানাফী মুহাদ্দিস ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্র (রা) কথার জওয়াব দিয়াছেন এই বলিয়া, 'আজল' এর ব্যাপারে সেই রকম অবস্থাই হইতে পারে যেমন কবর আযাবের ক্ষেত্রে হইয়াছে। ইয়াহুদীরা বলিয়াছিলঃ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهٖ 'মৃত ব্যক্তিকে কবরে আযাব দেওয়া হয়'। তখন নবী করীম (স) তাহাদিগকে 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কেননা এই সময় পর্যন্ত তিনি এই বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট হইতে কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরে আল্লাহ্ই যখন তাঁহাকে জানাইয়া ছিলেন যে, কবরে আযাব হওয়ার কথা সত্য, তখন তিনি কবর আযাব হওয়ার কথার সত্যতা স্বীকার করিলেন এবং না জানিয়া বলার কারণে তিনি আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাহিলেন। এখানেও সেই রকমই হইয়াছে। (অর্থাৎ তিনি না জানিতে পারা পর্যন্ত 'আজল' করিতে নিষেধ করেন নাই। পরে আল্লাহ্র নিকট হইতে জানিয়া উহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।) দ্বিতীয়, ইমাম তাহাভী যে হযরত জাবির বর্ণিত হাদীস দ্বারা হযরত জুযামা বর্ণিত হাদীস মনসুখ হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই কথা ঠিক হইতে পারে না। কেননা হযরত জুযামা ইসলাম কবুল করিয়াছেন দশম হিজরী সনে। কাজেই তাঁহার বর্ণিত হাদীস সর্বশেষের। অতএব তাঁহার হাদীসটিই মনসুখ করিয়াছে হযরত জাবির

(১) المحلى لابن حزم ج ١٠، ص ٨٧

বর্ণিত হাদীসকে। অবশ্য কেহ কেহ এও বলিয়াছেন যে, তিনি অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম কবুল করিয়াছেন। আবদুল হক বলিয়াছেন, ইহাই সহীহ কথা। (তবুও তাঁহার বর্ণিত হাদীস দ্বারা হযরত জাবির বর্ণিত হাদীসটির মনসুখ হইয়া যাওয়া ঠিকই থাকে)[১] ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমও লিখিয়াছেনঃ 'আজল' মুবাহ বা অ-নিষিদ্ধ হওয়ার কথাটি বর্ণনা হিসাবে সহীহ হইলেও উহা 'আজল' নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের বর্ণনা। পরে উহা হারাম ঘোষিত হইয়াছে। ফলে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস হইতে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নাকচ—রহিত—হইয়া গিয়াছে।[২]

বুখারী শরীফের শারাহ লেখক প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইবনে হাজার আল-আস কালানী 'আজল' সম্পর্কিত হাদীস সমূহের আলোচনায় লিখিয়াছেনঃ 'ইবরাহীম ইবনে মূসা সুফিয়ান হইতে—হযরত জাবির (রা) হইতে যে হদীসটির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে নিজ হইত এই কথাটুকু বাড়াইয়া বলিয়াছেনঃ اَیْ لَوْكَانَ حَرَامًا لَنَزَلَ فِیْهِ অর্থাৎ 'আজল' করা যদি হারাম হইত, তাহা এই বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হইত।

ইমাম মুসলিম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইর মুখে সুফিয়ান হইতে বর্ণিত হাদীসে এই কথাটি এভাবে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

لَوْكَانَ شَيْئًا يُنْهٰى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْاٰنُ

'আজল' কাজে নিষেধের কিছু থাকিলে কুরআন আমাদিগকে তাহা করিতে অবশ্যই নিষেধ করিত।

ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, সুফিয়ানের এই কথাটি মূল হাদীস হইতে নির্গলিত তাৎপর্য হিসাবে বলা হইয়াছে। ইহা আরও প্রমাণ করে যে, তাহাদের 'আজল' করার কাজকে কুরআন অব্যাহত রাখিয়াছে। রাসূলে করীম (স) এই কাজকে অস্বীকার বা বন্ধ করেন নাই। ইহার অর্থ হিসাবে বলা হইয়াছেঃ

فَعَلْنَاهُ فِىْ زَمَنِ التَّشْرِيْعِ وَلَوْكَانَ حَرَامًا لَمْ نُقَرَّ عَلَيْهِ

শরীয়াত রচিত হওয়ার সময়ে আমরা এই কাজ করিয়াছি। যদি ইহা হারাম হইত, তাহা হইলে শরীয়াত ইহা নিশ্চয়ই স্থায়ী থাকিতে দিত না।

কিন্তু হযরত জবির (রা) এর এই কথা শরীয়াত রচনা কালের প্রাথমিক পর্যায়ের অথচ এই কালের মেয়াদ অন্তত দশটি বৎসর দীর্ঘ।

শাফেয়ী মাযহাবপন্থী ইমাম গাজালী 'আজল' জায়েয মনে করিয়াছেন। কিন্তু সেই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বান বলিয়াছেনঃ

اَلْخَبَرُ الدَّالُّ عَلٰى اَنَّ هٰذَا الْفِعْلَ مَزْجُوْرٌعَنْهُ لاَ يُبَاحُ اِسْتِعْمَالُهُ

হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, 'আজল'-এর এই কাজটি নিষিদ্ধ, এজন্য হুমকি ও ধমক দেওয়া হইয়াছে। অতএব এই কাজটি করা কখনই মুবাহ হইতে পারে না।

ইহার পর তিনি হযরত আবূ যার (রা) বর্ণিত রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ

ضَعْهُ فِىْ حَلاَلِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ وَاَقْرِرْهُ فَاِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَحْيَاهُ وَاِنْ شَاءَ اَمَاتَهُ وَلَكَ اَجْرٌ

---

(১) عمدة القاری شرح البخاری (ج ۲۰، ص ۱۹۵-۱۹٦) (২) জাদুল মায়াদ, ৫ম খণ্ড, ১৪০-১৪৬ পৃঃ

উহাকে (শুক্রকীট) উহার হালাল অবস্থায়ই রাখিয়া দাও, হারাম হইতে উহাকে দূরে রাখ এবং উহাকে স্থিত হইতে দাও। অতঃপর আল্লাহ্ চাহিলে উহা হইতে জীবন্ত সত্তা সৃষ্টি করিবেন, নতুবা উহাকে মারিয়া ফেলিবেন। মাঝখানে তোমার জন্য সওয়াব লেখা হইবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'আজল' করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশেষ করিয়া গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত 'আজল' করা হইলে উহার পরিণতিতে গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে। কেননা এই অবস্থায় যৌন সঙ্গমে যে বীর্য স্খলিত হয়, তাহাই ভ্রূণের খাদ্য। ভ্রূণ সে খাদ্য না পাইলে উহার মৃত্যু বা দৈহিক দুর্বলতা বা অঙ্গহানি হইতে পারে। তাহাতে উঁহার মৃত্যু হওয়া অবশ্যাম্ভাবী। রাসূলে করীম (স) হয়ত এই জন্যই 'আজল'কে 'গোপন হত্যা' বলিয়াছেন। ইহার ফলে বংশের ধারাও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। ইহাতে সন্তান জন্মের পন্থাটিই বিনষ্ট হইয়া যায়। (فتح البارى شرح البخارى)

পরিবারবর্গের লালন-পালন ও ব্যয়ভার বহন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ اِمَّا اَنْ تُطْعِمَنِىْ وَاِمَّا اَنْ تُطَلِّقَنِىْ وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ اَطْعِمْنِىْ وَاسْتَعْمِلْنِىْ وَيَقُوْلُ الْاِبْنُ اَطْعِمْنِىْ اِلٰى مَنْ تَدَعُنِىْ فَقَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هٰذَا مِنْ كِيْسِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ. (بخارى. نسائى)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ অতি উত্তম দান তাহাই যাহা ধনী লোক নিজ হইতে ছাড়িয়া দিবে। আর উপরের হাত নীচের হাতের তুলনায় উত্তম। দেওয়া শুরু কর তোমার পরিবারবর্গ হইতে। স্ত্রী বলেঃ হয় আমাকে খাইতে দাও, না হয় আমাকে তালাক দাও। দাস বা খাদেম বলেঃ আমাকে খাইতে দাও ও আমাকে কাজে খাটাও। আর পুত্র বলেঃ আমাকে খাইতে দাও, তুমি আমাকে কাহার হাতে ছাড়িয়া দিবে?...... লোকেরা বলিল, হে আবূ হুরাইরা, তুমি কি এই সব কথা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট শুনিয়াছ? আবূ হুরাইরা বলিলেনঃ না, ইহা আবূ হুরাইরার পাত্র বা মেধা হইতে পাওয়া কথা।

(বুখারী, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম কথা, উত্তম দান তাহাই যাহা ধনী ব্যক্তি নিজ হইতে ছাড়িয়া দেয়। 'নিজ হইতে ছাড়িয়া দেয়' অর্থ যাহা দিতে দাতার কোনরূপ অসুবিধা হয় না, যাহা দেওয়া তাহার পক্ষে সহজ। বস্তুত ইসলামে অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের পরও সাধারণভাবে সমাজের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ লোকদের জন্য দান-খয়রাত করার এক বিশাল অবকাশ ও ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সচ্ছল অবস্থার ব্যক্তি নিজ হইতে নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনাক্রমে যাহা দিবে, যতটুকু দিবে, তাহাই সর্বোত্তম দান বিবেচিত হইবে। গ্রহীতার উচিত তাহাই গ্রহণ করা ও গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকা। অতিরিক্ত পাওয়ার জন্য তাহার উপর কোনরূপ চাপ সৃষ্টি করা বা বল প্রয়োগ করা অনুচিত। তাহা করা হইলে তাহা আর 'দান' থাকিবে না। তাহা হইবে ডাকাতি। আর ডাকাতি যে কোন ক্রমেই জায়েয নয়, তাহা বলার প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় বলা হইয়াছে, 'উপরের হাত নীচের হাতের তুলনায় উত্তম। উপরের হাত দাতার হাত, আর নীচের হাত দান-গ্রহীতার হাত। রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। যে লোক দান গ্রহণ করে ভিক্ষাবৃত্তি চালায়, এই কথাটি দ্বারা তাহার মর্যাদার কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে দান গ্রহণ করে তাহার মনে করা উচিত সে মোটেই ভাল কাজ করিতেছে না। সে অত্যন্ত নীচ ও হীন কাজ করিতেছে। তাহার এই কাজ যতশীঘ্র সম্ভব পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। আর যে লোক দান করে, রাসূলে করীম (স)-এর এই কথানুযায়ী সে উচ্চ মর্যাদায় আসীন। তাহার

অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম এমন ভাবে করিয়া যাওয়া উচিত, যেন তাহার এই সম্মানজনক স্থান সে কখনও হারাইয়া না ফেলে। অতএব বেহুদা খরচ হইতে তাহার বিরত থাকা ও বেশী বেশী আয় করার জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতে থাকা তাহার কর্তব্য।

তৃতীয় কথা, তোমার পরিবার বর্গ হইতেই দেওয়া শুরু কর। অর্থাৎ তোমার নিজের প্রয়োজন পরিপূরণের পর সর্বপ্রথম তোমার দায়িত্ব হইল তোমার পরিবার বর্গ ও তোমার উপর নির্ভরশীল লোকদের (Dependants) যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ও প্রয়োজন পূরণ করা। তাহার পরই তুমি অন্য লোকদের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে পার। নিজের উপর নির্ভরশীল লোকদের প্রতি লক্ষ্য না দিয়া ও তাহাদের নিম্নতম প্রয়োজন পূরণ না করিয়া অন্য লোকদের মধ্যে বিত্ত সম্পত্তি বিলাইয়া দেওয়া তোমার নীতি হওয়া উচিত নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠে, তবে কি নবী করীম (স) স্বার্থপরতার শিক্ষা দিয়াছেন? জওয়াবে বলা যাইতে পারে, হ্যাঁ স্বার্থপরতার শিক্ষাই তিনি দিয়াছেন। কেননা স্বার্থপরতাই পরার্থপরতার মূল। আর একটু উদার দৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা যাইবে, ইহা সেই স্বার্থপরতা নয়, যাহা নিতান্তই অমানবিক, অসামাজিক এবং হীন ও জঘন্য। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাইতে হইবে এবং একাজে অন্যদেরও সাহায্য সহযোগিতা করিতে হইবে। ইহা এক সঙ্গে দ্বিবিধ দায়িত্ব। নিজেকে বাঁচাইতে পারিলেই অন্যদের বাঁচাইবার জন্য করা একজনের পক্ষে সম্ভব। তাই নিজেকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে আর যাহাদের বাঁচাইবার জন্য কাজ করিতে হইবে, তাহারা হইল ব্যক্তির পরিবার বর্গ, ব্যক্তির উপর একান্ত নির্ভরশীল লোক। এইভাবে প্রত্যেক উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি যদি নিজের ও নিজের পরিবার বর্গের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নেয়, তাহা হইলে সমাজে এমন লোকের সংখ্যা বেশী থাকিবে না যাহাদের দায়িত্ব কেহই বহন করিতেছে না।[১]

পরিবারবর্গ ও নির্ভরশীল লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন কেবল কর্তব্যই নয়, ইহা অতিবড় সওয়াবের কাজও। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً۔

(بخاری عن ابی مسعود الانصاری)

মুসলিম ব্যক্তি যখন সচেতনভাবে ও বুঝে-শুনে তাহার পরিবার বর্গের জন্য অর্থব্যয় করে তখন উহা তাহার সাদকা হইয়া যায়।

এই হাদীসটির দুইটি কথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। একটি أَهْل বলিতে কোন সব লোক বুঝায় এবং أَهْل এর জন্য ব্যয় করিলে তাহা 'সাদকা' বা দান হইয়া যায় কিভাবে।

প্রথম কথাটির ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, أَهْل বলিতে বুঝায় ব্যক্তির স্ত্রী ও উপার্জন অক্ষম সন্তান। অনুরূপ ভাবে তাহার ভাই-বোন, পিতা-মাতা, চাচা-চাচাতো ভাই পর্যন্ত। যদি কোন বালক তাহার ঘরে লালিত হইতে থাকে, তবে সেও أَهْل বা পরিবার বর্গের মধ্যে গণ্য।

দ্বিতীয় কথাটির ব্যাখ্যা এই যে, এই খরচ বহন তাহার উপর ওয়াজিব হইলেও সে যদি এই কাজের বিনিময়ে পরিবার বর্গের প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র নিকট হইতে সওয়াব পাইবারও নিয়্যত করে তাহা হইলে সে সেকাজের জন্য সওয়াবও পাইবে। এই হিসাবেই এই কাজ তাহার জন্য

১. ইসলামে যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উপস্থাপিত করিয়াছে তাহার বিস্তারিত রূপ জানিবার জন্য পাঠ করুন এই গ্রন্থকারের লেখা 'ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা'। উহাতে উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

'সাদকা' হইয়া যায়। এই কথা বলার উদ্দেশ্য হইল, লোকটি খরচ করিতে করিতে মনে করিতে পারে যে, এই কাজ করায় সে বুঝি কোন সওয়াবই পাইবে না, ইহা বুঝি তাহার বলদের বোঝা টানার মতই নিষ্ফল কাজ। এই মনোভাব দূর করার ও এই ব্যয়ে তাহাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই এই কথাটি বলা হইয়াছে। মুহল্লাব বলিয়াছেন, পরিবার বর্গের ভরণ পোষণে ব্যয় করা ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব বা ফরয। ইহা সর্ব সম্মত কথা। তাবারী বলিয়াছেন, সন্তানরা ছোট ছোট থাকার সময় পর্যন্ত তাহাদের ব্যয়ভার বহন করা পিতার জন্য ফরয। সন্তান বড় হইয়া গেলে তখনও সে যদি উপার্জন-অক্ষম থাকে, তখনও তাহার খরচ বহন করা পিতার কর্তব্য। (عمدة القارى شرح البخارى)

উদ্ধৃত হাদীসটির পরবর্তী অংশে ব্যক্তির পরিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটা চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। দেখান হইয়াছে, একটা পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপর চারিদিক হইতে কি রকম চাপ আসে, কত লোকের দাবি পূরণ করা তাহার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। পরিবার সম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে থাকে তাহার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, চাকর-বাকর—কাজের লোক। সকলেরই খাবার চাহিদা, সকলের মৌল প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তায়। তাহাকে অবশ্যই স্ত্রীর দাবি ও প্রয়োজন পূরণ করিতে হয়। ইহাতে ব্যত্যয় ঘটিলে স্ত্রী স্বভাবতই বলেঃ হয় আমাকে খাইতে দাও, না হয় আমাকে তালাক দিয়া ছাড়িয়া দাও। তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া তোমার ঘর সংসার সামলানোর এবং তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ, প্রসব করণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব আমার উপর চাপাইয়া দিয়াছ। এই সব দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করিলে অতঃপর নিজের ভরণ-পোষণের জন্য উপার্জন করিতে যাওয়ার আর কোন সময় বা অবকাশ পাওয়া যাইতে পারে না। কাজেই ইহার দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি আমার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমাকেই বহন করিতে হয় তাহা হইলে তোমার ঘর-সংসার সামলানো, গর্ভে সন্তান ধারণ ও লালন-পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। এক দিকে গেলে অন্যদিকে অনুপস্থিতি অনিবার্য। যাহারা এই সব করিয়াও কামাই-রোজগার ও চাকরী-বাকরী করিতে যায়, তাহারা হয় তাহাদের ঘরের দায়িত্বে ফাঁকি দেয়, নতুবা ফাঁকি দেয় চাকরীর দায়িত্বে। এমতাবস্থায় আমাকে তালাক দাও। কোন একদিকে ফাঁকি দেওয়ার চাইতে ইহা উত্তম। কিন্তু স্ত্রীকে তালাক দিলে ব্যক্তির ঘর-সংসার ও পরিবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, ইহাও সে বরদাশ্ত করিতে পারে না। অতএব স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা তাহার প্রথম কর্তব্য হইয়া পড়ে। চাকর-বাকরদের ব্যাপারেও এই কথা। এই কথা সন্তানদের ক্ষেত্রেও।

ইসমাঈলীর বর্ণনায় হাদীসটির এখানকার ভাষা এইঃ

وَيَقُوْلُ خَادِمُكَ اَطْعِمْنِىْ وَاِلَّا فَبِعْنِىْ

তোমার ক্রীতদাস—চাকর-বাকররা বলেঃ আমাকে খাইতে দাও, নতুবা আমাকে বিক্রয় করিয়া—ছাড়িয়া দাও। অন্যত্র কাজ করিয়া জীবন বাঁচানোর সুযোগ করিয়া দাও।

লোকদের প্রশ্ন ছিলঃ হে আবূ হুরাইরা, তুমি এই সব কথা রাসূল (স)-এর মুখে বলিতে শুনিয়াছ কিনা? 'এইকথা' এই শেষের কথাগুলি—যাহাতে পারিবারিক চাপ দেখানো হইয়াছে—বুঝাইয়াছে। ইহার জওয়াবে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলিলেনঃ

لَا هٰذَامِنْ كِيْسِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

না, ইহা আবূ হুরাইয়ার থলে হইতে বাহির করা কথা।

হাদীস ব্যাখ্যাতা কিরমানী বলিয়াছেনঃ اَلْكِيْس অর্থ اَلْوِعَاء. পাত্র, থলিয়া। আর পাত্র বলিতে হযরত আবূ হুরাইরার 'স্মৃতি ভান্ডার, বোঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ রাসূলে করীম (স)-এর নিকট হইতে প্রত্যক্ষ শুনিতে পাওয়া যেসব কথা আমার স্মৃতি পাত্রে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, এই কথাগুলি সেখান হইতেই

বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। এই অর্থে এই গোটা হাদীসটিই—হাদীসটির শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাই রাসূলে করীম (স)-এর কথা বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই প্রেক্ষিতে হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর উপরোক্ত জওয়াবের তাৎপর্য হইলঃ

لَيْسَ هٰذَا اِلاَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

যাহা বলিলাম তাহা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট শুনা কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি জওয়াবে لا —'না' বলিয়াছেন, তাহা নেতিবাচক হইলেও উহার তাৎপর্য ইতিবাচক। নেতিবাচক কথার দ্বারা ইতিবাচক অর্থ বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছে। আরবী ভাষায় ইহার যথেষ্ট প্রচলন রহিয়াছে।

ইহার আরও একটি অর্থ হইতে পারে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) তাঁহার উক্ত জওয়াব দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, হাদীসের শেষাংশের কথাগুলি রাসূলে করীম (স)-এর নয়। ইহা হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক মূল হাদীসের সহিত নিজ হইতে শামিল করিয়া দেওয়া اِدْرَاج কথা। এই দৃষ্টিতে এই জওয়াবটি ইতিবাচক, নেতিবাচক নয়। অর্থাৎ হাদীসের শেষ অংশটি হযরত আবূ হুরাইরা (রা) এর নিজের সংরক্ষিত পাত্র হইতে উৎসারিত তাঁহার নিজের কথা। কোন কোন বর্ণনায় كِيْس শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থঃ هٰذَا مِنْ عَقْلِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ 'ইহা আবূ হুরাইরা'র বিবেক-বুদ্ধি নিঃসৃত কথা। ইমাম বুখারী নিজেও এই দিকে ইংগিত করিয়াছেন। তাহা হইলে হাদীস বিজ্ঞানের পরিভাষা অনুযায়ী ইহাকে বলা হইবে مدرج فى الحديث রাসূল (স)-এর কথার সহিত মূল বর্ণনাকারীর শামিল করিয়া দেওয়া নিজের কথা। ইহাতেও হাদীসের মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না। কেননা সাহাবী যাহা নিজে বলেন, তাহা আসলে তাঁহার নিজের কথা নয়। তাহা কোন-না-কোন সময় রাসূলে করীম (স)-এর নিকট শোনা। অথবা বলা যায়, হযরত আবূ হুরাইরা (রা) এই কথাটি বলিয়া রাসূলে করীম (স)-এর মূল কথাটিরই ব্যাখ্যা দিয়াছেন, নীতি কথার একটা বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু মুসনাদে আহমাদ ও দারেকুতনী হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি যে ভাষায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে এই ধরনের কোন কথাই নাই। তাহাতে ইহার সমস্ত কথাই নবী করীম (স)-এর বাণী রূপে উদ্ধৃত। হাদীসটির এই অংশের ভাষা তাহাতে এইভাবে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

فَقِيْلَ مَنْ اَعُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِمْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُوْلُ تَقُوْلُ اَطْعِمْنِىْ وَاِلاَّ فَارِقْنِىْ جَارِيَتُكَ تَقُوْلُ اَطْعِمْنِىْ وَاسْتَعْمِلْنِىْ وَوَلَدُكَ يَقُوْلُ اِلٰى مَنْ تَتْرُكُنِىْ

কেহ বলিলেন, হে রাসূল! আমি কাহার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করিব? তিনি বলিলেন, তোমার স্ত্রী-ই এমন যাহার ভরণ পোষণ তুমি করিবে। কেননা সে-ই বলে যে, আমাকে খাইতে দাও, অন্যথায় আমাকে বিচ্ছিন্ন কর। তোমার ভরণ-পোষণের লোক তোমার চাকর-চাকরাণী। কেননা সে বলেঃ আমকে খাইতে দাও ও আমাকে কাজে লাগাও। তৃতীয়, তোমার ভরণ পোষণ পাইবার অধিকারী তোমার সন্তান। কেননা সে-ই বলেঃ আমাকে তুমি কাহার নিকট ছাড়িয়া দিতেছ?

এই হাদীসের সমস্ত কথা তাহাই যাহা বুখারী উদ্ধৃত হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোন অংশই হযরত আবূ হুরাইর (রা)-এর নিজের নয়। সবই রাসূলে করীম (স)-এর কথা। শুধু তাহাই নয়, ইহা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারও নির্দেশ। ফিকাহবিদগণ কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহের ভিত্তিতে বলিয়াছেনঃ

فَهٰذِهِ النُّصُوصُ صَرِيحَةٌ فِى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ عَلَى الزَّوجِ وفَرضِ النَّفَقَةِ لِلاَ وْلَادِ عَلٰى اَبِيهِمْ. (الثقافة الاسلامية)

এই দলীল সমূহ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছে যে, স্ত্রীর খরচ বহন স্বামীর কর্তব্য এবং সন্তানদের খরচ বহন তাহাদের উপর অর্পিত।

আমাদের আলোচ্য মূল হাদীসটিতে কয়েকটি আইনের কথা বলা হইয়াছেঃ প্রথম, ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন সর্বাগ্রে পূরণ করা দরকার। অন্যদের হক্ ইহার পর। দ্বিতীয়, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভরণ পোষণ ও যাবতীয় মৌল প্রয়োজন পূরণ ব্যক্তির দ্বিতীয় কর্তব্য—ফরয। ইহাতে কোন দ্বিমত নাই।

তৃতীয়, খাদেম—চাকর-কামলাদের ব্যয়ভার বহন করাও তাহারই দায়িত্ব। ঘরের কাজ-কামের জন্য খাদেম নিয়োজিত করা যাইতে পারে। করা হইলে তাহার প্রয়োজনও পূরণ করিতে হইবে।

চতুর্থ, স্ত্রীর কথাঃ 'হয় আমাকে খাইতে দাও, না হয় আমাকে তালাক দাও'—হইতে কোন কোন ফিকাহবিদ এই মত রচনা করিয়াছেন যে, স্বামী যদি বাস্তবিকই স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালনে অর্থনৈতিক দিকদিয়া অক্ষম হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থায় স্ত্রী তালাক নিতে চায় ও দাবি করে, তাহা হইলে সে তালাক পাইবার অধিকারী।

অনেকের মতে ইহাই জমহুর আলিম ও ফিকাহবিদদের মত। আর কূফা'র ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেনঃ

يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ وَتَتَعَلَّقُ النَّفَقَةُ بِذِمَّتِهِ

এইরূপ অবস্থা দেখা দিলে স্ত্রীর কর্তব্য ধৈর্যধারণ এবং স্বামী-সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য লোকদের সহিত মিলিত থাকিয়া কষ্ট স্বীকার করা। অবশ্য ব্যয়ভার বহন ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তো স্বামীরই থাকিবে।

অর্থাৎ এখন তাহা দিতে না পারিলে পরে সচ্ছল অবস্থা ফিরিয়া আসিলে তখন দিতে হইবে।

জমহুর আলিম ও ফিকাহবিদদের যাহা মত তাহার দলীল হিসাবে তাঁহারা কুরআন মজীদের এই আয়াতটির উল্লেখ করিয়াছেনঃ

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا (البقره: ٢٣١)

স্ত্রীগণকে আটকাইয়া রাখিও না তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া ও তাহাদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, এই রূপ করিয়া তোমরা সীমালংঘন করিবে, এই উদ্দেশ্যে।

কেননা খাইতেও দিবে না আর সে অন্যত্র যাইয়া নিজের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা করিবে, তাহার সুযোগও দিবে না তাহাকে তালাক দিয়া, ইহা তো নিতান্তই সীমালংঘনমূলক কাজ।

বিপরীত মতের আলিমগণ ইহার জওয়াবে বলিয়াছেন, এই রূপ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যদি ওয়াজিবই হইত, তাহা হইলে স্ত্রীর ইচ্ছানুক্রমেও বিবাহ অক্ষুণ্ন রাখা জায়েয হইত না। অথচ স্ত্রী কষ্ট করিতে রাযী হইলে বিচ্ছেদ করাই বরং জায়েয নয়। আর এই অবস্থায়ও স্ত্রী স্বামীর সহিত থাকিতে রাযী হইলে বিবাহ অক্ষুণ্নই থাকিবে—এ ব্যাপারে পুরাপুরি ইজমা হইয়াছে। তাহা হইলে

আয়াতের সাধারণ নিষেধ সত্ত্বেও স্ত্রীর রাযী থাকার কারণে বিবাহ অক্ষুণ্ন রাখা এই আয়াতের পরিপন্থী নয়। ইহা ছাড়াও নিতান্ত মানবিকতার ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার সম্পর্কের দিক দিয়াও স্বামীর এই অক্ষমতার দরুন তালাক হইয়া যাওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। ইহা তো ক্রীতদাস ও জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতি। তাহা হইল, ক্রীতদাস ও গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের খবার দিতে মালিক অক্ষম হইলে তাহাকে উহা বিক্রয় করিয়া দিতে শরীয়াতের দৃষ্টিতেই বাধ্য করা হইবে। উপরন্তু এইরূপ বিধান হইলে পরিবার রক্ষা করাই কঠিন হইয়া পড়িবে।

কূফী ফিকাহবিদদের এই মত সমর্থন করিয়াছেন আতা ইবনে আবূ রাফে, ইবনে শিহাব জুহরী, ইবনে শাব্রামাত, আবূ সুলাইমান ও উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ প্রখ্যাত শরীয়াতবিদ্গণ। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)ও এই মত দিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

كَتَبَ عُمَرُرض إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ دَعُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا أُنَاسًا قَدْ اِنْقَطَعُوا عَنِ الْمَدِينَةِ وَرَحِلُوا عَنْهَا إِمَّا أَنْ يَّرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِنَفَقَةٍ إِلَيْهِنَّ وَإِمَّا أَنْ يُّطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَامَضَى. (شافعى، عبدالرزاق، ابن المنذر)

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) সেনাধ্যক্ষদের নামে এই নির্দেশ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তোমরা অমুক অমুক লোককে বাহিনী হইতে মুক্ত করিয়া দাও। ইহারা এমন লোক যে, তাহারা মদীনার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। এখন হয় তাহারা তাহাদের স্ত্রী-পুত্রদের নিকট ফিরিয়া আসুক, না হয় তাহাদের খরচ পত্র পাঠাইয়া দিক। আর তাহাও না হইলে তাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়া দিক ও অতীত দিনগুলির পাওনা খচরপত্র পাঠাইয়া দিক। (শাফেয়ী, আবদুর রাজ্জাক, ইবনুল মুন্যির)

হযরত উমর (রা) এই নির্দেশ নামায় মাত্র তিনটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া চতুর্থ কোন উপায়ের নির্দেশ করেন নাই। প্রথম দুইটি উপায় সম্পর্কে তো কাহারও কিছু বলিবার নাই। এই দুইটি কাজের একটিও করা না হইলে তালাক দিতে বলিয়াছেন। স্ত্রীদের 'ছবর' অবলম্বন করিয়া থাকিতে বলেন নাই। আর তাহাদের যদি 'ছবর' করিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইলে এইরূপ ফরমান পাঠাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ইহা খাবার দিতে অক্ষম স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অভিমত প্রমাণকারী বলিষ্ঠ ও অকাট্য দলীল।

এই মতের বিপরীত পন্থীরা বলিয়াছেন, দলীল হিসাবে কুরআনের যে আয়াতটির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, এই আয়াতটি বারবার তালাক দিয়াও বারবার পুনরায় গ্রহণ করিয়া স্ত্রীকে অন্য স্বামী গ্রহণ হইতে বিরত রাখা ও তাহাকে কঠিন কষ্টে নিক্ষেপ করার জাহিলিয়াতকালীন সমাজের রেওয়াজের প্রতিবাদে নাযিল হইয়াছিল। ইহাকে 'খাবার দিতে অক্ষম' স্বামীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অবান্তর। এই কারণে এ প্রসঙ্গে তাঁহাদের এই দলীল গ্রহণ যোগ্য নয়। দ্বিতীয়, ক্রীতদাস ও জন্তু-জানোয়ার সংক্রান্ত শরীয়াতী আইনের দোহাই দেওয়াও এক্ষেত্রে অচল। কেননা জন্তু জানোয়ার ও ক্রীতদাস এবং স্ত্রী কখনও এক পর্যায়ে পড়ে না। ক্রীতদাস ও জন্তু জানোয়ারগুলির নিজস্ব কিছু নাই। উদর ভর্তি খাবার খাওয়াই ইহাদের একমাত্র কাজ। ইহারা না খাইয়া থাকিতেই পারে না, মালিকের জন্য ইহাদের এমন প্রেম ভালবাসা হওয়ারও প্রশ্ন নাই, যাহার তাকীদে তাহারা না খাইয়া ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও মালিক বা মনিবের নিকট থাকিয়া যাইবে। কিন্তু স্ত্রীর কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে ধৈর্য ধারণ করিতে পারে, খাবার দিতে অক্ষম স্বামীর জন্য সে কষ্ট স্বীকার করিতে রাযী হইতে পারে। স্বামীর কথা বলিয়া সে কাহারও নিকট ধার আনিতে বা ঋণ করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত এইরূপ অবস্থায় যদি সরকারী ক্ষমতায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর দাবি করিবার কিছুই থাকে না; অথচ বিবাহ অক্ষুণ্ন থাকিলে স্ত্রীর অধিকারও অক্ষুণ্ন থাকে, যদিও তাহা স্বামীর সচ্ছলতা ফিরিয়া আসার পরই আদায় করা সম্ভব হইবে। আর সম্পূর্ণ বাতিল হইয়া যাওয়ার পরিবর্তে বিলম্বে পাওয়ার আশা যে অনেক উত্তম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? (عمدة القارى)

হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, যে সব লোক সম্পর্কে উক্ত ফরমান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা স্ত্রীর খাওয়া-পরা জোগাইতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, সে কথা উহা হইতে বুঝা যায় না। সম্ভবত ইহা ছিল তাহাদের পারিবারিক দায়িত্ব পালনে উপেক্ষা ও গাফিলতী। আর সে উপেক্ষা ও গাফিলতীর আচরণ ছিন্ন করাই ছিল হযরত উমর (রা)-এরই তাকিদী ফরমানের মূল লক্ষ্য। তাই এইরূপ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদই ঘটাইতে হইবে এমন কথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু এই সমস্ত কথা কেবলমাত্র তখন পর্যন্ত, যতক্ষণ স্ত্রী-স্বামীর আর্থিক দৈন্যের দরুন তালাক না চাহিবে। সে যদি তালাক চাহে, তাহা হইলে কুরআনের উপরোক্ত আয়ত, রাসূলে করীম (স)-এর বাণী এবং হযরত উমরের ফরমানের ভিত্তিতেই তালাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে কুরআনের উপরোদ্ধৃত আয়াত সম্পর্কে এই দৃষ্টিতে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে নাজিল হইলেও ইহার অর্থ ও প্রয়োগ অতীব সাধারণ ও ব্যাপক এবং সর্বাত্মক। ইসলামী আইন দর্শনে পারদর্শীগণ এই পর্যায়ে যে মূলনীতি রচনা করিয়াছেন তাহা হইলঃ فَالْاِعْتِبَارُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السبب। কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে আইন রচনা কালে উহার শব্দ সমূহের সাধারণ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। যে বিশেষ প্রেক্ষিতে উহা নাযিল হইয়াছে, তাহার মধ্যেই উহাকে বাঁধিয়া রাখা যাইবে না। কাজেই যেখানেই স্ত্রীর কষ্ট হইবে ও কষ্ট হইতে মুক্তি লাভের জন্য স্ত্রীই তালাক চাহিবে, সেখানেই এই আয়াতের প্রয়োগ যথার্থ হইবে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর প্রত্যক্ষ ফয়ছালাও বিভিন্ন হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلٰى اِمْرَاَتِهٖ قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. (دارقطنى، بيهقى)

যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম, তাহার সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, এই দুইজনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে।

এই হাদীসের ভিত্তিতে জমহুর শরীয়াত পারদর্শীগণ বলিয়াছেনঃ

اِنَّ الزَّوْجَ اِذَا اَعْسَرَ عَنْ نَفَقَةِ اِمْرَاَتِهٖ وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(فتح البارى، نيل الاوطار)

স্বামী যদি দারিদ্র্য বশত স্ত্রীর খরচ বহন করিতে অক্ষম হয় এবং এই অবস্থায় স্ত্রী তাহার স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে অবশ্যই দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হইবে। (نيل الاوطار)

স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা

ইসলামে একের অধিক চারজন পর্যন্ত স্ত্রী এক সঙ্গে রাখার অনুমতি রহিয়াছে। এই পর্যায়ে সর্ব প্রথম দলীল হইল কুরআন মজীদের আয়াত فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَرُبٰعَ কিন্তু এই আয়াতাংশের পর পরই ও সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়া দিয়াছেনঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۔۔۔۔۔ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلَّا تَعُولُوا (النسا : ٣)

কিন্তু তোমরা যদি ভয় পাও এই জন্য যে, তোমরা সুবিচার করিতে পারিবে না তাহা হইলে এক জন-ই।......ইহাই অবিচার ও না-ইনসাফী হইতে রক্ষা পাওয়ার অধিক নিকটবর্তী পন্থা।

এই আয়াতটির তিন ধরনের তাফসীর খুবই পরিচিত। প্রথম তাফসীরটি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত এবং বুখারী, মুসলিম, সুনানে নাসায়ী ও বায়হাকী ইত্যাদি গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত উরওয়া ইবনুজ্জুবাইর (রা) তাঁহার খালাম্মা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)র নিকট এই আয়াতটির তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা বলিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর এই তাফসীর হইতে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতটি মূলত ইয়াতীম কন্যাদের অধিকার সংরক্ষণ পর্যায়ে নাযিল হইয়াছে। কিন্তু প্রসঙ্গত এক সঙ্গে স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে চার সংখ্যা পর্যন্ত সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত আয়াতাংশের দ্বিতীয় তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁহার ছাত্র ইকরামা হইতে বর্ণিত। আর তৃতীয় তাফসীরটি বর্ণিত হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ ও অন্যান্য মুফাসসিরীন হইতে।

এই তিনওটি তাফসীরে পার্থক্য এই যে, প্রথম দুইটি তাফসীরে আয়াতটি মূলত ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের উপর জুলুম করা হইতে নিষেধ করার উদ্দেশ্যে নাজিল হইয়াছে। আর তৃতীয় তাফসীরের দৃষ্টিতে আয়াতটি প্রকৃত ও মূলত স্ত্রীলোকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতাংশে একাধিক স্ত্রী একসঙ্গে গ্রহণ করার ব্যাপারে যেমন চারজনের সীমা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তেমনি স্ত্রীদের মধ্যে 'সুবিচার' করার শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, এই সুবিচার কিসে—কোন্ ব্যাপারে শর্ত করা হইয়াছে? স্ত্রীদের নিকট অবস্থান করা, তাহাদের খোরপোষ ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় বহনে সাম্য ও মমতা রক্ষা করা জরুরী, না দিলের ঝোঁক ও প্রেম-ভালবাসায় সাম্য রক্ষা করা আবশ্যক? আমাদের মতে এই সূরা নিসার ১২৯ আয়াতেই ইহার জওয়াব পাওয়া যায়। আয়াতটি এইঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

স্ত্রীদের মধ্যে পুরা মাত্রায় সুবিচার রক্ষা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা যদি তাহা চাহও, তবুও তাহা করিতে তোমরা সক্ষম হইবে না। অতএব (একাধিক স্ত্রী থাকিলে) তোমরা একজন স্ত্রীর প্রতি এমন ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িবে না, যাহাতে অন্যান্য স্ত্রীদের ঝুলিয়া থাকা অবস্থায় রাখিয়া দিবে। তোমরা যদি নিজেদের কর্মনীতি সুষ্ঠু ও সঠিক রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিতে থাক, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ই গুনাহ সমূহ মাফ দানকারী ও অতিশয় দয়াবান।

আয়াতটি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছে যে, একাধিক স্ত্রীর স্বামীর সুবিচার করার দায়িত্ব শুধু ততটা যতটা তাহাদের সাধ্যে রহিয়াছে। যাহা তাহাদের সাধ্যের বাহিরে, তাহা করা তাহাদের দায়িত্ব নয়। হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি বর্ণনা হইতে আয়াতটির সহীহ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহা এইঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْ مَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ.

(ترمذى، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه، دارمى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। নবী করীম (স) তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে (অধিকার সমূহ) বন্টন করিতেন, তাহাতে তিনি পূর্ণমাত্রায় সুবিচার করিতেন। আর সেই সঙ্গে এই বলিয়া দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ্! আমার বন্টন তো এই, সেই সব জিনিসে, যাহার মালিক আমি। কাজেই তুমি আমাকে তিরস্কৃত করিও না সেই জিনিসে যাহার মালিক তুমি, আমি নহি।

রাসূলে করীম (স)-এর এই দোয়ার শেষাংশে 'আমি যাহার মালিক নহি তাহাতে আমাকে তিরস্কৃত করিও না' বলিয়া যে দিকে ইংগিত করিয়াছেন, তাহা হইল দিলের ভালবাসা, মনের টান ঝোঁক ও প্রবণতা। বস্তুত এই ব্যাপারে মানুষের নিজের ইখতিয়ার খুব কমই থাকে। অতএব একাধিক স্ত্রীর স্বামীর যে সুবিচার করার দায়িত্ব তাহার স্ত্রীদের মধ্যে, তাহা এই বিষয়ে নিশ্চয়ই নয়। তাহা যৌন সঙ্গম ও জীবন-জীবিকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বন্টনের ব্যাপারে হইতে হইবে।

একটি আয়াতে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি এবং সেই সঙ্গে তাহাদের মধ্যে সুবিচার করার শর্ত আরোপ—আবার অপর আয়াতে 'তোমরা চাহিলেও সেই সুবিচার তোমরা করিতে পারিবে না' বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কি প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ্ তা'আলা একবার অনুমতি দিলেন এবং অপর আয়াতে সেই অনুমতিই ফিরাইয়া লইয়াছেন?.... আর তাহা হইলে তো চারজন পর্যন্ত স্ত্রী এক সঙ্গে গ্রহণের কোন অবকাশই থাকে না?

কোন কোন অর্বাচিন ও কুরআনের বক্তব্য বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে এই ধরনের প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং তাহারা সিদ্ধান্ত দিতে চাহিয়াছে যে, আসলে কুরআন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতিই দেয় নাই।

কিন্তু ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত পুরাপুরি ভিত্তিহীন। কেননা আসলেই আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য তাহা নয় যাহা কেহ বলিতে চেষ্টা পাইয়াছে। বস্তুত প্রথম আয়াতে এক সঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার ফলে যে বাস্তব সমস্যার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করা হইয়াছে, দ্বিতীয় আয়াতটিতে উহারই সমাধান বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম অনুমতি সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে যাঁহারা একাধিক স্ত্রীর স্বামী ছিলেন তাঁহারা স্ত্রীগণের মধ্যে পূর্ণমাত্রার এবং পূর্ব হইতেও অনেক বেশী করিয়া সুবিচার করিতে শুরু করেন। এই চেষ্টায় তো তাঁহারা সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু অন্তরের প্রেম-ভালবাসা ও ঝোঁক প্রবণতার ক্ষেত্রে তাঁহাদের ব্যর্থতা ছিল মানবীয় দুর্বলতার ফল এবং অবধারিত। সতর্ক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা সবকয়জন স্ত্রীদের প্রতি সমান মাত্রার ভালবাসা দিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় তাহাদের মানসিক উদ্বেগ ও অস্থিরতা তীব্র হইয়া দেখা দেয়। তখন তাঁহাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগিল, তাঁহারা আল্লাহ্র নাফরমানী করিতেছেন না তো? প্রেম-ভালবাসায় 'সুবিচার' করিতে না পারার দরুন তাঁহারা কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবেন না তো? সাহাবীদের মনের এই তীব্র ও দুঃসহ উদ্বেগ বিদূরিত করার উদ্দেশ্যেই এই দ্বিতীয় আয়াতটি নাযিল হয় এবং রাসূলে করীম (স) নিজের আমল দ্বারাই উহার বাস্তব ব্যাখ্যা পেশ করিলেন।

স্ত্রীদের মধ্যে আচার-আচরণ ভারসাম্য রক্ষা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ يَمِيْلُ لِاَحَدِهِمَا عَلَى الْاُخْرٰى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ .

(ترمذى،مسند احمد، حاكم)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যাহার দুইজন স্ত্রী রহিয়াছে, সে যদি তাহাদের একজনের প্রতি অন্যজনের তুলনায় অধিক ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসিবে যে, তাহার দেহের একটি পাশ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া থাকিবে।

(তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদরাক—হাকেম)

ব্যাখ্যা ইসলামে এক সঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য মোটামুটি দুইটি শর্ত। প্রথম শর্ত—যাহা ইসলামের সাধারণ ব্যবস্থা নিহিত ভাবধারা হইতে বুঝা যায়—এই যে, ইহা কেবলমাত্র অনিবার্য কারণেই করা যাইবে। কেহ যদি মনে করে যে, তাহার বর্তমান একজন স্ত্রীর দ্বারা চলিতেছে না, আরও একজন দরকার, নতুবা তাহার চরিত্র কলুষিত হওয়ার ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। যেহেতু ইসলামে ব্যভিচার অতিবড় অপরাধ, ইসলাম কোন অবস্থাতেই ব্যভিচারকে বরদাশত করিতে প্রস্তুত নয়। তাই কেবলমাত্র এইরূপ অবস্থায়ই একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে।

ইহার দ্বিতীয় শর্ত এই যে, বিবাহের পূর্বে তুমি তোমার নিজেকে যাচাই ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, তুমি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে عدل সুষ্ঠু ও নিরংকুশ নিরপেক্ষতা ও সুবিচার করিতে পারিবে কিনা। তাহা পারিবে এই বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলেই কেবলমাত্র তখনই একজন স্ত্রীর বর্তমান থাকা অবস্থায় আরও একজন—চারজন পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু এই একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হইল, তাহাদের মধ্যে আজীবন পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা ও আচার আচরণের ভারসাম্য রক্ষা করা। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহাই এই সব কথার ভিত্তি।

প্রথমেই এই আয়াতটি আমাদের সামনে আসেঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً (النساء: ٣)

তোমরা যদি আশংকা বোধ কর যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার ও পক্ষপাতহীনতা রক্ষা করিতে পারিবে, তাহা হইলে তোমরা বিবাহ কর যাহা তোমাদের মন চাহে—দুইজন, তিনজন ও চারজন। আর যদি সুবিচার ও পক্ষপাতহীনতা বজায় রাখিতে না পাররা আশংকাবোধ কর, তাহা হইলে একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

ঘরে লালিতা পালিতা পিতৃহীন মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে না পারার আশংকায় তাহাদের পরিবর্তে অন্যত্র দুই-দুইজন, তিন-তিনজন, চার-চারজন করিয়া বিবাহ করার অনুমতি এই আয়াতটিতে দেওয়া হইয়াছে। এই কথাটি হাদীস হইতেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

গাইলান ইবনে উমাইয়াতা আস-সাকাফী যখন ইসলাম কবুল করেন, তখন তাহার দশজন স্ত্রী বর্তমান ছিল। কেননা জাহিলিয়াতের জামানায় বহু কয়জন স্ত্রী একসঙ্গে রাখার ব্যাপক প্রচলন ছিল। নবী করীম (স) তাহাকে বলিলেনঃ

اِخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

তুমি তাহাদের মধ্য হইতে মাত্র চারজন স্ত্রী বাছিয়া লও। আর অবশিষ্ট সব কয়জনকে ত্যাগ করিতে হইবে। (মুয়াত্তা মালিক, নাসায়ী, দারে কুতনী)

হারেস ইবনে কাইস বলিয়াছেনঃ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِىْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ আমি যখন ইসলাম কবুল করিলাম, তখন আমার ৮ জন স্ত্রী ছিল। আমি এই কথা রাসূলে করীম (স)কে বলিলে তিনি নির্দেশ দিলেনঃ اِخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا (ابو داؤد) তুমি ইহাদের মধ্য হইতে মাত্র চারজন বাছিয়া লইয়া রাখ।

এক সঙ্গে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতির উপর ইজমা হইয়াছে। সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ী ও আজ পর্যন্তকার ইসলামী শরীয়াত অভিজ্ঞ সমস্ত আলিম—সমস্ত মুসলমান এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। ইহার বিপরীত অন্য কোন মত মুসলিম সমাজ কর্তৃক আজ পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই। হ্যাঁ এই ইজমা চূড়ান্ত ও স্থায়ী এবং একজন স্ত্রী থাকা অবস্থায় শরীয়াত সীমার মধ্যে থাকিয়া আরও এক-দুই বা তিনজন বিবাহ করিতে হইবে, সে প্রথম একজন স্ত্রীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণের কোন শর্ত নাই।

একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের দ্বিতীয় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হইল তাহাদের মধ্যে عدل করা। অর্থাৎ মনের ঝোঁক-প্রবণতা, প্রেম-ভালবাসা, সঙ্গম, একত্র থাকা, একত্রে থাকার রাত্রি বিভক্ত ও নির্দিষ্ট করণ—এই সব দিক দিয়া স্ত্রীদের মধ্যে عدل সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও সুবিচার রক্ষা করিতে হইবে। আর তাহা করিতে পারিবে না মনে করিলে একজন মাত্র স্ত্রী রাখিবে, একজনের বেশী গ্রহণ করিবে না। গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহাদের মধ্যে ইনসাফ বলবত রাখিবে। আর রাখিতে অপারগ হইলে একজন বাছিয়া লইয়া অবশিষ্টদের ত্যাগ করাই উচিত। এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, عدل করা ওয়াজিব। এই সুবিচার যাহারা রক্ষা করিবে না, তাহাদের পরকালীণ চরম দুর্গতির করুণ চিত্র উপরোদ্ধৃত হাদীসে অংকিত হইয়াছে।

তিরমিযী ও হাকেম-এর বর্ণনায় এই হাদীসটির এখানকার ভাষা হইলঃ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ 'তাহার এক পার্শ্ব ঝুঁকিয়া পড়া' মনে হইবে তাহার দেহের অর্ধেক ভাঙিয়া পড়িয়াছে, পংগু হইয়াছে। সে যে জীবনে একজন স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছে, তাহার দেহের এই অবস্থা সেই কথাটিই সকলের নিকট প্রকট করিয়া তুলিবে। প্রমাণ করিবে, সে বর্তমানে যেমন অসুস্থ, ভারসাম্যহীন, দুনিয়ায় তাহার পারিবারিক জীবনও এমনিই অসুস্থ ও ভারসাম্যহীন ছিল।

বর্ণনাটির এই অংশের আর একটি ভাষা হইলঃ

يَجُرُّ اَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا اَوْمَائِلًا (رواه الخمسة)

তাহার দুইটি অংশের একটিকে নিম্নে পতিত কিংবা ঝুঁকিয়া থাকা অবস্থায় টানা হেঁচড়া করিয়া চলিতেছে।

ইমাম শওকানী এই হাদীসটির আলোচনায় লিখিয়াছেনঃ

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْلِ إِلَى إِحْدَى الزَّوْجَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فِي أَمْرٍ يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ كَالْقِسْمَةِ وَالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ كَالْمَحَبَّةِ وَنَحْوِهَا (نيل الاوطار)

এই হাদীস একথার দলীল যে, দুইজন স্ত্রীর মধ্যে একজনকে বাদ দিয়া অপরজনের দিকে স্বামীর ঝুঁকিয়া পড়া সম্পূর্ণ হারাম। অবশ্য ইহা সেই সব ব্যাপারে যাহাতে স্বামীর ক্ষমতা রহিয়াছে—যেমন দিন ও সময় বন্টন এবং খাওয়া-পরা ও সাধারণ আচার-আচরণ ইত্যাদি। কিন্তু যে সব ব্যাপারে স্বামীর কোন হাত নাই—যেমন প্রেম-ভালবাসা, অন্তরের টান ইত্যাদি—তাহাতে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নয়। মূলত তা عدل এর আওতার মধ্যেও পড়ে না।

অধিকাংশ ইমাম বলিয়াছেনঃ স্ত্রীগণের মধ্যে দিন সময় বন্টন ওয়াজিব।

এই পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) এর একটি কথা উল্লেখ্য। তিনি বলিয়াছেনঃ

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (رواه الخمسة الا احمد)

রাসূলে করীম (স) দিন বন্টন করিয়া স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করিতেন এবং বলিতেন, হে আল্লাহ্! ইহা আমার বন্টন যাহা করার ক্ষমতা আমার আছে তাহাতে। অতএব তুমি যাহাতে ক্ষমতা রাখ, আমি রাখি না, তাহাতে আমাকে তিরস্কার করিও না। (نيل الاوطار)

স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকার

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُقْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيْكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اِنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَا اِلَّا بِالْمَعْرُوْفِ (بخاری، مسلم)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, উত্‌বার কন্যা হিন্দ্ আসিল ও বলিলঃ ইয়া রাসূল! আবূ সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ ব্যক্তি। এমতাবস্থায় আমি তাহার সম্পদ হইতে আমার সন্তানদিগকে যদি খাওয়াই-পরাই, তাহা হইলে কি আমার কোন দোষ হইবে? রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ না, তবে প্রচলিত নিয়মে ও নির্দোষ পন্থায়। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা হাদীসটির মূল বক্তব্য হইল সন্তানদের খোরাক পোশাক জোগাইবার দায়িত্ব পালন। পিতা এই দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন না করিলে স্ত্রীকেই অগ্রসর হইয়া দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। হাদীসটির প্রতিপাদ্য ইহাই। এই হাদীসটি মাত্র দুইজন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। একজন হইলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা), আর দ্বিতীয় জন হইলেন হযরত ওরওয়া ইবনু-জুবাইর। হিন্দ্ বিনতে উত্‌বা হযরত আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী এবং হযরত আমীর মুয়াবিয়ার জননী। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম কবুল করেন। আবূ সুফিয়ান তাঁহার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে এই দুই জনের বিবাহ নবী করীম (স) অক্ষুণ্ন ও বহাল রাখিয়াছিলেন। হিন্দ্ হযরত নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার স্বামী আবূ সুফিয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিলেন ও সমস্যার সমাধানে পথের নির্দেশ চাহিলেন। অভিযোগে বলিলেনঃ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيْكٌ আবূ সুফিয়ান একজন অতিশয় কৃপণ ব্যক্তি। 'কৃপণ ব্যক্তি' বলিতে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তিনি এই কার্পণ্যের দরুন নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের খোরাক-পোশাকও ঠিক মত দিতেছেন না। ফলে পরিবার বর্গের লোকেরা—তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন—খুবই অভাব, দারিদ্র্য ও অসুবিধার মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিতে বাধ্য হইতেছে। এমতাবস্থায় শরীয়াতের আইনের দৃষ্টিতে স্ত্রী কি করিতে পারে? সে কি কি ভাবে তাহার ছেলে মেয়ে লইয়া জীবনে বাঁচিয়া থাকিবে—তাহাই জিজ্ঞাস্য।

মুসলিম শরীফে এই হাদীসটির ভাষা এইরূপঃ

اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لَا يُعْطِيْنِىْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِىْ وَيَكْفِىْ بَنِىَّ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهُوَ عَلَىَّ فِىْ ذٰلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِىْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ وَيَكْفِىْ بَنِيْكِ

আবূ সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ ব্যক্তি। তিনি আমার ও আমার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খরচ পত্র দেন না। তবে আমি তাঁহার অজ্ঞাতে যাহা গ্রহণ করি তাহা দিয়াই প্রয়োজন পূরণ করিয়া থাকি। ইহাতে কি আমার কোন গুনাহ হইবে? রাসূলে করীম (স) বলিলেন, তুমি তাহার অর্থ-সম্পদ হইতে তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে এমন পরিমাণ সম্পদ প্রচলিত নিয়মে গ্রহণ কর।

অপর একটি বর্ণনায় হিন্দের কথার ভাষা এই রূপঃ

إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

তবে আমি যাহা গোপনে—তিনি জানেন না এমনভাবে গ্রহণ করি। (শুধু তাহা দিয়াই আমাকে যাবতীয় খরচ চালাইতে হয়)

অর্থাৎ তিনি নিজে যাহা দেন তাহা যথেষ্ট হয় না। পরে তাহাকে না জানাইয়া গোপনে আমাকে অনেক কিছু লইতে হয়।

ইহার জওয়াবে রাসূলে করীম (স)-এর কথা এই ভাষায় বর্ণিত হইয়াছেঃ

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُطْعِمَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

তুমি যদি প্রচলিত নিয়মে সন্তানদিগকে খাওয়াও, পরাও, তবে তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না।

অন্যান্য সিহাহ গ্রন্থেও এই হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে ইহার ভাষা ভিন্ন ধরনের। একটি বর্ণনার ভাষা এইরূপঃ

إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِى مَا يَكْفِينِى وَوَلَدِى اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। তিনি আমাকে এমন পরিমাণ খোরাক-পোশাক দেন না যাহা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। তবে আমি যদি তাহাকে না জানাইয়া গ্রহণ করি, তবেই আমার ও আমার সন্তানদের খরচ বহন হইতে পারে।

ইহার জওয়াবে নবী করীম (স)-এর কথাটি এ ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

خُذِىْ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

তুমি প্রচলিত মান অনুযায়ী তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট হইতে পারে তাহা গ্রহণ কর।

বুখারী মুসলিমেরই অপর একটি বর্ণনায় এই জওয়াবের ভাষা এই রূপঃ

مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى وَلِيدَكِ

যাহা তোমার জন্যও যথেষ্ট হইতে পারে, যথেষ্ট হইতে পারে তেমার সন্তানের জন্যও।

হাদীসে ব্যবহৃত شَحِيحٌ শব্দটি بَخِيلٌ 'কৃপণ' হইতেও অধিক ব্যাপক অর্থবোধক। ইহার অর্থ بَخِيلٌ حَرِيصٌ 'কৃপণ ও লোভী'। শুধু 'বখীল' বা কৃপণ বলিতে বুঝায়, সে তাহার ধন সম্পদ ব্যয় করে না। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেয় না। আর الشُّحُّ অর্থঃ সর্বাবস্থায় সব রকমের জিনিসই আটক করিয়া রাখা ও কাহাকেও কিছু না দেয়া এবং সেই সঙ্গে আরও অধিক পাইবার জন্য বাসনা পোষণ করা। ফলে الشَّحِيحُ শব্দের অর্থ হয়, কৃপণ-লোভী।

হিন্দ্ যে ভাবে অভিযোগটি পেশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, আবূ সুফিয়ান পারিবারিক খরচপত্র চালাইবার জন্য যাহা দেন, তাহা যথেষ্ট হয় না বলে তিনি স্বামীর অজ্ঞাতসারে ও লুকাইয়া গোপনে আরও বেশী গ্রহণ করেন এবং তাহার দ্বারা নিজের ও সন্তানাদির প্রয়োজন পূরণ করিয়া থাকেন। এখন তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহার এই কাজটি শরীয়াত সম্মত কিনা, ইহাতে কি তাঁহার কোন গুনাহ হইবে?

এই পর্যায়ে মনে রাখা আবশ্যক, এই সময় হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন না। তাই ইহাকে 'স্বামীর অনুপস্থিত থাকাকালীন পারিবারিক সমস্যা' মনে করা যায় না। সমস্যা ছিল তাঁহার কার্পণ্য, পরিবার বর্গের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করিবার জন্য না দেওয়া। তবে স্বাম-স্ত্রী-পুত্র পরিজনের প্রয়োজন আদৌ পূরণ করেন না এমন কথা বলা হয় নাই। তাহাদিগকে অভুক্ত থাকিতে বাধ্য করেন এমন কথাও নয়। কেননা তাহা হইলে এতদিন পর্যন্ত তাহারা বাঁচিয়া থাকিল কিভাবে? হযরত আবূ সুফিয়ান নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিও ছিলেন না। পরিবারবর্গকে যথেষ্ট পরিমাণে জীবিকা দারিদ্রের কারণে দিতে পারিতেন না এমন কথা নয়। তিনি শুধু কৃপণতা বশতই তাঁহার আর্থিক সামর্থ্যানুপাতে স্ত্রী-পুত্রকে উপযুক্ত মানে ও যথেষ্ট পরিমাণে জীবিকা দিতেছিলেন না। ইহাই ছিল তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

নবী করীম (স) এই মামলার রায় দান প্রসঙ্গে শুধু একটি কথাই বলিয়াছেন। তাহা হইল, তুমি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতে পার না। গ্রহণ করিতে পার শুধু প্রচলিত মান পরিমাণ। অন্য কথায় স্বামীর দেওয়া সম্পদে মৌল প্রয়োজন অপূরণ থাকিয়া গেলে স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাহার সম্পদ হইতে সেই প্রয়োজন পূরণ হইতে পারে শুধু এতটা পরিমাণই গ্রহণ করা যাইতে পারে, উহার অধিক লইয়া যথেচ্ছ ব্যয় বাহুল্য ও বিলাসিতা করিবে, শরীয়াতে তাহার কোন অনুমতি নাই। সব কৃপণ স্বামীর ক্ষেত্রে সব স্ত্রীর জন্যই ইসলামের এই বিধান। রাসূলে করীমের জওয়াবটির অর্থ এই ভাষায় করা হইয়াছেঃ لَا يُسْرِفِىْ وَاَنْفِقِىْ بِالْمَعْرُوْفِ 'বেহুদা খরচ করিবে না। নিতান্তও প্রচলিত নিয়ম বা মান মাফিক ব্যয় করিতে পার। (عمدة القارى)

নবী করীম (স)-এর এই জওয়াব সম্পর্কে আল্লামা কুরতুবী বলিয়াছেনঃ

هٰذَا اَمْرُ اِبَاحَةٍ

ইহা এমন আদেশসূচক কথা যাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই কাজটি করা মুবাহ—জায়েয।

বুখারীর অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ لَاحَرَجَ 'তাহাতে দোষ নাই'। আল্লামা শাওকানী লিখিয়াছেনঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى وُجُوْبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلٰى زَوْجِهَا وَهُوَ مُجْمَعٌ

স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহন করা যে স্বামীর কর্তব্য, এই হাদীসটি হইতে তাহা স্পষ্ট অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় এবং ইহা সর্বসম্মত মত।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা নবী করীম (স)-এর ফতোয়া। কোন বিচার ফয়সালা বা قضاء নয়। অতএব ইহার ভিত্তিতে শরীয়াতের বিধান রচনা করা যায় না।

কিন্তু এই কথা স্বীকৃতব্য নয়। কেননা নবী করীম (স) ফতোয়া দিয়া থাকিলেও সে ফতোয়া দ্বীন-ইসলামেরই অন্যতম ভিত্তি।

এই হাদীসের ভিত্তিতে একথাও বলা হইয়াছে যে, ঠিক যে পরিমাণ সম্পদে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ-থাকন সুসম্পন্ন হয়, সেই পরিমাণ দেওয়াই স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব, তাহার বেশী নয়। কিন্তু এই মত-ও সর্ববাদী সম্মত নয়। কেবল মাপিয়া গুনিয়া ততটুকু পরিমাণ দ্বারা আর যাহাই চলুক, স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘর-সংসার চালানো যায় না।

স্ত্রীর জন্য গৃহকর্মে সাহায্যকারীর ব্যবস্থা করা

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ مَا هُوَ خَيْرٌلَّكِ مِنْهُ تُسَبِّحِيْنَ اللّٰهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدِيْنَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتُكَبِّرِيْنَ اللّٰهَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ اِحْدَاهُنَّ اَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ قِيْلَ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ قَالَ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ. (بخارى)

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ফাতিমা (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট একজন খাদেম চাহিলেন। নবী করীম (স) বলিলেনঃ আমি কি তোমাকে তোমার জন্য ইহাপেক্ষাও অধিক কল্যাণকর একটা উপায় বলিয়া দিব? তাহা হইলঃ তুমি যখন ঘুমাইতে যাইবে তখন ৩৩বার আল্লাহ্র তসবীহ করিবে, ৩৩বার আল্লাহ্র হামদ করিবে এবং ৩৪বার আল্লাহ্র তাকবীর বলিবে। সুফিয়ান বলিলেনঃ এই তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার ৩৪বার। অতঃপর আমি উহা কখনও বাদ দেই নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ছিফ্ফীন যুদ্ধের রাত্রেও নয়? তিনি বলিলেনঃ ছিফ্ফীন যুদ্ধের রাত্রেও নয়। (বুখারী)

ব্যাখ্যা হাদীসের কথা গুলি হইতে বুঝা যায়, হযরত ফাতিমা (রা) গৃহকর্মের অপারগ হইয়া তাঁহার পিতা হযরত রাসূলে করীম (স)-এর নিকট একজন খাদেম বা চাকর রাখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। নবী করীম (স) তাঁহাকে কোন চাকরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন বা দেন নাই, এ বিষয়ে উদ্ধৃত হাদীসে কোন কথাই বলা হয় নাই। তবে নবী করীম (স) এই প্রার্থনার জওয়াবে দোয়া তসবীহ করার নিয়ম শিক্ষা দিলেন। বলিলেন, ঘুমাইবার সময় ৩৩ বার সুবহান-আল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলিবে।

ইমাম ইবনে জরীর তাবারী বলিয়াছেন, ইহা হইতে বুঝা যায়, যে স্ত্রীর সামর্থ্য আছে রান্না-বান্না, চাউল তৈরী করা ইত্যাদি গৃহকর্ম তাহার নিজেরই করা উচিত। সেজন্য স্বামীর উপর দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া উচিত নয়। আর ইহাই সাধারণ প্রচলন। উপরোদ্ধৃত হাদীস হইতে জানা যায়, হযরত ফাতিমা (রা) তাঁহার পিতার নিকট গৃহকর্মে সাহায্যকারী খাদেম চাহিলেন। কিন্তু নবী করীম (স) তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার জন্য একজন খাদেমের ব্যবস্থা না নিজে করিয়া দিলেন, না তাঁহার সম্মানিত জামাতা হযরত আলী (রা)কে খাদেম রাখিয়া দিবার জন্য কোন নির্দেশ দিলেন। অন্তত এ হাদীসে উহার উল্লেখ নাই। তাহা করা যদি হযরত আলী (রা)-এর আর্থিক সামর্থ্যে কুলাইত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই উহা করার জন্য নির্দেশ দিতেন। ইমাম মালিক (রা) বলিয়াছেনঃ

اِنَّ خِدْمَةَ الْبَيْتِ تَلْزِمُ الْمَرْأَةَ وَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ قَدْرٍ وَشَرَفٍ اِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا

স্বামীর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইলে ঘরের কাজকর্ম করা স্ত্রীর কর্তব্য—সে স্ত্রী যতই সম্মান ও মর্যাদাশীলা হউক না কেন।

এই কারণেই নবী করীম (স) হযরত ফাতিমা (রা)কে গৃহকর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র সাহায্য লাভের একটা উপায়ও শিখাইয়া দিলেন। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, তুমি যদি গৃহকর্ম করিতে না পার, তাহা হইলে তাহা করিও না। কিংবা হযরত আলী (রা)কে বলিলেন না, আমার কন্যার কষ্ট হইতেছে, যে রকমই হউক, গৃহকর্মের জন্য তুমি একজন চাকরের ব্যবস্থা করিয়া দাও। এইরূপ আদেশ তিনি অবশ্যই দিতে পারিতেন, তাহাতে সম্মানিত জামাতার যত কষ্টই হউক না কেন। কিন্তু তিনি হযরত আলীর আর্থিক সামর্থ সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে তাঁহার মহা সম্মানিতা স্ত্রীর গৃহকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন খাদেম নিয়োগ করা সম্ভব নয়। ইহা সত্ত্বেও নির্দেশ দিলে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে তাহা পালন করা সম্ভবপর হইত না। ফলে তিনি ভয়ানক কষ্টে পড়িয়া যাইতেন। এ কথা নবী করীম (স) ভাল ভাবেই জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে এই কষ্টে ফেলিলেন না। সম্ভবত কোন শ্বশুরই নিজের জামাতাকে এই ধরনের অসুবিধায় ফেলে না। কোন কোন হাদীসবিদ বলিয়াছেন, এই হাদীস ছাড়া অন্য কোন দলীল হইতে আমরা জানিতে পারি নাই যে, নবী করীম (স) হযরত ফাতিমা (রা)-কে কোন আভ্যন্তরীণ গৃহ খেদমতের ফায়সালা দিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভাবে জানেন, ব্যাপারটি সেই ভাবে তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাই দাম্পত্য জীবনের উত্তম আচরণ বিধি। উচ্চতর নৈতিকতার দাবিও ইহাই। স্ত্রীকে ঘরের কাজে বাধ্য করা যাইতে পারে এমন কোন শরীয়াতী বিধান নাই। বরং বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত মত এই যে, স্বামীই স্ত্রীর যাবতীয় ব্যাপারের'জন্য দায়িত্বশীল। ইমাম তাহাভী বলিয়াছেন, স্ত্রীর খাদেমকে ঘর হইতে বহিষ্কৃত করার কোন অধিকার স্বামীর নাই। অতএব প্রয়োজন মত এই খাদেমের যাবতীয় খরচ বহন করা স্বামীর কর্তব্য। কূফার ফিকাহবিদ এবং ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, স্ত্রীর এবং তাহার খাদেমের—যদি সে খেদমতের কাজে নিযুক্ত থাকে—যাবতীয় খরচ স্বামীকে বহন করিতে হইবে।

হাদীসের ভাষা ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ 'অতঃপর সুফিয়ান বলিলেন'। এই সুফিয়ান হইলেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। তিনি আলোচ্য হাদীসের একজন বর্ণনাকারী। কোন্ বাক্যটি কতবার পড়িতে হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার মনে দ্বিধা ছিল সম্ভবতঃ। সেই কারণেই তিনি শেষে এই রূপ বলিয়াছেন। হাদীসের শেষাংশের উদ্ধৃত আমি উহা কখনও বাদ দেই নাই। অর্থাৎ আমি রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ মত নিয়মিত ভাবে এই তাসবীহ—তাকবীর পড়ার কাজটি করিয়াছি। হযরত আলী (রা)-এর নিকট হইতে এই হাদীসের জনৈক শ্রোতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিফ্ফীন যুদ্ধের ভয়াবহ রাত্রিতেও কি উহা পড়িয়াছেন? তিনি জওয়াবে বলিলেনঃ হ্যাঁ সেই ভয়াবহ রাত্রিতেও আমি ইহা না পরিয়া ছাড়ি নাই। 'ছিফ্ফীন' সিরীয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। হযরত মুয়াবীয়া (রা)-এর সহিত হযরত আলী (রা)-এর ইতিহাস খ্যাত যুদ্ধ এই স্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা ৩৬ হিজরী সনের কথা। এই কথাটি দ্বারা হযরত আলী (রা) বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এই রাত্রের ভয়াবহতা সত্ত্বেও তিনি নবী করীম (স)-এর শিক্ষা দেওয়া এই তাসবীহ তাকবীর হামদ পড়া ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি ইহার পুরাপুরি পাবন্দী করিয়াছেন। রাসূলে করীম (স) এর দেওয়া শিক্ষাকে সাহাবায়ে কিরাম (রা) কতখানি দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই কথা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। (عمدة القاری)

গৃহ কর্মে স্বামীর অংশ গ্রহণ

عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِى الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ فِىْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ خَرَجَ.

(بخاری، ترمذی)

আস্‌ওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি হযরত আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম (স) ঘরে থাকিয়া কি করিতেন? জওয়াবে হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, তিনি ঘরে থাকার সময় গৃহের নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। ইহার মধ্যে যখন-ই আযানের ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তখনই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন। (বুখারী, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা হাদীসটি বুখারী শরীফে এই একই মূল বর্ণনাকারী আসওয়াদ হইতে তিনটি স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এই তিনটি স্থানে উদ্ধৃত হাদীসটির ভাষায় কিছুটা পার্থক্য আছে। কিন্তু সে পার্থক্যের দরুন মূল বক্তব্যে কোনই পার্থক্য সূচিত হয় নাই। নবী করীম (স) যখন ঘরে থাকিতেন তখন তিনি কি করিতেন, ইহাই ছিল মূল প্রশ্ন। ইহার জওয়াবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলিলেনঃ তিনি ঘরে থাকার সময় ঘরের লোকদের কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। হাদীসের শব্দ مِهْنَةٌ ইহার অর্থ খেদমত। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আদম ইবনে আবূ ইয়াস এই অর্থ বলিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ও আবূ দায়ূদ তায়লিসীও এই হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এই শব্দ হইতে তাহারাও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

'আল মুহকাম' গ্রন্থ প্রণেতা এই শব্দটির একটা বিশেষ অর্থ করিয়াছেন এই ভাষায় اَلْمِهْنَةُ اَلْحَذَقُ بِالْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ অর্থাৎ এই শব্দটির অর্থ শুধু খেদমত নয়। ইহার অর্থ, খেদমত ও যাবতীয় কাজ-কর্মে দক্ষতা ও কুশলতা। কোন কোন বর্ণনায় ইহার ভাষা হইলঃ فِىْ مِهْنَةِ بَيْتِ اَهْلِهِ তাঁহার পরিবার বর্গের ঘরের কাজ কর্মে......। ইহার মূল অর্থে কোন পার্থক্য হয় না। اهل বলিতে নিজেকে সহ ঘরে অবস্থানকারী সব লোকই বুঝায়। শামায়েলে তিরমিযীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেনঃ

مَا كَانَ اِلَّا بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يُفْلِى ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ

নবী করীম (স) সাধারণ মানুষের মধ্যে গণ্য একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। এই হিসাবে তিনি তাঁহার কাপড় পরিষ্কার করিতেন, ছাগী দোহন করিতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ কর্ম করিতেন।

আর মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে হাব্বানে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

يُخَيِّطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ

তিনি তাঁহার কাপড় ধোলাই করিতেন ও জুতায় তালি লাগাইতেন।

বুখারীরই একটি বর্ণনার ভাষা كَانَ يَكُوْنُ হইতে বুঝা যায় যে, ইহা নবী করীমের স্থায়ী নীতি ও কর্ম তৎপরতা ছিল। আর مِهْنَةُ اَهْلِه বাক্যাংশের অর্থ হাদীস বর্ণনাকারী নিজেই বলিয়াছেনঃ خِدْمَةُ اَهْلِه তাঁহার পরিবার বর্গের কাজ-কর্ম নবী করীম (স) করিতেন।

এই হাদীস হইতে কয়েকটি কথা স্পষ্ট রূপে জানা যায়। প্রথম এই যে, নবী করীম (স) একজন মানুষ ছিলেন দুনিয়ার আর দশজন মানুষের মত। তাঁহার ঘর গৃহস্থালী ছিল। তিনি দুনিয়া ত্যাগী বৈরাগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুসলমানদের শাহান শাহ; কিন্তু তাঁহার মন মেজাজে অহংকার আহমিকতা বলিতে কিছু ছিল না। এই সব মৌলিক মানবীয় গুণ ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ খোদানুগত বান্দাহ। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র ওহী গ্রহণকারী নবী ও রাসূল।

তিনি যে আদর্শ স্বামী ছিলেন, এই হাদীসে তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, তিনি ঘরে আসিয়া অলস বিশ্রামে সময় কাটাইতেন না, ঘরের কাজ কর্ম করিতেন, ঘরের লোকদের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করিতেন। বস্তুত দুনিয়ার সব স্বামীরও এই গুণ ও পরিচয় থাকা আবশ্যক। নতুবা ঘরের সমস্ত কাজ যদি কেবলমাত্র স্ত্রীর উপর ন্যাস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং সে কাজ সম্পাদনে স্বামী কিছু মাত্র অংশ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহা হইবে স্ত্রীর প্রতি জুলুম একদিকে এবং অপর দিকে স্বামীতে স্ত্রীতে দূরত্ব ও ব্যবধান বিরোধ সৃষ্টি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

শুধু তাহাই নয়, রাসূলে করীম (স) ছিলেন একজন আদর্শ খোদানুগত মুসলমান। ইহারই প্রমাণ স্বরূপ হাদীসে বলা হয়াছেঃ

فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ خَرَجَ

তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় যখনই নামাযের আযান শুনিতে পাইতেন নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়ার জন্য তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন।

বুখারীর-ই অন্যত্র এই বাক্যটির ভাষা হইল

فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ

যখন নামায উপস্থিত হইত, তিনি নামাযের জন্য বাহির হইয়া যাইতেন।

বস্তুত ইহাই আদর্শ মুসলমানের নিয়ম ও চরিত্র। তাহারা যেমন আল্লাহ্র হক আদায় করেন তেমনি আদায় করেন মানুষের হকও। (فتح البارى، عمدة القارى)

সদ্যজাত শিশুর প্রতি কর্তব্য

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِالصَّلٰوةِ. (ترمذى، ابوداؤد)

হযরত আবূ রাফে (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি রাসূলে করীম (স) কে হযরত আলী ইবনে আবূ তালিবের (রা) পুত্র হাসান-এর কানে নামাযের আযান দিতে দেখিয়াছি। যখন হযরত ফাতিমা (রা) তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন। (তিরমিযী, আবূ দায়ূদ)

ব্যাখ্যা সন্তান প্রসব হওয়ার পরই তাহার প্রতি নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য কি, তাহা এই হাদীসটি হইতে জানা যাইতেছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, হযরত ফাতিমা (রা) যখন হযরত হাসান (রা)কে প্রসব করিয়াছিলেন ঠিক তখনই নবী করীম (স) তাহার দুই কানে আযান ধ্বনী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এই আযান পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযানেরই মত ছিল, উহা হইতে ভিন্নতর কিছু ছিল না। ইহা হইতে সদ্যজাত শিশুর কানে এইরূপ আযান দেওয়া সুন্নাত প্রমাণিত হইতেছে। ইহা ইসলামী সংস্কৃতিরও একটি অত্যন্ত জরুরী কাজ। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মানব শিশু যাহাতে তওহীদবাদী ও আল্লাহ্র অনন্যতায় বিশ্বাসী ও দ্বীন-ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। সদ্যজাত শিশুর কর্ণে সর্বপ্রথম—দুনিয়ার অন্যান্য বিচিত্র ধরনের ধ্বনি ধ্বনিত হইতে না পারে তাহার পূর্বেই এই আযান ধ্বনি তাহার কর্ণে ধ্বনিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বস্তুত আযানের বাক্য সমূহে ইসলামের মৌলিক কথাগুলি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্র সর্ব শ্রেষ্ঠ হওয়া, আল্লাহ্রই একক ও অনন্য মাবুদ হওয়া এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার কথা ঘোষিত হইয়াছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও চূড়ান্ত ভাবে। আর ইহাই হইল ইসলামী বিশ্বাসের মৌলিক ও প্রাথমিক কথা সমূহ। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওজিয়া বলিয়াছেনঃ

وَالْحِكْمَةُ مِنْهُ اَنْ يَّكُوْنَ اَوَّلَ مَا يَطْرُقُ سَمْعَهُ تَكْبِيْرُ اللّٰهِ وَشَهَادَةُ الْاِسْلَامِ

সদ্যজাত শিশুর কর্ণে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র তাকবীর—নিরংকুশ শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, আল্লাহ্ ছাড়া কেহ ইলাহ বা মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল—এই উদাত্ত সাক্ষ্য ও ঘোষণার ধ্বনি সর্বপ্রথম যেন ধ্বনিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَاَذَّنَ فِىْ اُذُنِهِ الْيُمْنٰى وَاَقَامَ فِىْ اُذُنِهِ الْيُسْرٰى لَمْ تَضُرَّهُ اُمُّ الصِّبْيَانِ. (بيهقى ابن السنى)

হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) হইতে নবী করীম (স) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ যাহার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, পরে উহার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্কামত উচ্চারিত হইলে 'উম্মুস্‌সিব্‌ইয়ান উহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। (বায়হাকী, ইবনুস-সনী)

ব্যাখ্যা হযরত হাসান (রা) বর্ণিত এই হাদীসটিতে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্কামত বলার কথা হইয়াছে, যদিও ইহার পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসটি কানে শুধু আযান দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। বাহ্যত দুইটি হাদীসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য মনে হয়। কিন্তু মূলত এই দুইটির মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নাই। প্রথম হাদীসটিতে রাসূলে করীম (স) এর নিজের আমল বা কাজের বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে রাসূলে করীম (স)-এর নিজের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত আব্বাস (রা)-এর সূত্রেও বর্ণিত ও হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলিয়াছেন, সদ্যজাত শিশুর এক কানে আযান ও অপর কানে ইক্কামতের শব্দগুলি উচ্চারিত ও ধ্বনিত হইলে তাহা তাহার উপর ইসলামী জীবন গঠনের অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। কি ধ্বনিত হইল সে বিষয়ে যদিও শিশুটির চেতনা নাই। সে শব্দ বা বাক্য সমূহের তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারে না, একথা সত্য। কিন্তু ইহার কোন কোন প্রভাব তাহার মনে মগজে ও চরিত্র মেজাজে অবশ্যই পড়িবে, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে না। দুনিয়ায় তাহার জীবনের প্রথম সূচনা কালের 'তালকীন' বিশেষ, যেমন মুমূর্ষাবস্থায়ও তাহার কানে অনুরূপ শব্দ ও বাক্য সমূহ তালকীন করা হয়। ইহাতে সূচনা ও শেষ এর মধ্যে একটা পূর্ণ সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি সদ্যজাত শিশুকে আয়ত্তাধীন ও প্রভাবাধীন বানাইবার জন্য শয়তান ধাবিত হইয়া আসিতেই যদি আযান ইক্কামতের ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহা হইলে উহার দ্রুত পালাইয়া যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। ফলে সদ্যজাত শিশুটি শয়তানের মারাত্মক অস্‌অসা থেকে রক্ষা পাইয়া যায়। উম্মুসসিবইয়ান বলিয়া সদ্যজাত শিশুর গায়ে লাগা ক্ষতিকর বাতাস বোঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ শিশুর কানে আযান ইক্কামত দেওয়া হইলে সাধারণ প্রাকৃতিক কোন ক্ষতিকর প্রভাব উহার উপর পড়িবেনা। পড়িলেও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। (تحفة المودود، تربية الاولاد)

শিশুদের প্রতি স্নেহ-মমতা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بْنِ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِىُّ فَقَالَ الْاَقْرَعُ اِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ اَحَدًا قَطُّ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَايَرْحَمْ لَايُرْحَمْ. (بخارى)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) হযরত আলী (রা)-এর পুত্র হাসান ও হুসাইন (রা)কে স্নেহের চুম্বন করিলেন। এই সময় আকরা ইবনে হাবিস আত-তামীমী (রা) তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি উহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার দশটি সন্তান রহিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের কোন একজনকেও কখনও আদরের চুম্বন দেই নাই। তখন রাসূলে করীম (স) তাঁহার দিকে তাকাইলেন এবং পরে বলিলেনঃ যে লোক নিজে (অন্যদের প্রতি) দয়া-মায়া স্নেহ পোষণ করে না, তাহার প্রতিও দয়া-মায়া স্নেহ পোষণ করা হয় না। (বুখারী)

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে নিজ বংশের শিশু সন্তানদের প্রতি অকৃত্রিম ও নির্মল স্নেহ-মায়া-দরদ বাৎসল্য পোষণ ও প্রকাশ করার প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং এই পর্যায়ে বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ্র রহমত হযরত নবী করীম (স) তাঁহার নিজ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর গর্ভজাত দুই সন্তান হযরত হাসান ও হুসাইনের প্রতি যে অসীম স্নেহ-মমতা-মায়া পোষণ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে স্নেগময় চুম্বন দিয়া যে বাস্তব নিদর্শন স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে আক্‌রা (اَقْرَعْ) ইবনুল হাবেস—যিনি জাহিলিয়াতের যুগের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং পরে ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন—সেখানে উপস্থিত থাকিয়া নিজ চক্ষে এই পবিত্রতাময় দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সময় তিনি যে উক্তিটি করিয়াছিলেন, তাহা জাহিলিয়াতের যুগে মানুষদের মানসিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি দশটি সন্তানের পিতা হইয়াও কোন দিন কোন মুহূর্তে স্নেহের বশবর্তী হইয়া কোন একটি শিশু সন্তানকেও চুম্বন করেন নাই। কতখানি নির্মম ও পাষাণ হৃদয় হইলে ইহা সম্ভব হইতে পারে,তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমন মানবিক তেমনি ইসলামী ভাবধারারই পূর্ণ অভিব্যক্তি। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ্ই হইলেন একমাত্র রহমাতদানকারী। মানুষকে সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার মধ্যে স্বভাবগত স্নেহ-ভালোবাসা ও দয়া-মায়া রাখিয়া দিয়াছেন। ইসলামের নবী (স) মানুষের প্রতি সেই দয়া-মায়া ও স্নেহ মমতা নিজে পোষণ করিতেন এবং তাঁহার উম্মাতকে তাহা পোষণ করার শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা যেমন মানবিক কর্তব্য, তেমনি ইসলামীও। পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি দয়া-মায়া-স্নেহ পোষণ করিবে, তাহা হইলে সেই পিতা-মাতাও সন্তানের মায়া-মমতা পাইবে। শুধু তাহাই নয়, আল্লাহ্র রহমাত লাভ করারও ইহাই পন্থা।

বস্তুত পিতা-মাতার অপত্য স্নেহ-মমতা পাওয়া সন্তানের প্রধান মৌল অধিকার। বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, মানব-সন্তান পিতা-মাতার অপত্য স্নেহ-মমতা ও আদরযত্ন যথারীতি ও পুরাপুরি মাত্রায় না পাইলে তাহাদের বাঁচিয়া থাকা ও বড় হওয়া প্রায় অসম্ভব। মানব শিশু পশু শাবকদের মত নয়। পশু-শাবক প্রাথমিক কয়েক মুহূর্তের সামান্য আদর যত্ন ও সংরক্ষণ পাইলেই ইহারা নিজস্বভাবে চলা-ফিরা ও খাদ্য গ্রহণে সক্ষম হইয়া যায়। কিন্তু মানব শিশু যেহেতু সর্বাধিক দুর্বল অক্ষম হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং বড় ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে অন্তত ৫-৭ বৎসর পর্যন্ত পিতা-মাতার স্নেহযত্ন ও লালান পালনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, এই জন্য তাহাদের বেলায় পিতা-মাতার স্নেহ-যত্ন ও মায়া-মমতার প্রশ্ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব মানবতার কল্যাণ বিধায়ক ইসলামে এবং স্বয়ং ইসলামের নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) দ্বারা ইহার বাস্তবায়ন এমনভাবে হইয়াছে, যাহার কোন দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসে পাওয়া যাইতে পারে না।

উপরিউক্ত হাদীসে দয়া-স্নেহ প্রসঙ্গে নবী করীম (স) যাহা বলিলেন, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহা মানুষের একটি স্বভাবজাত ব্যাপার এবং ইহা প্রত্যেক মানুষেরই করা উচিৎ। বড়রা ইহা না করিলে তাহারাও কখনই দয়া স্নেহ পাইবেনা। ইহা শিশুদের অধিকার, শিশুদের প্রতি ইহা কর্তব্য। এই মায়া-স্নেহ-দয়ার বন্ধনেই মানব সমাজের ব্যক্তিরা ওতোপ্রোত বন্দী। এই দয়া-স্নেহের উপরই মানব সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। হযরত আকরা (রা)-এর বিস্ময় বোধ হইতে প্রমাণিত হয় যে, জাহিলিয়াতের যুগে আরব দেশের লোকেরা বস্তুতঃই নির্মম, দয়া-মায়াহীন ছিল। নতুবা তাহারা নিজেরা নিজেদেরই সন্তানদের হত্যা করিত কিভাবে? রাসূলে করীম (স) যে মানবিক আদর্শ আল্লাহর নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে এই নির্মমতার কোন স্থান নেই। সেখানে আছে দয়া স্নেহ-বাৎসল্য ও মমতার দুশ্ছেদ্য বন্ধন।

এই পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

جَاءَ اِعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّكُمْ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ

وَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اِنْ نَزَعَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ؟

একজন বেদুঈন রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল। বলিল, আপনি তো শিশুদের চুম্বন করেন; কিন্তু আমরা তাহা করি না। জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তোমার দিল হইতে আল্লাহ যদি দয়া-স্নেহ-মমতা বাহির করিয়া লইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি তাহার কি করিতে পারি?

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা স্বভাবতঃই যে স্নেহ-মমতা-বাৎসল্যের পবিত্র ভাবধারা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাহারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিশুদের চুম্বন করায়। তোমরা যদি শিশুদের চুম্বন না কর, তাহা হইলে প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের দিলে আল্লাহ তা'আলার এই স্নেহ-মমতা-বাৎসল্য সৃষ্টিই করেন নাই। আর তিনিই যদি তাহা সৃষ্টি না করিয়া থাকেন তবে কাহার কি করিবার থাকিতে পারে।

অন্য কথায় শিশুদের স্নেহসিক্ত চুম্বন করা ও তাহাদের প্রতি নির্মম না হওয়া তোমাদের কর্তব্য। আমরা ইসলামে বিশ্বাসীরা নির্মম নহি বলিয়াই আমরা আমাদের শিশুদের স্নেহের ও আদরের চুম্বন করিয়া থাকি।

রাসূলে করীম (স) সম্পর্কে একজন সাহাবীর উক্তি হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَرْحَمَ النَّاسِ بِالْعِيَالِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(مسلم)

পরিবার পরিজনের লোকদের প্রতি রাসূলে করীম (স) সর্বাধিক দয়াশীল ছিলেন। তাঁহার অধিক দয়াশীল আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।

এই কারণেই তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দিয়াছেন এই বলিয়াঃ

اَكْرِمُوْا اَوْلَادَكُمْ وَاَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ

তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্মান ও আদর যত্ন কর এবং তাহাদিগকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দাও।

নিজেদের ঔরসজাত সন্তানদেরও একটা সম্মান ও মর্যাদা রহিয়াছে, এই সম্মান তাহাদের প্রতি পিতা-মাতা মুরব্বীদের অবশ্যই জানাইতে হইবে, ইহাই রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ। কেননা তাহারাও সেই মানবতারই অন্তর্ভুক্ত যাহার স্থান ও মর্যাদা গোটা সৃষ্টি লোকের সব কিছুর উর্ধ্বে; কাজেই তাহা কোনক্রমেই এবং কোন অবস্থায়ই অস্বীকৃত হইতে পারে না।

সন্তানের নামকরণ

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَلِىْ غُلَامٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ اِبْرٰهِيْمَ فَحَنَكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَالَهُ بِالْبَرْكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرَوَلَدِ اَبِىْ مُوْسٰى. (بخارى مسلم)

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে আমি তাহাকে লইয়া নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তাহার নাম রাখিলেন ইবরাহীম এবং একটি খেজুর দিয়া তিনি তাহার 'তাহনীক'[১] করিলেন। আর তাহার জন্য বরকতের দোয়া করিলেন। অতঃপর তাহাকে আমার কোলে ফিরাইয়া দিলেন। ইবরাহীম ছিল হযরত আবূ মূসার বড় সন্তান। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে দুইট কথা বলা হইয়াছে। একটি হইল, সদ্যজাত শিশুর নামকরণ। আর দ্বিতীয়টি হইল, সদ্যজাত শিশুর 'তাহনীক' করা।

নামকরণ সম্পর্কে হাদীসের ভংগী হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এই নাম করণে বিলম্ব করা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সদ্যজাত শিশুর নাম রাখা আবশ্যক। হযরত আবূ মূসা (রা)-এর পুত্র সন্তান প্রসূত হওয়ার পর পরই অনতিবিলম্বে তাহাকে লইয়া নবী করীম (স)-এর খেদমতে হাজির হইলেন এবং তিনি তাহার নাম রাখিলেন ইবরাহীম। ইমাম বায়হাকী বলিয়াছেন, সদ্যজাত শিশুর নামকরণ পর্যায়ে দুই ধরনের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এক পর্যায়ের হাদীস হইতে জানা যায়, সপ্তম দিনে আকীকাহ করা কালে নামকরণ করিতে হইবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীসে বলা হইয়াছে, শিশুর জন্মের পর-পরই অবিলম্বে নাম রাখিতে হইবে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের তুলনায় এই দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীস সমূহ অধিক সহীহ।

ইহার বিপরীত কথা প্রমাণিত হয় হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস হইতে। তিনি বলিয়াছেনঃ

عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا.

(البزار، ابن حبان، حاكم)

নবী করীম (স) হযরত হাসান ও হুসাইনের (রা) আকীকাহ্ করিলেন জন্মের সপ্তম দিনে এবং তাহাদের দুইজনের নাম রাখিলেন। (আল-বাজ্জার, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

আমর ইবনে শুয়াইব—তাঁহার পিতা হইতে—তাঁহার দাদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ لِسَابِعِهِ. (ترمذى)

---

১. খেজুর মুখে চিবাইয়া নরম করিয়া সদ্যজাত শিশুর মুখের ভিতরে উপরের তালুতে লাগাইয়া দেওয়াকে পরিভাষায় 'তাহ্নীক' (تحنيك) বলা হয়।

রাসূলে করীম (স) আমাকে সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে তাহার নামকরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নিজে বলিয়াছেনঃ

سَبْعَةٌ مِّنَ السُّنَّةِ فَالصَّبِيُّ يَوْمَ السَّابِعِ يُسَمّٰى وَيُخْتَنُ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْاَذٰى وَيُثْقَبُ اُذُنُهُ وَيُعَقُّ عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُلْطَخُ مِنْ عَقِيْقَتِهِ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبٌ اَوْ فِضَّةٌ. (دارقطنى فى الاوسط)

সাতটি কাজ সুন্নাত। সপ্তম দিনে সদ্যজাত শিশুর নামকরণ করিতে হইবে, খাত্না করিতে হইবে, তাহার দেহের ময়লা দূর করিতে হইবে, কানে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিতে হইবে। তাহার নামে আকীকাহ করিতে হইবে, তাহার মাথা মুন্ডন করিতে হইবে এবং আকীকায় যবেহ করা জন্তুর রক্ত শিশুর মাথায় মাখিতে হইবে ও তাহার চুলের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য সাদকা করিতে হইবে। (দারে কুতনী—আল-আওসাত)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেন, এই বর্ণনাটির সনদ যয়ীফ। এই পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে নিম্নোদ্ধৃত মরফু হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছেঃ

اِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ لِلْمَوْلُوْدِ فَاهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى وَسَمُّوْهُ

(دار قطنى)

সদ্যজাত সন্তানের সপ্তম দিন হইলে তাহার নামে রক্ত প্রবাহিত কর, তাহার দেহের ময়লা আবর্জনা দূর কর এবং তাহার নাম ঠিক কর। (দারে কুতনী—আল-আওসাত)

এই হাদীসটির সনদ حسن 'উত্তম'।

ইমাম খাত্তাবী বলিয়াছেনঃ

ذَهَبَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اِلٰى اَنَّ التَّسْمِيَةَ تَجُوْزُ قَبْلَ ذٰلِكَ

বহু বিশেষজ্ঞের মত হইল সত্যজাত শিশুর নাম রাখা সপ্তম দিনের পূর্বেও জায়েয।

মুহাম্মাদ ইবনে শিরীন, কাতাদাহ ও ইমাম আওজায়ী বলিয়াছেনঃ

اِذَا وَلَدَ وَقَدْ تَمَّ خَلْقُهُ يُسَمّٰى فِى الْوَقْتِ اِنْ شَاءَ

একটি সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন বুঝিতে হইবে তাহার সৃষ্টি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাত নামকরণ করা যাইতে পারে।

মুহাল্লাব বলিয়াছেনঃ সদ্যজাত শিশুর নামকরণ জন্ম গ্রহণ সময়ে এবং উহার এক রাত্র বা দুই রাত্র পর শিশুর পিতা যদি সপ্তম দিনে আকীকাহ করার নিয়্যত না করিয়া থাকে, তবে তাহা জায়েয হইবে। আর যদি সপ্তম দিনে আকীকা করার নিয়্যত থাকে, তাহা হইলে সপ্তম দিন পর্যন্ত নামকরণ বিলম্বিত করা যাইতে পারে।

নামকরণ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ

(مسند احمد، ابوداؤد، بيهقى)

কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদের ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে ডাকা হইবে। অতএব তোমরা তোমাদের জন্য উত্তম নাম ঠিক কর।

বস্তুত উত্তম—তথা ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত নামকরণ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নামের পরিচয়টা কোন অংশেই হেলাফেলার নয়। কাজেই সদ্যজাত শিশুর নাম যেমন উত্তম হইতে হইবে, তেমনি উহা ইসলামী ভাবধারা সম্পন্নও হইতে হইবে। নাম দ্বারাই বুঝাইতে হইবে যে, লোকটি মুসলমান, ইসলামে বিশ্বাসী।

প্রথমোক্ত হাদীসের দ্বিতীয় কথা হইল, সদ্যজাত শিশুর 'তাহনীক' করা। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে যে প্রশ্নটি আলোচিতব্য, তাহা হইল, 'তাহনীক' করার যৌক্তিকতা ও ইহাতে নিহিত ফায়দাটা কি? কেহ কেহ বলিয়াছেন, এইরূপ করিয়া উহাকে খাওয়ায় অভ্যস্ত করা হয়। কিন্তু ইহা যে কত হাস্যকর, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা সদ্যজাত শিশুর 'তাহনীক' করার সময় তাহাকে খাওয়ার অভ্যাস করানোর কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। শিশুর খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা হয় জন্মের দুই বছর কিংবা তাহার কিছু কম কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর।

এই কাজের একটা তাৎপর্যই বলা চলে। তাহা হইল, এইরূপ করিয়া তাহার দেহের অভ্যন্তরে ঈমানের রস পৌঁছাইবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কেননা এই কাজে খেজুর ব্যবহার করাই বিধেয়। আর খেজুর এমন গাছের ফল, রাসূলে করীম (স) যাহার সহিত মু'মিনের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উহার মিষ্টতা এই ধরনেরই জিনিস। বিশেষ করিয়া এই কাজটি যখন দ্বীনদার খোদাভীরু মুরব্বী পর্যায়ের লোকদের দ্বারা করারই নিয়ম তখন তাহার মুখের পানি শিশুর উদরে প্রবেশ করানোর একটা শুভ ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। রাসূলে করীম (স) যখন আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের এই কাজ করিয়াছিলেন, তখন ইহা তাঁহার একটা বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার হইয়াছিল। তিনি খুব ভাল কুরআন পড়িতেন এবং পবিত্র ইসলামী জীবন যাপন করিয়াছেন, ইহা তো সামান্য কথা নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবূ তালহারও 'তাহনীক' তিনি করিয়াছিলেন। ফলে দেখা যায়, ইবনে আবূ তালহা পরিণত জীবনে অতীব জ্ঞানের অধিকারী, বড় আলেম ও মর্যাদা সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে সকল নেক কাজে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করিতেন। ইহা যে, রাসূলে করীম (স)-এর মুখের পানি তাঁহার উদরে প্রবেশ করার শুভ ক্রিয়া নয়,তাহা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে? (عمدة القارى)

আকীকাহ্

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوْقَ وَكَاَنَّهٗ كَرِهَ الْاِسْمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا نَسْئَلُكَ عَنْ اَحَدِنَا يُوْلَدُ لَهٗ؟ قَالَ مَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّنْسُكَ عَنْ وَلَدِهٖ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

(مسنداحمد، ابوداؤد، نسائی، موطأ ملك)

আমর ইবনে শুয়াইব তাঁহার পিতা হইতে—তাঁহার দাদা হইতে (রা) বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স)-কে 'আকীকাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্ রাব্বুর আলামীন 'উকুক' পছন্দ করেন না। .....সম্ভবত তিনি এই নামটাকে অপছন্দ করিয়াছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূল! আমাদের একজনের ঘরে সন্তান জন্ম হইলে কি করিতে হইবে, সেই বিষয়ে আমরা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ যদি কেহ নিজের সন্তানের নামে যবেহ্ করা পছন্দ করে, তাহা হইলে তাহা তাহার করা উচিত। পুত্র সন্তান জন্মিলে দুইটি সমান সমান আকারের ছাগী এবং কন্যা সন্তান জন্মিলে তাহার পক্ষ হইতে একটি ছাগী যবেহ করিতে হয়। (মুসনাদে আহমদ, আবূ দায়ূদ, নাসায়ী, মুয়াত্তা মালিক)

ব্যাখ্যা اَلْعَقِيْقَةُ শব্দের মূল হইল اَلْعَقُّ ইহার অর্থ কর্তন করা, কাটিয়া ফেলা। আচমায়ী বলিয়াছেন, সন্তান মাথায় যেসব চুল লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, মূলত উহাকেই 'আকীকাহ্' বলা হয়। সন্তানের জন্ম গ্রহণের পর উহার নামে যে জন্তু যবেহ্ করা হয়, প্রচলিত কথায় উহার নাম রাখা হইয়াছে 'আকীকাহ্'। ইহার কারণ হইল, এই জন্তু যবেহ করার সময় সদ্যজাত শিশুর প্রথমে মাথা মুন্ডন করা হয় ও জন্মকালীন মাথার চুল কামাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়।' এই কারণেই হাদীসে বলা হইয়াছেঃ اَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى 'উহার কষ্টদায়ক ও ময়লাযুক্ত চুল দূর করিয়া দাও।'

আবূ উবাইদ বলিয়াছেন, যে সব চুল লইয়া জন্তু শাবক জন্ম গ্রহণ করে উহাকেও 'আকীকাহ্' বলা হয়; কিংবা বলা হয় عِقَّةٌ ,عَقِيْقٌ। আর এই শব্দগুলির মূল অভিন্ন।

আজহারী বলিয়াছেন, اَلْعَقُّ শব্দের আসল অর্থ হইল اَلشَّقُّ চূর্ণ বা দীর্ণ করা। সন্তানের জন্মকালীন মাথার চুলকে 'আকীকাহ্' বলা হয় এই জন্য যে, উহা কামাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। সদ্যজাত সন্তানের নামে যবেহ করা জন্তুটিকে 'আকীকাহ্' বলা হয় এই জন্য যে, সে সন্তানের নামে বা উহার তরফ হইতে জন্তুটির গলা কাটা হয়, গলার রগ ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়। উহাকে اَلذَّبِيْحَةُ বলা হয়। এই শব্দটির মূল اَلذَّبْحُ। উহার অর্থ اَلشَّقُّ দীর্ণ বা চূর্ণ বা ছিন্ন করা।

'আল-মুহকাস' গ্রন্থ প্রণেতা বলিয়াছেন, আরবী ভাষায় বলা হয় عَقَّ عَنْ وَلَدِهٖ তাহার সন্তানের পক্ষ হইতে সে 'আকীকাহ্' করিয়াছে'। 'তাহার মাথার চুল কামাইয়া ফেলিয়াছে; কিংবা তাহার পক্ষ হইতে একটি ছাগী যবেহ করিয়াছে। এই দুইটি অর্থই বুঝা যায়', সে 'আকীকাহ্' করিয়াছে' কথাটি হইতে। আচমায়ী ও অন্যান্যরা 'আকীকাহ্' শব্দের ব্যাখ্যায় এই যাহা কিছু বলিয়াছেন, ইমাম আহমাদ তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এসব কথা যথার্থ নয়। আসলে এই শব্দটির অর্থ যবেহ করা। আবূ আমর বলিয়াছেন, ইহাই ঠিক কথা। পরবর্তীকালের ভাষাবিদগণও বলিয়াছেন, ইহা এক সুপরিচিত পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ কর্তন করা। কাজেই সোজাসুজিভাবে 'আকীকাহ্' হইল সদ্যজাত সন্তানের নামে ও তাহার পক্ষ হইতে জন্তু যবেহ করা।

(بلوغ الامانى، شرح الزرقانى على الموطاء)

ইমাম খাত্তাবী বলিয়াছেনঃ 'আকীকাহ্' বলা হয় সেই জন্তুটিকে যাহা সদ্যজাত সন্তানের পক্ষ হইতে যবেহ করা হয়। উহাকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে এই কারণে যে, উহার যবেহকারী উহার গলা কাটিয়া ছিন্ন করিয়া দেয়। (معالم السنن، عمدة القارى)

আল্লামা জামাখশারীর মতে আকীকাহ্ আসল অর্থ শিশুর জন্মকালীন মাথার চুল। আর সদ্যজাত শিশুর জন্য যবেহ করা জন্তুকে যে 'আকীকাহ্' বলা হয় তাহা ইহা হইতে গ্রহীত—বানানো অর্থ।

(سبل السلام)

মূল হাদীসে বলা হইয়াছেঃ রাসূলে করীম(স) কে 'আকীকাহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা عُقُوقٌ অপছন্দ করেন না।

'আকীকাহ্' সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি শব্দের মূলের ঐক্য ও অভিন্নতার কারণে। কেননা عَقِيقَه আকীকাহ্ শব্দের যাহা মূল, তাহাই عُقُوقٌ শব্দেরও মূল। আর ইহার অর্থ হইল পিতা-মাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা—একটা বিশেষ পরিভাষা হিসাবে। অর্থের এই সামঞ্জস্যতার সুযোগে রাসূলে করীম (স) যে কথাটি বলিলেন, তাহার দুইটি তাৎপর্য হইতে পারে। একটি এই যে, সদ্যজাত সন্তানের নামে যে জন্তু যবেহ করা হয়, উহাকে 'আকীকাহ্' বলা তিনি পছন্দ করেন না। কেননা উহাতে পিতা-মাতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক ছিন্ন করার 'ভাব' রহিয়াছে। এই হাদীসের কোন একজন বর্ণনাকারী এই কারণেই হাদীসের সঙ্গে নিজের এই মত শামিল করিয়া দিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেনঃ كَانَّهٗ كَرِهَ الْاِسْمَ এই জন্তুর আকীকাহ নামকরণ তিনি পছন্দ করেন নাই। আর দ্বিতীয় তাৎপর্য এও হইতে পারে যে, তিনি এই কথাটি বলিয়া 'আকীকাহ'র গুরুত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন আর তাহা এই ভাবে যে, সন্তানের সহিত পিতা-মাতার সম্পর্ক ছিন্ন করাটা আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন না। এই জন্যই সন্তানের জন্মের পর তাহার নামে জন্তু যবেহ করা পিতামাতার কর্তব্য। তাহা তাহারা না করিলে মনে হইতে পারে, তাহারাই সন্তানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আর সন্তানের সহিত পিতা কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া আল্লাহ্র নিকটও মোটেই পছন্দনীয় কাজ নয়।

'নেছায়া' গ্রন্থে বলা হইয়াছে, রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি হইতে একথা মনে করা যাইবে না যে, তিনি 'আকীকা'র সুন্নাতী প্রথাটির অপমান করিয়াছেন; কিংবা এই প্রথাটিকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বড় জোর এতটুকু বলা যায় যে, শব্দটির অর্থের একটা খারাপ দিকও আছে বলিয়া তিনি এই নামকরণটা পছন্দ করেন নাই। বরং তিনি ইহা হইতেও একটি উত্তম অর্থবোধক নাম দেওয়ার পক্ষপাতী। বস্তুত খারাপ অর্থবোধক নাম বদলাইয়া ভাল তাৎপর্যপূর্ণ শব্দে ব্যক্তির, কাজের ও জিনিসের নামকরণ তাঁহার একটা বিশেষ সুন্নাত।

হাদীসবিদ তুরেপুশ্তী বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর উক্তিটির সঙ্গে সঙ্গে 'তিনি এই নাম পছন্দ করেন নাই' বলিয়া যে কথাটুকু হাদীসের বর্ণনাকারী মূল হাদীসের সহিত শামিল করিয়া

দিয়াছেন,ইহা যথার্থ কারণ হয় নাই। এই বর্ণনাকারীকে তাহা অবশ্য চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয় নাই। আসলে এই কথাটি বর্ণনাকারীর নিজের ধারণা মাত্র। আর লোকদের ধারণা শুদ্ধও হইতে পারে যেমন, তেমনি ভুলও হইতে পারে। তবে এখানে মনে হয়, ইহা করিয়া ভুল করা হইয়াছে। কেননা বহু কয়টি সহীহ হাদীসে এই 'আকীকাহ্' শব্দটি প্রচুর প্রয়োগ ও উল্লেখ হইয়াছে। রাসূলে করীম (স)ই যদি এই নামটি পছন্দ না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা কোন হাদীসে ব্যবহৃত হইত না। সাহাবায়ে কিরাম এই শব্দটি বলিয়া সেই সংক্রান্ত বিধান জানিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিতেন না। রাসূলে করীম (স) পূর্বেহ ইহা পরিবর্তন করিয়া দিতেন। কেননা খারাপ নাম বদলাইয়া ভাল নাম রাখা তাঁহার স্থায়ী নীতি। রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটির এই তাৎপর্য নয় যে, তিনি 'আকীকাহ' বলাকে অপছন্দ করিয়াছেন। বরং তিনি এই রূপ বলিয়া একথা বুঝাইয়াছেন যে, পিতা-মাতার হক নষ্ট করা যেমন সন্তানের জন্য عقوق —বড় পাপ, তেমনি সন্তানের নামে আকীকাহ্ করা পিতার উপর সন্তানের হক। আকীকাহ না দিলে সন্তানের সে হক শুধু নষ্ট নয় অস্বীকার করা হয়। ইহাও আল্লাহ্ তা'আলা বিন্দুমাত্র পছন্দ করেন না। অতএব 'আকীকাহ' করার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমরা সাবধান হইয়া যাও।

হাদীসের ভংগী হইতে বুঝা যায়, প্রশ্নকারীরা রাসূলে করীম (স)-এর কথার এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা পুনরায় অন্য ভাষায় প্রশ্ন রাখার প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং নবী করীম (স)ও অতঃপর সেই মূল প্রশ্নের জওয়াব দিয়াছেন।

এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে লোক তাহার সন্তানের পক্ষ হইতে জন্তু যবেহ করিতে ইচ্ছুক হয় বা পছন্দ করে, তাহার তাহা করা উচিত। কথার এই ধরন হইতে স্পষ্ট হয় যে, 'আকীকাহ্' করা ফরয বা ওয়াজিব নয়। ইহাকে সুন্নাত বলা যাইতে পারে। হযরত সালমান ইবনে আমের আজুরী (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছিঃ

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَامِيْطُوْا عَنْهُ اَذًى. (بخارى)

সন্তান মাত্রের জন্যই আকীকাহ্র ব্যবস্থা রহিয়াছে। অতএব তোমরা উহার পক্ষ হইতে রক্ত প্রবাহিত কর ও উহার দেহ হইতে ময়লা দূর কর।

غلام শব্দটি বাচ্চা ও যুবক উভয়ই বুঝায়।

হাদীসটির শেষাংশে নবী করীম (স) 'আকীকাহ্' সংক্রান্ত নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন। এই ভাষায় যে, পুত্র সন্তান হইলে দুইটি সমান সমান আকারের ছাগী যবেহ করিতে হইবে এবং কন্যা সন্তানের নামে করিতে হইবে একটি মাত্র ছাগী।

সমান সমান আকারের ছাগী অর্থ প্রায় একই বয়সের ছাগী হইতে হইবে, যে ছাগী কুরবানী করা চলে, তাহাই আকীকাহ রূপে যবেহ করিতে হইবে। (بلوغ الامانى شرح مسند احمد)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. (ابوداؤد، ابن خزيمه)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম(স) হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা)-এর পক্ষ থেকে একটি ছাগী আকীকাহ্ দিয়াছেন। (আবূ দায়ূদ, ইবনে খুজাইমা)

'আকীকাহ্' সংক্রান্ত নিয়ম পর্যায়ে ইহা আর একটি হাদীস। ইহাতে পুরুষ সন্তানের আকীকায় দুইটি পরিবর্তে একটি করিয়া যবেহ্ করার কথা জানানো হইয়াছে। পূর্বোদ্ধৃত হাদীসে পুত্র সন্তানের আকীকায় দুইটি যবেহ করা সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর মুখের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। আর এই হাদীসটিতে উদ্ধৃত হইয়াছে রাসূলে করীম (স)-এর নিজের কাজ। এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

কিন্তু এই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ও নাসায়ী গ্রন্থে উদ্ধৃত অপর একটি বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ

রাসূলে করীম (স) উভয়ের নামে আকীকাহ্ করিয়াছেন দুইটি করিয়া ছাগল (বা ভেড়া) দ্বারা।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَعِقُّ عَنْ بَنِيْهِ الذُّكُوْرِ وَالْاِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ

সাহাবী হযরত উরওয়া ইবনুজ জুবাইর (রা) তাঁহার পুত্র ও কন্যা সন্তানের আকীকাহ্ করিতেন একটি একটি ছাগী দিয়া।

এই বিষয়ে ইমাম মালিক (রা)-এর কথা হইলঃ

যে-ই আকীকাহ করিবে, সে যেন পুত্র ও কন্যা উভয় ধরনের সন্তানের নামে একটি করিয়া ছাগী যবেহ করে। তবে 'আকীকাহ্' দেওয়া ওয়াজিব (বা ফরয) নয়। ইহা করা মুস্তাহাব—খুবই ভালো ও পছন্দনীয় কাজ। ইহা এমন একটি কাজ যাহা—আমার মতে মুসলমান জনগণ চিরকালই করিয়া আসিয়াছেন। যদি কেহ আকীকাহ করে তবে তাহা কুরবানীর সমতুল্য কাজ হইবে। ইহাতে পঙ্গু, অন্ধ, খোড়া, দুর্বল, অংগ ভাংগা, রোগাক্রান্ত জন্তু যবেহ করা যাইবে না। উহার গোশত বা চামড়া আদৌ বিক্রয় করা যাইবে না। বিক্রয় করা হইলে লব্ধ মূল্য গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। উহার হাড় চূর্ণ করা যাইবে। উহার গোশ্‌ত পরিবারের লোকজন খাইবে। আত্মীয় স্বজন ও গরীবদের উহার গোশ্‌তের অংশ দেওয়া যাইবে। উহার একবিন্দু রক্তও শিশুর গায়ে মাথায় মাখা যাইবে না। (موطا امام مالك)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمْ. (بيهقى)

হযরত নবী করীম (স) হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের (রা) নামে তাঁহাদের জন্মের সপ্তম দিনে আকীকাহ করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটিরই অপর একটি বর্ণনা এইরূপঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صلعم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا وَسَمَّاهُمَا وَاَمَرَ اَنْ يُّمَاطَ عَنْ رَأْسِهِمَا الْاَذٰى . (بيهقى، حاكم، ابن حبان)

নবী করীম (স) হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা)-এর নামে তাঁহাদের জন্মের সপ্তম দিনে আকীকাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের দুইজনের নাম রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের দুইজনের মাথার আবর্জনা দূর করার আদেশ দিয়াছেন। (বায়হাকী, হাকেম, ইবনে হাব্বান)

এ পর্যায়ে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস এইঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ اَيَّامٍ.

(بيهقى)

হযরত নবী করীম (স) হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রা)-এর নামে সপ্তম দিনে আকীকাহ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দুইজনের খাত্‌না করাইয়াছেন। (বুখারী)

অপর একটি বর্ণনায় ইহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিও রহিয়াছেঃ

وَكَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُوْنَ قُطْنَةً فِىْ دَمِ الْعَقِيْقَةِ وَيَجْعَلُوْنَهَا عَلٰى رَأْسِ الْمَوْلُوْدِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ صلعم اَنْ يَّجْعَلُوْا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوْقًا.

(مسند احمد، نسائى، ابن السكن)

জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা আকীকাহর রক্তে চুল ভিজাইয়া উহা শিশুর মাথায় রাখিত। ইহা দেখিয়া নবী করীম (স) রক্তের পরিবর্তে রক্ত মিশ্রিত সুগন্ধি লাগাইবার নির্দেশ দিলেন।

এই সমস্ত হাদীস হইতে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, 'আকীকাহ্' করা একটি শরীয়াত সম্মত ও ইসলামী পদ্ধতির কাজ। তবে ইহার গুরুত্ব কতটা সে বিষয়ে বিভিন্ন মত জানা যায়। জমহুর ফিকাহবিদদের মতে ইহা সুন্নাত। দায়ূদ যাহেরী এবং তাঁহার অনুসারীগণের মতে ইহা ওয়াজিব। জমহুর ফিকাহবিদগণ দলীল হিসাবে বলিয়াছেন, নবী করীম (স) নিজে এই কাজ করিয়াছেন। তাঁহার এই করা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা সুন্নাত। এই পর্যায়ে হাদীসের এই ভাষাও উল্লেখ্যঃ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْسُكَ عَنْ وَلَدِهٖ فَلْيَفْعَلْ যে লোক নিজের সন্তানের নামে যবেহ করিতে পছন্দ করে—ভাল বাসে, তাহার তাহা করা উচিৎ বা সে যেন তাহা করে। ইহাতে প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট কোন আদেশ নাই। ইহা লোকের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। আর দায়ূদ যাহেরীর দলীল হইল হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসের ভাষাঃ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُمْ 'নবী করীম (স) লোকদিগকে আদেশ করিয়াছেন।' ইহা হইতে সুস্পষ্ট রূপে আদেশ বুঝায় এবং নবী করীম (স) কোন কাজের আদেশ করিলে তাহা যে ওয়াজিব হইয়া যায় তাহা তো সর্বজন স্বীকৃত।

প্রায় হাদীসেই আকীকাহ্‌র জন্য সপ্তম দিনের স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে যে, ইহাই আকীকার জন্য নির্দিষ্ট দিন ও সময়। কাজেই উহার পূর্বেও ইহা করা যাইবে না, পরেও না। কিন্তু ইমাম নববী বলিয়াছেন اِنَّهٗ يَعُقُّ قَبْلَ السَّابِعِ সপ্তম দিনের পূর্বেও আকীকাহ করা যায়।

সপ্তম দিন ছাড়া আকীকাহ করা যাইবে না, এই কথাটির বিপরীত কথা প্রমাণের জন্য একটি হাদীস পেশ করা হয়। তাহা হইলঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صلعم عَقَّ عَنْ نَّفْسِهٖ بَعْدَ الْبَعْثَةِ (بيهقى عن انس)

নবী করীম (স) নবুয়্যাত লাভের পর নিজের আকীকাহ নিজে করিয়াছেন।

কিন্তু এই বর্ণনাটি 'মুনকার'। তাই ইহা গ্রহণ যোগ্য নয় এবং ইহা কোন কথার দলীলও নয়। ইমাম নববীও এই বর্ণনাটিকে 'বাতিল' বলিয়াছেন। (سبل السلام)

মোট কথা, শিশুর জন্মের সপ্তম দিনের মধ্যে আকীকাহ করা, মাথা মুন্ডন করা, নাম রাখা ও খাত্না করাই ইসলামের প্রবর্তিত নিয়ম। পারিবারিক জীবনে ইহা ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ। ইহার বরখেলাফ কাজ হওয়া উচিত নয়।

সন্তানের খাত্না করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظَافِرِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ.

(بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ পাঁচটি কাজ স্বভাব সম্মত। তাহা হইল খাত্না করা, নাভির নীচে ক্ষুর ব্যবহার, মোচ কাটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম উপড়ানো। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা সুস্থ সভ্য ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য জরুরী কার্যাবলী বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) নির্দেশ করিয়াছেন। এই কার্যাবলী স্বভাব সম্মত এবং পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য অপরিহার্য। এই সকল কাজ কিংবা ইহার কোন একটি না করা হইলে তাহার পক্ষে সভ্য ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন সম্ভব হইতে পারে না। উদ্ধৃত হাদীসে এই পাঁচটি কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথমেই বলা হইয়াছে 'খাত্না' করার কথা। 'খাত্না' বলা হয় শিশু বা বালকের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়া কাটিয়া ফেলা। এই কাজ বিশেষ ভাবে শৈশব বা বাল্য জীবনে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় ইহাতে ময়লা আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া নানা রোগ সৃষ্টির কারণ হইতে পারে। এই কাজ শৈশব কালে সহজেই হওয়া সম্ভব। অন্যথায় যৌবন কালে 'খাতনা' করা খুবই কষ্টদায়ক হইতে পারে।

উদ্ধৃত হাদীসটিতে মাত্র পাঁচটি কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالسِّوَاكُ وَتَقْلِيْمُ الْاَظَافِرِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَالْاِخْتِتَانُ

(مسند احمد عن عمار بن يسار)

কুলিকুচি করা, নাশারন্ধ্রের অভ্যন্তর পরিষ্কার করা, মোচ বা গোঁফ কর্তন করা, মিসওয়াক করা, নখ কাটা, বগলের চুল উপড়ানো, নাভির নীচের পশম কামানো এবং খাত্না করা।

প্রথমোক্ত হাদীস ও এই শেষোক্ত হাদীসের উল্লেখ সংখ্যার পার্থক্য, ইহা উল্লেখের পার্থক্য, কোন মৌলিক পার্থক্য নহে। রাসূলে করীম (স) একটি হাদীসে মাত্র পাঁচটি কাজের উল্লেখ করিয়াছেন। আর অপর এক হাদীসে আটটি কাজের উল্লেখ করিয়াছেন। মূলত এই সব কয়টি কাজই স্বাভাবিক কাজ, স্বভাব সম্মত কাজ। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের এই কাজগুলি করা বাঞ্ছনীয়।

হাদীসের اَلْفِطْرَةُ সহজাত বা জন্মগত (Innate)। মানুষ এই কাজ স্বাভাবিকভাবে করে বা করা উচিত। ইহার অন্যথা বা ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়, কাম্যও নয়। ইহার প্রত্যকটি সম্পর্কে চিন্তা করিলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বস্তুত ইসলাম মানুষের যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছে, তাতে এই স্বাভাবিক ও সহজাত কার্যাবলীর অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইসলামী পরিভাষায় اَلْفِطْرَةُ দুই প্রকারের। একটি فِطْرَةٌ اِيْمَانِيَّةٌ ঈমানী ফিতরাত। ইহার সম্পর্ক মানুষের দিল—হৃদয় ও অন্তরের সহিত। যেমন অন্তরে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বের চেতনা ও তাঁহার প্রতি ঈমান। আর দ্বিতীয়টি হইল فِطْرَةٌ عَمَلِيَّةٌ হাদীসে উল্লেখিত কাজ সমূহ এই পর্যায়ে গণ্য। প্রথম প্রকারের فِطْرَةٌ সহজাত প্রবণতা 'রূহ' বা আত্মাকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও সতেজ করে। আর দ্বিতীয় প্রকারের فِطْرَت মানুষের দেহ ও অবয়বকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ নিরোগ বানাইয়া রাখে। মূলত দ্বিতীয় প্রকারের- ফিত্‌রাত প্রথম প্রকারের ফিতরাত বা সহজাত কাজেরই ফসল। ঈমান প্রথম ও প্রধান, দৈহিক পরিচ্ছন্নতা উহার ফল।

দেহকে পরিচ্ছন্ন ও নিরোগ বানাইয়া রাখে যে সব সহজাত কাজ, উপরে উদ্ধৃত হাদীসদ্বয়ে সেই কাজসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি কাজই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুলকুচি করিলে মুখে খাদ্যের কণা জমিয়া থাকিতে পারে না। দাঁত সুস্থ থাকে। নাক বা নাসারন্ধ্রে ধূলি ময়লা জমে বাহির হইতে আর ভিতরের দিক হইতে—মস্তিষ্ক হইতে নামে নিষ্ঠাবন এবং নাসারন্ধ্রের মুখে ময়লা জমিয়া যায়। ইহা পরিষ্কার করিলে দেহের মধ্যে ক্ষতিকর জিনিস জমিতে বা প্রবেশ করিতে পারে না। এই কারণে এই দুইটি কাজ প্রতি অযুর মধ্যে শামিল করা হইয়াছে, যেন অন্তত, পাঁচবারের নামাযের পূর্বেকৃত অযুর সময় এই দুইটি কাজ সম্পন্ন হয়। ইহার পর গোঁফ কাটা। ইসলামে গোপ খাটো রাখা ও শ্মশ্রু বা দাড়ি লম্বা রাখা রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ইহার আদেশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اِحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللُّحٰى (مسلم)

গোঁফ ধারণ ও কর্তন কর এবং দাঁড়ি ছাড়িয়া দাও।

অপর হাদীসে বলিয়াছেনঃ

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اِحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَوْفُوا اللُّحٰى (مسلم)

মুশরিকদের বিরুদ্ধতা কর। তাই মোচ কাট এবং শ্মশ্রু পূর্ণ কর।

অতএব গোঁফ খাটো রাখা অন্ততঃ উহাকে উপর ওষ্ঠের বাহিরে আসিতে না দেওয়া এবং শ্মশ্রু বা দাড়ি বাড়িতে দেওয়া ইসলামী শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইহার বিপরীত দাড়ি মুন্ডন ও গোঁফ বড় রাখা মুশরিকদের কাজ, মুশরিকী রীতি।

দাঁত পরিষ্কার রাখা ও উহাতে ময়লা জমিতে না দেওয়া স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য। অন্যথায় মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং খাদ্য হজমে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেওয়া নিশ্চিত। নখ কাটা সভ্যতার লক্ষণ। বড় বড় নখ রাখা পশু ও পাখীর কাজ, মানুষের নয়। দুই হাতের নিম্নভাগের গোড়ায়—বগলে—যে পশম থাকে, তা এবং নাভির নীচের অংশে—যৌন অঙ্গকে কেন্দ্র করে যে পশম জন্মে তা নিয়মিত মুন্ডন করা একান্তই আবশ্যক। হাদীসে ইহাকে সুন্নাতে ইবরাহীমী বলা হইয়াছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) সর্ব প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই কাজগুলি করার রীতি-নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন।

তবে এই পর্যায়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে খাত্‌নার উপর। খাতনা করা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব, ফিকহর দৃষ্টিতে এই পর্যায়ে দুইটি প্রবল মত রহিয়াছে। ইমাম হাসান আল বসরী, ইমাম আবূ

হানীফা এবং কয়েকজন হাম্বলী আলিম বলিয়াছেন, ইহা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। ইহাদের দলীল হইল রাসূলে করীম (স)-এর একটি কথা। শাদ্দাদ ইবনে আওস নবী করীম (স)-এর এই কথার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ

اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرِمَةٌ لِّلنِّسَاءِ

পুরুষ ছেলের খাতনা করানো সুন্নাত এবং মেয়েদের জন্য সম্মানের ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (স) খাতনা করানোর কথা অন্যান্য সুন্নাত সমূহের সহিত এক সাথে বলিয়াছেন।

ইমাম শবী, রবীয়া, আওজায়ী, ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আনসারী, মালিক, শাফেয়ী ও আহমাদ খাতনার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করিয়াছেন। ইমাম মালিক বলিয়াছেন, যে লোক খাতনা করায় নাই, তাহার ইমামতি করা জায়েয নয়। আর হাদীসের দলীল হিসাবে তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নূতন ইসলাম কবুল করিলে রাসূলে করীম (স) তাহাকে বলিলেনঃ

اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ (مسند احمد، ابوداؤد)

তোমার কুফরী চুল মুন্ডন কর এবং খাত্না করাও।

জুহরী বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

مَنْ اَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا

যে লোকই ইসলাম কবুল করিয়াছে সেই যেন খাতনা করায়, বয়সে বড় হইলেও।

এই বর্ণনাটি সনদের দিক দিয়া দুর্বল হইলেও অন্য বহু কয়টি হাদীসের অনুরূপ বর্ণনার কারণে ইহা শক্তিশালী হইয়া গিয়াছে। এই হাদীস হইতে মনে হয়, তদানীন্তন আরবে সাধারণ ভাবে খাতনা করার প্রচলন ছিল না। অন্যথায় বড় বয়সে ইসলাম গ্রহণকারীকে খাতনা করাইতে বলার এই নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল না। ইহার জন্য তাকীদ এতই যে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ 'যে খাতনা করায় নাই, তাহার নামায কবুল হইবে না, তাহার যবেহ করা জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া যাইবে না'। (ইবনে আব্বাস)

ইমাম খাত্তাবী বলিয়াছেন, খাতনার কথা যদিও সুন্নাত কাজ সমূহের মধ্যে শামিল করিয়া হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে তবুও বহু সংখ্যক শরীয়াত বিশেষজ্ঞ (আলিম) বলিয়াছেন, ইহা ওয়াজিব। ইহা দ্বীন-ইসলামের বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। কে মুসলিম আর কে কাফির, তাহার পার্থক্য নির্ধারক এই খাতনা। বহু সংখ্যক খাতনাহীন লোকদের লাশের মধ্যে একজন খাতনা সম্পন্ন লোক পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে, সে মুসলমান। তাহার জানাযা পড়িতে হইবে এবং তাহাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করিতে হইবে। (نبوى شرح مسلم، تربية الاولاد)

কন্যা ও ভগ্নিদের লালন-পালন

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ اَخَوَاتٍ اَوْ اِبْنَتَانِ اَوْ اُخْتَانِ فَاَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

(ترمذى)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোকের তিনটি ভগ্নি আছে; কিংবা আছে দুইটি কন্যা, অথবা দুইটি বোন এবং সে তাহাদের সহিত উত্তম সম্পর্ক-সাহচর্য রক্ষা করিয়াছে ও তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করিয়াছে, সে জান্নাত লাভ করিবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা হাদীসে তিনটি বোন বা দুইটি বোন অথবা দুইটি কন্যার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যাটাই এখানে কোন মুখ্য বা অপরিবর্তনীয় ও নিশ্চিত রূপে নির্দিষ্ট বিষয় নয়। সম্ভবত রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটির মূল উদ্দেশ্য হইল কন্যা সন্তান কিংবা ভগ্নিদের ভাল ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও শুভ পন্থায় লালন-পালন করার গুরুত্ব বোঝানো ও এই কাজে লোকদিগকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা—সংখ্যা তাহাদের যাহাই হউক না কেন। তবে মেয়েদের লালন-পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণ এমনিতেই খুব জটিল ব্যাপার। তাহাতে যদি একাধিক মেয়ে বা একাধিক বোন থাকে, তবে তাহাদের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিকতর জটিল ও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। একের অধিক সংখ্যক বোন বা কন্যার কথা বলিয়া রাসূলে করীম (স) এই অধিক জটিলতার কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন মাত্র।

বস্তুত মেয়েদের লালন-পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহাদিগকে শুধু খাওয়া-পরা দিলেই তাহাদের লালন-পালন দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আদায় হয় না। বিশেষত মেয়ে কিংবা বোন যে-ই হউক, তাহাকে বিবাহ দিতে হইবে, পিতা বা ভাইর ঘর হইতে চলিয়া গিয়া তাহাকে ভিন্নতর এক পরিবারে ও পরিবেশে স্বামীর সহিত ঘর বাঁধিতে ও জীবন কাটাইতে হইবে। তাহার গর্ভজাত সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া বংশের একটা নূতন ধারা সূচিত ও নূতন সমাজের সদস্য গঠিত হইয়া উঠিবে। তাহাদের প্রথমে স্ত্রী, গৃহবধু এবং পরে সন্তানের মা হইতে হইবে। কাজেই এই দৃষ্টিতেই সুসম্পন্ন করিতে হইবে তাহাদের লালন পালন ও শিক্ষণ প্রশিক্ষণ।

শুধু শিক্ষাদান করা-ই তো নয়, সর্বোপরি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। মেয়েরা ছোট বয়সের থাকা অবস্থায় একরকমের নাজুকতার সম্মুখীন হইতে হয়, আর বয়স বৃদ্ধির ও তাহাদের যৌবনে পদার্পন করার পর এই নাজুকতা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া যায়। নবী করীম (স) আলোচ্য কথাটি বলিয়া কন্যাদের পিতা বা ভাইদের অতিশয় কঠিন দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া ও সে বিষয়ে তাহাদিগকে সদা সচেতন সতর্ক থাকার কথা বলিয়াছেন. وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيْهِنَّ 'তাহাদের আল্লাহ্কে ব্যাপারে ভয় করিল' কথাটির অর্থ ইহাই। এই দিক দিয়া হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাহারা যদি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে পারে, তবে তাহাদের পক্ষে বেহেশতে যাওয়া সহজ হইবে। অন্যথায় অন্যান্য হাজারও নেক আমল থাকা সত্ত্বেও বেহেশতের পথে ইহাই বিরাট বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

এই হাদীসটির অপর একটি বর্ণনার ভাষা এই রূপঃ

لَايَكُوْنُ لِاَحَدِكُمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ اَوْثَلَاثُ اَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِنَّ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

তোমাদের কাহারও তিনটি কন্যা কিংবা তিনটি ভগ্নি থাকিলে ও তাহাদের কল্যাণ সাধন করিলে সে জান্নাতে যাইবে।

বুখারীর আদাবুল মুফরাদের উদ্ধৃত বর্ণনায় অতিরিক্ত শব্দ হইল فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ 'তাহাদের ব্যাপারে সে ধৈর্য ধারণ করিল'। ইবনে মাজাহর বর্ণনায় অতিরিক্ত শব্দগুলি হইলঃ

اَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ

তাহাদিগকে খাওয়াইল, পান করাইল ও কাপড় পোশাক পরিতে দিল।

আর তাবারানী গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত শব্দ হইলঃ

فَاَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَاَحْسَنَ اَدَبَهُنَّ

তাহাদের জন্য ব্যয় করিল, তাহাদিগকে বিবাহ দিল এবং তাহাদিগকে উত্তম আদব-কায়দা ও স্বভাব চরিত্র শিক্ষা দিল।

এই হাদীস হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, পিতার অবর্তমানে পিতার কন্যা—অর্থাৎ বোনদের লালন পালনের দায়িত্ব ভাইদের উপর অর্পিত হয়। (تحفة الاحوذى)

কন্যা সন্তানের ব্যাপারে অগ্নি পরীক্ষা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَلٰى بِشَيْئٍ مِّنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهٗ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ (ترمذى)

যে লোক কন্যাদের ব্যাপারে বিপদগ্রস্থ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে এবং তাহাদের ব্যাপারে হইবে অবিচল ধৈর্যশালী, এই কন্যারা তাহার জন্য জাহান্নাম হইতে আবরণ হইয়া দাঁড়াইবে। (তিরমিযী)

মূল হাদীসের শব্দ হইতেছে اِبْتَلٰى। এই শব্দটি اِبْتِلَاء হইতে বানানো হইয়াছে। এখানে ইহার যথার্থ তাৎপর্য কি সে বিষয়ে নানা কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রশ্ন হইয়াছে اِبْتِلَاء শব্দের মূল অর্থ বিপদগ্রস্থ হওয়া। পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়াও ইহার একটি অর্থ। তাহা হইলে মেয়েদের বিষয়ে বিপদগ্রস্থ বা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার সঠিক তাৎপর্য কি? ইহা কি তাহাদের অস্তিত্বের কারণে?... কাহারও কন্যা সন্তান হওয়াটাই কি বিপদের কারণ?..... কন্যা হওয়াই যদি পিতার পক্ষে বিপদের কারণ হয়, তাহা হইলে দুনিয়ায় মানব বংশের ধারা চলিবে কি ভাবে? উপরন্তু ইহা কি সাধারণভাবে কন্যামাত্রের ব্যাপারেই প্রযোজ্য, না বিশেষ বিশেষ কন্যার ক্ষেত্রে? কিংবা কন্যাদের কারণে পিতাকে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, অথবা কন্যাদের যেসব আচরণ ও চরিত্র সাধারণতঃ হইয়া থাকে, এই কথাটি সেই জন্য?

ইবনে বাত্তাল এ বিষয়ে বলিয়াছেন, এই ব্যাপারটিকে اِبْتِلَاء বলা হইয়াছে এই জন্য যে, জাহিলিয়াতের যুগে আরব সমাজের লোকেরা সাধারণত কন্যা সন্তানদেরকে ঘৃণা করিত, কাহারও ঘরে

কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার মনে ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির উদ্রেক হইত এবং তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইত। এ কালেও কন্যা সন্তানের জন্ম হইলে পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়রা খুব উৎফুল্ল ও উল্লসিত হইয়া উঠে, এমন কথা বলা যায় না। বরং বিভিন্ন দেশের গর্ভবতীরা গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ জানিতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চেষ্টা করিতেছে। তাহার ফলে গর্ভে কন্যা সন্তানের উদ্ভব হইয়াছে জানিতে পারিলে ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ও চৈনিক বৌদ্ধ সমাজতান্ত্রিবাদী সমাজের এক শ্রেণীর মেয়েরা গর্ভপাত করিয়া উহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। রাসূলে করীম (স)-এর এই শব্দ প্রয়োগ এই প্রেক্ষিতে হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই রূপ বলিয়া তিনি আসলে লোকদিগকে এই মানসিকতা পরিহার করিতে এবং কন্যাদের প্রতি আস্থাশীল হইবার জন্য তাহাদের জীবনের শত্রু না হইয়া তাহাদের কল্যাণকামী হওয়ার আহবান জানাইয়াছেন। সেই সঙ্গে তাহাদের অযত্ন করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও তাহাদের হত্যা করা হইতে বিরত রাখিতে চাহিয়াছেন।

হাফেয ইরাকী বলিয়াছেন, اِبتلاء শব্দের অর্থ এখানে হইতে পারে اَلْاِخْتِبَارُ। যাচাই করা বা পরীক্ষা গ্রহণ। অর্থাৎ কাহারও ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম তাহার জন্য একটা বিশেষ পরীক্ষা। একজনকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাহাকে কন্যা সন্তান দেওয়া হয়। সে পরীক্ষা এই ব্যাপারে যে, সে কন্যা সন্তানের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, যত্ন করে কি অযত্ন, তাহার সঠিক লালন-পালন করে, না তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তাহাকে বন্য পশু সন্তানের মত লাগাম শূন্য করিয়া ছাড়িয়া দেয়, না গৃহপালিতের মত বাঁধিয়া-ছাঁদিয়াও রাখে ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে। আর বিশেষ ভাবে কন্যা-সন্তান যে পিতার জন্য এই দিক দিয়া একটা কঠিন পরীক্ষার ব্যাপার তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ নাই। হযরত আবূ সায়ীদ (রা) বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে এই কারণেই وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيْهِنَّ বলিয়া কন্যাদের ব্যাপারে ভয় করিয়া চলার কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সেই কন্যা সন্তানের সুষ্ঠু ও সঠিক লালন-পালন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব আন্তরিক ভাবে পালন করে এবং তাহা করিয়া সে আল্লাহর নিকট হইতে অশেষ সওয়াবের অধিকারী হয়। তাই এই হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ। 'এই কন্যারাই তাহার জাহান্নামে যাওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে'। পক্ষান্তরে যদি কোন পিতা কন্যা সন্তানের প্রতি গুরুত্ব না দেয় যথার্থ লালন-পালন না করে, তাহাকে যদি সৎ শিক্ষা দিয়া চরিত্রবতী না বানায়, অসৎ সংসর্গে পড়িয়া উচ্ছৃংখল হইবার জন্য যদি তাহাকে উন্মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেয়, উপযুক্ত সময়ে ভাল ছেলের সহিত তাহার বিবাহ না দেয়, তাহা হইলে এই কন্যারাই তাহার জাহান্নামে যাওয়ার বড় কারণ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আলোচ্য হাদীসে কন্যা সন্তানদের হক ও অধিকার যে অনেক বেশী এবং তাহাদের ব্যাপারে পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য যে অধিক তীব্র ও গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা বিশেষ বলিষ্ঠ ভংগীতে বলা হইয়াছে। হাদীসে বহু বচন ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া কাহারও মনে এই ধারণা আসা উচিত নয় যে, একাধিক কন্যা হইলেই বুঝি তাহা বিপদের কারণ হয় এবং তাহাদের দ্বারা তাহার পরীক্ষা হইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, একটি কন্যা হইলে তুমি এই কথা প্রযোজ্য নয়; না—ইহা ঠিক নয়। কেননা কন্যা মাত্রই গুরুদায়িত্ব ও কঠিন পরীক্ষার ব্যাপার। একাধিক হইলে এই গুরুদায়িত্বের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পাইয়া যায় এবং পরীক্ষাও হয় অধিক তীব্র ও কঠিন। তখন তাহা হয় কঠিন অগ্নি পরীক্ষা।

কন্যাদের ব্যাপারে এইরূপ বলার একটা নৃতাত্বিক কারণও আছে। তাহা এই যে, কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের তুলনায় জন্মগতভাবেই দুর্বল হইয়া থাকে। কেননা একটা ছেলে সাধারণভাবে দশ বার বৎসর বয়সে যতটা কর্মক্ষম হয়, একটা মেয়ে তাহা হয় না। দৈহিক সংস্থা সংগঠনের জন্মগত পার্থক্যের কারণেই এই কথা অনস্বীকার্য। (فتح البارى، نبوى، تحفة الاحوذى)

সন্তানদের প্রতি স্নেহ বাৎসল্য

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمٌّ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءَ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءَ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِىْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَالَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلُ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلَامِ فَفَرِحُوْا بِهِ فَرَحًا شَدِيْدًا لِاَنَّهُمْ قِيْلَ لَهُمْ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُوْلَدُ لَكُمْ. (بخارى، مسلم)

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনুজ্জুবাইরকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন মক্কা শরীফে থাকা অবস্থায়। তিনি বলিয়াছেন, আমি মক্কা হইতে যখন হিজরত করার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম, তখন আমি গর্ভমাসসমূহ পূর্ণ করিতেছিলাম। পরে মদীনায় আসিয়া আমি কুবা'য় অবস্থান গ্রহণ করিলাম এবং এই কুবা'য়ই আমি তাহাকে প্রসব করিলাম। পরে আমি তাহাকে লইয়া রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে তাঁহার কোলে রাখিয়া দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনিতে বলিলেন। তিনি খেজুরটি চিবাইয়া তাহার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন। আবদুল্লাহ্‌র পেটে সর্বপ্রথম যে জিনিস প্রবেশ করিল, তাহা হইল রাসূলে করীম (স)-এর মুখের পানি। অতঃপর তিনি খেজুরটিকে 'তাহ্নীক' করিলেন। ইহার পর তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন। তাহার জীবনে বরকত হওয়ার জন্যও দোয়া করিলেন। আবদুল্লাহই ছিলেন প্রথম সন্তান, যে ইসলামের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে সকল লোক খুব বেশী উৎফুল্ল আনন্দিত হইয়াছিল। কেননা তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, ইয়াহুদীরা তোমাদের উপর যাদু করিয়াছে, ফলে তোমাদের ঘরে আর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে না। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা সদ্য প্রসূত আবদুল্লাহ ইবনুজ্জুবাইরকে রাসূলে করীম (স) কিভাবে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে লইয়া তিনি কি কি করিলেন, উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে তাহারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, নবী করীম (স) প্রথমে তাহাকে নিজের কোলে লইলেন। তাহার পর একটি খেজুর আনিতে বলিলেন। তিনি খেজুরটি প্রথমে নিজে মুখে রাখিয়া খুব করিয়া চিবাইলেন ও উহাকে নরম ও দ্রবীভূত করিলেন। ইহার পর তিনি সদ্যজাত শিশুর মুখে নিজের মুখের পানি দিয়া ভিজাইয়া দিলেন। ইহা করার পর তিনি চিবানো খেজুরটি দিয়া 'তাহ্নীক' تَحْنِيْك করিলেন। তাহার পর তিনি আবদুল্লাহ্‌র জন্য দোয়া করিলেন, তাহার প্রতি 'তাবরীক' করিলেন। তাবরীক করা অর্থ

জীবনে ও জীবনের সব কাজে-কর্মে 'বরকত' হওয়ার জন্য বলা। আর 'বরকত' অর্থ শ্রীবৃদ্ধি। এই দুইটি দোয়া পর্যায়ের কাজ। অর্থাৎ রাসূলে করীম (স) তাহার সাধারণ কল্যাণ সাধিত হওয়ার জন্য দোয়া করার পর তাহার জীবনে—জীবনের যাবতীয় কাজে-কর্মে বিপুলভাবে শ্রী-বৃদ্ধি সধিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিলেন।

বস্তুত মুসলিম সমাজে সদ্যজাত শিশুর প্রতি কিরূপ আচারণ করা বাঞ্ছনীয়, তাহার মোটামুটি দিগদর্শন এই হাদীসটি হইতে লাভ করা যায়। এক কথায় এই সমস্ত কাজকে বলা হয়, 'তাহ্নীক'। এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে প্রথম কাজ হইল, সদ্যজাত শিশুকে সমাজের কোন শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত ব্যক্তির—পুরুষ বা মহিলার—কোলে দিতে হইবে। সে ব্যক্তি প্রথমে শিশুটির মুখ নিজের মুখের পানি দিবেন। পরে একটি খেজুর ভাল ভাবে চিবাইয়া নরম করিয়া শিশুটির মুখের তালুতে চাপিয়া বসাইয়া ও লাগাইয়া দিবেন এবং তাহার পর উহার সাধারণ সঠিক কল্যাণ এবং জীবনের সর্বকাজে সর্বক্ষেত্রে শ্রী-বৃদ্ধি হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিবেন। সদ্যপ্রসূত শিশুর সহিত এইরূপ আচরণ তাহার প্রতি প্রকৃত ও সত্য নিষ্ঠ স্নেহ-বাৎসল্যের প্রতীক। বস্তুত ইহাই ইসলামী সংস্কৃতি সমৃদ্ধ আচরণ।

বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন, সদ্য জাত শিশুর প্রতি এইরূপ আচরণ করা মুস্তাহাব—অতীব উত্তম কাজ ও আচরণ। এই কাজে সর্বত্র খেজুর ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন ধরাবাঁধা কথা নাই। খেজুর না পাইলে তৎপরিবর্তে অনুরূপ অন্য যে কোন জিনিস ব্যবহার করা যাইতে পার, তবে তাহা প্রথমতঃ মিষ্ট হইতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ চিবাইয়া নমর করা ও গলাইয়া দিতে হইবে—সে জিনিসটির এই রকমই হইতে হইবে। খেজুর পাওয়া না গেলে এতদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে প্রাপ্য উত্তম চকোলেট এই কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জিনিসটি শিশুর মুখের তালুতে লাগাইয়া দিলে মুখের পানির সহিত উহা গলিয়া গলিয়া ধীরে ধীরে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে থাকিবে। ফলে শিশুটি দীর্ঘক্ষণ স্বয়ংক্রিয় ভবে মিষ্টতা পান করিতে পারিবে। এই কাজটি করিবেন এমন নেক ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত না থাকিলে শিশুটিকে তাহার নিকটে লইয়া যাইতে হইবে এবং সদ্যজাত শিশুকে পাইয়া সংশ্লিষ্ট সকলেরই আনন্দিত ও উৎফুল্ল উল্লাসিত হইয়া উঠা বাঞ্ছনীয়। তাহাতে আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি যেমন সন্তুষ্টি প্রকাশিত হইবে, তেমনি প্রকাশ পাইবে বিশ্ব মানবতা ও মানব বংশবৃদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা। ইহা ইসলামী ভাবধারার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাসূলে করীম (স) নিজে সদ্য জাত শিশুর প্রতি এইরূপ আচরণ করিতেন। এই কারণে এরূপ করার সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত।

হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, 'হযরত আবূ তালহা আনসারীর পুত্র আবদুল্লাহ্ যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন আমি তাঁহাকে লইয়া নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি খেজুর আনিতে বলিলেন এবং খেজুর নিজের মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিলেন। পরে শিশুটির মুখ খুলিয়া উহার তালুতে লাগাইয়া দিলেন। শিশুটি জিহ্বা নাড়িয়া চাটিতে ও মিষ্টতা পান করিতে লাগিল। (মুসলিম)

(نبوى، عمدة القارى)

সন্তানের শিক্ষা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَ انِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ الاية. (مسلم)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিতেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে সন্তানই জন্ম গ্রহণ করে তাহার জন্ম হয় স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম ও ভাবধারার ভিত্তিতে। পরে তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ইয়াহুদী বানায়, বানায় খৃস্টান কিংবা অগ্নিপূজক। ইহা ঠিক তেমন যেমন চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ, সুগঠিত দেহ সংস্থা সম্পন্ন বাছুর প্রসব করে। তোমরা কি উহার মধ্যে কোন অঙ্গহানী বা কর্তিত অঙ্গ দেখিতে পাও? অতঃপর হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলিলেন, তোমাদের ইচ্ছা হইলে পড়ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ব্যবস্থা ও ভাবধারা, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন রূপ পরিবর্তন নাই। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ইহা একটি অতীব প্রসিদ্ধ ও দার্শনিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ হাদীস। হাদীসটি সাধারণভাবে সমস্ত জীব সন্তানের এবং বিশেষভাবে মানব সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত মৌলিক নিয়ম ও ভাবাধারার কথা বলা হইয়াছে এবং উহার পর দেখানো হইয়াছে, উত্তর কালে উহার দেহে বা চরিত্রে প্রবৃত্তিতে কিভাবে পরিবর্তন বা বিকৃতি আসে।

রাসূলে করীম (স)-এর প্রথম কথা হইল, মানব শিশু-সন্তান আল্লাহ্‌র স্থায়ী নিয়মে ও স্বভাবজাত ভাবধারায়ই জন্মগ্রহণ করে। ইহার পর তাহার পিতা-মাতারই কর্তব্য ও দায়িত্ব হয় তাহারা এই শিশুকে কিভাবে গড়িয়া তুলিবে। তাহারা যেভাবে গড়িতে চাহিবে, শিশু ধীরে ধীরে সেই ভাবে গড়িয়া উঠিবে। ইহাই স্বাভাবিক।

এই মূল কথাটি বুঝাইবার জন্য নবী করীম (স) একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তটি সমাজের আশ-পাশ হইতে গৃহীত ও সহজবোধ্য। কোন জটিল তত্ত্ব নয়। মানুষের চারি পাশে যে সব জন্তু-জানোয়ার থাকে, তাহাতে দেখা যায় সে জন্তু-জানোয়ার যে সব বাছুর প্রসব করে, তাহা সম্পূর্ণ নিখুঁত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। উহাতে কোন অঙ্গহানি দেখা যায় না, হাত-পা নাক-কানে কোন কাটা-ছেঁড়াও লক্ষ্য করা যায় না। দেখা যায় না কোন রূপ অসম্পূর্ণতা বা আঙ্গিক ও দৈহিক কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি। ইহাই সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম। মানব সন্তানও ঠিক এইরূপ। জন্তু-সন্তান যেমন দৈহিক দিক দিয়া ত্রুটিহীন ও খুঁতমুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, মানব-সন্তান নৈতিকতা বা ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়া অনুরূপ নিখুঁত ও ত্রুটিহীন অবস্থায় জন্ম নেয়। যাহা স্বাভাবিক, যাহা স্বভাবের নিয়ম ও ভাবধারা সম্পন্ন, মানুষের স্বভাব প্রকৃতিও সেইরূপ থাকে। সমগ্র বিশ্ব-স্বভাবের মর্মকথা যে আল্লাহ্ বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য, মানব সন্তানও সেই ভাবধারাসম্পন্ন থাকে উহার জন্ম মূহূর্তে। জন্তু-সাবকের দৈহিক ত্রুটিহীনতার দৃষ্টান্ত দিয়া মানব-সন্তানের নৈতিক ও প্রকৃতিগত ত্রুটিহীনতা বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছে এই হাদীসটিতে। কিন্তু ইহার পর জন্তু-জানোয়ারের দেহে যেমন বিকৃতি ও ত্রুটি সূচিত হয়, মানব-শিশুর ক্রমশ বড় হইতে থাকাকালে তাহার স্বভাব, চরিত্র, প্রবণতা ও হৃদয়-বৃত্তিতে বিকৃতি ও বিচ্যুতি সংঘটিত হয়। জন্তুর সন্তানের দেহে বিকৃতি আসে সমাজের লোকদের হাতে প্রচলিত নিয়ম-প্রথার প্রভাবে ও কারণে। আর তাহা এই যে, উহার কান চিড়িয়া দেওয়া হয়, নাক ছেঁদা করা হয়। হাতে পায়ে নানাভাবে কাটার চিহ্ন অংকিত করা হয়। এইরূপ করা ছিল তদানীন্তন আরব জাহিলিয়াতের জামানায় মুশরিক লোকদের দেব-দেবী পূজার একটা বিশেষ পদ্ধতি। তাহাদের উপাস্য দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই তাহারা এইরূপ করিত। এইরূপ করা না হইলে সে জন্তু শাবক চিরকাল অক্ষত, নিঃখুত ও ত্রুটিহীন দেহ লইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। মানব শিশু সন্তানের নৈতিকতা স্বভাব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি-প্রবণতায় অনুরূপ বিকৃতি ও বিচ্যুতি আসে পরিবার ও সমাজ পরিবেশ, দেশ চলতি প্রথা ও রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের কারণে। আর তাহার সূচনা হয় পিতা মাতার

নিকট হইতে। কেননা পিতা-মাতার ঔরসে ও গর্ভে তাহার জন্ম। জন্ম মুহূর্ত হইতে সে মায়ের বুকের অপত্য স্নেহ সুধা ও স্তন-দুগ্ধের অমৃত লাভ করে, লাভ করে পিতার অসীম আবেগ মিশ্রিত স্নেহ বাৎসল্য ভরা ক্রোড়। এই কারণে শিশু সন্তান পিতা-মাতার নিকট হইতে সামাজিক ও নৈতিক প্রভাবও গ্রহণ করে গভীর ভাবে। তখন পিতা-মাতা শিশু সন্তানকে যেরূপ আদর্শে ও ভাবধারায় গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছুক হয়, সন্তান ঠিক সেই ভাবধারা লইয়াই লালিত-পালিত ও বড় হইয়া উঠে। এই প্রেক্ষিতেই বলা হইয়াছে, তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ইয়াহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায় বা অগ্নিপূজক বানায়। পিতা-মাতা ইয়াহুদী বানায়, অথচ ইয়াহুদী হইয়া সে জন্মায় নাই, ইয়াহুদী হইয়া সত্য দ্বীন-বিদ্বেষী বা ইসলামের দুশমন হইয়া জীবন যাপন করিবে এ উদ্দেশ্যে তাহাকে সৃষ্টি করা বা তাহার জন্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই। পিতা মাতা খৃষ্টান বানায় অথচ সে শিশু বড় হইয়া ত্রীত্ববাদে বিশ্বাসী হইবে, হযরত ঈসা (আ)কে আল্লাহ্র নবী-রাসূল বিশ্বাস করার পরিবর্তে (নায়ূযুবিল্লাহ) আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবে, অথবা এক আল্লাহ্র বন্দেগী করার পরিবর্তে আগুনের পূজা ও উপাসনা করিবে কিংবা নিজ হাতে গড়া মূর্তি বা চাঁদ সূর্য পাহাড় বৃক্ষের পূজা করিবে—এই জন্য তাহার জন্ম হয় নাই। তাহাকে তো সৃষ্টি করা হইয়াছে এক আল্লাহ্র বন্দেগী করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে ইহা করিবে না—করিতে জানে না শুধু এই কারণে যে, তাহার পিতা-মাতা তাহাকে স্বভাব নিয়ম ও প্রকৃতি অনুযায়ী এক আল্লাহ্র বান্দাহ বানাইবার পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম বা মতাবলম্বী বানাইয়া দিয়াছে। শিশু বড় হইয়া কি হইবে তাহা পিতা-মাতার উপর নির্ভরশীল। অতএব শিশুদের উত্তম চরিত্রগঠন ও ইসলামী আদর্শবাদী বানাইয়া তোলা পিতা-মাতার উপর অর্পিত কঠিন দায়িত্ব। এই দায়িত্ব শুরু হইতেই তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদিগকে আল্লাহ্র নিকট কিয়ামতের দিন কঠিন জওয়াবদিহির সম্মুখীন হইতে হইবে। এই হাদীসের যথার্থতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কুরআন মজীদের যে আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়াছেন, আলোচনায় লিখিত সমস্ত কথাই সেই প্রেক্ষিতে লেখা। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, মূলত হাদীসটি কুরআন নিঃসৃত ও কুরআন সমর্থিত। কুরআনের এই আয়াতটিরই সাধারণ বোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা হইতেছে এই হাদীসটি। আয়াতটি স্বয়ং আল্লাহ্র বাণী; আর হাদীসটি রাসূল (স)-এর মুখে উহারই ব্যাখ্যা।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

(مسند احمد، بخاری، ترمذی، ابوداؤد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক আমাদের শিশু ও ছোট বয়সের লোকদিগকে স্নেহ বাৎসল্য দেয় না, আমাদের মধ্যে যাহারা বেশী বয়সের তাহাদিগকে সম্মান করে না এবং ভাল কাজের আদেশ করে না ও মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করে না, সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।

(মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, আবূ দায়ূদ)

ব্যাখ্যা ছোট শিশু ও অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রতি দয়া ও স্নেহ-বাৎসল্য প্রদর্শন সাধারণভাবে সব মানুষেরই কর্তব্য। অনুরূপ কর্তব্য হইতেছে পরিবারের ও সমাজের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন। সাধারণ ভাবে ইহাই সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল (স)-এর উপদেশ। এই প্রেক্ষিতে শিশু সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহ মমতা পোষণ করা সেই শিশু সন্তানের পিতা-মাতার পক্ষে যে কতবড় দায়িত্ব ও কর্তব্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পিতা মাতার শুধু জৈবিক কর্তব্যই ইহা নয়, ইহা তাহাদের নৈতিক দায়িত্বও।

শিশু বালকদের প্রতি স্নেহ আর বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান মূলত একই ভাবধারার এপিঠ ওপিঠ, শুরু অবস্থা ও পরিণত অবস্থা। আজ যে শিশু সকলের ছোট, কালই সে অনেকের তুলনায় বড় এবং ৩০-৪০ বৎসর পর তাহারাই সমাজের বড় ও বয়স্ক ব্যক্তি। যে সমাজে শিশু বালকদের প্রতি স্নেহ মমতা থাকে, সে সমাজে বয়োঃবৃদ্ধদের প্রতিও থাকে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ। পক্ষান্তরে যে সমাজে প্রথমটি থাকে না, সে সমাজে দ্বিতীয়টিরও প্রচণ্ড অভাব ও অনুপস্থিতি অনিবার্য। যে সমাজে মানব শিশু অবাঞ্ছিত, সে সমাজে বয়োঃবৃদ্ধরা চরমভাবে উপেক্ষিত, নিদারুন দুর্দশাগ্রস্থ, নিরুপায়, অসহায় ও লাঞ্ছিত।

রাসূলে করীম (স) যে সমাজ-আদর্শ পেশ করিয়াছেন, তাহাতে মানুষের সার্বিক মর্যাদা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সে মানুষ সদ্যজাত শিশু কিংবা অল্প বয়স্ক বালক অথবা বয়োঃবৃদ্ধ, উপার্জন-অক্ষম—যাহাই হউক না কেন। সে সমাজে কোন অবস্থায় মানুষ উপেক্ষিত ও অবহেলিত হইতে পারে না। মানবতার প্রতি ইহা নির্বিশেষ ও সুগভীর মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধেরই প্রমাণ। এই মানবতাবাদী ও মানব কল্যাণকামী ভাবধারার কারণেই ন্যায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কর্তব্য। এই কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবে ও এ কর্তব্য সামষ্টিভাবেও। মানুষকে ভাল বাসিতে হইবে, এই জন্যই মানুষকে ভাল কাজ করার পথ দেখাইতে হইবে। ভাল কাজের উপদেশ দিতে হইবে ও ব্যাপক প্রচার চালাইতে হইবে, কল্যাণকর পথে পরিচালিত করিতে হইবে ব্যাপক বিপুল জনতাকে। কেননা ভাল কাজ করা ও কল্যাণকর পথে চলার ইহকালীন পরিণাম যেমন কল্যাণময়, তেমনি পরকালীন পরিণতিও। অনুরূপভাবে মানুষকে ভালবাসিতে হইবে বলিয়াই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে হইবে, অন্যায়ের যে অন্যায়ত্ব তাহা সকলের সম্মুখে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। লোকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে, প্রচার করিতে হইবে যে, ইহা অন্যায়, ইহা করা উচিত নয়। সে অন্যায় হইতে লোকদিগকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে হইবে এবং তাহা হইতে বিরত রাখিতে হইবে। বস্তুত শিশুদের প্রতি স্নেহ মমতা দান, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন, ন্যায়ের প্রচার আদেশ ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ বিশ্লেষণ, নিষেধ ও প্রতিরোধ—এই চারওটি কাজ পরস্পর সম্পৃক্ত, সম্পূরক ও একই ধারাবাহিকতার শৃংখলে আবদ্ধ। এই চারওটি কাজ সামাজিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা যেমন পরিবারের ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে হইতে হইবে, তেমনি হইতে হইবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। যে সমাজ বা রাষ্ট্র শিশু সন্তানের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে না, সে সমাজে ও রাষ্ট্রে বয়োবৃদ্ধদের চরম দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। পরন্তু সে সমাজ-রাষ্ট্র ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা না হইয়া হয় ন্যায়ের প্রতিরোধকারী। অন্যায়ের প্রতিরোধ করা উহার পক্ষে সম্ভব হয় না, অন্যায় ও পাপের সয়লাবে সমস্ত মানবীয় মূল্যবোধ ও মানবিকতার পয়মাল হইতে দেওয়াই হয় উহার একমাত্র পরিচয়

তাই রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ এই চারটি কাজ যে করে না, সে আমার মধ্যে গণ্য নয়। হাদীসের শব্দ হইল لَيْسَ مِنَّا । ইহার সঠিক তাৎপর্য কি? হাদীসবিদদের মতে ইহার একটি অর্থ হইল; لَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَطَرِيقَتِنَا 'সে (লোক-সমাজ ও রাষ্ট্র) আমার নীতি আদর্শ ও পন্থা বা পথ অনুসারী নয়।' কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, সে রাসূলের দ্বীন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে বা বাহির করিয়া দেওয়া বা দিতে হইবে। এতটা কড়া অর্থ ইহার নয়। কিন্তু এইরূপ বলার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। ইহাতে তীব্র শাসন ও তিরস্কার নিহিত। পিতা যেমন পুত্রের কোন কাজে অসন্তুষ্ট হইয়া বলেঃ তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই; কিংবা তুই যদি এই কাজ কর তাহা হইলে তুই আমার ছেলে নস্। রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটিও তেমনি। পিতার উক্ত কথায়ই যেমন পিতা-পুত্রের সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্য হয় না—ইহাও তেমনি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই চারটি কাজ না করিলে রাসূলে করীম (স)-এর আদর্শ লংঘিত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ, لَيْسَ عَلٰى دِيْنِنَا الْكَامِلِ 'সে আমার উপস্থাপিত পূর্ণ দ্বীন-ইসলামের অনুসারী নয়'। অর্থাৎ সে রাসূলের উপস্থাপিত দ্বীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বা শাখাকে অমান্য করিয়াছে, যদিও মূল দ্বীন এখন পর্যন্ত অস্বীকৃত হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও রাসূলে করীম (স) তাহাকে নিজের উম্মতের মধ্যে গণ্য করেন নাই। ইহা অতীব সাংঘাতিক কথা। (تحفة الاحوذى)

সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণ দান

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. (مسند احمد، ترمذى)

হযরত সায়ীদ ইবনুল আ'চ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ পিতা সন্তানকে উত্তম স্বভাব-চরিত্রের তুলনায় অধিক উত্তম ভাল কোন দান-ই দিতে পারে না। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তিকালের সময় সায়ীদ ইবনুল আ'চ মাত্র নয় বৎসরের বালক ছিলেন। তিনি নিজের কর্ণে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি শুনিয়াছেন এমন কথা মনে করা যায় না। ফলে এই হাদীসটি সনদের দিক দিয়া 'মুরসাল'—যে সাহাবী এই হাদীসের প্রথম ও মূল বর্ণনাকারী তাঁহার নাম এখানে উহ্য। কিন্তু এহা যে নবী করীম (স)-এর বাণী তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ নাই। কেননা এই মর্মের ও এই প্রসঙ্গের বহু বাণী সাহাবীদের সনদে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা তাঁহারা সরাসরিভাবে রাসূলে করীম (স)-এর মুখে শুনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসটির সংক্ষিপ্ত কথনে নবী করীম (স) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পিতা স্বাভাবিক ভাবে পুত্র-কন্যার জন্য অনেক বিত্ত সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে চাহে ও চেষ্টা করে। কিন্তু বিত্ত-সম্পত্তি দেওয়া পিতার বিশেষ কোন দেওয়া নয়। এই দেওয়া কোন কৃতিত্বের দাবি রাখে না। যদি সন্তানকে উত্তম চরিত্র ও ভাল আদব কায়দা শিক্ষা দিতে না পারে, তবে তুলনামূলকভাবে ইহাই তাহার সর্বোত্তম দান হইবে। ইহার পর সন্তানের জন্য দারিদ্রের পাহাড় রাখিয়া গেলেও তাহা কাটাইয়া উঠা চরিত্রবান ও ভাল আদব-কায়দা সম্পন্ন সন্তানের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। চরিত্রহীন ছেলের হাতে যদি বিপুল ধন-সম্পদ রাখিয়া যায়, তাহা হইলে সে কেবল ধন-সম্পদই বিনষ্ট করিবে না, নিজেকেও ধ্বংস করিবে। তাই চরিত্র শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও মর্যাদা সর্বাধিক।

(تحفة الاحوذى، بلوغ الامانى)

সন্তানদের প্রতি পিতার অর্থনৈতিক কর্তব্য

عَنْ سَعَدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ وَاَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ اَنْ يَمُوْتَ بِالْاَرْضِ الَّتِىْ هَاجَر مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ اِبْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ

عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَاِنَّكَ مَهْمَا اَنْفَقْتَ مِنْ نَّفَقَةٍ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتّٰى اللُّقْمَةُ الَّتِىْ تَرْفَعُهَا اِلٰى اِمْرَاَتِكَ وَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّبِكَ اٰخَرُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا اِبْنَةٌ. (بخارى، مسلم، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه)

হযরত সায়াদ ইবনে আবূ অক্কাচ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) আমাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। এই সময় আমি মক্কায় অবস্থান করিতেছিলাম। তিনি যে স্থান হইতে হিজরত করিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানে মৃত্যুবরণ করাকে অপছন্দ করিতেছিলেন। রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইবনে আফরাকে রহমত দান করুন। আমি বলিলামঃ হে রাসূল! আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ অছিয়ত করিতেছি। তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, তাহা হইলে অর্ধেক? বলিলেন, না। বলিলাম, এক তৃতীয়াংশ, বলিলেনঃ হ্যাঁ, এক তৃতীয়াংশ করিতে পার এবং ইহা অনেক। তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদিগকে সচ্ছল ও ধনশালী রাখিয়া যাইতে পার তবে তাহা তাহাদিগকে নিঃস্ব দরিদ্র ও লোকদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষাকারী বানাইয়া রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। আর তুমি যাহা কিছুই ব্যয় কর, তাহা সাদকা হইবে। এমন কি, যে খাদ্যমুঠি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দাও তাহাও। আল্লাহ্ তোমাকে শীঘ্র ভাল করিয়া দিবেন। অতঃপর তোমার দ্বারা বহু লোক উপকৃত হইবে এবং অন্যান্য বহু লোক ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। এই সময় হযরত সায়াদ ইবনে অক্কাচের একটি কন্যা ছাড়া আর কোন সন্তান ছিল না। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দায়ূদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা হাদীসটি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সায়াদ ইবনে আবূ অক্কাচ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নিজেই রাসূলে করীম (স)-এর একটি কথা বর্ণনা করিয়াছেন। মূল কথাটি বর্ণনা প্রসঙ্গে কথাটির পটভূমিও তিনি বলিয়াছেন। এই হাদীস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম বুখারী তাঁহার একই গ্রন্থের অন্তত দশটি প্রসঙ্গে ও স্থানে এই হাদীসটি বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সিহাহ্ সিত্তার প্রত্যেক গ্রন্থেই ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

হাদীসটির পটভূমি স্বরূপ জানা গিয়াছে, বিদায় হজ্জ উপলক্ষে নবী করীম (স) লক্ষাধিক সাহাবী সমভিব্যবহারে মক্কা শরীফ গমন করিয়াছেন। এই সময় হযরত সায়াদ ইবনে আবূ অক্কাচ (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই রোগের প্রকৃত রূপ কি ছিল? তাহা অপর একটি বর্ণনা হইতে জানা গিয়াছে। রোগের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত সায়াদ (রা) বলিয়াছেনঃ اُشْفِيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ 'আমি এই রোগের দরুন মৃত্যুমুখে উপনীত হইয়া গিয়াছি'। অর্থাৎ এই রোগের আতিশয্যে তিনি জীবনে বাঁচিয়া থাকার ব্যাপারে সন্দিহান এবং নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। এই সময় রাসূলে করীম (স) তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এইখানে মূল হাদীসে একটি বিচ্ছিন্ন বাক্য বলা হইয়াছে। তাহা হইলঃ তিনি যে স্থান হইতে হিজরত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন সেই স্থানে মৃত্যু বরণ করিতে তিনি নিতান্ত অপছন্দ করিতেছিলেন। এই তিনি বলিয়া কাহাকে বুঝানো হইয়াছে? জওয়াবে বলা যায়, 'তিনি' বলিতে স্বয়ং নবী করীম (স) ও হইতে পারেন, হইতে পারেন হযরত সায়াদ। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বাক্যটি যেভাবে বলা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই অপছন্দকারী নবী করীম (স)। তিনি হযরত সায়াদের রোগাক্রান্ত হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেননা মৃত্যু অবধারিত ও সময় নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একবার ত্যাগ করিয়া যাওয়া এই স্থানে—মক্কায়—হযরত সায়াদ কিংবা তাঁহার ন্যায় অন্য কোন মুহাজির সাহাবী মৃত্যু বরণ করুক তাহা নবী করীম (স) পছন্দনীয় হইতে পারে না। কিংবা এই স্থানটি জন্মভূমি হইলও এখন তাঁহার স্থায়ী

বাসস্থান মক্কা নয়—মদীনা। মক্কা হইতে তো তিনি হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। হজ্জব্রত উদযাপনের উদ্দেশ্যে এখানে কিছুদিনের জন্য আসিয়াছেন মাত্র। ইহা এখন তাঁহাদের জন্য বিদেশ। এই বিদেশ বেভূঁইয়ে প্রবাসী অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হউক, তাহা কাহারওই পছন্দনীয় হইতে পারে না। এই হইল এই বাক্যটির তাৎপর্য।

এই অপছন্দকারী হযরত সায়াদও হইতে পারেন। কেননা মুসলিম শরীফে এই হাদীসটিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَشِيْتُ اَنْ اَمُوْتَ بِالْاَرْضِ الَّتِىْ هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ

হে রাসূল যে স্থান হইতে আমি হিজরাত করিয়া গিয়াছি সেখানেই আমার মৃত্যু হয় নাকি, যেমন সায়াদ ইবনে খাওলা'র মৃত্যু হইয়াছিল, আমি ইহাই ভয় করিতেছি।

অপছন্দকারী হযরত সায়াদ তাহাই এ উদ্ধৃত হইতে স্পষ্ট ভাষায় জানা গেল। রাসূলে করীম (স) হযরত সায়াদের রোগাক্রান্ত অবস্থা দেখিয়া বলিলেনঃ

يَرْحَمُ اللّٰهُ ابْنَ عَفْرَاءَ

আল্লাহ্ ইবনে আফরাকে রহমত দান করুন।

ইবনে আফরা—আফরা'র পুত্র—বলিতে হযরত সায়াদ (রা)কেই বুঝাইয়াছেন। তাহা হইলে 'আফরা' কে? দায়ূদী বলিয়াছেন, ইহা অরক্ষিত শব্দ। হাফেয দিমইয়াতী বলিয়াছেন, ভুল বশতঃ এই রূপ বলা হইয়াছে। নাসায়ী গ্রন্থে 'সায়াদ ইবনে খাওলা' বলা হইয়াছে। কেননা তিনি মদীনা হইতে মক্কায় আসিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। আল্লামা আইনী লিখিয়াছেন, ইহা হযরত সায়াদের মায়ের নাম হইতে পারে এবং এই হিসাবেই রাসূলে করীম (স) এই বাক্যটি বলিয়াছেন।

হযরত সায়াদ রাসূলে করীম (স)কে বলিলেনঃ اُوْصِى بِمَالِىْ كُلِّه 'আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ দান করিয়া দিব'। বাক্যটি সংবাদমূলক। অর্থাৎ হযরত সায়াদ (রা) তাঁহার সমস্ত সম্পদ দান করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাসূলে করীম (স)কে জানাইলেন। কিন্তু অপর একটি বর্ণনায় এই বাক্যটি জিজ্ঞাসা সূচক। তা হইলঃ اَفَاَتَصَدَّقُ بِمَالِىْ كُلِّه 'হে রাসূল আমি আমার সমস্ত মাল-সম্পদ দান করিয়া দিব'? রাসূলে করীম (স) ইহার জওয়াবে বলিলেনঃ না। অর্থাৎ সমস্ত মাল-সম্পদ দান করিয়া দেওয়া তোমার উচিত নয়। অতঃপর তিনি অর্ধেক মাল-সম্পদ কিংবা দুই তৃতীয়াংশ দান করার অনুমতি চাহেন। রাসূলে করীম (স) ইহার জওয়াবেও 'না' বলেন। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ এক তৃতীয়াংশ দিতে পারি? রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ 'হ্যাঁ তুমি এক তৃতীয়াংশ দিতে পার। আর যাবতীয় মাল-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ তো অনেক। অপর বর্ণনায় كَثِيْر এর স্থানে كَبِيْر উদ্ধৃত হইয়াছে। অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ বেশ বড়।

এখানে প্রশ্ন উঠে, হযরত সায়াদ তাঁহার ধন-সম্পত্তি দান করিয়া দেওয়ার জন্য এতটা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন কেন? ইহার জওয়াব তিনি নিজেই দিয়াছেন। এতদসংক্রান্ত প্রশ্নের পূর্বেই তিনি বলিয়াছেনঃ

اِنِّىْ قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجْعِ وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَلَا يَرِثُنِىْ اِلَّا ابْنَةٌ

আমার রোগ যন্ত্রণা চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছে। (অতঃপর বাঁচিব সে আশা খুবই কম) অথচ আমি একজন ধনশালী ব্যক্তি। কিন্তু আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেহই উত্তরাধিকারী নাই।

এই বর্ণনাটি বুখারী গ্রন্থেই অন্য এক প্রসঙ্গে সায়াদ ইবনে ইবরাহীম বর্ণনাকারী সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। আর উপরোদ্ধৃত বর্ণনাটির শেষে বর্ণনাকারীর উক্তি হিসাবে বলা হইয়াছেঃ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ। 'এই সময় তাঁহার একটি কন্যা ছাড়া (সন্তান বা উত্তরাধীকারী হইবার মত) আর কেহই ছিল না'। এই কন্যার নাম ছিল আয়েশা। তিনি ও সাহাবী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কথার সার নির্যাস হইল, হযরত সায়াদ (রা) অসুখের যন্ত্রণায় জীবনে বাচিয়া থাকা হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করিবেন, তাহা লইয়া তাঁহার মনে দুশ্চিন্তার উদয় হইয়াছিল। এই বিষয়ে তিনি নবী করীম (স)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাঁহার সম্পদ-সম্পত্তি দান করিয়া যাইবেন কিনা। নবী করীম (স) তাঁহাকে মাত্র এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত বা দান করার অনুমতি দিলেন। ইহার অধিক দান বা অসিয়ত করিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিলেন। ইহার কারণ স্বরূপ তিনি বলিলেনঃ তুমি যদি তোমার উত্তারাধিকারীদিগকে সচ্ছল ও ধনশালী করিয়া রাখিয়া যাইতে পার তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পর তাহারা জনগণের হাতে পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষাকারী নিঃস্ব ফকীর হইবে—এইরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা ইহা অনেক বেশী উত্তম কাজ। ইহা এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত বা দান করিতে নিষেধ করার কারণ। এই কথাটির বিস্তারিত রূপ এইঃ তুমি এক তৃতীয়াংশের অধিক দান বা অসিয়াত করিও না। কেননা এখন তুমি যদি মরিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদিগকে সচ্ছল ও ধনশালী বানাইয়া রাখিয়া যাইতে পারিবে। আর তুমি যদি জীবনে বাঁচিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি দানও করিতে থাকিবে, ব্যয়ও করিতে পারিবে এবং তাহাতে তুমি শুভ কর্মফল লাভ করিতে পারিবে জীবনে মরণে উভয় অবস্থায়। আর তুমি যদি প্রয়োজনে ব্যয় কর, তবে এই ব্যয় দান-সাদকার ন্যায় সওয়াব পাওয়ার মাধ্যম হইবে। এই দান যে কোন ক্ষেত্রে এবং যে কোন রকমেরই হউক না কেন। অপর দুইটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

فَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا

কেননা তুমি যে কোন ধরনের ব্যয় বহন কর না কেন, উহার দায়িত্ব তুমি যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে উহার দরুন তোমাকে বিপুল সওয়াব দেওয়া হইবে।

এখানে ব্যয়কে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা বা নিয়্যতের সহিত শর্তযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে সওয়াব লাভের ব্যাপারে অর্থাৎ ব্যয় করা যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়, তাহা হইলে সওয়াব পাওয়া যাইবে না। সেই উদ্দেশ্যে হইলে তবেই সওয়াব পাওয়া সম্ভব হইবে।

হাদীসটিতে একটি কথা বিশেষ গুরুত্ব সহাকরে বলা হইয়াছে। তাহা হইলঃ

حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

এমন কি সেই খাদ্যমুঠি যাহা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দাও............।

অর্থাৎ ইহাও তোমার দান বিশেষ এবং ইহাতেও তোমার সওয়াব হইবে। এই বাক্যটি অপর একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে এই ভাষায়ঃ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ এমনকি তুমি যাহা তোমার স্ত্রীর মুখে রাখ। উভয় বাক্যের মৌল তাৎপর্য একই এবং অভিন্ন।

এখানে প্রশ্ন উঠে, অসিয়ত প্রসঙ্গে পারিবারিক ব্যয়ের প্রসঙ্গ আনা হইয়াছে কেন? ইহার জওয়াব এই যে, হযরত সায়াদের জিজ্ঞাসা হইতে যখন জানা গেল যে, তিনি বেশী বেশী সওয়াব পাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী অথচ নবী করীম (স) এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে নবী করীম (স) একথা বলার প্রয়োজন বোধ করিলেন যে,

তোমার ধন-মাল তুমি যাহাই কর না কেন উহার কিছু অংশ অসিয়ত কর ও কিংবা স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য ব্যয় করনা কেন, এমন কি কর্তব্য পর্যায়ের খরচও যদি কর, তাহা হইলেও তুমি তাহাতেই সওয়াব পাইতে পার। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ উহার মূলে নিহিত উদ্দেশ্য হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে স্ত্রীর কথা বিশেষভাবে বলা হইল কেন, এই প্রশ্নও উঠিতে পারে। জওয়াবে বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন স্বামীর স্থায়ী কর্তব্যভুক্ত, অন্যান্য ব্যয় সেরূপ নহে আর এই স্থায়ী খরচপত্রে কোন সওয়াব হইবার নয় বলিয়া কাহারও ধারণা জাগিতে পারে, এই কারণে নবী করীম (স) প্রসঙ্গত এই কথাটি বলিয়া এ পর্যায়ের ভুল ধরণা দূর করিতে চাহিয়াছেন।

হাদীসটির শেষাংশে যে বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হযরত সায়াদের জন্য নবী করীম (স)-এর বিশেষ দোয়া। এই দোয়া তিনি করিয়াছিলেন হযরত সায়াদের জীবন সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করার পরে। তিনি অসুখের তীব্রতার দরুন ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি হয়ত বাচিবেন না, এই ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া স্থানেই বুঝি মৃত্যু বরন করিতে হইবে। তিনি নবী করীম (স)কে প্রশ্ন করিয়াছিলেনঃ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِىْ 'হে রাসূল! আমি কি আমার সঙ্গীদের পিছনে এখানে পড়িয়া থাকিব'? অর্থাৎ হজ্জ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ-কর্ম সমাপ্ত হইয়া যাওয়ার পর সব মুহাজির সাহাবী তো মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া যাইবেন। তখন কি আমি এখানে একা পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইব? ইমাম কুরতুবী লিখিয়াছেনঃ হযরত সায়াদ মক্কাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়া না যায়, এই ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহার জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ

'আল্লাহ্ তোমাকে শীঘ্র ভাল করিয়া দিবেন'। অর্থাৎ এখনই তোমার মৃত্যু হইবে না। বরং তোমার জীবন দীর্ঘ হইবে। কাযী ইয়ায বলিয়াছেন, এই হাদীসের আলোকে মনে হয়, মক্কা বিজয়ের পরও হিজরাতের অর্থাৎ মক্কা ত্যাগ করার পূর্ব নির্দেশ বহাল ও কার্যকর ছিল। তবে ইহাও বলা হইয়াছে, যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরত করিয়াছিলেন এই নির্দেশ কেবল তাঁহাদের জন্যই বলবত ছিল। যাহারা উহার পর হিজরাত করিয়াছেন তাহাদের জন্য নয়। আর হযরত সায়াদ (রা) মক্কা বিজয়ের পূর্বেই হিজরতকারী ছিলেন। রাসূলে করীম (স)-এর দোয়ার শেষাংশে বলা হইয়ছেঃ 'তোমার দ্বারা বহু লোক উপকৃত হইবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হইবে অন্য বহু লোক।

এই দোয়াটির তাৎপর্য হইল, হযরত সায়াদ এই রোগে মরিবে না। ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিবেন—ছিলেনও তাই। চল্লিশ বৎসরেরও বেশী। এই বৎসরগুলিতে তাঁহার বহু পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। উপরন্তু তাঁহাকে যখন ইরাক অভিযানে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি এমন বহু লোকের সাক্ষাৎ পাইলেন যাহারা মুর্তাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) হইয়া গিয়াছিল ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিদ্রোহী হইয়া গিয়াছিল। হযরত সায়াদ (রা) তাহাদিগকে তওবা করিয়া পুনরায় দ্বীন-ইসলাম কবুল করার আহবান জানাইয়া ছিলেন। তাহাদের অনেকেই তাহাই করে। যাহারা তওবা করিয়া দ্বীন-ইসলাম কবুল করিতে প্রস্তুত হয় নাই, তাহাদিগকে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁহার এই কাজের ফলে বাস্তবিকই বহুলোক উপকৃত হয় এবং বহু লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[১] ইহার মাধ্যমেই নবী করীম (স)-এর দোয়ার বাস্তবতা প্রকট হইয়া উঠে।

১. হাদীসের কথাঃ 'অতঃপর তোমার দ্বারা বহু লোক উপকৃত হইবে এবং অন্যান্য বহু লোক ক্ষতিগ্রস্থ হইবে' কথাটির একটি ব্যাখ্যা হইল, মুসলমান জনগণ তোমার নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া বিপুল পরিমাণ গণীমতের মাল-সম্পদ লাভ করিবে, আর বহু সংখ্যক মুশরিক তোমার হাতে নিহত পর্যুদস্ত হইয়া বিরাট ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। ইবনুত্তীন বলিয়াছেনঃ তাঁহার দ্বারা উপকৃত হওয়ার কথার তাৎপর্য হইল, হযরত সায়াদ (রা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কাদেসীয়া ইত্যাদি যুদ্ধে বিজয় লাভ। ইহা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। মূলত ইহা নবী করীম (স)-এর একটি বিস্ময়কর মু'জিজা। তিনি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বেই এই আগাম সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন আল্লাহ্র নিকট হইতে পাওয়া ইংগিতের ভিত্তিতে। (عمدة القارى)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেন, এই হাদীসটি যে সর্বোতভাবে সহীহ সে বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ সম্পূর্ণ একমত। ইহাতে অসীয়ত করার সে সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, ফিকাহবিদদের নিকট ইহাই অসিয়তের মৌল মানদণ্ড। আর তাহা হইল, মুমূর্ষ ব্যক্তির মালিকানাধীন ধন-সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মাত্র। ইহার অধিকের জন্য অসিয়াত করা কাহারও পক্ষেই জায়েয নয়। বরং উহারও কম পরিমাণের জন্য অসিয়ত করাই বিশেষজ্ঞদের মতে বাঞ্ছনীয়। ইমাম সওরী বলিয়াছেন, বিশেষজ্ঞদের মত হইল অসিয়তের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশের কম এক চতুর্থাংশ কিংবা এক পঞ্চমাংশ হওয়াই উচিত, উহার অধিক নহে। ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ একমত হইয়া বলিয়াছেন, মুমূর্ষ ব্যক্তির যদি উত্তরাধিকারী পুত্র সন্তান কিংবা পিতা-মাতা বা ভাই-চাচা থাকে, তাহা হইলে এক তৃতীয়াংশের অধিকের জন্য অসিয়ত করা কোন প্রকারেই জায়েয নয়। আর যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে হযরত ইবনে মাসউদের (রা) মতে সম্পূর্ণ সম্পত্তি অন্য কাহারও জন্য অসিয়ত করিয়া যাইতে পারে। হযরত আবূ মূসা, মসরুক, উবাইদা, ইসহাক, প্রমুখ ফিকাহবিদগণও এইমত সমর্থন করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত অপর একটি যয়ীফ হাদীস ইহার সমর্থনে উদ্ধৃত হইয়াছে। হাদীসটি হইল, নবী করীম (স) বলিয়াছেঃ

جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فِى الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ اَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِىْ اَعْمَالِكُمْ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ধন-মালের এক তৃতীয়াংশে অসিয়ত বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়া তোমাদের আমল সমূহে প্রাচুর্য ও আধিক্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। অতএব সন্তানদিগকে নিঃস্ব সর্বহারা করিয়া রাখিয়া না যাওয়ার জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালানো পিতার প্রধান কর্তব্য।

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম সমাজের কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহার ইয়াদাতের জন্য যাওয়া এবং রোগীর দীর্ঘজীবনের জন্য দোয়া করা ও উৎসাহ ব্যাঞ্জক কথা বলা সুন্নাত। ইহা ছাড়া জায়েয উপায়ে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা যে নাজায়েয নয়, তাহাও এই হাদীস হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

সন্তানদের প্রতি সমতাপূর্ণ আচরণ গ্রহণ

عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَ اِبْنًا لَهُ غُلاَمًا فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هٰذَا؟ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ.

(ترمذى، مسلم، بخارى، بيهقى)

নু'মান ইবনে বশীর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পিতা (বশীর) তাঁহার এক পুত্রকে একটি দাস দান করিলেন। অতঃপর তিনি নবী করীম (স)কে এই কাজের সাক্ষী বানাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার সব কয়জন সন্তানকেই কি এই রূপ (দাস) দান করিয়াছ? বশীর বলিলেন, না। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তাহা হইলে তোমার এই দাস প্রত্যাহার কর ও ফিরাইয়া লও। (তিরমিযী, মুসলিম, বুখারী, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা হাদীসের শব্দ نَحَلَ অর্থ দান করা, হেবা করা, কোন রূপ বিনিময় এবং কোন রূপ অধিকার ছাড়াই কাহাকেও কিছু দেওয়া। হযরত বশীর (রা) তাঁহার কোন সন্তানকে তাঁহার দাস দান

করিয়া রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিলেনঃ আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার এই দাসটিকে আমার এই সন্তানকে দান করিলাম। ইহার জওয়াবে রাসূলে করীম (স) যাহা বলিয়াছেন, তাহার বুখারী মুসলিমে উদ্ধৃত ভাষা হইলঃ

أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا

তুমি কি তোমার সমস্ত সন্তানকে এইরূপ দিয়াছ?

উত্তরে তিনি যখন বলিলেন—না, তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষা কর।

বুখারী মুসলিমের-ই অপর একটি বর্ণনায় রাসূলে করীম (স)-এর জওয়াবের ভাষা এইঃ

لَا أَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ

আমি জুলুম ও অবিচারের সাক্ষী হইবে না।

এই একই ঘটনার বিভিন্ন ভাষায় উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে হাদীসটির ব্যাপকতা অধিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত সন্তানদের মধ্যে বস্তুগত সামগ্রী দানের ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা পিতা-মাতার কর্তব্য। তাহা করা না হইলে—কাহাকেও বেশী কাহাকেও কম; কিংবা কাহাকেও দান করা ও কাহাকেও বঞ্চিত করা স্পষ্টরূপে জুলুম। ইহা কোনক্রমেই ইসলাম সম্মত কাজ নহে। ইমাম তিরমিযী উপরোদ্ধৃত হাদীসটির ভিত্তিতে বলিয়াছেন, দ্বীন-বিশেষজ্ঞগণ সন্তানদের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করাই পছন্দ করেন। এমনকি স্নেহ-বাৎসল্য ও দান-হেবা সর্বক্ষেত্রেই মেয়ে সন্তান ও পুরুষ সন্তানের মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব, বেশী কম বা অগ্রাধিকার ও বঞ্চনার আচরণ আদৌ করা যাইবে না।

পুত্র সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ ন্যায়পরতা ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য নবী করীম (স) বিশেষভাবে তাকীদ করিয়াছেন। এই পর্যায়ের হাদীসঃ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

(مسند احمد، ابن حبان)

নুমান ইবনে বশীর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা তোমাদের পুত্র সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত কর, তোমাদের পুত্র সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত কর, তোমাদের পুত্র সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত কর। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা এখানে উদ্ধৃত হাদীসটিতে শুধু পুত্র সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে ন্যায়পরতা, পক্ষপাতহীনতা ও পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবী করীম (স) পরপর তিনবার একই কথা বলিয়া তাকীদ দিয়াছন। একই কথা পর পর তিনবার বলার উদ্দেশ্য মূল বিষয়টির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ বুঝায়।

আর ইহারও পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসটিতে ولد শব্দ ব্যবহার করিয়া নবী করীম (স) শুধু পুত্র সন্তানদের মধ্যেই নয় বরং পুত্র কন্যা নির্বিশেষে সকল সন্তানের প্রতিই পূর্ণ সমতা ও নিরপেক্ষতা ভিত্তিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা দুনিয়ায় একমাত্র দ্বীন-ইসলামই সকল পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে ও ব্যাপারে সকলের প্রতি ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকামী একমাত্র জীবন বিধান। কুরআন মজীদে নিঃশর্ত ভাবে হুকুম হইয়াছেঃ

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى (المائده: ٨)

তোমরা সকলে সুবিচার ও পূর্ণ ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতা স্থাপন কর। কেননা তাহাই আল্লাহ্ ভয়ের অতীব নিকবর্তী নীতি।

অন্তরে ঈমান ও আল্লাহ্র ভয় থাকিলে উহার সহিত অতীব ঘনিষ্ঠ ও সামঞ্জস্যশীল আচরণ নীতি হইল পূর্ণ নিরপেক্ষ ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচার। এই ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে গোটা বিশ্ব ব্যবস্থা। অতএব মানুষের জীবন যাত্রায়—বিশেষ করিয়া পারিবারিক জীবনেও তাহা পুরামাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হইতে হইবে।

পারিবারিক জীবনে পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে পুত্র ও কন্যা সর্বতোভাবে অভিন্ন। সকলেরই দেহে একই পিতা-মাতার রক্ত প্রবাহমান। কাজেই স্নেহ-বাৎসল্য, আদর-যত্ন ও কর্ম সম্পাদনে এই সমতা-অভিন্নতা ও ন্যায়পরতা ও সুবিচার অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত থাকিতেই হইবে। ইহা এক বিন্দু লংঘিত হইলে গোটা পরিবার-পরিবেশ বিপর্যস্ত হইবে, বিনষ্ট হইবে পারিবারিক জীবনে যাবতীয় শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ।

অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির দিকে পিতা-মাতাকে সদা জাগ্রত ও অতন্দ্র প্রহরী হইয়া থাকিতে হইবে।

সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক্

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ. (ترمذى)

হযরত মুয়াবীয়া ইবনে হায়দাতা আল-কুশাইরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিলামঃ ইয়া রাসূল, আমার নিকট কে অধিক ভাল ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী? তিনি বলিলেনঃ তোমার মা। বলিলেন, আমি বলিলামঃ তাহার পর কে? বলিলেনঃ তোমার মা। বলিলেন, ইহার পর আমি বলিলামঃ তাহার পর কে? বলিলেনঃ তোমার মা। বলিলেন, ইহার পর আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলামঃ অতঃপর কে? বলিলেনঃ অতঃপর তোমার পিতা এবং তাহার পর যে অতি নিকটবর্তী, যে তাহার পর অতি নিকটবর্তী সে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা সাধারণভাবে সমাজের সমস্ত মানুষকে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্কের দুশ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধিয়া দেওয়ার খোদায়ী বিধান পর্যায়ে এই হাদীসটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে। নাসায়ী ও দারেমী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে। বায়হাকী ও বগাভী নিজ নিজ গ্রন্থে (এই হাদীসটি) উদ্ধৃত করিয়াছেন হযরত আয়েশা (রা) হইতে এবং তিরমিযীর গ্রন্থে অপর একটি স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে হযরত আবুদ দারদা (রা) হইতে। আবূ দায়ূদ গ্রন্থেও এই হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছ। হাদীসটির বর্ণনা যে কত ব্যাপক ও মজবুত সনদ ভিত্তিক, তাহা এই কথা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

মূল হাদীসের প্রশ্ন হইল مَنْ اَبَرُّ অর্থ اَلْبِرُّ অর্থ اَلْاِحْسَانُ 'ভাল ব্যবহার, সঠিক আচরণ, দয়া অনুগ্রহ ইত্যাদি। পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের হক বা অধিকার পর্যায়ে এই শব্দটি عقوق এর বিপরীত অর্থ সম্পন্ন। আর عُقُوْق শব্দের অর্থঃ পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের সহিত অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার বা দুর্ব্যবহার করা এবং তাহাদের অধিকার বিনষ্ট করা। (نهاية)

بر শব্দের আর একটি অর্থ হইলঃ صِلَةُ الرَّحِمِ 'ছিলায়ে রেহমী' করা। রক্ত সম্পর্ক সম্পন্ন লোকদের পরস্পরের উপর যে অধিকার ও কর্তব্য-দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাহা পুরাপুরি যথাযথভাবে ও মাত্রায় আদায় করা এবং এই সম্পর্কে লোকদের সহিত সর্বাধিক ভাল ব্যবহার করা, নম্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, আন্তরিকতা ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার গ্রহণই এই শব্দটির মৌলিক ভাবধারা। ইহার বিপরীত শব্দ قَطْعُ الرَّحِمِ রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাহাদের অধিকার আদায় না করা, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার ও অপমানকর ব্যবহার গ্রহণ। মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরার বর্ণনায় এই প্রশ্নটি তিন প্রকারের শব্দ সংযোজন ও বাক্য গঠনের মাধ্যমে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

প্রথম বর্ণনাঃ

مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ

লোকদের মধ্যে কোন্ লোক আমার উত্তম ও মহত সাহচর্য-সংস্পর্শ ও সহযোগিতা পাওয়ার অধিক অধিকার সম্পন্ন?

দ্বিতীয় বর্ণনায় এই বাক্যটি এই ভাষায় বর্ণিত ও উদ্ধৃতঃ

مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ

ইহাতে الناس শব্দটি নাই।

তৃতীয় বর্ণনায় আবার এই বাক্যের ভাষা হইলঃ

مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

এক হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনাটি একমাত্র মুসলিম শরীফেই এই রূপ বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য সংগঠনে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হাদীসটিতে উদ্ধৃত প্রশ্নের জওয়াবে একবার নয়—পর-পর তিনবার নবী করীম (স) একটি শব্দই বলিয়াছেন, তাহা হইল امك। 'তোমার মা'।

ইমাম নববী বলিয়াছেন, এই হাদীসে রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়া আনুপাতিকভাবে সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তির হক্ ও অধিকার আদায় করার জন্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভংগীতে তাকীদ জানানো হইয়াছে। এই দিক দিয়া—আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী—মা-ই সর্বাধিক ও সর্বাগ্রগণ্য অধিকারের মালিক। ইহার কারণ হইল, মা-ই সন্তান গর্ভে ধারণ, প্রসব, লালন-পালন, স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্ন দান ইত্যাদির ব্যাপারে সর্বাধিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। মা সন্তানকে যতটা স্নেহ যত্ন ও মায়া মমতা দেয় এবং যতবেশী খেদমত করে উহার সহিত অন্য কাহারও অবদানের কোন তুলনা হইতে পারে না। বস্তুত মা-ই যদি সন্তান গর্ভধারণ করিতে ও প্রসবের প্রাণান্তকর যন্ত্রণা সহ্য করিতে ও আদর যত্ন সহকারে শিশুকে লালন পালন করিতে প্রস্তুত না হইতেন—বরং তাহা করিতে অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এই দুনিয়ায় মানব বংশের রক্ষা পাওয়া ও লালিত পালিত হইয়া বড় হওয়া পরিণামে মানবংশের বিস্তার লাভ করা কখনই সম্ভবপর হইত না।

মা'র এই দুইটি বিরাট ও তুলনাহীন-দৃষ্টান্তহীন অবদানের কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। বলিয়াছেনঃ

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا (الاحقاف: ١٥)

মা সন্তানকে অতিশয় কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ ও বহন করিয়াছে। তাহাকে প্রসব করিয়াছেন প্রাণান্তকর কষ্ট সহকারে। এই গর্ভে ধারণ ও দুগ্ধ সেবন করানোয় ত্রিশটি মাস অতিবাহিত হইয়াছে।

অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰي وَهْنٍ (لقمان ١٤)

তাহার মা তাহাকে বহন করিয়াছে দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করিয়া।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে পিতামাতার প্রতি ভাল ব্যবহারের কথা বলা প্রসঙ্গে মার কথাই বলা হইয়াছে সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে।

রাসূলে করীম (স) তিন তিন বারের প্রশ্নের জওয়াবে কেবল মার অধিকারের কথাই বলিয়াছেন। ইহার কারণ হইল, তিনটি কাজ কেবল মাত্র মার-ই অবদান। তাহা হইল, গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসব যন্ত্রণা ভোগের কষ্ট এবং দুগ্ধ সেবন করানো—লালন পালন-করার কষ্ট। এই তিনওটি অত্যন্ত দুঃসহ ও প্রাণান্তকর কষ্ট। কাজে যে কষ্ট মাকে ভোগ করিতে হয়, তাহা কোন ভাষা দিয়া প্রকাশ বা বর্ণনা করা সম্ভব নয় এবং এই তিনওটি বড় বড় কষ্ট কেবল মাকেই ভোগ করিতে হয়। এই কষ্ট ভোগে তাহার সহিত অন্য কেহ শরীক থাকেনা।

কিন্তু কেবল মার অধিকারের কথা বলিয়াই হাদীসটি শেষ করা হয় নাই। ইহার পর আরও দুইটি অধিকারের কথা বলা হইয়াছে। তাহা হইল মার পরে পরেই সর্বাধিক অধিকার হইতেছে পিতার। কেননা মা'র উপরোক্ত তিনওটি কাজ তিনও পর্যায়ের কষ্ট স্বীকার সম্ভব হয় পিতার বাস্তব সাহায্য সহযোগিতা ও আনুকূল্যের ফলে। এই ক্ষেত্রে পিতার অবদান কোন অংশে কম নয়। কেননা মা'র পক্ষে উক্ত কাজ সমূহের কোন একটি কাজও পিতা ছাড়া সম্ভব নয়। পিতা না হইলে মা'র গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন-পালন, দুগ্ধ সেবন করানোর কোন প্রশ্ন উঠিতে পরে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মা'র বিশেষ অবদানের কথা স্বতন্ত্র গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিলেও কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অধিকার ও পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য একটি শব্দে ও একই সঙ্গে বলিয়াছেন।

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করার চূড়ান্ত ফরমান দেওয়ার পরই বলিয়াছেন পিতা-মাতার প্রতি 'ইহসান' করার কথা।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ (٢٣)

তোমার রব্ ফরমান জারী করিয়াছেন যে, তোমরা কেবল মাত্র তাঁহারই বন্দেগী করিবে—তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও দাসত্ব করিবে না এবং পিতা-মাতার সহিত খুবই উত্তম ব্যবহার ও আচরণ অবলম্বন করিবে।

সূরা লুকমানএ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে ও ভাষায় বলিয়াছেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ (١٤)

মানুষকে তাহার পিতা-মাতার ব্যপারে শক্ত বিধান পালনের নির্দেশ দিয়াছি। অতএব তুমি শোকর করিবে আমার এবং তোমার পিতা-মাতার, শেষ পরিণতি তো আমার নিকটই হইবে।

এই আয়াতেও প্রথমে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার পরই এক সঙ্গেই পিতা-মাতার শোকর আদায় করিতে বলা হইয়াছে। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলার চূড়ান্ত ফরমান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মা'র অধিকার পিতার তুলনায় অধিক হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। হারেস আল-মুহাসিবী বলিয়াছেনঃ

اجماع العلماء على ان الام تفضل فى البر على الاب

পিতার তুলনায় মা'র ভাল ব্যবহার পাওয়ার অধিক অধিকারী হওয়া সম্পর্কে সমস্ত শরীয়াতবিদ

সম্পূর্ণ একমত। তবে কেহ কেহ দুইজনার অধিকার সমান বলিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের দৃষ্টিতে তাহা ঠিক নয়।

কিন্তু ব্যক্তির উপর কেবল পিতা-মাতারই হক্ থাকে না, হক্ থাকে অন্যান্য নিকটাত্মীয়দেরও। এই পর্যায়ে অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালনে একটি মূলনীতি ও ফর্মূলা স্বয়ং নবী করীম (স) বলিয়াছেন। তাহ হইল اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ রক্ত সম্পর্কে যে প্রথম নিকটাবর্তী সে এই দিক দিয়াও নিকটবর্তী, যে তাহার পর নিকটবর্তী, সে এই দিকদিয়া অতঃপর নিকটবর্তী। এইভাবে সমাজের সমস্ত মানুষকে পরস্পরের সাথে আত্মীয়তা এবং অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালনের বন্ধনে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সমাজে এই সম্পর্ক পুরাপুরি রক্ষিত হয় এবং অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালন যথাযথভাবে পালন করা হয়, সে সমাজ যে শান্তি ও সুখের সমাজ হইবে এবং এই সমাজের মানুষও যে সর্বাধিক সুখী মানুষ হইযে, তাহাতে কি একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ আছে?

বস্তুত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধানের মানসিকতা ও সর্বাধিক কল্যাণকরতার বৈশিষ্ট্য এই দৃষ্টিতেই বিচার্য। (نبوی، تحفة الاحوذی)

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ (ترمذى، ابن حبان، حاكم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হযরত নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি জন্মদাতার সন্তুষ্টিতে নিহিত এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও রোষ জন্মদাতার রোষ-অসন্তুষ্টিতে নিহিত। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

ব্যাখ্যা হাদীসটির বক্তব্য সুস্পষ্ট। পিতা সন্তুষ্ট হইলে আল্লাহ্‌ও সন্তুষ্ট হন এবং পিতা অসন্তুষ্ট হইলে আল্লাহ্‌ও অসন্তুষ্ট হন, ইহাই হাদীসটির কথা ও ঘোষণা।

হাদীসের শব্দ الوالد অর্থ সাধারণতঃ পিতা। এই হাদীসে শুধু পিতার কথা বলা হইয়াছে, অথচ মা'র অধিকার সর্বাগ্রগণ্য, ইহা কিরূপ কথা?

ইহার জওয়াবে বলা যায়, এই হাদীসটিতে যদি শুধু পিতার কথাই বলা হইয়া থাকে এবং মার কথা নাও বলা হইয়া থাকে, তবুও তাহাতে কোন দোষ নাই। কেননা পিতার মর্যাদা সন্তানের নিকট যদি এতটা নাজুক হইয়া থাকে, তাহা হইলে মা'র মর্যাদা সন্তানের নিকট ইহা হইতেও অনেক গুণ—অতন্তঃ তিনগুণ—বেশী হইবে, তাহা তো এই হাদীস হইতেই বুঝা যায়।

কিন্তু মূল কথায় রাসূলে করীম (স) শুধু পিতার কথা বলিয়াছেন এমন মনে হয় না। বরং তিনি পিতা-মাতা উভয়ের কথাই বলিয়াছেন, এই কথা বিশ্বাস করার অনেক কারণ আছে। বিশেষ করিয়া এই হাদীসটিরই যে বর্ণনা তাবারানী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পিতা-মাতা উভয়ের কথাই আছে। উহার ভাষা এইঃ

رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِىْ سَخَطِهِمَا

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতা-মাতা দুইজনের সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ্‌র রোষ-অসন্তুষ্টি পিতা-মাতা উভয়ের অসন্তুষ্টিতে নিহিত।

কিন্তু কেন এই কথা? আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির সহিত পিতা মাতার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির এই গভীর সম্পর্ক এবং প্রথমটির দ্বিতীয়টির উপর এই নির্ভরশীলতার মূল কারণ কি?

ইহার কারণ হইল, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ নিষেধ পালন করিলে যে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে অমান্য-অগ্রাহ্য করিলে যে তিনি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন ইহা তো সকলেরই জানা কথা। আর ইহাই যদি জানা কথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কথাটুকুও জানিয়া রাখা উচিত যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই পিতা-মাতার হক্ আদায় করিতে ও সম্মান শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আদেশ দিয়াছেন। এমতাবস্থায় যে লোক পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন করিবে—ইহা আল্লাহ্‌র আদেশ মনে করিয়া, সে ঠিক আল্লাহ্‌রই আদেশ পালন করিল এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের কারণ সৃষ্টি করিল। পক্ষান্তরে যদি

কেহ পিতা-মাতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিল—আল্লাহর নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সে কেবল পিতা-মাতারই অপমান করিল না, সে আল্লাহ্‌রও অমান্য করিল। কাজেই সে অবস্থায় যে আল্লাহ্‌র রোষ-অসন্তুষ্টি বর্ষিত হইবে, তাহা কে রোধ করিবে?......... কাজেই রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটিতে একটি কঠোর কঠিন সতর্কবাণী—অশুভ অকল্যাণের ঘোষণা—উচ্চারিত হইয়াছে। ইহাপেক্ষা কঠোর কঠিন বাণী আর কিছুই হইতে পারে না।

হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ (ترمذى، مسند احمد)

পিতা (এবং মাতাও) জান্নাতের দরজা সমূহের মাধ্যম।

মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনায় اَلْوَالِدُ এর পরিবর্তে اَلْوَالِدَةُ শব্দটি বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার এবং উহাতে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করার সর্বোত্তম অসীলা ও উপায় হইতেছে পিতা-মাতা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, জান্নাতের বহু কয়টি দরজা পথ আছে। প্রবেশ করার জন্য উহাদের মধ্যে সর্বোত্তম দ্বার-পথ হইল মধ্যবর্তী দরজা। আর এই মধ্যবর্তী দ্বারপথে প্রবেশ লাভের প্রধান উপায় হইল পিতা-মাতার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা। এই কারণে পিতা-মাতার অধিকার হরণ ও তাহাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা ও তাহাদের প্রতি অমর্যাদা দেখানো—রাসূলে করীম (স)-এর ঘোষণা মতে—কবীরা গুনাহ। রাসূলে করীম (স) সাহাবীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ

اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ (ترمذى، ابوداؤد)

কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে অধিক বড় গুনাহ কোনটি তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিব? সাহাবীগণ বলিলেন হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদিগকে বলুন। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ তাহা হইলঃ আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করা এবং পিতা-মাতার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ, অধিকার অনাদায় ও দুর্ব্যবহার করা।

عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ইসলামী বিধানের একটা বিশেষ পরিভাষা। ইহার অর্থঃ সন্তানের এমন সব কাজ করা বা কথা বলা কিংবা আচরণ গ্রহণ করা, যাহার ফলে পিতা-মাতা মনে ও দেহে কোন রূপ কষ্ট পায়।

হযরত মুগিরা ইবনে শুবা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ عُقُوقُ الْاُمَّهَاتِ (بخارى، مسلم)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মা (সেই সঙ্গে পিতা)র সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ও দুর্ব্যবহারের অপরাধ করাকে হারাম করিয়া দিয়াছেন। (বুখারী, মুসলিম)

পিতা-মাতার সহিত দুর্ব্যবহার, সম্পর্কচ্ছেদ ও অধিকার আদায় না করার আচরণের পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে আরও কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। হযরত আবূ বাকরাতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَاشَاءَ اِلاَّ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يَجْعَلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ (مشكوة)

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ সমস্ত গুনাহ-ই এমন যে, তাহা হইতে আল্লাহ্ যাহা এবং যতটা ইচ্ছা মাফ করিয়া দিবেন। কিন্তু পিতা-মাতার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করণ, দুর্ব্যবহার করা, অধিকার আদায় না করার গুনাহ তিনি মাফ করিবেন না। বরং যে লোক এই গুনাহ করে তাহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পূর্বেই তাহার শাস্তি ত্বরান্বিত করেন। (মিশকাত)

এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি অবশ্যই স্মার্তব্য; আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (بنیاسرائیل: ۲۳-۲٤)

তুমি তাহাদের (পিতা-মাতার) জন্য উহ্ বলিও না। তাহাদের দুই জনকে ভর্ৎসনা করিও না। তাহাদের দুইজনের জন্য সর্বদা দয়ার্দ্র হৃদয়ে বিনয়ের হস্ত অবনত করিয়া রাখ এবং বলঃ হে রব্! এই দুইজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেমন তাহারা দুইজন আমাকে বাল্যাবস্থায় লালন পালন করিয়াছেন।

আল্লামা কুরতুবী এই আয়াতটির তাফসীরে এই পর্যায়ের কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলে করীম (স) কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বান্দাহর কোন্ কাজ অধিক প্রিয়, পছন্দনীয়"

নবী করীম (স) বলিলেনঃ اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا সময় মত ফরয নামায আদায় করা। জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহার পর কোন্ টি? নবী করীম (স) বলিলেনঃ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ অতঃপর পিতা মাতার সহিত ভাল-সম্ভ্রমপূর্ণ আচার আচরণ অবলম্বন।

এই হাদীসে নবী করীম (স) বলিয়াছেন, ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নামাযের পরই পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব।

পরিভাষা হিসাবে بِرُّ الْوَالِدَيْنِ এরই বিপরীত অর্থজ্ঞাপক শব্দ হইল عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ—হাদীস অনুযায়ী পিতা-মাতাকে গালাগাল করা عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ এর অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যতম কবীরা গুনাহ। একজন সাহাবী বলিলেন هَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ইয়া রাসূল! পিতা-মাতাকেও কি কোন লোক গালাগাল করে? তিনি জওয়াবে বলিলেনঃ نَعَمْ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ হ্যাঁ, একজন লোক অপর এক লোকের পিতাকে গাল দেয়, তখন সে-ও তাহার পিতাকে গাল দেয়, একজন অপর জনের মা'কে গাল দেয়, সেও তাহার মা কে গাল দেয়। আর এই ভাবেই একজন তাহার নিজের পিতা-মাতাকে গালাগাল করে।

পিতা-মাতার বৈধ ইচ্ছা-বাসনার বিরুদ্ধতা করা عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ-এর মধ্যে গণ্য। যেমন তাহা পূরণ করা ও পিতা-মাতার কথা মত কাজ করা بِرُّ الْوَالِدَيْنِ এর মধ্যে গণ্য।

আলোচ্য হাদীস সমূহ এবং এই পর্যায়ের আরও বহু হাদীস উপরোক্ত আয়াতটিরই ব্যাখ্যা মাত্র। উক্ত আয়াতের ভিত্তিতেই নবী করীম (স) এই সব কথা ইরশাদ করিয়াছেন। অতএব কুরআন ও হাদীস যে পরস্পর সম্পৃক্ত, ওতোপ্রোত জড়িত তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকে না।

(الجامع لاحكام القران للقرطبى)

পিতা-মাতার খেদমত জিহাদ অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

(بخارى، مسلم، مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট জিহাদে যোগদান করার অনুমতি চাহিল। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে কি? লোকটি বলিল, জ্বি হ্যাঁ, তাহারা দুই জনই জীবিত আছেন। তখন নবী করীম (স) বলিলেন, তাহা হইলে সেই দুইজনের খেদমতে জিহাদ করার কাজে নিযুক্ত থাক। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা 'জিহাদ' শব্দের অর্থ কোন উদ্দেশ্যের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া চরম প্রচেষ্টা চালানো। দ্বীন-ইসলামের প্রাচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া চালানো হয়, ইসলামী পরিভাষায় তাহাকেই জিহাদ বলা হয়। ফিকাহর ফয়সালা অনুযায়ী জিহাদের কাজ মুসলমানদের জন্য ফরয হইলেও এই কাজে অন্যান্য বহু লোক নিয়োজিত থাকিলে তখন অন্যান্য মুসলমানদের জন্য উহা 'ফরযে কেফায়া' পর্যায়ের হইয়া যায়। এই সময় কাহারও পিতা-মাতা যদি বৃদ্ধ অক্ষম হয়, তাহা হইলে বিশেষ করিয়া এই অবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করা সন্তান বিশেষ করিয়া পুত্র সন্তানের উপর 'ফরযে আইন' হইয়া যায়। রাসূলে করীম (স)-এর নিকট লোকটি জিহাদে যোগদানের অনুমতি চাহিলে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, লোকটির পিতা-মাতা জীবিত তখন হয়ত তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই লোকটির জিহাদে যোগদান অপেক্ষা বৃদ্ধ-অক্ষম ও সন্তানের খেদমতের মুখাপেক্ষী পিতা-মাতার খেদমতে নিযুক্ত থাকা-ই উত্তম এবং জরুরী। তাই তিনি তাহাকে নির্দেশ দিলেনঃ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ তোমার পিতা-মতার খেদমতেই তুমি জিহাদ কর—সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া যাও। অর্থাৎ জিহাদের তুলনায় পিতা-মাতার খেদমতে লাগিয়া থাকা-ই তোমার অধিক কর্তব্য। বস্তুত ইহা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। নবী করীম (স) জিহাদে লোক নিয়োগ কালে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া কাহার জিহাদে যাওয়া উচিত, কাহার ঘরে থাকিয়া পিতা-মাতার খেদমত করিয়া যাওয়া উচিত এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা গ্রহণ করিতেন। সেই অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে ইহাও একটি। বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে এই হাদীসটি এ ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ

এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে বলিলেনঃ আমি জিহাদ করিব। রাসূলে করীম (স) তাহাকে জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেনঃ তোমার পিতা-মাতা আছে? লোকটি বলিলেন হ্যাঁ। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ 'তাহা হইলে তুমি সেই দুইজনের খেদমতে নিয়োজিত থাকিয়া জিহাদ কর।

তাবারানী উদ্ধৃত একটি হাদীসের ভাষা এইরূপঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ الرَّسُوْلُ هَلْ أُمُّكَ حَيَّةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَلْزِمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ

এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল এবং বলিলঃ আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। রাসূলে করীম (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার মা কি জীবিত? লোকটি বলিলেন, হ্যাঁ, তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তাহার পায়ে লাগিয়া থাক। সেখানেই জান্নাত অবস্থিত।

পায়ে লাগিয়া থাকা অর্থ, তাহার খেদমতে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত থাকা।

অপর একটি বর্ণনায় আলোচ্য হাদীসটির ভাষা এইরূপঃ

أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ فَارْجِعْ إِلٰى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا. (مسلم عن عبد الله بن عمر وبن العاص)

একটি লোক রাসূলে করীম (স)-এর দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলঃ আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের 'বয়আত' করিতেছি। ইহা করিয়া আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে শুভ পূণ্যফল পাইতে চাহি। বলিলেনঃ অতঃপর তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং পরে তাহাদের দুইজনের উত্তম সাহচর্য অবলম্বন কর।

কিন্তু মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে এই হাদীসটি যে ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে এই পর্যায়ের সমস্ত কথা স্পষ্ট হইয়া যায়। হাদীসটি এইঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِئْتُ لِأُبَايِعُكَ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا وَأَبٰى أَنْ يُّبَايِعَهُ

'একটি লোক' নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন, অতঃপর বলিলেনঃ আমি আপনার নিটক বায়আত করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। আমি আমার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও এবং তুমি তাহাদিগকে যেমন কাঁদাইয়াছ, তেমনি গিয়া হাসাও। আর তিনি তাহাকে বায়আত করিতে অস্বীকার করিলেন।

লোকটি কিসের বায়আত করিতে আসিয়াছিল, উপরোক্ত বর্ণনার ভাষায় তাহার উল্লেখ নাই। তবে আবূ দায়ূদ ও মুসনাদে আহমাদের অপর এক বর্ণনায় اَلْهِجْرَةُ শব্দটির উল্লেখ হইয়াছে। আর এই হিজরাতও যে জিহাদেরই উদ্দেশ্যে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইমাম খাত্তাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ

اَلْجِهَادُ إِذَا كَانَ الْخَارِجُ فِيْهِ مُتَطَوِّعًا فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَيَجُوْزُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ فَأَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجِهَادِ فَلاَ حَاجَةَ بِهِ إِلٰى إِذْنِهِمَا

জিহাদের উদ্দেশ্যে যে লোক ঘর-বাড়ি ও আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া বাহির হইয়া দূরে চলিয়া যায়, তাহা যদি তাহার জন্য নফল পর্যায়ের হইয়া থাকে, তাহা হইলে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত ইহা জায়েয হইবে না। কিন্তু এই জিহাদ যদি ফরযে আইন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাতে যাওয়ার জন্য পিতা-মাতার অনুমতির অপেক্ষা রাখার প্রয়োজন হইবে না। (معالم السنن)

এই সব হাদীসের ভাষা ও বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মূল কথা ও প্রতিপাদ্য এক ও অভিন্ন। আর তাহা হইল, পিতা-মাতার খেদমতে নিযুক্ত থাকার বিরাট ফযীলত—মর্যাদা, গুরুত্ব ও সওয়াব আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক স্বীকৃত এবং উচ্চস্বরে বিঘোষিত। উপরন্তু অবস্থা বিশেষে ইহা জিহাদের তুলনায়ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। বিশেষজ্ঞগণ এই সব হাদীসের ভিত্তিতেই বলিয়াছেন, পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যোগদান করা জায়েয নয়, অবশ্য যদি সে পিতা মাতা মুসলিম—ইসলামী মতানুসারী হয়। অন্যথায় এই কাজের অনুমতি লওয়ার কোন শর্ত নাই। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ফিকাহবিদরা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ইহাও সেই সময়ের কথা, যখন জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সাধারণ নির্দেশ দেওয়া ও সেজন্য আহবান জানানো হয় নাই। যদি সে রূপ আহবান জানানো হয় ও নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকেই জিহাদে যোগদান করিতে হইবে। (نبوى، معالم السنن، بلوغ الامانى)

সিলায়ে রেহমীর গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحْمُ فَقَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَذَاكَ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا. (مسلم)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কাজ হইতে যখন অবসর পাইলেন, তখন রিহম্ দাঁড়াইয়া গেল। বলিলঃ ইহা বিচ্ছিন্নতা ও কর্তন হইতে পানাহ চাওয়ার স্থান। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ হ্যাঁ, তুমি কি সন্তুষ্ট হইবে না এই ব্যবস্থায় যে, আমি সম্পর্ক রাখিব সেই ব্যক্তির সহিত যে তোমাকে রক্ষা করিবে এবং আমি সম্পর্ক কর্তন করিব সেই ব্যক্তির সহিত যে তোমাকে কর্তন করিবে? রিহ্ম বলিলঃ হ্যাঁ অবশ্যই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিলেনঃ তোমার জন্য ইহাই করা হইবে। এই কথা বলার পর রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তোমরা ইচ্ছা করিলে কুরআনের (সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৪ দ্রষ্টব্য) এই আয়াত পাঠ কর। এখানে তোমাদের হইতে ইহাপেক্ষা আরও কিছুর আশা করা যায় কি যে, তোমরা যদি উল্টা মুখে ফিরিয়া যাও তাহা হইলে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে এবং রিহমকে কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিবে?...... ইহারা সেই লোক, যাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে তিনি বধির করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই লোকেরা কি কুরআন মজীদ চিন্তা-গবেষণা করে নাই, কিংবা দিল সমূহের উপর উহার তালা পড়িয়া গিয়াছে? (মুসিলম)

ব্যাখ্যা রেহ্ম—'রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা' রক্ষা সম্পর্কে ইহা একটি অতিশয় মহিমান্বিত বিরাট গুরুত্ব সম্পন্ন হাদীস। এই হাদীসে 'রেহম'কে শরীরী ও দেহসত্তা সম্পন্নরূপে পেশ করা হইয়াছে। কাযী ইয়ায বলিয়াছেন, 'রেহম'—যাহা রক্ষা করা হয় কিংবা ছিন্ন ও কর্তন করা হয়—একটি অশরীরী বিষয়, ইহার কোন দেহ-সত্তা নাই। ইহা বলিতে বুঝায়, সম্পর্ক ও বংশীয় আত্মীয়তার নৈকট্য। ইহার সূচনা হয় মা'র 'রেহেম'—গর্ভাধার হইতে। সম্পর্কের ইহা কেন্দ্রস্থল। এই দিক দিয়া যে সব লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক যথাযথ রক্ষা করা ও উহার হক্ ও অধিকার গুরুত্ব সহকারে আদায় করিতে থাকাই হইল 'সিলায়ে রেহ্মী' রক্ষা করা।

এই অশরীরী ও বিদেহী সত্তা সম্পর্কে 'দাঁড়ানো ও কথা বলা'র কথা অবান্তর—অকল্পনীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অত্র হাদীসে এবং ইহার ন্যায় আরও বহু কয়টি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ রেহেম দাঁড়াইল, কথা বলিল। মূলত ইহা রূপক পর্যায়ের কথা। আরবী ভাষায় ইহার ব্যাপক প্রচলন প্রাচীনকাল হইতে

একাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এখানে এইরূপ বলার উদ্দেশ্য, উহার মাহাত্ম্য, বিরাটত্ব ও অতিশয় গুরুত্ব বুঝানো মাত্র। যে ইহার হক্ আদায় করে তাহার বিশেষ মর্যাদা এবং যে ইহা কর্তন ও ছেদন করে তাহার বিরাট গুনাহ্ ও পাপের কথা বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছে এইরূপ বলিয়া। 'রেহম সম্পর্ক ছেদন' করাকেই বলা হয় عَقٌّ কিংবা عُقُوقٌ। প্রথমটি এক বচন, দ্বিতীয়টি বহু বচন। ইহার অর্থঃ الشَّقُّ। দীর্ণ করা, ছেদন করা। যে ইহা করে সে রেহম সম্পর্কে জড়িত। মানুষগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে 'সিলায়ে রেহমী' না করিয়া 'কেতে রেহমী' করিল (অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কের দাবি পূরণ করিল না।)

'রেহম দাঁড়াইল ও বলিল' এই কথাটির এ তাৎপর্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, একজন ফেরেশতা দাঁড়াইয়া গেলেন ও আল্লাহ্র আরশ ধরিয়া রেহম সম্পর্কের হক্ আদায় করা সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জওয়াবে সেই সব কথা বলিলেন, যাহা মূল হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে। صِلَةٌ শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য হইল اَللُّطْفُ وَالرَّحْمَةُ 'নম্রতা, দয়া, অনুগ্রহ আর আল্লাহ্র صِلَةٌ করার অর্থঃ দয়া করা, অনুগ্রহ করা সেই লোকের প্রতি, যে রেহেম সম্পর্ক রক্ষা করে ও উহার হক্ আদায় করে। তিনি তাহার প্রতি নানা ভাবে অনুগ্রহ দেন, নিয়ামত দান করেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ্র উচ্চতর মালাকূতী জগতের সহিত তাহার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কথাও ইহাতেই নিহিত আছে। আল্লাহ্র গভীর পরিচয় লাভ এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করা এই লোকের পক্ষেই সম্ভব। ইহাও এই তাৎপর্যের অংশ।

কাযী ইয়ায ইহাও বলিয়াছেন যে, 'সিলায়ে রেহমী' করা ওয়াজিব এবং উহা ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। এই পর্যায়ে শরীয়াত অভিজ্ঞ সমস্ত মনীষী সম্পূর্ণ একমত। এ বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তাহা সবই একবাক্যে এই কথাই বলে। তবে 'সিলায়ে রেহমী'র বিভিন্ন পর্যায় আছে এবং এক একটি পর্যায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। একটি অপরটির তুলনায় উচ্চতর ও অধিক গুরুত্বশীল। ইহার প্রাথমিক ও নিম্নতম পর্যায়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা হইতে বিরত থাকা, অন্ততঃ পরস্পরে কথা-বার্তা ও সালাম-কালাম জারী রাখা। শক্তি-ক্ষমতা ও প্রয়োজনের বিচারেও ইহার গুরুত্ব বিভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। কখনও ইহা রক্ষা করা ওয়াজিব হয়, কখনও মুস্তাহাব। তবে ইহার কিছুটা পরিমাণও রক্ষা করা হইলে এবং প্রয়োজন পরিমাণ রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে 'সিলায়ে রেহমী' কর্তন করিয়াছে এমন বলা যাইবে না। তবে সে তাহা রক্ষা করিয়াছে, এইরূপ বলারও কারণ নাই।

সিলায়ে রেহমী—যা রক্ষা করা ওয়াজিব—তাহার সীমা কতটা বিস্তীর্ণ, এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রেহম সম্পর্কের দিক দিয়া যত লোকের পারস্পরিক বিবাহ হারাম, সেই সবের মধ্যে সিলায়ে রেহমী রক্ষা করা ওয়াজিব। অতএব চাচাতো, ফুফাতো, খালাতো ভাই-ভগ্নি এই পর্যায়ে নয়। একজন মেয়ে লোক এবং তাহার ফুফি বা খালাকে একত্রে একজনের স্ত্রীরূপে গ্রহণ জায়েয না হওয়ার অন্যতম দলীল হইতেছে এই হাদীস।

কাহারও কাহারও মতে মীরাসী আইনে 'যবীল-আরহাম' বলিতে যত লোককে বুঝানো হইয়াছে, এই পর্যায়ে তাহারা সকলেই গণ্য।

নবী করীম (স) এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের যে আয়াতটি দলীল রূপে উল্লেখ করিয়াছেন উহা সূরা মুহাম্মাদ-এর ২২, ২৩ ও ২৪ আয়াত। এই আয়াতে কেতে রেহমী করাকে হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুরআন মজীদের আরও বহু কয়টি আয়াতে ইতিবাচকভাবে সিলায়ে রেহমী করার—আত্মীয়-স্বজনের সহিত ভাল ব্যবহার করার ও তাহাদের হক্ আদায় করার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ও উহার বড় সওয়াবের কথা বলা হইয়াছে। নবী করীম (স) কথা প্রসঙ্গে এই আয়াত পাঠ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, তিনি রেহেম সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের কথা নয়। ইহা কুরআনের—আল্লাহ্র কথা। কুরআন চিন্তা গবেষণা করিলেই এই সব কথা জানা যায়। বস্তুত হাদীস যে এক হিসাবে কুরআনের তাফসীর এবং হাদীস না পড়িলে কুরআনের সঠিক মর্ম বুঝা যায় না, উপরন্তু হাদীস যে কোন ভিত্তিহীন জিনিস নয়, উহা কুরআন হইতেই উৎসারিত, এই হাদীস হইতে তাহা অকাট্যভাবে বুঝিতে পারা যায়। (نبوی)

মৃত পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

عَنْ اَبُوْاَسِيْدَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ عَلَىَّ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَىْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّهُمَا بِهِ قَالَ نَعَمْ خِصَالٌ اَرْبَعَةٌ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَا رَحْمَ لَكَ اِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَهُوَ الَّذِىْ بَقِىَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا. (ابوداؤد، ابن ماجه، مسند احمد)

হযরত আবূ আসীদ মালিক ইবনে রবীয়াতা আস-সায়েদী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট বসা ছিলাম, এই সময় আনসার বংশের একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর বলিলঃ ইয়া রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাহাদের সহিত সিলায়ে রেহমী ও ভাল ব্যবহার করার এমন আর কোন কাজ অবশিষ্ট থাকিয়া গিয়াছে কি যাহা আমি করিতে পারি? রাসূলে করীম (স) জবাবে বলিলেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই করার মত কাজ আছে এবং তাহা মোটামুটি চারটি ভাগের কাজ। তাহা হইলঃ তাহাদের দুইজনের জন্য পরিপূর্ণ রহমতের জন্য দোয়া করিতে থাকা ও তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাওয়া, তাহাদের দুইজনের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পূরণ ও কার্যকর করা, তাহাদের দুইজনের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সেই রেহম সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলা যাহা তাহাদের দুইজনের সম্পর্কের দিক ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়া তোমার উপর বর্তায় না।.... তাহাদের দুইজনের মৃত্যুর পর তাহাদের জন্য করণীয় শুভ আচরণের মোটামুটি এই কয়টি কাজই অবশিষ্ট থাকে।

(আবূ দায়ূদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার ও তাহাদের অধিকার আদায় করা সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্য কেবল মাত্র তাহাদের জীবন্তকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে। তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের প্রতি করণীয় কর্তব্য নিঃশেষ হইয়া যায় বলিয়া মনে করা যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহা এই হাদীস হইতে স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। মুসনাদে আহমাদ উদ্ধৃত হাদীসটির ভাষায় এই কথা জানা গিয়াছে জনৈক আনসার ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলে করীম (স)-এর বলা কথা হইতে। কিন্তু আবূ দায়ূদ ও ইবনে মাজার উদ্ধৃত বর্ণনায় مِنَ الْاَنْصَارِ -এর পরিবর্তে مِنْ بَنِىْ سِلْمَةَ বলা হইয়াছে। ইহাতে মূল কথায় কোনই পার্থক্য হয় না। শুধু এতটুকুই পার্থক্য হয়, এই বর্ণনানুযায়ী প্রশ্নকারী আনসার বংশের নয়, সালেমা বংশের।

রাসূলে করীম (স)-এর জওয়াব হইতে জানা গেল, পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও সন্তানের পক্ষে তাহাদেরই জন্য চারটি কাজ করণীয় রহিয়াছে। প্রথমঃ

اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا

তাহাদের দুইজনের জন্য পরিপূর্ণ রহমতের দোয়া করা এবং তাহাদের দুই জনের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট গুনাহ্ মাফ চাওয়া।

এখানে اَلصَّلٰوةُ। অর্থ 'রহমতে কামেলা'—পরিপূর্ণ রহমত নাজিল হওয়ার জন্য দোয়া করা। সম্ভবত এই দোয়াই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে শিক্ষা দিয়াছেন এই বলিয়াঃ

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

হে রব্ব! পরোয়ার দিগার, আমার পিতা-মাতা দুই জনের প্রতি রহমত নাযিল কর ঠিক তেমনই যেমন তাহারা দুই জনে মিলিত হইয়া আমার শৈশব অবস্থায় থাকাকালে আমাকে লালন-পালন করিয়াছে।

দ্বিতীয় কাজ হইলঃ اِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا 'পিতা-মাতা দুইজনের করা ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পরিপূরণ ও কার্যকর করণ'। পিতা-মাতা তাহাদের জীবদ্দশায় কাহারও সহিত কোন ভাল কাজের ওয়াদা করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু জীবনে বাঁচিয়া থাকা অবস্থায় তাহারা নিজেরা তাহা পূরণ করিয়া যাইতে পারে নাই। এইরূপ ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পরিপূরণ সন্তানের দায়িত্ব। পিতা-মাতার গ্রহণ করা ঋণও এই পর্যায়ের জিনিস। কেননা তাহাও তো তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল ফিরাইয়া দিবার ওয়াদা করিয়া। কিন্তু জীবদ্দশায় তাহা তাহারা ফিরাইয়া দিয়া যাইতে পারে নাই।

তৃতীয় হইল, পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অন্য একটি হাদীসে এই পর্যায়ে নবী করীম (স) এই কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُّوَلِّىَ

পিতা-মাতার চলিয়া যাওয়া ও সন্তানের তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর পিতা-মাতার বন্ধু পরিবার ও ব্যক্তিদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলা পিতা-মাতার সহিত সিলায়ে রেহমী করার অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

স্বয়ং নবী করীম (স) তাঁহার প্রথম বেগম হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা (রা)-এর আত্মীয়-স্বজনের সহিত তাঁহার ইন্তেকালের পরও সিলায়ে রেহমী রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ইহা তাঁহার আমল। তাহা হইলে পিতার বন্ধুদের সহিত যে অতি জরুরী ভাবে সিলায়ে রেহমী রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

আর চতুর্থ হইল, কেবল মাত্র পিতা-মাতার দিক দিয়া ও পিতা-মাতার কারণে যাহাদের সহিত রেহমী সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাদের সহিত সিলায়ে রেহমী করিয়া যাওয়া।

এই হাদীসটি ইবনে হাব্বান ও তাঁহার সহীহ হাদীস গ্রন্থেও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে শেষে একটু বেশী কথা রহিয়াছে। তাহা হইলঃ

قَالَ الرَّجُلُ مَا اَكْثَرَ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَطْيَبَهُ قَالَ فَاعْمَلْ بِهِ

রাসূলে করীম (স)-এর কথা শুনার পর লোকটি বলিলঃ এই কাজগুলি তো খুব বেশী নয় বরং ইহা অতীব উত্তম কাজ। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তাহা হইলে তুমি এই অনুযায়ী আমল করিতে থাক। (بلوغ الاماني)

রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত কথা হইতে তাঁহার নেতৃত্বে গঠিত সমাজের বৈশিষ্ট ও বিশেষত্ব স্পষ্ট বুঝা যায়। সে সমাজের লোকদের পারস্পরিক শুভেচ্ছা পোষণ, ওয়াদা প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ, পারস্পরিক বন্ধুতা-প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন এবং রক্ত সম্পর্কের হক আদায় করা এবং উহার অব্যাহত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। একজন মরিয়া গেলে তাহার জীবদ্দশায় এই পর্যায়ের কৃত যাবতীয় কাজ বন্ধ হইয়া না যাওয়া বরং উহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বংশানুক্রমিক দায়িত্বশীলতা। বস্তুত সন্তান যেমন পিতা-মাতার পরিত্যাক্ত বস্তুগত সম্পদ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়া থাকে, তেমনি তাহাদের অ-বস্তুগত ন্যায়-কাজ সমূহ করার দায়িত্বের উত্তরাধিকারও পাইয়া থাকে। অ-ইসলামী সমাজে এই মহৎ ব্যবস্থার কোন দৃষ্টান্তই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না।

তালাক্

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ. (ابوداؤد، ابن ماجه، حاكم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমস্ত হালাল কাজের মধ্যে ঘৃণ্যতম কাজ হইতেছে তালাক্। (আবূ দায়ূদ, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে তালাক্ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। হাদীসটির ভাষ্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় , তালাক্ আল্লাহ্‌র নিকট হালাল বটে; কিন্তু ইহা নিকৃষ্টতম ও ঘৃণ্যতম হালাল। হলাল-হারাম আল্লাহ্ তা'আলাই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। হারাম হইল তাহা যাহা করিতে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহা করিলে আল্লাহ্ তা'য়ালা সন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন। কুরআন বা রাসূলে করীম (স)-এর মাধ্যমে জানাইয়া দিয়াছেন এবং যাহা অকাট্য দলীল (نص) দ্বারা প্রমাণিত।

আর হালাল তাহা যাহা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন না, ক্রুদ্ধ হন না; বরং সন্তুষ্ট হন বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তালাক্ হইল এমন একটা কাজ যাহা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা কিছু মাত্র সন্তুষ্ট হন না; বরং অত্যন্ত বেশী অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন, যদিও তাহা হারাম করিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহার পিছনে নিশ্চয়ই কারণ নিহিত রহিয়াছে। সে কারণের বিশ্লেষণের পূর্বে 'তালাক্' বলিতে কি বুঝায়, তাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ইমাম নববী বলিয়াছেনঃ 'তালাক্' طَلَاق শব্দের অর্থঃ اَلتَّرْكُ ও اَلْاِرْسَال—ছাড়িয়া দেওয়া,ত্যাগ করা বা বন্ধন খুলিয়া দেওয়া। আরবী ভাষায় বলা হয় طَلَّقْتُ الْبِلَادَ 'আমি শহর ত্যাগ করিয়াছি'। শহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। (نبوى)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ

'তালাক্' শব্দের আভিধানিক অর্থঃ رَفْعُ الْقَيْدِ বাধন খুলিয়া ফেলা। জন্তু-জানোয়ার রশি দিয়া বাঁধিয়া রাখার পর রশি খুলিয়া উহাকে মুক্ত করিয়া দিলে বলা হয় طَلَّقْتُ ঃ 'উহার গলার রশির বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়াছি'। উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি, উহাকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে দিয়াছি। আর শরীয়াতের পরিভাষায় 'তালাক্' হইলঃ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ বিবাহের বন্ধন তুলিয়া ও খুলিয়া দেওয়া। (عمدة القارى)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-কাহ্লানী ছানয়ানী ও ইবনে হাজার আল-আসকালানী লিখিয়াছেনঃ তালাক্ শব্দের আভিধানিক অর্থঃ حَلُّ الْوِثَاقِ 'শক্ত রজ্জুর বাঁধন খুলিয়া ফেলা'। এই শব্দটি গ্রহীত হইয়াছে اَلْاِطْلَاقُ হইতে। ইহার অর্থ, ছাড়িয়া দেওয়া, ত্যাগ করা। আর শরীয়াতের পরিভাষায় ইহার অর্থ ঃ حَلُّ عُقْدَةِ التَّزْوِيْجِ 'বিবাহের শক্ত বাঁধন খুলিয়া দেওয়া'। ইসলামের পূর্বেও এই শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের কথা বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়াছেন।

বস্তুত বিবাহ একটা বন্ধন। ইহাতে দুই বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরের জন্য হারাম ব্যক্তিসত্তা একজন পুরুষ ও একজন মেয়েকে—ঈজাব ও কবুলের শক্ত রশি দিয়া সামাজিক সমর্থনের মাধ্যমে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এক দেহ এক প্রাণ হইয়া একত্র জীবন যাপন, জৈবিক উদ্দেশ্য ও কামনা-বাসনা পরিপূরণ এবং এক সঙ্গে থাকিয়া পারিবারিক দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যেই এই বাঁধন সংস্থাপিত করা হয়। এই বাঁধনকে ছিন্ন করা, এক সঙ্গে থাকিয়া দাম্পত্য জীবন যাপনের সিদ্ধান্তকে বাতিল করিয়া পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া এবং শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মুক্ত ও পরিত্যাগ করাকেই বলা হয় 'তালাক্'। এই হিসাবে বিবাহ পরিবার গঠন করে। আর তালাক্ পরিবার সংস্থাকে চূর্ণ করে।

ইসলামে বিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে পরিবার গঠন, পারিবারিক জীবন যাপনের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে যৌন প্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনা পরিপূরণ ও সন্তান উৎপাদন—সর্বোপরি পিতৃ-মাতৃ স্নেহে সন্তান উৎপাদন ও প্রকৃত মানুষরূপে তাহাদিগকে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে।

বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর কঠিন দুশ্ছেদ্য প্রতিশ্রুতি বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একটি পবিত্রতম ব্যাপার। ইহা ভাঙিয়া ও ছিন্ন হইয়া যাওয়া আল্লাহ্‌র নিকট কিছুতেই পছন্দনীয় হইতে পারে না। একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে লোক যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন ইহার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে যার পর নাই সন্তুষ্ট হন। কিন্তু যখন 'তালাক' সংঘটিত হয়, তখন ইহার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহ বন্ধনকে কঠিন দুশ্ছেদ্য প্রতিশ্রুতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ করিয়াছেনঃ

وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا (النساء ٢١)

এবং মেয়েরা তোমাদের নিকট হইতে শক্ত ও দুশ্ছেদ্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে।

এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি অনিবার্য পরিণতি। কেননা প্রথম কাজটি—অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া—আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছার বাস্তবতা। আর দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ তালাক দেওয়া—আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'আলা গঠন ও সংযোজন পছন্দ করেন এবং ভাঙন ও বিচ্ছেদ করেন অপছন্দ, ইহা তো সকলেরই জানা কথা। কুরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে। (البقرة: ٢٠٥) وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ আল্লাহ্ বিপর্যয়, ভাঙন ও অশান্তি পছন্দ করেন না। 'তালাক' যে পারিবারিক জীবনের একটা প্রচণ্ড ভাঙন ও বিপর্যয় তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাই হাদীসের কথাঃ 'তালাক' হালাল বটে, কিন্তু ইহা নিকৃষ্টতম ঘৃণ্যতম এবং আল্লাহ্‌র রোষ ক্রোধ উদ্রেককারী হালাল কাজ। ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

রাসূলে করীম (স) অপর একটি হাদীসে তালাক্-এর ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ

تَزَوَّجُوْا وَلَا تُطَلِّقُوْا فَاِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ

তোমরা বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না। কেননা তালাক সংঘটিত হইলে আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়া উঠে।

'তালাক' স্বামী স্ত্রীর পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়। এই কাজের উদ্যোগ গ্রহণকারী আসলে পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। ইসলামের দৃষ্টিতে সে মহা অপরাধী।

পরিবার গঠনের সূচনা হয় পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক ইচ্ছা, সম্মতি, মানসিক প্রস্তুতি ও আগ্রহ-উদ্যোগের ফলে। ইহার স্থিতি ও স্থায়ীত্বও নির্ভর করে পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাস ও

ঐকান্তিকতার উপর। কিন্তু সে ইচ্ছা ও আগ্রহ যখন বিলুপ্ত হইয়া যায়, যখন একজন অপর জনের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠে—উহার কারণ যাহাই হউক না কেন—তখন তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া উঠে। পরস্পর হইতে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য পাগল হইয়া উঠে। এই সময় উভয়ের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হইয়া পড়ে। একত্রে ও মিলিত হইয়া থাকা যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে তখন মুক্তির একটা বিধিসম্মত পথ উন্মুক্ত থাকাও বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় স্বামী বা স্ত্রী কারো পক্ষেই সুখ সাচ্ছন্দ্য সহকারে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় না, ঠিক এই কারণেই ইসলামে এই তালাক-এর ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। যে সব ধর্মে তালাক দেওয়ার—উক্তরূপ অবস্থায় পরস্পর হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার—কোন পথ নির্দিষ্ট হয় নাই, সেই ধর্মাবলম্বীদের জীবন অনিবার্যভাবে দুর্বিসহ হইয়া পড়ে। স্বামীর ঘর-সংসার বরবাদ হইয়া যায়। স্ত্রী সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া যায়। ইহা অনস্বীকার্য। তাই ইসলামে তালাক ঘৃণ্য অপছন্দনীয় ও আল্লাহ্‌র ক্রোধ উদ্রেককারী হইলেও স্বামী-স্ত্রীর জন্য মুক্তির এই উপায়টিকে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে ইহা এক স্বভাব-সম্মত ব্যবস্থা। যখন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জীবন সম্ভব নয়, তখন পরস্পর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অন্যত্র সুখী জীবন লাভের সন্ধান করা উভয়ের জন্য অবশ্যই মানবিক ব্যবস্থা এবং সর্বতোভাবে যুক্তি সংগত পন্থা। দাম্পত্য জীবনের উত্থান পতন এবং ভাঙ্গা-গড়া সম্পর্কে যাহাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে, তাহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা ইসলামে চূড়ান্ত নিরুপায়ের উপায় স্বরূপই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বিবাহিত জীবনের চরম লক্ষ্যই যখন বিঘ্নিত হয় এবং একত্রের জীবন যাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন বিধিসম্মত ভাবে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর কি পথ থাকিতে পারে? তাই কুরআন মজীদে তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে 'তালাক' যে কিছু মাত্র আনন্দ দায়ক ব্যাপার নয়, বরং অত্যন্ত দুঃখ-বেদনাময় ও হৃদয় বিদারক, তাহা রাসূলে করীম (স)-এর আলোচ্য ছোট্ট হাদীসটি হইতে জানা যায়।

অতএব পারস্পরিক মিলমিশ ও মিটমাট চূড়ান্ত মাত্রার চেষ্টা করিয়াও যখন একত্র ও স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকা ও জীবন যাপন করা সম্ভব হইবে না বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইবে, ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বশেষ উপায় রূপে এই অস্ত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহার পূর্বে নয় এবং তাহা শরীয়াতের প্রদর্শিত পথে ও নিয়মেই তাহা ব্যবহার করিতে হইবে, খামখেয়ালীভাবে ও নিজ ইচ্ছামত নয়।

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস স্মরণীয়। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা কয়িয়াছেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

নবী করীম (স) হযরত হাফসা (রা)-কে 'তালাক' দিয়াছেন, পরে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়াছেন।

এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেন, এই হাদীসটি হইতে প্রমাণিত হয় যে, অপছন্দ না করিয়াও স্ত্রীকে কোন না কোন কারণে তালাক দেওয়া স্বামীর জন্য জায়েয। কেননা যে কাজ জায়েযের সীমার মধ্যে, সম্পূর্ণ হারাম নয়, রাসূলে করীম (স) সে কাজ অপছন্দ করা ছাড়াই করিতেন। ইহা তালাক ঘৃণ্য হওয়া সংক্রান্ত হাদীসের সহিত সংঘর্ষিত নয়। কেননা কোন কাজ ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় হইলেও যে তাহা হারাম হইবে, কিছুতেই করা যাইবে না, তাহা জরুরী নয়।

এই ঘটনা এই কথাও প্রমাণ করে যে, তালাক দিয়াও—যে তালাক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়া দেয়—স্ত্রীকে স্ত্রী হিসাবে পুনরায় গ্রহণ করা যয় ইহাও এক প্রকারের তালাক। এই রূপ তালাক হইলে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা শরীয়াত সম্মত কাজ। ইহা হইতে একথাও বুঝা যায় যে, কেহ যদি একান্ত নিরুপায় হইয়া স্ত্রীকে তালাক দেয়-ই তাহা হইলে সে যেন এমন ভাবে তালাক দেয়, যাহাতে তালাক দেওয়ার পরবর্তী সময়ে তাহাকে স্ত্রী হিসাবে পুনরায় গ্রহণ করার পথ উন্মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ

হইয়া না যায়। রাসূলে করীম (স) হযরত হাফসা (রা)কে তালাক দেওয়ার পর পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া সেই পথই দেখাইয়াছেন।

আবূ দায়ূদ গ্রন্থে উদ্ধৃত বর্ণনায় এই মূল হাদীসটির ভাষা হইলঃ

مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

তালাক অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য জঘন্য ক্রোধ উদ্রেককারী অসন্তোষজনক আর কোন জিনিসকেই আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেন নাই।

আবূ দায়ূদে এই বর্ণনাটি 'মুরসাল' হইলেও হাকেম-'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে ইহা মরফু মুত্তাছিল[১] রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হাদীসটি হইতে একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হইলে শয়তান যারপর নাই উল্লসিত হয়। ইহার প্রেক্ষিতেই বলা যায়, এই বিচ্ছেদ বা তালাক আল্লাহ্র নিকট আদৌ পছন্দনীয় কাজ হইতে পারে না।

এই পর্যায়ের আর একটি হাদীসঃ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (دار قطنى)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ হে মুয়ায! দাস মুক্তি বা বন্দী মুক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও পছন্দময় কাজ আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে আর কিছু সৃষ্টি করেন নাই। অনুরূপভাবে তালাক অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় কাজ আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে আর কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। (দারে কুত্নী)

ব্যাখ্যা দাস মুক্তি ও বন্দীমুক্তি এবং তালাক দুইটি কাজই আল্লাহ্র সৃষ্টি, আল্লাহ্র উদ্ভাবন। কিন্তু তন্মধ্যে একটি অধিক পছন্দনীয় আর অপরটি অধিক ঘৃণ্য। একটি কাজে আল্লাহ্ খুবই খুশী হন। আর অপর কাজটিতে আল্লাহ্ হন অসন্তুষ্ট, রাগান্বিত ও ক্রুদ্ধ। অথচ উভয় কাজের পরিণাম মুক্তি। ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ সুস্পষ্ট। দাস বা বন্দী মুক্তিতে মানুষ চরম মর্মান্তিক ও লাঞ্ছিত অবমানিত দুরবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করে। অতঃপর মানুষের মত মাথা উঁচু করিয়া মুক্ত আলো-বাতাসে জীবন যাপন করিবার সুযোগ পায়। মানুষকে তো আল্লাহ্ তা'আলা মুক্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ভাষায় وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ اَحْرَارًا 'তাহাদের মায়েরা তাহাদিগকে মুক্ত ও স্বাধীন অবস্থায়ই প্রসব করিয়াছে'। দাসত্ব নিগড়ে কিংবা কারাগারে মানুষকে বন্দী করে মানুষই। কাজেই ইহা মনুষ্যত্বের অপমান। ইহা হইতে মুক্তি পাইলে মানুষ তাহার আসল মর্যাদায় ফিরিয়া আসে। এর ফলে আল্লাহ্র অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্টির উদ্রেক আর কাহার হইতে পারে।

১. 'মরফু' বলিতে সেই হাদীস বুঝায় যাহা স্বয়ং রাসূলের কথা এবং 'মুত্তাছিল' বলিতে সেই হাদীস বুঝায় যাহার সনদের ধারাবাহিকতা অক্ষত, মধ্যখানে ছিন্ন হইয়া যায় নাই।

তালাকেও মুক্তি। স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু এই মুক্তি কাহারও কাম্য হওয়া উচিত নয়। এই মুক্তিতে সর্বাধিক উল্লসিত হয় শয়তান। কেননা স্বামী-স্ত্রীর বৈধ যৌন মিলন ও পবিত্র যৌন জীবন শয়তান পছন্দ করিতে পারে না। উহার পছন্দ হইল জ্বেনা-ব্যাভিচার। পরিবার দুর্গে দাম্পত্য বন্ধনের মধ্যে জীবন-যাপনকারী নারী-পুরুষের পক্ষে এই কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না বলিলেই চলে। কিন্তু এই দুর্গ ভাঙিয়া গেলে, নারী-পুরুষ মুক্ত জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় অবাধ বিচরণ করিতে পারিলেই তাহাদের দ্বারা জ্বেনা-ব্যাভিচার ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া অত্যন্ত সহজ হইয়া যায়। আর তখনই হয় শয়তানের উল্লাসের সূচনা।

কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তালাক অনেক সময় অপরিহার্য হইয়া পড়ে। অনেক সময় শরীয়াতের দিক দিয়াই তালাক দেওয়া প্রয়োজন তীব্র হইয়া দেখা দেয়। যেমন স্ত্রী বা স্বামী যদি দ্বীন ও শরীয়াত অমান্যকারী হয়, শত বলা ও বুঝানো সত্ত্বেও যদি শরীয়াত পালন ও ফরযাদি যথারীতি পালন করিতে প্রস্তুত না হয় এবং শেষ পর্যন্ত যদি স্পষ্ট হইয়া যায় যে, সে শরীয়াত পালন করিবে না, তখন একজন দ্বীনদার মুসলমান পুরুষের পক্ষে তাহার সহিত একত্র দাম্পত্য জীবন যাপন করা সম্ভবপর হয় না। তখন তালাক দেওয়া শুধু অপরিহার্যই নয়, একান্তই বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে। ইবনুল হুম্মাম বলিয়াছেন, এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীকে (বা স্বামীকে) তালাক দেওয়া মুস্তাহাব। আবূ হাফ্ছ বুখারী বলিয়াছেন, বেনামাযী স্ত্রী (বা স্বামীর সহিত) সঙ্গম করা অপেক্ষা তাহাকে তালাক দিয়া তাহার মহরানা (বা তালাক বাবদ দেয়) নিজ মাথায় চাপাইয়া লওয়া অধিক পছন্দনীয় কাজ। (مرقات)

এই কারণে তালাক সম্পর্কে শরীয়াত যে পথ ও পন্থা বাত্লাইয়া দিয়াছেন তাহা অতীব স্বভাবসিদ্ধ ও মানবিক বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। শরীয়াত মুতাবিক যদি কেহ স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং পর মুহূর্তেই যদি তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করার ইচ্ছা জাগে তবে তাহার সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। শরীয়াতের দেখাইয়া দেওয়া নিয়ম লংঘন করিয়া তালাক দিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হইয়াছে এই কারণেই। অনেক ক্ষেত্রে তালাক দাতার বা উদ্যোক্তার উপর অনেক অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয়, যেন শেষ পর্যন্ত একটি পরিবারের এই ভাঙনটা রোধ করা সম্ভবপর হয়।

হাদীস-পারদর্শীদের মতে তালাক চার প্রকারের। তাহা হইল, হারাম, মক্রূহ, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব। দুইটি অবস্থায় তালাক দেওয়া হালাল, দুইটি অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। হালাল অবস্থা এই যে, স্ত্রী ঋতু হইতে পবিত্র হইয়াছে ও সঙ্গম হয় নাই, অথবা স্ত্রী গর্ভবতী হইয়াছে ও তাহার গর্ভ প্রকাশ পাইয়াছে। স্ত্রীর ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম—অর্থাৎ তালাক তো সংঘটিত হইবে; কিন্তু হারাম কাজ করার গুনাহ হইবে। আর স্ত্রীর সহিত সঙ্গম চলিতেছে, গর্ভাধারে কোন গর্ভের সঞ্চার হইয়াছে কিনা স্বামী সে বিষয়ে অবহিত নয়, এইরূপ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। (دار قطنى- হযরত ইবনে আব্বাস-এর কথা)। ইহা অবস্থাগত বিবেচনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ চরমপর্যায়ে পৌঁছিলে ও তালাকই সর্বশেষ উপায় হইয়া দাঁড়াইলে তখন তালাক দেওয়া ওয়াজিব। চারমাস পর্যন্ত স্বামী যদি স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক না রাখে ও স্ত্রী তাহার অধিকার পাইবার দাবি জানায় আর স্বামী যদি সে অধিকার দিতে কিংবা তালাক দিয়া দিতে রাযী না হয়, তাহা হইলে তখন সরকার রিজয়ী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিবে। ইহাও ওয়াজিব। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাল থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি বিনা কারণে তালাক দিয়া বসে, তবে ইহা মাকরূহ।

যে তুহরে সঙ্গম হইয়াছে সেই তুহরে তালাক দেওয়া হারাম। কাহারও একাধিক স্ত্রী থাকিলে ও একজনের জন্য নির্দিষ্ট রাত্রি আসিবার পূর্বেই তাহাকে তাহার পাওনা হইতে বঞ্চিত করা হারাম। দাম্পত্য জীবনে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমা রক্ষা করা সম্ভব না হইলে তখন তালাক দেওয়া মুস্তাহাব।

এই পর্যায়ে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে, তালাক দেওয়ার অধিকার কেবলমাত্র স্বামীর। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে (البقرة: ২৩৭) بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 'পুরুষটির হাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে বিবাহ

বন্ধন'। তাই এই বন্ধন কেবল মাত্র সেই রাখিতে পারে এবং সে-ই তাহা খুলিয়া দিতে পারে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ (ابن ماجة) إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ যে উরু ধরিয়াছে অর্থাৎ স্বামী তালাক দেওয়ার অধিকার ও ক্ষমতা তাহারই। অন্য কাহারও নয়।[১]

ইসলামে তালাক দেওয়ার মৌলিক অধিকার কেবলমাত্র স্বামীকেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণও রহিয়াছে। স্বামী বিবাহে ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং নবগঠিত পরিবার সংস্থার যাবতীয় ব্যয়ভার কেবলমাত্র তাহাকেই বহন করিতে হয়। এই কারণে পরিবার সংস্থা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবে সে-ই যে অধিক আগ্রহী ও সচেষ্ট হইবে এবং কোন মতেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে রাযী হইবে না—চূড়ান্তভাবে নিরূপায় হওয়া ছাড়া, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তাহাকেই ভাবিত হইতে হয় যে, স্ত্রীকে তালাক দিয়া পরিবার সংস্থা চূর্ণ করিয়া দিলে পুনরায় আর একটি বিবাহ করিয়া এই পরিবার সংস্থাকে নূতন করিয়া তাহাকেই গঠন করিতে হইবে। তাহাতে যে আবার বিপুল অর্থব্যয় করিতে ও বহু প্রকারের ঝামেলা পোহাইতে হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। আর পরবর্তী বিবাহিত স্ত্রী বর্তমানের চেয়ে যদি ভালো না হয় তাই শেষ পর্যন্ত পরিবার সংস্থা রক্ষা করা ও উহাকে কোনরূপ চূর্ণ হইতে না দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা স্বামীর পক্ষেই স্বাভাবিক। উপরন্তু তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর পাওনা অবশিষ্ট মহরানা ও জরুরী দ্রব্য সামগ্রী দেওয়া এবং স্ত্রী-ইদ্দাৎকালীন থাকা-খাওয়া-পরার ব্যবস্থায় অর্থ ব্যয় করার দায়িত্বও তাহাকেই পালন করিতে হইবে। এই সব দিক দিয়া স্ত্রীর কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। কাজেই তালাক দেওয়ার ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে স্বামীর হাতে অর্পন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, পক্ষপাতিত্বও নয় এবং স্ত্রীর প্রতি নয় কোনরূপ অবিচার। বিবাহের আক্দ করার সময় স্ত্রী 'ইজাব' করিয়া সেই নিজের অধিকার স্বামীকে দিয়াছে। তাই উহা ছাড়া না-ছাড়ার ইখতিয়ার স্বামীর—স্ত্রীর নয়।

দ্বিতীয়তঃ স্বামী স্ত্রীর তুলনায় অধিক ধৈর্যশীলও হইয়া থাকে। তাই আশা করা যায় যে, সে সামান্য ও খুটিনাটি ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা তালাক দিয়া বসিবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রী সহসা ও কারণে-অকারণে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িতে পারে। তাহার সহ্য শক্তিও সীমিত, সামান্য। তালাকের পর তাহাকে কোন দায়-দায়িত্ব বা ঝামেলাও পোহাইতে হয় না। এই কারণে সে খুব সহজেই এবং অতি তাড়াতাড়িই তালাক দানে উদ্যত হইতে পারে। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তালাক দানের মৌলিক ও চূড়ান্ত ক্ষমতা স্ত্রীর হাতে দেন নাই। বাস্তবতার নিরিখেও এই ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও নির্ভুল। ইউরোপে এই ক্ষমতা স্ত্রীকেও দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তথায় তালাকের হার বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুসলিম সমাজে যত না তালাক সংঘটিত হয়, তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী তালাক সংঘটিত হয় ইউরোপীয় সমাজে।

তালাক দেওয়ার ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োগের জন্য স্বামীর পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ও স্বাধীন বা স্বেচ্ছাধিকারী হওয়া পূর্বশর্ত। এইরূপ স্বামী তালাক দিলেই সেই তালাক সংঘটিত ও কার্যকর হইবে। পক্ষান্তরে স্বামী পাগল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা চাপে বাধ্য হইলে তাহার দেওয়া তালাক সংঘটিত ও কার্যকর হইবে না। কেননা তালাক এমন একটা কাজ যাহার একটা পরিণাম-পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে। এই কারণেই তালাক দাতাকে সর্বদিক দিয়া যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে। তিরমিযী ও বুখারী মওকুফ বর্ণিত হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

সর্বপ্রকারের তালাকই কার্যকর—বিবেক-বুদ্ধি রহিত ব্যক্তির তালাক ব্যতীত।

---

১. বিবাহে স্ত্রীর পক্ষ হইতে ইজাব হয়, আর স্বামী তাহা কবুল করে। ফলে যে বিবাহ বন্ধনটি হইয়া যায় উহার সূত্রের গোড়া স্বামীর হাতেই নিবদ্ধ হয়। ফলে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্ত্রীর থাকে না।

অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তির তালাক কার্যকর হইবে না। চোর-ডাকাতের জবরদস্তিতে মজবুর ও বাধ্য হইয়া তালাক দিলে—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 'উহা গণনার যোগ্য নয়'। (বুখারী)। জোর জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও মুসলিম বানাইলে সে প্রকৃত মুসলিম হয় না। জোর পূর্বক কাহাকেও কুফরি কালেমা বলিতে বাধ্য করা হইলে সেও কাফির হইয়া যায় না। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (النمل: ١٠٦)

যে লোককে কাফির হওয়ার জন্য বলপ্রয়োগে বাধ্য করা হইয়াছে তাহার দিল যদি ঈমানে অবিচল থাকে, তবে (সে কাফির হইয়া যাইবে না।)

অনুরূপভাবে কাহাকেও যদি বলপ্রয়োগে তালাক দিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহার তালাকও কার্যকর হইবে না। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

(ابن ماجه، ابن حبان، دار قطني، الطبراني، حاكم)

আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ও বলপ্রয়োগে জবরদস্তি করানো কাজ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ ও দায়ূদ জাহেরী এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আলী ইবনে আবূ তালিব ও ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবী (রা) গণও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা বলিয়াছেনঃ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ যাহাকে বল প্রয়োগে বাধ্য করা হইয়াছে তাহার দেওয়া তালাক কার্যকরী হইবে। কিন্তু ইহার সমর্থনে কোন দলীল পাওয়া যায় নাই।

তবে বেহুশ ও ক্রোধান্ধ ব্যক্তির দেওয়া তালাক সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন রকমের সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলেঃ তুমি আমার উপর হারাম—ইহাতে স্বামী যদি স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম মনে করিয়া লয়, তবে তাহাতে সে প্রকৃতপক্ষেও হারাম হইয়া যাইবে না। কেননা হালাল কে হারাম করার অধিকার বা ক্ষমতা কাহারও নাই। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলঃ إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا 'আমি আমার স্ত্রীকে আমার উপর হারাম করিয়াছি'। তখন তিনি বলিলেনঃ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ 'না সে তোমার উপর হারাম নয়'।

আর সে যদি এই কথা তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে এবং এই শব্দ দ্বারা তালাক বুঝিয়া থাকে, তাবে সে তালাক সংঘটিত হইবে। তখন ইহা ইংগিতমূলক কথা বিবেচিত হইবে। বোবা-বাকশক্তিহীন ব্যক্তি স্পষ্ট ইশারা করিয়া স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে। প্রতিনিধির মাধ্যমেও স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাতে পারে, চিঠি লিখিয়া তালাক দিলে তাহাও সংঘটিত হইবে। তবে তাহা স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া স্পষ্টভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

কুরআন মজীদে সূরা الطلاق -এর ২ নং আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছেঃ

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

এবং তোমরা সাক্ষী বানাও তোমাদের মধ্য থেকে সুবিচার ও ন্যায়পরতা সম্পন্ন দুইজন লোককে এবং আল্লাহ্‌র জন্য তোমরা সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত কর।

তালাক দেওয়া এবং উহার পর স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া হইলে উভয় ক্ষেত্রেই সাক্ষী বানানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইমাম আবূ হানীফার মতে ইহা মুস্তাহাব। আর এক তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনা হইলে তখন সাক্ষী বানানো ইমাম শাফেয়ীর মতে ওয়াজিব। ইমাম আহমাদের একটি মত ইহার সমর্থক এই পর্যায়ে কোন হাদীস বর্ণিত বা উদ্ধৃত হয় নাই—না নবী করীম (স)-এর কোন উক্তি, না সাহাবীদের কোন কথা। তবে একটি বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিলঃ এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে পরে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়াছে; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সে সাক্ষী বানায় নাই। এ সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলিয়াছিলেনঃ

طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ اَشْهِدْ عَلٰى طَلَاقِهَا وَعَلٰى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ.

(ابوداؤد)

সুন্নাতের নিয়ম ব্যতীতই তালাক দিয়াছে, সুন্নাতের নিয়ম ব্যতীতই তাহাকে ফিরাইয়া লইয়াছে। তালাক দান ও ফিরাইয়া লওয়া উভয় ক্ষেত্রেই সাক্ষী বানাও।

এক বোন কর্তৃক অপর বোনের তালাক চাওয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَافِىْ اِنَائِهَا. (ترمذى، ابن حبان، بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি এই বাক্যটি রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছাইতে ছিলেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ কোন মেয়ে লোক-ই তাহার ভগিনীর তালাক চাহিতে পারিব না—এই উদ্দেশ্যে যে, তাহার পাত্রে যাহা আছে তাহার সবটুকুই সে একাই ঢালিয়া লইবে। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা উপরের হাদীসটি তিরমিযী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইবনে হাব্বান এই হাদীসটিই নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন ভিন্নতর ভাষায়। উহার ভাষা এইঃ

لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَاِنَّ الْمُسْلِمَةَ اُخْتُ الْمُسْلِمَةِ

কোন মেয়ে লোক-ই তাহার ভগিনীর তালাকের দাবি করিতে পারিবে না—এই উদ্দেশ্যে যে, সে তাহার (ভগিনীর) পাত্রের সব কিছুই সে নিজে নিঃশেষ করিয়া লইবে। কেননা মুসলিম মহিলা অপর মুসলিম মহিলার ভগিনী।

আসলে এই কথাটি দৃষ্টান্তমূলক। কোন মহিলার স্বামী যখন অপর একজন মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন এই (দ্বিতীয়) মহিলা সেই পুরুষটিকে বলেঃ তোমার বর্তমান স্ত্রীকে যদি আগেই তালাক দিতে পার এবং তাহা দিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি তোমাকে বিবাহ করিতে রাযী হইবে। ইহা যেমন তদানীন্তন আরব সমাজে একটা অনাচার হিসাবে প্রচলিত ছিল, বর্তমানেও ইহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নয়। কিন্তু ইহা একটি চরম অবিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, এই পুরুষটি

হয়ত একজন কুমারী কিংবা অধিক সুন্দরী যুবতী বা ধনবতী মেয়েকে বিবাহ করার লোভে পড়িয়া নিজের বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দিয়া বসে। অথচ সে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার যুক্তি সংগত কোন কারণই নাই। আর বিনা কারণে—বিনা দোষে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মত অন্যায় অবিচার ও জুলুম আর কিছুই হইতে পারে না। যে মেয়েটি এইরূপ কথা বলে—তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে তাহার বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দিতে প্ররোচিত করে, সে তো একজন মুসলিম মেয়ে লোক, যাহাকে তালাক দিবার জন্য এই প্ররোচনা, সেও একজন মুসলিম মহিলা। আর এই দুইজন মুসলিম মিল্লাতের লোক হিসাবে পরস্পরের বোন ছাড়া কিছুই নয়। অনুরূপভাবে কোন পুরুষের যদি এক সঙ্গে একাধিক স্ত্রী থাকে এবং তাহাদের একজন স্বামীকে বলে যে, তুমি তোমার অন্য বা অন্যান্য স্ত্রীদের তালাক দিলে আমি তোমাকে বেশী ভালবাসিব। এই ধরনের কথা-বার্তা প্রায়ই হইয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষটি তাহার কথা মত তাহার আগের বা অপর স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিতে উদ্যত হইয়া যায়। উপরোক্ত হাদীস এই প্রেক্ষিতেই প্রযোজ্য। বুখারী শরীফে এই হাদীসটির শেষাংশের ভাষা এই রূপঃ

لِتَسْتَفْرِغَ صَحِيْفَتَهَا فَاِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

একজন মেয়ে লোক অপর এক মেয়ে লোককে তালাক দিবার জন্য তাহার স্বামীকে প্ররোচিত করে এই উদ্দেশ্যে যে, তাহার পাত্রটি সে নিজে নিঃশেষ করিয়া লুটিয়া লইবে। এইরূপ করা নিস্ফল, কেননা সে তো ততটুকুই পাইবে যতটুকু তাহার জন্য নির্ধারিত হইয়াছে।

এই হাদীসের আর একটি ভাষা হইলঃ

لاَ يَصْلِحُ لِاِمْرَأَةٍ اَنْ تَشْتَرِطَ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَكْفِئَ اِنَاءَهَا

কোন মেয়ে লোকের জন্যই কল্যাণকর নয় যে, সে তাহারই এক বোনকে তালাক দানের শর্ত করিবে এই উদ্দেশ্যে যে, সে নিজে তাহার পাত্রটি একাই লুটিয়া পুটিয়া খাইবে।

ইমাম নববী এই হাদীসের তাৎপর্য লিখিয়াছেনঃ

مَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ نَهْىُ الْمَرْأَةِ الاَجْنَبِيَةِ اَنْ تَسْأَلَ رَجُلاً طَلاَقَ زَوْجَتِهِ لِيُطَلِّقَهَا وَيَتَزَوَّجَ بِهَا

এই হাদীসের তাৎপর্য হইল, অপরিচিত বা সম্পর্কহীন মেয়েলোক একজন পুরুষকে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতে প্ররোচিত করিবে—যেন সে তাহাকে তালাক দিয়া সেই মেয়েলোককে বিবাহ করে—এই কাজ হইতে বিরত রাখা।

ইবনে আবদুল বার্ এই হাদীস হইতে যে মৌলনীতি গ্রহণ করা যায় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলঃ

لاَ يَنْبَغِىْ اَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا اَنْ يُطَلِّقَ ضُرَّتَهَا لِتَنْفَرِدَ بِهِ

কোন মেয়ে লোক তাহার সতীনকে তালাক দিবার জন্য স্বামীকে বলিবে এই উদ্দেশ্যে যে, অতঃপর সে একা-ই থাকিয়া যাইবে ও সব কিছু একাই ভোগ দখল করিবে—ইহা কিছুতেই সমীচীন হইতে পারে না।

ইবনে হাজার আল্-আসকালীন বলিয়াছেনঃ ইবনে আবদুল বার্ লিখিত তাৎপর্য হইতে পারে সেই হাদীসটির, যাহাতে বোনের তালাকের দাবি করার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু যে হাদীসটিতে তালাক দেওয়ার শর্ত করার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই কোন সম্পর্কহীন মেয়ে লোক প্রসংগের কথা। আসল কথা হইল, এই ধরনের কথা বলা যায় যে ধরনের মন-মানসিকতা থাকিলে, তাহা নিতান্তই স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও হীন জিঘাংসাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন মেয়েলোক তাহারই মত অপর একজন মেয়ে লোককে স্বামী বঞ্চিতা করার কুটিল ষড়যন্ত্র পাঁকাইবে, ইসলাম ইহা কোনক্রমেই পছন্দ করিতে পারে না। মুসলমান হইয়া অপর একজন অবলা মুসলমানের কপাল ভাঙার জন্য এইরূপ কার্যকলাপ করিবে, রাসূলে করীম (স) আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে ইহা হইতে পরিষ্কার কণ্ঠে নিষেধ করিয়াছেন।

এই প্রেক্ষিতে বক্তব্য হইল, ইসলামে তালাক কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। উহা কোন আনন্দ বা খুশীর ব্যাপারও নয়। ইহা কোন ছেলে খেলাও নয়। ইহা অত্যন্ত জটিল ও সাংঘাতিক ব্যাপার। কথায় কথায় রাগ করিয়া সাময়িক ঝগড়া-ঝাটির দরুন উত্তেজিত হইয়া কখনই তালাক দেওয়া উচিত হইতে পারে না। তালাক দিবার পূর্বে শতবার ভাবিতে হইবে। ইহার পরিণতি নিজের জীবনে, পারিবারিক ক্ষেত্রে ও সন্তানাদির জীবনে কি রূপ দেখা দিবে, তাহা সুস্থ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। (تحفة الاحوذی، نیل الاوطار)

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণীয়। তাহা হইল, কোন স্ত্রীর পক্ষে নিজের স্বামীর নিকট নিজের তালাক চাওয়া বা দাবি করাও কি কোনক্রমে উচিত হইতে পারে? স্ত্রী স্বামীকে বলিবে, 'তুমি আমাকে তালাক দিয়া ছাড়িয়া দাও', এই কথা সাধারণভাবেই অকল্পনীয়। কোন বিশেষ কারণ যদি না-ই থাকে এবং দাম্পত্য জীবনকে অব্যাহত অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সর্বশেষ চেষ্টা করিয়াও যদি ব্যর্থতা হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহার পূর্বেই সেরূপ কোন কারণ ছাড়া-ই তালাক দাবি করাকে ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। এই পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত হাদীসটি স্মরণীয়ঃ

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

(ترمذی، ابن ماجه، ابوداؤد، دارمی، ابن حبان، مسند احمد)

হযরত সওবান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে মেয়ে লোকই স্বামীর নিকট তাহার নিজের তালাক চাহিবে—স্বামীকে বলিবে—তাহাকে তালাক দিতে কোনরূপ কঠিন ও অসহ্য কারণ ব্যতীতই—তাহার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি-সৌরভ সম্পূর্ণ হারাম।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবূ দায়ূদ, দারেমী, ইবনে হাব্বান, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা তালাক অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। কোন স্ত্রী-ই নিজের স্বামীর নিকট নিজের তালাক চাহিতে পারে না, বলিতে পারে নাঃ 'তুমি আমাকে তালাক দাও'। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহারও অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। উপরোদ্ধৃত হাদীসের শব্দ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ 'কোনরূপ কঠোরতা ব্যতীত' হইতেই এই কথা জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। بَأْس শব্দের অর্থ اَلشِّدَّةُ। কঠিন অবস্থা, কঠোরতা, চূড়ান্ত ভাবে ঠেকিয়া যাওয়া। এমন অবস্থা, যাহা মানুষকে তালাক চাহিতে বাধ্য করে, যখন চূড়ান্ত বিচ্ছেদ—ছাড়া কোন গতিই থাকে না এমন কোন বাস্তব কারণ যদি দেখা দেয়, কেবলমাত্র তখনই স্ত্রী স্বামীকে বলিতে পারে আমাকে তালাক দাও। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট তালাক চাহে, তবে তাহাতে গুনাহ হইবে না।

কিন্তু এইরূপ অবস্থার উদ্ভব না হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক পাইতে চাহে, তাহা হইলে তাহার জন্য আলোচ্য হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

সেই স্ত্রীলোকটির জন্য জান্নাতের সুগন্ধি সম্পূর্ণ হারাম হইয়া যাইবে।

কিছু সংখ্যক হাদীস বিশেষজ্ঞ এই কথাটুকুর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ ইহা ইংগিতমূলক কথা। ইহা হইতে বুঝানো হইয়াছে যে, সে মেয়ে লোকটি জান্নাতে যাইতে পারিবে না। কেননা সুগন্ধি পাওয়া যায় নিকটে গেলে, ভিতরে প্রবেশ করিলে। আর ভিতরে প্রবেশ করিলে সুগন্ধি না পায়ার কোন কথা হইতে পারে না। অতএব যখন বলা হইয়াছে যে, সে সুগন্ধি পাইবে না, তখন বুঝিতেই হইবে যে, সে জান্নাতে যাইতেই পারিবে না, এই কথাই বলা হইয়াছে।

অবশ্য কেহ কেহ এই কথাটুকুকে উহার শাব্দিক ও সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই রূপ মেয়েলোক জান্নাতে গেলেও জান্নাতের সৌরভ লাভ করিতে পারিবে না। আর এই মোট কথাটির তাৎপর্য হইল, সে জান্নাতে প্রথম চোটে প্রবেশকারী লোকদের সঙ্গে প্রবেশ করিতে পারিব না। কেননা সে স্বামীর নিকট তালাক চাহিয়া একটা অত্যন্ত বড় গুনাহ করিয়াছে। আর এই কথাটা দ্বারা এরূপ স্ত্রী লোককে খুব বেশী সাবধান ও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী লিখিয়াছেন, যে সব হাদীসে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের স্বামীর নিকট তালাক চাওয়ার দরুন ভয় দেখানো হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র সেই অবস্থায়ই প্রযোজ্য, যদি কোনরূপ কঠিন কারণ ব্যতীতই তালাক চাওয়া হয়। (بلوغ الامانى، فتح البارى)

পিতা-মাতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَتْ تَحْتِىْ اِمْرَأَةٌ اُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَاَمَرَنِىْ اَنْ اُطَلِّقَهَا فَاَبَيْتُ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِمْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ فَاَمَرْتُهُ اَنْ يُّطَلِّقَهَا فَاَبٰى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْ اِمْرَأَتَكَ فَطَلَّقْتُهَا.

(ابوداؤد، ابن ماجه، ترمذى، نسائى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার এক স্ত্রী ছিল, আমি তাহাকে ভাল বাসিতাম, কিন্তু আমার পিতা উমর (রা) তাহাকে অপছন্দ করিতেন। এই কারণে উহাকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করিলেন। কিন্তু আমি তাহা করিতে অস্বীকার করিলাম। তখন তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ ইয়া রাসূল! আমার পুত্র আবদুল্লাহ্‌র একজন স্ত্রী আছে, আমি উহাকে তাহার জন্য অপছন্দ করি। এই কারণে উহাকে তালাক দেওয়ার জন্য আমি তাহাকে আদেশ করিয়াছি। কিন্তু সে আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিয়াছে। অতঃপর রাসূলে করীম (স) আবদুল্লাহ্‌কে বলিলেনঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। ফলে আমি তাহাকে তালাক দিয়া দিলাম।

(আবূ দায়ূদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা হাদীসটির মূল কথা হইল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের একজন স্ত্রী ছিল, তিনি তাহাকে খুবই ভালবাসিতেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাহাকে পছন্দ করিতেন না বলিয়া তাহাকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত উমরের পছন্দ না করার কারণ কি ছিল তাহা হাদীসে বলা হয় নাই। ইহার একটা শরীয়াত সম্মত কারণ নিশ্চয়ই ছিল। নতুবা অযথা ও শুধু শুধুই তিনি পুত্রবধুকে তালাক দিতে বলিতে পারেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) পিতার আদেশ মানিয়া স্ত্রীকে তালাক দিতে রাযী হইলেন না। হয়ত যে কারণে হযরত উমর (রা) তালাক দিতে বলিয়াছিলেন, সে কারণটি তাঁহার নিকট স্পষ্ট ছিল না। অথবা তিনি হয়ত সে কারণকে এতটা গুরুত্ব দেন নাই যে, তাহার জন্য স্ত্রীকে তালাকই দিতে হইবে।

উপরোদ্ধৃত হাদীসের ভাষায় বলা হইয়াছে, হযরত উমার (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট এই ব্যাপারটিকে একটি মামলা হিসাবে পেশ করিলেন। নবী করীম (স) হযরত উমরের কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া তিনিও স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য ইবনে উমর (রা)কে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি এই নির্দেশ মত তালাক দিয়া দিলেন।

তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটির ভাষা ইহাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। হযরত উমর (রা) এই ব্যাপারটি নবী করীম (স)-এর নিকট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে এই কথার উল্লেখ নাই। তাহাতে বলা হইয়াছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নিজই এই ব্যাপারটি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট পেশ করিয়াছিলেন। হইতে পারে পিতা পুত্র উভয়ই ব্যাপারটি নবী করীম (স)- নিকট পেশ করিয়াছেন। কিন্তু একজন বর্ণনাকারী হযরত উমর (রা)-এর পেশ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং অন্য বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ্র নিজেরই পেশ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে মূল ব্যাপারে কোনই তারতম্য হয় নাই। এই হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পিতার আদেশ হইলে পুত্রকে প্রিয়তমা স্ত্রীকে তালাক দিতে হইবে। ইহা পিতৃ আদেশ পালন করার ব্যাপারে পুত্রের বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করে। ইসলামে আল্লাহ্র পরই পিতা-মাতার স্থান আদেশ মান্যতার দিক দিয়া। অতএব পুত্রের প্রিয়তমা স্ত্রীকে তালাক দিতে পিতা আদেশ করিলে তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

হযরত উমরের নির্দেশ মত স্ত্রীকে তালাক দিতে রাযী না হওয়ার একটা কারণই ছিল বলা যায়। আর তাহা হইল তিনি তাহাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু কেবলমাত্র ভালবাসার কারণেই কোন মেয়ে লোক স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা পাইবে, এমন নাও হইতে পারে। এই ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও এমন শরীয়াত সম্মত কারণ থাকিতে পারে, যাহার দরুন স্ত্রীকে ত্যাগ করাই কর্তব্য ও বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে।

এক কথায় বলা যায়, পিতা-মাতার আদেশক্রমে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া পুত্রের জন্য কর্তব্য। হাদীসে কেবল পিতার কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সন্তানের নিকট পিতার তুলনায় মাতার স্থান যে অনেক উপরে সে কথা বহু কয়টি হাদীস হইতেই অকাট্যভাবে জানা গিয়াছে। কাজেই পিতার ন্যায় মায়ের নির্দেশ হইলেও স্ত্রীকে তালাক দিতে হইবে। আল্লাহ্র নিকট এই ঘৃণ্যতম কাজটিও পিতা কিংবা মাতার নির্দেশে করিতে হয়। ইহাই আলোচ্য হাদীসটির বক্তব্য।

হায়য অবস্থায় তালাক্

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ

لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

(بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسای)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে তালাক্ দিলেন এমন সময় যখন তাঁহার স্ত্রী ঋতুবতী। ইহা রাসূলে করীম (স)-এর জীবিত থাকা সময়ের ঘটনা। তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এই বিষয়ে রাসূলে করীম (স)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তাহাকে আদেশ কর, সে যেন তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লয়। আর তাহাকে রাখিয়া দেয়। পরে সে যখন হায়য অবস্থা হইতে পবিত্র হইবে, পরে আবার ঋতুবতী হইবে, পরে আবার সে পবিত্র হইবে, তখন সে ইচ্ছা করিলে পরবর্তী কালের জন্য তাহাকে রাখিয়া দিতে পারে, ইচ্ছা করিলে তালাক্ও দিতে পারে। তবে তাহা স্পর্শ করার পূর্বে দিতে হইবে। ইহাই হইল সেই ইদ্দত যে জন্য স্ত্রীদের তালাক্ দিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করিয়াছেন। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দায়ূদ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা স্ত্রীকে তালাক্ দেওয়া পর্যায়ে এই হাদীস। কোন্ অবস্থায় তালাক্ দেওয়া যায় কোন অবস্থায় নয়, প্রধানত এই বিষয়েই পথ-নির্দেশ এই হাদীসটিতে রহিয়াছে। তালাক্ দেওয়ার ব্যবস্থা ইসলামে এক চূড়ান্ত পন্থা ও নিরুপায়ের উপায় হিসাবেই রাখা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে মূল কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে স্বামীকে। কুরআন মজীদের ঘোষণা 'তাহার—অর্থাৎ স্বামীর হাতেই রহিয়াছে বিবাহের বন্ধন (খোলার চাবিকাঠি)'। সহীহ সনদে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ وُلِّيَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ الزَّوْجُ 'বিবাহ বন্ধনে (খোলার) কর্তৃত্ব স্বামীকেই দেওয়া হইয়াছে' (القرطبی)। অর্থাৎ তালাক্ দেওয়ার মূল মালিক ও অধিকারী হইতেছে স্বামী। সে ইচ্ছা করিলে তালাক্ দিবে, না হয় না দিবে। সে তালাক্ না দিলে বা দিবার সুযোগ করিয়া না দিলে তালাক হইতে পারে না। তবে সরকার যদি কোন বিশেষ অবস্থায় বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয় ও স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, স্বামী স্ত্রীকে কোন্ কারণে তালাক্ দিবে? কি অবস্থায় তালাক্ দিবে? কোন রূপ কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক্ দেওয়া কি সংগত, তালাক্ কি যখন-ইচ্ছা তখনই দিতে পারে?.... এই সব প্রশ্নেরই সুস্পষ্ট জওয়াব পাওয়া যায় উপরোদ্ধৃত হাদীসে। এই পর্যায়ে প্রথমে আমরা হাদীসে উদ্ধৃত কথাগুলির পর্যালোচনা করিব। পরে তালাক্ সংক্রান্ত অন্যান্য জরুরী কথা পেশ করা হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁহার স্ত্রীকে তালাক্ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই স্ত্রীর নাম ছিল আমেনা—গিফারের কন্যা। মুসনাদে আহমাদ-এ বলা হইয়াছে, তাহার নাম ছিল 'নাওয়ার'। এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের জন্য বলা যাইতে পারে, নাম ছিল আমেনা, 'নাওয়ার' ছিল তাহার উপনাম বা ডাক নাম।

হাদীসে বলা হইয়াছে وَهِيَ حَائِضٌ অর্থাৎ হযরত ইবনে উমর (রা) তাহার স্ত্রীকে যখন তালাক্ দিয়াছিলেন, তখন সে ছিল ঋতুবতী। তাহার হায়য হইতে ছিল। কাসেম ইবনে আচবারের বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي دَمِهَا حَائِضٌ

তিনি তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দিলেন, তখন সে ঋতুবতী ছিল, তাহার রক্তস্রাব হইতেছিল। আর বায়হাকীর বর্ণনার ভাষা হইলঃ

طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا

তিনি তাহার স্ত্রীকে তাহার (স্ত্রীর) হায়য অবস্থায় তালাক্ দিলেন।

তাহার পিতা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারটি বিবৃত করিলেন। ইহা শুনিয়া রাসূলে করীম (স) রাগান্বিত হইলেন। আবূ দায়ূদের বর্ণনায় রাসূলে করীম (স) ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। উহার ভাষা হইলঃ

فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত উমর (রা) রাসূলে করীম (স)কে সমস্ত ঘটনার বিবরণ বলিয়া শুনাইলেন। সব শুনিয়া রাসূলে করীম (স) ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত হইলেন।

পরে তিনি বলিলেনঃ 'সে যেন তাহার স্ত্রীকে অবিলম্বে ফিরাইয়া লয় এবং ঘরে রাখে। অতঃপর হায়য অবস্থা হইতে পবিত্র হওয়ার পর এতটা সময় অতিবাহিত করাইতে হইবে যখন আবার তাহার হায়য হইবে এবং সে হায়য হইতেও পবিত্র হইবে। এই ভাবে চলতি হায়য অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক তুহরে ও এক হায়য অতিবাহিত হইতে হইবে। ইহার পর যে তুহর হইবে, সে যদি তাহাতে তালাক্ দিতে বদ্ধপরিকরই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই তুহর অবস্থায় তালাক্ দিবে। কিন্তু শর্ত এই যে, এই তুহর কালে সে যেন স্ত্রীর সহিত সঙ্গম না করে।

এই পর্যায়ে আল্লামা খাত্তাবী লিখিয়াছেনঃ

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ بِدْعَةٌ وَاَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُوْلاً بِهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا شَئٌ فَاَنَّ عَلَيْهِ اَنْ يُرَاجِعَهَا

এই হাদীসটির এ কথার দলীল যে, হায়য অবস্থায় তালাক্ দেওয়া বিদয়াত—সুন্নাত বিরোধী কাজ। যদি কেহ হায়য অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক্ দিয়া বসে আর সে যদি সঙ্গমকৃতা হইয়া থাকে এবং তালাকের একটা অংশ অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে। অর্থাৎ তিন নয়, এক বা দুই তালাক্ ইতিপূর্বে দিয়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া তাহার কর্তব্য।

অর্থাৎ তুহর অবস্থায় তালাক্ দেওয়া সুন্নাত তরীকা মুতাবিক। তিনি আরও লিখিয়াছেনঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ يَقَعُ كَوُقُوْعِهِ لِلسُّنَّةِ اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا اَكَمَنْ يَكُنْ لِمُرَاجَعَتِهَا اِيَّا هَا مَعْنِيٌّ

এই হাদীসটি একথাও প্রমাণ করে যে, বিদ্য়াত পন্থায় তালাক্ দিলেও তাহা কার্যকর হয় যেমন কার্যকর হয় সুন্নাত পন্থানুযায়ী দেওয়া তালাক্। কেননা তাহা যদি কার্যকর না হইত তাহা হইলে স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে বলার কোনই অর্থ হয় না।

হাদীসের ভাষা হইলঃ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ ইহার অর্থ, হযরত উমর (রা)-এর পুত্র যে তাহার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক্ দিয়াছেন, এই ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম বা ফয়সালা কি, তাহাই তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। ইহার জওয়াবে রাসূলে করীম (স) যে ফয়সালা শুনাইলেন উহার শুরুতে তিনি হযরত উমর (রা)কে বলিলেন مُرْهُ অর্থাৎ তোমার পুত্রকে নির্দেশ দাও, সে যেন এইরূপ করে। রাসূলে করীম (স)-এর এই যে নির্দেশ, শরীয়াতের দৃষ্টিতে ইহার মর্যাদা কি, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ নানা কথা বলিয়াছেন। ইমাম মালিকের মতে এই নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। আর তাহার অর্থ এই যে, যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে হায়য বা নেফাস (সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাব) অবস্থায় তালাক্ দেয়, তাহা হইলে তাহাকে 'রুজু' করিতে—স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য করিতে হইবে। ইমাম মালিকের এই কথায় হায়য অবস্থা ও নেফাস অবস্থাকে এক ও অভিন্ন অবস্থা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইবনে আবূ লাইলা, আওজায়ী, শাফেয়ী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক, আবূ সওর প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا وَلَا يُجْبَرُ তাহাকে আদেশ করা হইবে, যেন সে তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লয়; কিন্তু ফিরাইয়া লইতে 'মজবুর' বা বাধ্য করা যাইবে না। ইহাদের এই মতে রাসূলের আদেশ বা নির্দেশ পালন করা মুস্তাহাব ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, ওয়াজিব নয়। আর তাহাও এই জন্য যে, তালাক্ দেওয়ার কাজটা যেন সুন্নাত তরীকা মুতাবিক হয়।

কিছু লোক (ইবনে দকীকুল-ঈদ) এখানে ইসলামী আইন রচনার মূলনীতির প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাহা এই যে, রাসূলে করীম (স) হযরত উমর (রা) কে আদেশ করিলেন, তিনি যেন তাঁহার পুত্রকে এইরূপ করার নির্দেশ দেন। ইহা হইল اَلْاَمْرُ بِالْاَمْرِ بِالشَّيْءِ 'কোন কাজ করিবার আদেশ করার জন্য আদেশ করা'। কিন্তু ইহা কি সেই মূল করণীয় কাজের জন্য আদেশ? আল্লামা ইবনে হাজেব এই প্রশ্ন তুলিয়া বলিয়াছেনঃ 'কোন কাজের আদেশ করার জন্য রাসূলে করীম (স) আদেশ করিয়া থাকিলে সেই মূল কাজের জন্য রাসূলে করীমের নির্দেশ করা হইল না। অতএব রাসূলের দেওয়া ফয়সালা অনুরূপ আমল করা ওয়াজিব। কিন্তু আল্লামা রাযী বলিয়াছেনঃ এই মত ঠিক নয়। বরং কোন কাজ করার জন্য কাহাকেও আদেশ করার জন্য আদেশ করা হইলে তাহা সেই মূল আদেশকারীরই আদেশ হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

হযরত উমর (রা) রাসূলে করীম (স)-এর এই আদেশ পাইয়া তাঁহার পুত্রকে সেই মতো করিতে আদেশ করিলেন। হযরত ইবনে উমর (রা) অতঃপর কি করিলেন, তাহা উপরোদ্ধৃত হাদীসের ভাষায় বলা হয় নাই। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

فَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ كَمَا اَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ তাঁহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইলেন, যেমন করার জন্য তাঁহাকে রাসূলে করীম (স) নির্দেশ দিয়াছিলেন।

ইহাতে বুঝা যায়, রাসূলে করীম (স)-এর আদেশকে তিনি তাঁহার প্রতি করা আদেশরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাসূলে করীম (স)-এর আদেশ মনে করিয়াই তিনি তাহা পালন করিয়াছিলেন। আর এই আলোকে বলা যায়, ইমাম রাযীর উপরোক্ত মতই যথার্থ।

হযরত ইবনে উমর (রা) তাঁহার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক্ দিয়াছিলেন, একথা বহু কয়টি বর্ণনায়ই উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু কয়টি তালাক্ দিয়াছিলেন, তাহা উপরোদ্ধৃত বুখারীর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় নাই। তবে মুসলিম শরীফের অপর একটি বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

اِنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَةً وَهِيَ حَائِضٌ

তিনি তাঁহার স্ত্রীকে এক তালাক্ দিয়াছিলেন তাহার ঋতুবতী হওয়া অবস্থায়।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে, স্ত্রীর হায়য হওয়া অবস্থায় তাহাকে এক তালাক্ দিলে তাহাকে ফিরাইয়া লওয়া (رجعة) করা কি ওয়াজিব? ইমাম মালিক ও আহমাদ ইবনে হাম্বল এই ওয়াজিব হওয়ার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জমহুর ফিকাহবিদ বলিয়াছেন, ইহা করা মুস্তাহাব। আর হেদায়াত গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ইহা করা ওয়াজিব। কেননা ইহা কারার জন্য রাসূলে করীম (স)-এর স্পষ্ট আদেশ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ হায়য অবস্থায় তালাক্ দেওয়াই যখন হারাম, তখন বিবাহ অবস্থা স্থায়ী বা বিলম্বিত রাখা ওয়াজিব হইবে। হাদীসের ভাষাঃ ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا 'স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইয়া ঘরে রাখিয়া দিবে'। ইহার অর্থ, তাহাকে নিজের স্ত্রীরূপে ঘরে স্থান দিবে, থাকিতে ও পরিতে দিবে—যতক্ষণ চলতি হায়য শেষ হওয়ার পর এক তুহর ও এক হায়য অতিক্রান্ত হইয়া আবার 'তুহর' অবস্থায় ফিরিয়া না আসে।

মূল হাদীসের ভাষা হইলঃ

ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ

অতঃপর ইচ্ছা করিলে পরবর্তী কালের জন্য তাহাকে স্ত্রী হিসাবে রাখিবে। আর রাখার ইচ্ছা না হইলে ও তালাক্ দেওয়ার ইচ্ছা হইলে তালাক্ দিবে—স্পর্শ করার পূর্বে।'

স্পর্শ করার পূর্বে 'অর্থ' যে তুহর-এ তালাক্ দিবে, সে তুহরে স্ত্রী সঙ্গম করিতে পারিবে না সেই তুহরে স্ত্রী সঙ্গম করা হইলে সে স্ত্রীকে সে তুহরে তালাক্ দেওয়া চলিবে না। ইহা হইতে বুঝা গেল, স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তাহাকে তালাক্ দেওয়া যাইবে না, তালাক্ দিলে দিতে হইবে তুহর অবস্থায়। কিন্তু যে তুহরে স্ত্রী সঙ্গম হইয়াছে, সে তুহরে তালাক্ দেওয়া চলিবে না।

হাদীসটির শেষ বাক্য হইলঃ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ ইহাই হইল সেই ইদ্দাত, যে ইদ্দাত পালনের কথা সম্মুখে রাখিয়া স্ত্রীকে তালাক্ দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করিয়াছেন।

'আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন' বলিয়া রাসূলে করীম (স) এই আয়াতটির দিকে ইংগিত করিয়াছেনঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (الطلاق: ١)

হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক্ দিবে, তখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ইদ্দাতের জন্য তালাক্ দাও।

ইহার অর্থ হইল, তালাক্ দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা দায়িত্বহীনতার আচরণ করিও না। স্বামী-স্ত্রীতে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটিলেই ক্রোধান্ধ হইয়া চট করিয়া তালাক্ দিয়া বসিবে না। এমনভাবে তালাক্ দিবে না যে তাহার পর স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়ারও কোন অবকাশ থাকিবে না। বরং তালাক্ যদি দিতেই হয় তাহা হইলে বিচার বিবেচনা করিয়া দিবে এবং তালাক দিবে ইদ্দাত পালনের উদ্দেশ্যে। আল্লামা জামাখশারী এই আয়াতের অর্থ করিয়াছেন এই ভাষায়ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ اى مُسْتَقْبِلَاتٍ لِعِدَّتِهِنَّ 'তাহাদিগকে তালাক্ দাও তাহাদের ইদ্দাতের জন্য' অর্থ, তাহাদের ইদ্দাত কাল সম্মুখে রাখিয়া তালাক দাও'।[১]

এই হাদীস হইতে শরীয়াতের কয়েকটি বিধান জানা যায়ঃ (১) স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তাহাকে তালাক্ দেওয়া হারাম। এই কারণেই হযরত উমর (রা)-এর নিকট হযরত ইবনে উমর (রা)-এর তালাক্ দানের বিবরণ শুনিয়া রাসূলে করীম (স) রাগান্বিত হইয়াছিলেন। আর রাসূলে করীম (স) কোন হারাম কাজেই রাগান্বিত হইতে পারেন, অ-হারাম কাজে নয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ হায়য অবস্থায়ই

---

১. এই আয়াত সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা জানিবার জন্য পাঠ করুন 'তাফহীমুল কুরআন সূরা আত-তালাক-এর ১নং টীকাঃ২৮ পারা। (عمدة القارى، نيل الاوطار، معالم السنن)

তালাক্ দেয় তবে তাহা সংঘটিত হইবে। তবে কাহারও কাহারও মতে তালাক্ দিলেও তাহা কার্যকর হইবে না। ইহা জাহেরী ফিকাহবিদদের মত। কোন কোন তাবেয়ীও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। (২) সুন্নাত তরীকা মত তালাক্ দেওয়ার নিয়ম হইল স্ত্রীর তুহর অবস্থায় তালাক্ দেওয়া। (৩) তালাক্ দেওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়ার জন্য নবী করীম (স) আদেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হযরত ইবনে উমর (রা) তাঁহার স্ত্রীকে এমন তালক্ দিয়াছিলেন, যে তালাক্রের পর স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়ার সুযোগও থাকে। তাহাকে বলা হয় রিজয়ী তালাক। আর এক তালাক দেওয়ার কথা যে হাদীসের বর্ণনা হইতে জানা গিয়াছে তাহা আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহা 'বাঈন' তালাক্ ছিল না। কেননা বাঈন তালাক্ দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া যায় না। (৪) রিজয়ী তালাক্ দেওয়ার পর স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে পারে। সেজন্য স্ত্রীর রাযী অরাযীর কোন প্রশ্ন নাই। এই ফিরাইয়া লওয়াটা স্ত্রীর রাযী হওয়ার উপর নির্ভরশীলও নয়। (৫) রিজয়ী তালাক্ দেওয়া স্ত্রীকে শুধু মুখের কথা দ্বারাই ফিরাইয়া লওয়া চলিবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই। তবে এ জন্য কোন কাজ করিতে হইবে কিনা, এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রা) 'হ্যাঁ' বলিয়াছেন এবং ইমাম শাফেয়ী 'না' বলিয়াছেন। (৬) ইমাম আবূ হানীফা এই হাদীসের ভিত্তিতে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তালাক্ দেওয়া হইলে স্বামী ঘুনাহগার হইবে। স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া তাহার কর্তব্য। যদি ইদ্দাতের মধ্যে ফিরাইয়া না লয় বরং ইদ্দাত শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে এক তালাকেই স্ত্রী হারাম হইয়া যাইবে।

এক সঙ্গে তিন তালাক্

قَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهٰذَا فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ (بخارى، مسلم)

লাইস নাফে হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইবনে উমর (রা) কে যখনই কোন তিন তালাক্ দাতা ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইত, তখনই তিনি সেই লোককে বলিতেনঃ তুমি যদি এক তালাক বা দুই তালাক্ দিতে (তাহা হইলে তোমার পক্ষে খুবই ভাল হইত); কেননা নবী করীম (স) আমাকে এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন। বস্তুত যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক্ দিয়া দেয় তাহা হইলে সে (স্ত্রী) তাহার জন্য হারাম হইয়া গেল। যতক্ষণ না সে অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা হযরত ইবনে উমর (রা)-এর কথা 'তুমি যদি এক তালাক্ বা দুই তালাক্ দিতে'—ইহা অসম্পূর্ণ কথা। ইহার সম্পূর্ণরূপ হইতে পারে দুইটি কথা শামিল করিলে। একটি উপরে দুই বেষ্টনীর মধ্যে লিখা হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় কথা হইলঃ তাহা হইলে তুমি স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইবার অধিকারী হইতে। ইহার তাৎপর্য হইল, এক সঙ্গে তিন তালাক্ দেওয়ার পরিবর্তে যদি এক বা দুই তালাক্ দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে ফিরাইয়া স্ত্রী হিসাবেই গ্রহণ করিতে পারে। তখন কোন ঝামেলায় পড়িতে হয় না। কিন্তু যদি এক সঙ্গে তিন তালাক্ই দিয়া থাকে, তাহা হইলে দুঃখে মাথা কুটিয়া মরিলেও স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাকে পুনরায় স্ত্রী হিসাবে পাইতে হইলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষায় থাকিতে হইবে এবং কার্যত তাহা সম্ভব হইবে, স্ত্রী যদি অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করে, স্বামী স্ত্রী সঙ্গম হয়, তাহার পর সেই স্বামী মরিয়া যায় কিংবা তিন তালাক্ দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়, কেবল তখন। (عمدة القارى)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيْدَ اَخُوْبَنِيْ مُطَّلِبِ اِمْرَأَتِهِ ثَلَاثًا فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيْدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا اِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرٰى اِنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ

(مسند احمد، ابويعلى)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আবদে ইয়াজীদের পুত্র বনু মুত্তালিবের ভাই রুকানা তাহার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক্ দিয়াছিলেন। ফলে এজন্য তিনি খুব সাংঘাতিক ভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন—হযরত ইবনে আব্বাস বলেন—রাসূলে করীম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কিভাবে তোমার স্ত্রীকে তালাক্ দিলে? রুকানা বলিলেনঃ আমি তাহাকে তিন তালাক্ দিয়াছি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন—রাসূলে করীম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ একই বৈঠকে দিয়াছ কি? বলিলেনঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ ইহা তো মাত্র এক তালাক্। কাজেই তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লও যদি তুমি ইচ্ছা কর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, অতঃপর রুকানা তাঁহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইলেন। ইহা হইতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই মত গ্রহণ করিলেন যে, তালাক্ কেবলমাত্র প্রত্যেক তুহরে দেওয়া বাঞ্ছণীয়। (মুসনাদে আহমাদ, আবূ ইয়ালা)

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে তালাক্ সংক্রান্ত ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এখানে মুসনাদে আহমাদ হইতে হাদীসের যে ভাষা উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাইতেছে। তিরমিযী শরীফে আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে রুকানা তাঁহার পিতা হইতে তাঁহার দাদা অর্থাৎ রুকানা হইতে এই সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ভাষা এইরূপঃ

قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا اَرَدْتَ بِهَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ وَاللّٰهِ قُلْتُ وَاللّٰهِ قَالَ هُوَ مَا اَرَدْتَ

রুকানা বলিলেনঃ আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূল! আমি আমার স্ত্রীকে 'বাত্তা' তালাক্ দিয়াছি। নবী করীম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি ইহার দ্বারা কি নিয়্যাত করিয়াছ। বলিলেনঃ আমি বলিলাম এক তালাক্, নবী করীম (স) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম? বলিলাম, হ্যাঁ, কসম। রাসূলে করীম (স) বলিলেন, তাহা হইলে তুমি যাহা নিয়্যাত করিয়াছ, তাহাই হইবে। اَلْبَتَّةَ অর্থ চূড়ান্তভাবে কর্তন করা, দৃঢ় সংকল্প কার্যকর করা।

এই বর্ণনাটি পূর্বোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। 'নেছায়া' গ্রন্থে বলা হইয়াছেঃ 'রুকানার কথা طَلَّقْتُهَا اَلْبَتَّةَ অর্থ, তাহাকে আমি কর্তনকারী ও বিচ্ছিন্নকারী তালাক্ দিয়াছি। এই কথাটির অর্থ তিনি তিন তালাক্ দিয়াছেন এইরূপ গ্রহণ করা হাদীসের বর্ণনাকারীর নিজের মত মাত্র এবং নিজের এই মতের প্রতিফলন ঘটাইয়া মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থের প্রথমোদ্ধৃত হাদীসটিতে তিন তালাকের কথা স্পষ্ট

ভাষায় উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। অথচ মূলত রুকানা তিন তালাক্ নয় 'আল্-বাত্তা' তালাক্ দিয়াছিলেন। কাজেই এক সঙ্গে তিন তালাক্ দিলেও তাহাতে এক তালাক্ রিজয়ী হইবে, হাদীসটি হইতে এইরূপ মত গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটির উল্লেখ করার পর বলিয়াছেনঃ এই বর্ণনার সনদে জুবাইর ইবনে সায়ীদ আল হাশেমী একজন বর্ণনাকারী রহিয়াছেন। বহু কয়জন মুহাদ্দিস তাঁহাকে 'যয়ীফ' বলিয়াছেন। ইমাম বুখারীও তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ إِنَّهُ يَضْطَرِبُ 'তিনি হাদীসের কথাগুলি ওলট-পালট করিয়া দিয়া থাকেন'। কখনও উহাতে তালাক্ বলেন, কখনও বলেন, এক তালাক্। আর আসলে সহীহতম কথা হইল, রুকানা 'আল-বাত্তা' তালাক্ দিয়াছিলেন, তিন তালাক্ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে উহার ভাবার্থ হিসাবে। তিনি নিজে তাহা বলেন নাই।

রুকানার স্ত্রীর নাম ছিল 'সুহাইমা'।

তিরমিযী হইতে উদ্ধৃত এই হাদীসটিতে রাসূলে করীম (স)-এর কথা হিসাবে বলা হইয়াছেঃ هُوَ مَا أَرَدْتَ 'উহা তাহাই যাহার তুমি নিয়্যাত বা ইচ্ছা করিয়াছ'। আবূ দায়ূদের বর্ণনা ইহার পরিবর্তে রাসূল সম্পর্কে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ 'রাসূলে করীম (স) রুকানার স্ত্রীকে তাঁহার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন' ইহার ভিত্তিতেই ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেনঃ

فِيهِ بَيَانٌ أَنَّ طَلَاقَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةٌ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ غَيْرُ بَائِنٌ

তালাক দিয়া চূড়ান্তভাবে কাটিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলার কথা বলিলে এক তালাক্ হইবে—যদি এইরূপ বলিয়া এক তালাকের বেশী দেওয়ার নিয়্যাত না করিয়া থাকে এবং এইরূপ তালাকে রিজয়ী তালাক্ হইয়া থাকে, স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া যায়। সম্পূর্ণ হারাম হইয়া যায় না।

কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে বলেঃ أَنْتَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ 'তুমি তালক্ চূড়ান্তভাবে' তাহা হইলে ইহার ফলে কয়টি তালাক্ হইবে, সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হইয়াছে। হযরত উমর (রা)-এর মতে ইহাতে এক তালাক্ হইবে, আর যদি তিন তালাকের নিয়্যাত করে তবে তাহাই হইবে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিছু লোক বলিয়াছেন, আল্-বাত্তা তালাক্ দিলে তিন তালাক্ হয়। হযরত আলী, ইবনে উমর, ইবনুল মুসাইয়্যিব, ওরওয়া, জুহরী, ইবনে আবূ লাইলা, ইমাম মালিক, আওজায়ী ও আবূ উবাইদ প্রমুখ ফিকাহবিদগণ এইমত দিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

মুল্লা আলী আল্-ক্বারী বলিয়াছেনঃ আল-বাত্তা তালাকে ইমাম শাফেয়ীর মতে এক তালাক্ রিজয়ী হয়—দুই বা তিন তালাকের নিয়্যাত করিলে তাহাই হইবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে এক তালাক্ বাঈন হইবে, তবে তিন তালাকের নিয়্যাত করিলে তিন তালাক্ই হইবে। ইমাম মালিকের মতে সম্পূর্ণভাবে তিন তালাক হইবে।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেনঃ এ ব্যাপারে ব্যক্তির নিয়্যাতই আসল। যেমন নিয়্যাত হইবে তালাক্ ততটাই হইবে। (عمدة القارى، تحفة الاحوذى، مرقات)

উপরে উদ্ধৃত এই বর্ণনা দুইটি মূলত একই ঘটনা সম্পর্কে। এই ঘটনার আসল কথা হইল, রুকানা তাঁহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক্ দেন নাই। তিনি আল-বাত্তা তালাক্ দিয়াছেন। আর এইরূপ তালাকে তালাক্ দাতার নিয়্যাতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিয়্যাত যে কয় তালাকের হইবে, সেই কয় তালাকই সংঘটিত হইবে।

রুকানা বলিয়াছেনঃ 'একই বৈঠকে তালাক্ দিয়াছি', সম্ভবতঃ ইহার অর্থ এক শব্দে বা একবাক্যে তালাক্ দিয়াছি—একই তালাক্ শব্দের বার বার উল্লেখ না করিয়া। যেমন বলা হইয়াছেঃ তোমাকে তিন তালাক্ দিয়াছি। যদি কেহ বলেঃ তুমি তালাক্, তুমি তালাক্, তুমি তালাক্ এবং ইহাতে যদি একই কথার তাকীদ মনে না করা হইয়া থাকে ও এই বাক্য কয়টি ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে উহার ফলে তিন তালাক্ হইয়া যাইবে। তাহা এক মজলিসে বলিলেও ফলে কোন পার্থক্য হইবে না। (بلوغ الاماني)

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِىْ اَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ اِنَاةٌ فَلَوْ اَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَاَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (مسلم، مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বৎসর তালাকের অবস্থা এই ছিল যে, তিন তালাক দিলে এক তালাক্ সংঘটিত হইত। পরবর্তী কালে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলিলেনঃ যে ব্যাপারে লোকদের জন্য বিশেষ মর্যাদা, ধৈর্যসহ অপেক্ষা ও অবকাশ ছিল, তাহাতে লোকেরা খুব তাড়াহুড়া করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই আমরা উহা তাহাদের উপর কার্যকর করিব না কেন! অতঃপর তিনি উহাকে তাহাদের উপর কার্যকর করিয়া দিলেন। (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা হাদীসের মূল বক্তব্যটি রাসূলে করীম (স)-এর নয়, বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কথা। আর তিনি একজন সাহাবী বিধায় হাদীস বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী ইহা একটি মরফু হাদীসের মর্যাদা পায়।

হাদীসটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকারী ও ফিকাহ্‌বিদগণ এই হাদীসটি লইয়া যথেষ্ট পর্যালোচনা করিয়াছেন। ইহার সনদ যাচাই পরীক্ষা করিয়াছেন এবং ইহার তাৎপর্য লইয়া যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক ও সওয়াল জওয়াব করা হইয়াছে।

মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত এই বর্ণনাটির প্রথম বর্ণনাকারী (হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে) হইলেন তায়ূস তাবেয়ী। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত এই হাদীসেরই আরও দুইটি বর্ণনার প্রথম বর্ণনাকারী হইলেন চাহ্‌বা তাবেয়ী। সে বর্ণনা দুইটি এখানে পরপর উদ্ধৃত করা যাইতেছে। প্রথমটি এইঃ

اَنَّ اَبَا الصَّهْبَا قَالَ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ اَتَعْلَمُ اِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صلعم وَاَبِىْ بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ اِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

আবূ চাহ্‌বা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'আপনি কি জানেন, রাসূলে করীম (স)' হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম তিন বছর তিন তালাককে এক তালাক্ গণ্য করা হইত? ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেনঃ হ্যা।

দ্বিতীয়টি এইঃ

اَنَّ اَبَا الصَّهْبَا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هُنَاتِكَ اَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم وَاَبِىْ بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ تَابَعَ النَّاسُ فِى الطَّلَاقِ فَاَجَازَهُ عَلَيْهِمْ

আবূ চাহ্‌বা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)কে বলিলেনঃ আপনার জ্ঞান তথ্য হইতে কিছু প্রকাশ করুন। রাসূলে করীম (স) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে তিন তালাক্ কি এক তালাক্ ছিল না? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তাহাই ছিল বটে; কিন্তু হযরত উমর (রা)-এর সময়ে লোকেরা পরপর তালাক্ দিতে শুরু করিলে তিনি তাহাদের উপর তাহাই কার্যকর করিয়া দিলেন।

মসলিম শরীফের বর্ণনা এই পর্যন্তই। কিন্তু এই হাদীসটিই আবূ দায়ূদ গ্রন্থে আবূ চাহ্‌বা কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উহার ভাষায় যে পার্থক্য আছে তাহা এইরূপঃ

اِنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهُ وَاحِدَةً

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, এক ব্যক্তি যখন তাহার স্ত্রীকে বিবাহের পর সঙ্গম করার পূর্বেই তালাক্ দিত, তখন লোকেরা তিন তালাক্‌কে এক তালাক্ গণ্য করিত।

উপরোদ্ধৃত চার প্রকারের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, একটি মূল ঘটনার বর্ণনা চার ভাবেই হইয়াছে এবং ইহাতে মূল হাদীসের ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দিয়াছে। প্রথম উদ্ধৃত হাদীসটির ভাষা হইতে বাহ্যত মনে হয়, সাধারণভাবে তিন তালাক্ দেওয়া হইলেই এক তালাক্ গণ্য করা হইত এবং নবী করীম (স), হযরত আবূ বকর, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের শুরু জামানা পর্যন্ত এইরূপ হইতে থাকে। তখন স্বামী স্ত্রীকে সহজেই ফিরাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাহার খিলাফতের দুই বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিন তালাক্‌কে তিন তালাক্ই কার্যকর করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার নিজের করা কাজ। তাঁহার এই কাজটির পশ্চাতে রাসূলে করীম (স)-এর কোন উক্তি বা কুরআন মজীদের কোন আয়াতের সমর্থন ছিল এমন কথা বর্ণনার বাহ্যিক ভাষা হইতে বুঝা-ই যায় না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শরীয়াতের একটা ব্যাপারে রাসূলে করীম (স) ও প্রথম খলীফার আমলে এক রকমের রায় দেওয়া হইত। হযরত উমর (রা) নিজের খিলাফতের আমলে সে রায় নিজ ইচ্ছামত পরিবর্তন করিয়া ভিন্নভাবে কার্যকর করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ করার কি তাঁহার কোন ইখতিয়ার ছিল?

কিন্তু আবূ দায়ূদের বর্ণনাটি পাঠ করিলে এই প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকে না। আবূ দায়ূদের বর্ণনা হইতে জানা যায়, তিন তালক্ দেওয়া সত্ত্বেও তাহাতে মাত্র এক তালাক্ সংঘটিত হওয়ার প্রচলন সাধারণ ভাবে সর্বক্ষেত্রে ছিল না। ইহা হইতে কেবলমাত্র তখন, যদি কেহ বিবাহ করার পর স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করার পূর্বেই তাহাকে এক সঙ্গে তিন তালাক্ দিয়া দিত, তখন। সঙ্গমকৃত স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক্ দেওয়া হইলে তাহাতে তিন তালাক্-ই সংঘটিত হইত, এক তালাক্ নয়। হাদীসের উদ্ধৃত বর্ণনা সমূহের ভিত্তিতে ইহা হইল একটা মোটামুটি পর্যালোচনা।

ইমাম নববী লিখিয়াছেন, স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক্ দেওয়া হইলে তখন শরীয়াতের ফয়সালা কি, এই বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে বলেঃ

أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا 'তুমি তিন তালাক্, এই বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল এবং একালের ও সেকালের জমহুর শরীয়াতবিদগণ বলিয়াছেন, তিন তালাক্ সংঘটিত হইবে। আর তায়ূস ও জাহেরী মাযহাবের কিছু সংখ্যক আলেমের মতে ইহাতে মাত্র এক তালাক হইবে, তিন তালাক্ নয়। হাজ্জাজ ইবনে আরতাত ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হইতও এইমতই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের প্রখ্যাত মত হইল, এইরূপ বলা হইলে তাহাতে কোন কিছুই হয় না। ইবনে মুক্কাতিল ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হইতেও এইরূপ মতের বর্ণনা জানা যায়। ইঁহারা সকলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃত হাদীসকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় হযরত ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তিন তালাক্ দিয়া দিলেন; কিন্তু তাহা গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ রুকানা সম্পর্কেও বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক্ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নবী করীম (স) তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। এই দুইটি বর্ণনাও এই শেষোক্ত লোকদের মত গঠনে সাহায্য করিয়াছে, এই দুইটি হাদীসও তাহাদের দলীল।

আহ্লি সুন্নত আল-জামায়াতের চারজন শ্রেষ্ঠ ইমাম ও জমহুর ফিকাহবিদদের মতের প্রধান উৎস হইল কুরআন মজীদের আয়াতঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا (الطلاق:١)

ইহাই হইল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। যে লোক আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করিবে, সে নিজের উপর জুলুম করিবে। তুমি জান না, হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা ইহার পর কোন ব্যাপার ঘটাইতে পারেন।

আল্লাহ্র সীমা অর্থ, আল্লাহ্র দেওয়া আইন বিধান। তিনি ইহা বান্দাহদের পালন করা ও মানিয়া লওয়ার জন্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। ইহা লংঘন করিতে তিনি নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তাই যে লোক ইহা লংঘন করে সে নিজের উপর নিজে জুলুম করে। নিজেকে ধ্বংসকেন্দ্রে পৌছাইয়া দেয়।

যে ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলা পরে ঘটাইতে পারেন বলিয়া জানানো হইয়াছে, তাহা হইল আল্লাহ্ তা'আলা তালাক্ দাতার মনের পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। তাহাতে ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পরিবর্তে প্রেম ভালবাসা ও সন্তুষ্টি জানাইয়া দিতে পারেন। অনীহার পরিবর্তে আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দিতে পারেন। তালক্ দেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছাকে হরণ করিয়া অনুতাপ ও লজ্জা জাগাইয়া দিতে পারেন। আর তাহার পর লোকটি এই তালাক্ দেওয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে। এই আয়াতে امر। শব্দ বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা 'স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়ার ইচ্ছা ও আগ্রহ' বুঝাইয়াছেন। এ ব্যাপারে সমস্ত তাফসীরকারই সম্পূর্ণ একমত। আর সমস্ত কথার সার হইল, এক তালাক্ দেওয়ার উৎসাহ দান এবং তিন তালাক্ দিতে নিষেধ করণ ও বিরত রাখা। তাহা সত্ত্বেও যদি কেহ এক সঙ্গে তিন তালাক্ দেয়, তাহা হইলে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। কেননা ইহার ফলে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও তাহাকে ফিরাইয়া লওয়ার আর কোন পথ উন্মুক্ত পায় না। (قرطبى)

ইমাম নববী লিখিয়াছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতের ভিত্তিতে জমহুর ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেন, তালাক্ দাতা যেহেতু এক সঙ্গে তিন তালাক্ বাঈন দিয়াছে, এই কারণে তাহার মনে অনুতাপ ও অনুশোচনা জাগা স্বাভাবিক। এই কথা-ই উক্ত আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে। উহাতে যদি তিন তালাক্ সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে উহাতে রিজ্য়ী তালাক্ হইবে। আর রিজ্য়ী তালাক্ হইলে তাহাতে

অনুতাপ অনুশোচনার কোন প্রশ্ন থাকে না। রুকানার হাদীস সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য হইল, রুকানা তো আল্-বাত্তাতা' তালাক দিয়াছিলেন, সুস্পষ্ট ভাষায় তিন তালাক্ দেন নাই। আর 'আল-বাত্তাতা' তালাকে এক বা তিন—যাহারই নিয়্যাত করা হইবে তাহাই সংঘটিত হইতে পারে। নবী করীম (স) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتَ اِلَّا وَاحِدَةً 'আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বল যে, তুমি এক তালাকেরই নিয়্যাত করিয়াছিলে'? রুকানা বলিলেন, وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُ اِلَّا وَاحِدَةً আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি এক তালাক্ ছাড়া আর কিছুরই নিয়্যাত করি নাই। এই কথোপকথন হইতেই প্রমাণিত হয় যে, রুকানা তিন তালাকের নিয়্যাত করিলে তিন তালাক্ই হইতে পারিত। নতুবা এইরূপ শপথ করানোর কোন তাৎপর্য থাকিত না। এক কথায় ইহাতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইল যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা সংঘটিত ও কার্যকর হইবে। রুকানা তিন তালাক্ দিয়া ছিলেন; কিন্তু নবী করীম (স) উহাকে এক তালাক্ হিসাবে কার্যকর করিয়া ছিলেন বলিয়া বিপরীত মতের লোকেরা দলীল হিসাবে যে বর্ণনাটিকে উপস্থাপিত করিয়াছে, উহা একটি যয়ীফ বর্ণনা। অজ্ঞাতনামা লোকেরা উহার বর্ণনা করিয়াছে। এই বর্ণনাটির আসল ও যথার্থ কথা হইল, রুকানা তিন তালাক্ দেন নাই, দিয়াছিলেন 'আল-বাত্তাতা' তালাক্। আর আল-বাত্তাতা তালাকে এক ও তিন উভয় ধরনের তালাক্ অর্থ করা যাইতে পারে। ফলে এই যয়ীফ বর্ণনাটির বর্ণনাকারী মনে করিয়াছেন যে, উহাতে তিন তালাক্ হইয়াছে এবং তাহার এই ধারণাটিকেই সে হাদীসের বর্ণনা হিসাবে চালাইয়া দিয়াছে। আর ইহাতেই সে মারাত্মক ভুল করিয়া বসিয়াছে।

হযরত ইবনে উমর (রা) সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, উহার সহীহ বর্ণনা হইল, তিনি মাত্র এক তালাক দিয়াছিলেন, তিন তালাক্ নয়। কাজেই তিন তালাক্ এক তালাক্ করা হইয়াছে, উহার ভিত্তিতে এইরূপ কথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।

তৃতীয়, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ইহার সঠিক তাৎপর্য ও জওয়াব দান পর্যায়ে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন। তবে যথার্থ ও সহীহতম কথা এই যে, ইসলামের প্রথম দিকে একজন লোক যদি স্ত্রীকে বলিতঃ তুমি তালাক্, তুমি তালাক, তুমি তালাক্ এবং সে এইরূপ বলিয়া একই কথার তাকীদ ও প্রত্যেকটি কথা নূতন অর্থে না বলার নিয়্যাত করিত, তাহা হইলে উহাতে এক তালাক্ সংঘটিত হওয়ার ফয়সালা-ই দেওয়া হইত। কেননা এই বাক্যগুলি নূতন করিয়া এক-একটি তালাক্ সংঘটোনের উদ্দেশ্যে বলা হইত না। তখন সাধারণত মনে করা হইত যে, সে আসলে মাত্র এক তালাক্ দিয়াছে ও সেইটির তাকীদের উদ্দেশ্যেই পরবর্তী বাক্য দুইটি উচ্চারণ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু উত্তর কালে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত আমলে লোকেরা তালাক্ দিতে গিয়া এই রকমেই তিনটি বাক্য বলিত ও প্রত্যেকটি বাক্য নূতন করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিল। ফলে সাধারণত বুঝা যাইতে লাগিল যে,লোকটি আলাদা-আলাদা ভাবে তিনটি তালাক্-ই দিয়াছে। এই কারণে তখন উহার দ্বারা তিন তালাক্ই সংঘটিত করানো হইল। হযরত উমর (রা)-এর উক্ত কথার প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই। কাজেই হযরত উমর (রা) শরীয়াতের আইন পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিলেন এমন কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। কেহ কেহ এইরূপ তাৎপর্যও বলিয়াছেন যে, ইসলামের প্রথম দিকে নবী করীম (স) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলে লোকেরা সাধারণত এক তালাক্ই দিত উচ্চারণ যতটারই করা হউক না কেন। এই কারণে তখন এক তালাক্ই সংঘটিত করানো হইত। আর হযরত উমর (রা)-এর আমলে লোকেরা এক সঙ্গেই তিন তালাক্ দিতে শুরু করিয়াছিল বিধায় তাহাতে তিন তালাক্ই সংঘটিত করানো উচিত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে হযরত উমর (রা)-এর কথাটি হইতেছে লোকদের অভ্যাস পরিবর্তিত হওয়ার সংবাদ দান পর্যায়ের। তিনি নিজে শরীয়াতের হুকুম পরিবর্তন করিয়াছেন তাঁহার উক্ত কথাটি সেই পর্যায়ের নয়।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেন, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী কালের জমহুর আলেমগণ ইমাম আওজায়ী, নখয়ী, সওরী, আবূ হানীফা ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ

ইবনে হাম্বল এবং তাঁহাদের সঙ্গী-সাথীগণ, ইস্‌হাক, আবূ সওর, আবূ উবাই ও অন্যান্য বহু সংখ্যক বড় বড় ফিকাহবিদ এই মত দিয়াছেন যে, কোন লোক যদি তাহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক্ দেয়, তবে তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। যদিও সে লোকটি গুনাহগার হইবে। ইঁহারা এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই মতের বিপরীত মত পোষণকারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আর তাহারা আহলুস্ সুন্নাত্ আল-জামায়াতের বহির্ভূত, তাহারা আসলে বিদয়াতপন্থী। তাহাদের মতের কোন মূল্য নাই। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করা যাইতে পারে না। উপরন্তু যে জামায়াত কুরআন ও সুন্নাতে কোনরূপ রদবদল করিয়াছে বলিয়া ধারণাও করা যায় না—সেই সুন্নাত আল্ জামায়াত হইতে তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে।

ইমাম তাহাভী হযরত উমর (রা)-এর বক্তব্যটি নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِى الطَّلَاقِ إِنَاةٌ وَإِنَّهُ مَنْ تَعَجَّلَ إِنَاةَ اللّٰهِ فِى الطَّلَاقِ أَلْزَمْنَاهُ إِيَّاهُ

হে জনগণ! তালাকের ব্যাপারে তোমাদের জন্য একটা মহা সুযোগ ও অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল। যে লোক আল্লাহ্‌র দেওয়া এই সুযোগকে তালাকের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ও ত্বরান্বিত করিবে, আমরা তাহাকে উহার জন্য বাধ্য করিয়া দিব।

ইহা ইমাম তাহাভী'র সহীহ সনদে উদ্ধৃত বর্ণনা। হযরত উমর (রা) এই ভাষণ দিয়াছিলেন সেই লোকদের সম্মুখে, যাঁহারা নবী করীম (স)-এর যুগে কি বিধান ছিল তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই হযরত উমর (রা)-এর এই কথার প্রতিবাদ করেন নাই। কাজেই ইহা একটা অতিবড় ও অকাট্য প্রমাণ—ইহা সাহাবীদের ইজমা (اجماع)। নবী করীম (স)-এর যুগে অনেক ব্যাপারের এক রকমের তাৎপর্য ছিল, তাঁহারই সঙ্গী-সাথীগণ সেই সবেরই ভিন্ন তাৎপর্য করিয়াছেন পরবর্তী কালে। ফলে ইহা এমন একটি দলীল হইয়া দাড়াইয়াছে যাহা পূর্ববর্তী তাৎপর্য বাতিল করিয়া দিয়াছে। সাহাবীদের ইজমা কুরআনের অকাট্য সুস্পষ্ট ঘোষণার—نص-এর মতই ইলমে ইয়াকীন দেয়। কাজেই এই ব্যাপারে কোনই সন্দেহ বা মত-বিরোধের অবকাশ থাকিতে পারে না। সাহাবীদের ইজমা 'মশহুর হাদীস' হইতেও অধিক বলিষ্ঠ। উহার ভিত্তিতে অকাট্য দলীল— نص -এর উপর বৃদ্ধি সাধন ও জায়েয।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর অন্য একটি কথা হইতেও তাঁহার উপরোদ্ধৃত বর্ণনা বাতিল হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে, একটি লোক আসিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা)কে বলিলঃ আমার চাচা তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেনঃ

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللّٰهَ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ

তোমার চাচা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়াছে ও শয়তানের আনুগত্য করিয়াছে।

কিন্তু অতঃপর তিনি তাহার জন্য কোন উপায় বলিয়া দেন নাই। একথা বলেন নাই যে, 'ইহাতে এক তালাক হইয়াছে—চিন্তার কারণ নাই'।

ইহার পর বলা হইয়াছেঃ 'যে লোক এই তিনি তালাক্ দেওয়া স্ত্রীকে তাহার জন্য হালাল মনে করে তাহার সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলিলেনঃ

مَنْ يُّخَادِعُ اللّٰهَ يُخَادِعْهُ

যে লোক আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিবে, আল্লাহ্‌ও তাহাকে ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিবেন।

ইহার অর্থ, তিন তালাক্ দিয়াও স্ত্রীকে হালাল মনে করা আল্লাহ্র সহিত ধোঁকাবাজি করার সমান অপরাধ। মুজাহিদদের সূত্রের একটি বর্ণনাও ইহার সমর্থক রহিয়াছে। এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল; সে তাহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক্ দিয়া ফেলিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি চুপ থাকিলেন। মনে হইল যেন তিনি ইহা প্রত্যাখ্যান করিবেন। পরে বলিবেনঃ

وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللّٰهَ فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ

তুমি তাহাকে ভয় কর নাই। কাজেই আমি তোমার জন্য মুক্তির কোন পথ দেখিতেছি না। তুমি তোমার আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়াছ এবং তোমার স্ত্রী তোমার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তোমার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছে। (بذل المحمود)

বস্তুত হাদীসের বর্ণনাকারীই যদি সেই হাদীসের মূল প্রতিপাদ্যের বিপরীত ফতোয়া দেন তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনা অপেক্ষা তাঁহার ফতোয়া-ই গ্রহণের দিক দিয়া অগ্রাধিকার পাইবে, ইহা সর্বজনমান্য নীতি।

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, তিনি হয়ত পরে সঠিক কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার পূর্ববর্তী কথাকে তিনি নিজেই বাতিল করিয়া দিয়াছেন। কেননা তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নামে এক রকমের বর্ণনা করিয়া উহার বিপরীত কাজ করিতে পারেন না।

আল্লামা আবূ বকর আল-জাস্সাস বলিয়াছেন, হযরত ইবনে আব্বাস যদি মনে করিয়াও থাকেন যে, তিন তালাক্ এক সঙ্গে দিলে তাহাতে এক তালাক্ই হয়, তবুও তাহা বাতিল মনে করিতে হইবে কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে। কুরআনের আয়াত হইলঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ 'তালাক্ মাত্র দুইবার'। অর্থাৎ আয়াত অনুযায়ী দুই তালাক্ পর পর দেওয়া হইলে যদি কার্যকর হইতে পারে তাহা হইলে এক সঙ্গে তিন তালাক্ দিলে তাহা কার্যকর হইবে না কেন? আর تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ 'ভালভাবে ছাড়িয়া দেওয়া' কুরআনের কথাটি হইতেও এক সঙ্গে তিন তালাক্ দেওয়ার ও তাহা কার্যকর হওয়ার কথাই বুঝায়। এই দীর্ঘ আলোচনা হইতে নিঃসন্দেহ জানা গেল যে, এক সঙ্গে তিন তালাক্ দিলে তাহাতে তিন তালাক্ই সংঘটিত ও কার্যকর হইবে এক তালাক্ নয়। এই কথাটি খোদ কুরআন হইতেই প্রমাণিত।

(عمدة القارى، احكام القران للجصاص)

তিন তালাক্ পাওয়া স্ত্রীর প্রথম স্বামীর সহিত বিবাহ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اِمْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَائَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِىْ فَبَتَّ طَلَاقِىْ وَاِنِّىْ نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيِّ وَاِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْنَ اِلٰى رِفَاعَةَ لَا حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ

(بخارى، مسلم، الطبرانى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রিফায়া আল কুরাজীর স্ত্রী রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলঃ ইয়া রাসূল! রিফায়া আমাকে তালাক্ দিয়াছে। আমার সে তালাক্ অকাট্য ও

কার্যকর হইয়াছে। অতঃপর আমি আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর আল কুরাজীকে বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু তাহার নিকট যাহা আছে তাহা কাপড়ের 'পাড়ের' মত মাত্র। তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ সম্ভবত তুমি রিফায়ার নিকট ফিরিয়া যাইতে চাও। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে না যতক্ষণ সে (আবদুর রহমান) তোমার মধু পান না করিবে এবং তুমি তাহার মধু পান না করিবে।

(বুখারী, মুসলিম, তাবারানী)

ব্যাখ্যা তাবারানীর বর্ণনা হইতে জানা গিয়াছে, এই স্ত্রী লোকটির নাম ছিল তমীমা বিনতে অহাব। সে প্রথমে কুরাজী বংশের রিফায়া নামক একটি লোকের স্ত্রী ছিল। কিন্তু সে পরে তালাক্ দেয়। সে তালাক্ অকাট্য ও চূড়ান্ত হইয়া যায়। بَتَّ طَلَاقِي অর্থ قَطَعَ قَطْعًا كُلِّيًّا 'সে আমাকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়'। ইহার অর্থ দাঁড়ায়, সে হয়ত এক সঙ্গে তিন তালাক্ দিয়াছে; কিংবা একের পর এক করিয়া তিন তালাক্ দিয়াছে। এই তিন তালাকের কারণে সে তাহার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হইয়া গিয়াছে ও পরে সে আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর নামক কুরাজী বংশেরই অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে। মেয়ে লোকটি বলিলঃ তাহার সহিত যাহা আছে, তাহা কাপড়ের পাড়ের মত। এই কথা দ্বারা সে বুঝাইতে চাহিয়াছ যে, আবদুর রহমানের পুরুষাঙ্গ শক্তিহীন, কাপড়ের পাড় যতটা শক্ত, তাহার পুরুষাঙ্গও ততটা শক্ত। অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্বল। (তাহা দিয়া সে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না।) এই কথাটি শুনিয়াই নবী করীম (স) বুঝিতে পারিলেন যে, মেয়ে লোকটি আবদুর রহমানের পৌরুষের প্রতি যৌনতার দিক দিয়া মোটেই সন্তুষ্ট নয়। এই কারণে সে তাহার স্ত্রী হইয়া থাকিতে রাযী নয় এবং সে তাহার পূর্ববর্তী স্বামী রিফায়া—যে তাহাকে পূর্বে তালাক্ দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল—এর নিকট যাইতে ও তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে চাহে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, এখন স্ত্রী লোকটি তাহার পূর্বের সেই তালাক্ দাতা স্বামীকে কি করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারে? নবী করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তাহার নিকট যাইতে ও তাহাকে স্বামীরূপে বরণ করিতে পার না। সে তোমার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছে। তবে তাহার একটি মাত্র পথ হইল, তুমি যদি তোমার বর্তমান স্বামীর সহিত সার্থক সঙ্গম কার্য করিতে পার এবং সে তোমাকে তালাক্ দেয় তবে তাহার পর তুমি তোমার সেই প্রথম স্বামী রিফায়াকে বিবাহ করিতে পারিবে—'মধুপান' অর্থ সার্থক স্বামী-স্ত্রী সঙ্গম। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় হযরত আয়েশার এই কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

রাসূলে করীম (স)-এর এই ঘোষণা কুরআন মজীদের স্পষ্ট ঘোষণার উপর ভিত্তিশীল। প্রথম কথাটি সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হইলঃ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (البقرة: ٢٣٠)

বর্তমান স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক্ দেয়, তাহা হইলে সে স্ত্রী লোকটি ও তাহার পূর্ববর্তী স্বামী যদি মনে করে যে, তাহারা পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হইয়া আল্লাহ্র সীমা সমূহ কায়েম ও রক্ষা করিতে পারিবে, তাহা হইলে তাহাদের দুইজনের পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হইতে কোন দোষ নাই।

আর দ্বিতীয় কথাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা হইলঃ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: ٢٣٠)

স্বামী যদি তাহার স্ত্রীকে (তিন) তালাক্ দিয়া দেয়, তাহা হইলে এই স্ত্রী তাহার জন্য হালাল হইবে না যতক্ষণ না সে অন্য এক স্বামী 'বিবাহ' করিবে।

অন্য এক স্বামীকে 'বিবাহ' করিলে তাহার (সে স্বামীর তালাক্ বা মৃত্যুর পর) প্রথম স্বামীর জন্য এই স্ত্রী হালাল হইবে। ইহা কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। এ অর্থে نكاح শব্দের অর্থ করা হইয়াছে

'বিবাহ'। কিন্তু এখানে এই 'নিকাহ' বা 'বিবাহ' বলিতে সত্যি-ই কি বুঝানো হইয়াছে, তাহা আলোচনা সাপেক্ষ।

বিবাহ বলিতে এখানে কি বুঝানো হইয়াছে ও কি কাজ হইলে প্রথম স্বামীর সহিত পুনরায় বিবাহিত হওয়া হালাল হইবে, এ বিষয়ে শরীয়াতবিদ লোকেরা নানা কথা বলিয়াছেন। সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এবং তাঁহার সমর্থকদের মত হইল, দ্বিতীয় একজনের সাথে শুধু বিবাহের আকদ (عقد) হওয়াই যথেষ্ট। হাসান ইবনে আবুল হাসান বলিয়াছেনঃ কেবলমাত্র সঙ্গমই যথেষ্ট নয়। স্ত্রী অঙ্গে শুক্র নিক্রমণ হওয়া জরুরী। জমহুর আলেম ও বিপুল সংখ্যক ফিকাহবিদ বলিয়াছেন, শুধু যৌন সংমই যথেষ্ট। আর তাহা হইল স্ত্রী অঙ্গের মধ্যে পুরুষাঙ্গের প্রবেশ করা—যাহার ফলে গোসল ওয়াজিব হয় এবং রোযা ও হজ্জ বিনষ্ট হয় এবং পূর্ণ মহরানা দিয়া দেওয়া ওয়াজিব হয়।

ইবনুল আরাবী বলিয়াছেন, আমার নিকট ফিকাহর এই মাসলাটি সর্বাপেক্ষা কঠিন ও দুর্বোধ্য। ফিকাহর নিয়ম ও মূল নীতি একটা জিনিসের নামের প্রথম ভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট, না উহার শেষ ভাগের সঙ্গে, ইহাই বড় প্রশ্ন। 'বিবাহ' কাজটির প্রথম ভাগ হইল শুধু আকদ হওয়া। আর উহার দ্বিতীয় ভাগ—উহার অনিবার্য পরিণতি স্ত্রী সঙ্গম। কুরআনের 'নিকাহ' শুদ্ধ হইতে উহার প্রথম ভাগ—অর্থাৎ আকদ—বুঝিলে সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের কথাকে সত্য মানিয়া লইতে হয়। আর শেষ ভাগ বুঝিলে, এই শর্ত করিতে হয় যে, দ্বিতীয় স্বামীর সহিত যৌন সঙ্গম ও তাহাতে শুক্র নিক্রমণ হওয়া জরুরী। কেননা ইহাই হইল স্বামী-স্ত্রীর মধু পানের সর্বশেষ পর্যায়।

ইবনুল মুনযির বলিয়াছেন, আয়াতের 'নিকাহ' অর্থ বিবাহ হওয়ার পর যৌন সুখ মাধুর্য লাভ করা। আর তাহা স্ত্রী সঙ্গমেই সম্ভব। অতএব প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীর হালাল হওয়া নির্ভর করে দ্বিতীয় স্বামীর সহিত বিবাহের আকদ ও সার্থক যৌন সঙ্গম সংঘটিত হওয়ার উপর।

যে সব লোকের নিকট এই পর্যায়ের হাদীস পৌঁছায় নাই কিংবা পৌঁছিয়া থাকিলেও যাঁহারা এই পর্যায়ের হাদীসকে সহীহ মনে করেন নাই, কেবলমাত্র তাহাকেই দ্বিতীয় স্বামীর সহিত শুধু 'আকদ-নিকাহ' হওয়াকেই প্রথম স্বামীর পক্ষে তাহার হালাল হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। কিন্তু এই পর্যায়ের হাদীস সহীহ না হওয়ার কোনই কারণ নাই, হযরত আয়েশা (রা) হইতে বুখারী বর্ণিত হাদীসটি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পর্যায়ে আরও একটি হাদীস হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। উহার ভাষা এইরূপঃ

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَه ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِه (دار قطنى)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে এ স্ত্রী তাহার জন্য হালাল হইবে না যতক্ষণ না সে তাহার ছাড়া অন্য এক স্বামী গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের দুইজনের প্রত্যেকের পরস্পরের মধুপান করিবে।

বুখারী উদ্ধৃত অপর একটি হাদীস হইতেও এই কথা জানা যায়। হাদীসটি এইঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ اِمْرَأَتَه ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَحِلُّ لِلْاَوَّلِ قَالَ حَتّٰى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْاَوَّلُ

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক্ দিল। পরে সে স্ত্রী অন্য এক স্বামী গ্রহণ করিল। পরে সেও তাহাকে তালাক্ দিল। এই সময় নবী করীম (স)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই স্ত্রী লোকটি কি তাহার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল? জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেন, না যতক্ষণ না এই দ্বিতীয় স্বামী তাহার মধু পান করিয়াছে, যেমন করিয়াছে প্রথম স্বামী।

এই দুইটি হাদীস হইতে কুরআনে ব্যবহৃত حَتّٰى تَنْكِحَ যতক্ষণ না বিবাহ করিবে কথাটির সঠিক তাৎপর্য স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। আর তাহা হইল, দ্বিতীয় স্বামীর সহিত বিবাহের আকদ হওয়ার পর যৌন সঙ্গম শুধু সঙ্গম নয়, সার্থক সঙ্গম হইতে হইবে এবং তাহাতে এই দুইজনের সমান ভাবে যৌন মাধুর্য লাভ করিতে হইবে। নতুবা অতঃপর এই স্বামী তাহাকে তালাক দিলে সে তাহার পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য হালাল হইবে না। নবী করীম (স)-এর কথা এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট, অকাট্য ও বলিষ্ঠ।

(عمدة القارى، تفسير القرطبى)

'কিতাবুল কুনিয়া' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব তাঁহার উপরোদ্ধৃত মত পরে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার ভিন্নতর কোন মত আছে বলা কোনক্রমেই সহীহ হইতে পারে না।

জোর পূর্বক তালাক লওয়া

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِىْ اِغْلَاقٍ

(ابوداؤد، ابن ماجه، مسند احمد، حاكم)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (স)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রতিবন্ধকতায় তালাক্ও হয় না, দাসমুক্ত করণও হয় না।

(আবূ দায়ূদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, হাকেম)

ব্যাখ্যা স্ত্রীকে তালক্ দেওয়া ও দাসমুক্ত করার কাজটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী পরিণতি সম্বলিত কাজ। ইহা সার্বিকভাবে উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছণীয়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে এই দুইটি কাজ হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

হাদীসের শব্দ اِغْلَاقٌ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। ইহার মূল শব্দ হইল غَلْقٌ। অভিধানে ইহার কয়েকটি অর্থ লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলঃ সংকীর্ণমনা হওয়া, ক্রোধান্ধ হওয়া, চরিত্রহীন হওয়া। اَغْلَقَهُ عَلٰى كَذَا 'তাহাকে এইকাজ করিতে সে বাধ্য করিয়াছে, ও اِنْغَلَقَ অর্থ, দরজা বন্ধ হওয়া। اَلْغَلَقُ অর্থ, তালা লাগানো। মুহাদ্দিসদের মতে اِغْلَاقٌ অর্থ اَلْاِكْرَاهُ জোর করিয়া কোন কাজ করিতে বাধ্য করা। কেননা যাহার উপর জোর প্রয়োগ করা হয় তাহাকে সাধারণত কোন কক্ষে বা ঘরে বন্দী করা হয়, বাহির হইতে তালা লাগানো হয়। কিংবা ঘরে, দরজা এমন ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যে, আদিষ্ট কাজটি না করা পর্যন্ত উহা হইতে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভ সম্ভবপর হয় না। এই প্রেক্ষিতে এ হাদীসটির মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায়, জোর পূর্বক তালাক্ লওয়া হইলে সে তালাক্ গণ্য হইবে না। দাসমুক্ত করণের ব্যাপারটিও এইরূপ।

বস্তুত বিবাহ যেমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে ও নিজস্ব ইচ্ছা ও উদ্যোগ সহকারে হইয়া থাকে, তালাক্ও অনুরূপ ভাবে স্বামীর ইচ্ছা ও সংকল্পের ভিত্তিতে হইতে হইবে। স্বামী নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পে যখনই তালাক্ দিবে, তখনই তালাক্ সংঘটিত হইবে। ইহাতে যদি অন্য কাহারও চাপ প্রয়োগ হয়, কেহ যদি কাহারও নিকট হইতে জোর পূর্বক তালাক্ আদায় করিতে চাহে ও কাহাকেও আটক

করিয়া—গলায় গামছা দিয়া তালাক্ দিতে বাধ্য করে, তবে তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র, উহাতে তালাক্ হয় না। এই উপায়ে যে তালাক্ লওয়া হয়, ইসলামী শরীয়াতে তাহা তালাক্ বলিয়া গণ্য হয় না।

আল মুনযেরী বলিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে এই হাদীসে إِغْلَاقٌ শব্দের অর্থঃ اَلْغَضَبُ—ক্রোধ। আবূ দায়ূদ তাঁহার গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেনঃ اَلْغِلَاقُ أَظُنُّهُ فِى الْغَضَبِ এখানে إِغْلَاقٌ বা اَلْغِلَاقُ অর্থ ক্রোধের বশঃবর্তি হইয়া তালাক্ দেওয়া। এই অর্থে কেহ যদি ক্রোধান্ধ হইয়া স্ত্রীকে তালাক্ দেয়, তবে সে তালাক্ সংঘটিত ও কার্যকর হইবে না।

কিন্তু এই হাদীস হইতে এরূপ অর্থ গ্রহণ সহীহ্ হইতে পারে না। কেননা যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে দুনিয়ায় তালাক্ আদৌ সংঘটিত হইতে পারে না। কেননা স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ না হইলে কেহই তাহার স্ত্রীকে তালাক্ দেয় না। কাজেই إِغْلَاق শব্দের অর্থ اَلْغَضَبُ 'ক্রোধ' করা সহীহ্ নয়।

এই হাদীস হইতে একথা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয় যে, জোরপূর্বক কাহাকেও তালাক্ দিতে বাধ্য করা হইলে তাহাতে তালাক্ হইবে না। হযরত আলী, উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও জুবাইর (রা) প্রমুখ সাহাবী এবং হাসান বসরী, আতা, মুজাহিদ, তায়ূস, শুরাইহ, আওজায়ী, হাসান ইবনে সালেহ, মালিক, শাফেয়ী প্রমুখ তাবেয়ী ও পরবর্তী ফিকাহবিদগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উপরোদ্ধৃত হাদীসটিই তাঁহাদের এই মতের দলীল। তাঁহারা দলীল হিসাবে আরও একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

আমার উম্মাতের লোক ভুল-ভ্রান্তি ও বাধ্যতার কারণে যাহা করে তাহা মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অর্থাৎ ইহার কোন কার্যকারিতা নাই। সে জন্য আল্লাহ্ কাহাকেও দায়ী করিবেন না। পক্ষান্তরে নখয়ী, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সওরী, উমর ইবনে আবদুল আজীজ এবং ইমাম আবূ হানীফা ও তাহার সঙ্গীদ্বয় মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেহ বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তালাক্ দেয় তাহা হইলে তাহা সংঘটিত হইবে ইহাদের প্রথম দলীল কুরআন মজীদের আয়াত إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক্ দিবে, তখন তাহাদিগকে তালাক্ দিবে তাহাদের ইদ্দাতের জন্য।' এখানে তালাক্ দেওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শর্তহীন। তালাক্ দিলেই হইল কোন্ কারণে ও কি অবস্থায় তালাক্ দিয়াছে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

দ্বিতীয় দলীল হইল, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهُ

সব তালাক্‌ই সংঘটিত হইবে—বালক ও পাগল-বেহুঁশ লোকের তালাক্ ছাড়া।

কুরআন ও হাদীস উভয় স্থানেই তালাক্ শর্তহীন ভাবেই সংঘটিত হওয়ার কথা ঘোষিত হইয়াছে। কাজেই তালাক্ যে অবস্থায়ই দেওয়া হউক না কেন তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। জোর পূর্বক তালাক্ লওয়া হইলে—কাহারও চাপে পড়িয়া তালাক্ দিতে বাধ্য হইয়া তালাক্ দিলেও তাহা কার্যকর হইবে। ইহার স্বপক্ষে যুক্তিও রহিয়াছে। যে লোক কোন চাপে বাধ্য হইয়া তালাক্ দেয়, প্রকৃতপক্ষে সে তালাক্ উচ্চারণ করিতে প্রস্তুত হয় বলিয়াই উহার শব্দ মুখে উচ্চারণ করে। আর এই উচ্চারণেই

তালাক্ কার্যকর হইয়া যায়। উপরোদ্ধৃত হাদীসটি হইতে যে অর্থ গ্রহণ করা হইতেছে তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নয়। যে লোক اَلْاِغْلَاقُ এর অর্থ اَلْغَضَبُ করে সে মারাত্মক ভুল করে।

তাহা হইলে আলোচ্য হাদীসটির কি অর্থ দাঁড়ায়? এই হাদীসটির অর্থ হইল, اَلْاِكْرَاهُ عَلَى الْكُفْرِ 'কুফরির উপর জবরদস্তি'। যে লোকদের সামনে এই হাদীসটি ঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহারা নূতন নূতন ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন। এ সময় কুফরির উপর জোর প্রয়োগ ছিল একটা সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আর তাঁহাদের মুখে ভুল ও ভ্রান্তি বশতঃ কুফরি কালামও প্রায়ই উচ্চারিত হইত। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা মাফ করিয়া দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

আমর ইবনে শারাহীল হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একটি স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে তালাক দিতে জোর পূর্বক বাধ্য করিল। সে তালাক্ দিয়া দিল। পরে এই মামলা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সমীপে উপস্থিত করা হয়। তিনি সে তালক্কে কার্যকর করিয়া দেন। (بذل المجهود، عمدة القاري)

খোলা তালাক্

عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ كَانَتْ حَبِيْبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَاسٍ الْاَنْصَارِىِّ فَكَرِهَتْهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيْمًا فَجَائَتْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ فَلَوْلَا مَخَافَةَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لَبَزَقْتُ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ الَّتِىْ اَصْدَقَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَكَانَ ذٰلِكَ اَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِى الْاِسْلَامِ

(مسند احمد، مسند بزار، الطبرانى فى الكبير)

হযরত সহল ইবনে আবূ হাস্‌মা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, সহল কন্যা হাবীবা সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শিমাস আল-আনসারীর স্ত্রী ছিল। পরে সে (স্ত্রী) তাহাকে (স্বামীকে) ঘৃণা করিতে লাগিল। কেননা সে (সাবিত) একজন কুৎসিত বীভৎস চেহারা ও খারাপ আকার-আকৃতির লোক ছিল। এই সময় সে (হাবীবা) নবী করীম (স)-এর নিকট আসে ও বলেঃ ইয়া রাসূল! আমি লোকটিকে দেখি বটে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র ভয়ই যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহার মুখের উপর থুথু নিক্ষেপ করিতাম। তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি কি তাহার সেই বাগানটা তাহাকে ফিরাইয়া দিবে, যাহা সে তোমাকে মহরানা বাবদ দিয়াছিল? সে বলিল, হ্যাঁ, দিব। তখন রাসূলে করীম (স) তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। হাবীবা তাহার বাগানটি তাহাকে ফিরাইয়া দিল। অতঃপর রাসূলে করীম (স) তাহাদের দুইজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিলেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, ইসলামে ইহাই ছিল প্রথম সংঘটিত খোলা তালাক্। (মুসদ আহমাদ, মুসনাদে বাজ্জার, তাবারানী—কবীর)

ব্যাখ্যা হাদীসটির মোটামুটি বক্তব্য হইল, স্বামী যদি স্ত্রীর অপছন্দ হয়, স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত থাকিতে অরাযী হয় এবং তাহার মূলে কোন বাস্তব কারণ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক্ চাহিতে পারে। এই রূপ প্রস্তাবনার পর স্বামী তালাক্ দিলে শরীয়াতের পরিভাষায় এই তালাক্‌কে খোলা তালাক্ خلع বলা হয়। অভিধানের দৃষ্টিতে খোলা তালাকের কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইলঃ

هُوَ مُفَارِقَةُ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ عَلٰى مَالٍ

ধনমালের বিনিময়ে এক ব্যক্তির তাহার স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া।

অথবাঃ فِرَاقُ الزَّوْجَةِ عَلٰى مَالٍ অর্থ সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া। ইহা আরবী কথন خَلْعُ الثَّوْبِ 'কাপড় খুলিয়া ফেলা' হইতে গৃহীত। কেননা কুরআনের ঘোষণাঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

স্ত্রীরা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।

এই অনুযায়ী স্ত্রী তাৎপর্যগতভাবে স্বামীর পোশাক। কাজেই স্ত্রীকে তালাক্ দেওয়া ও গায়ের পোশাক খুলিয়া ফেলা একই ধরনের কাজ। ইসলামী শরীয়াতের বিশেষজ্ঞগণ একমত হইয়া বলিয়াছেনঃ এই পন্থায় স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে তালাক্ গ্রহণ করিতে পারে। ইহা শরীয়াত সম্মত এবং সত্যকার ও বাস্তব করণে এই পন্থায় তালাক্ গ্রহণ করা হইলে তাহাতে গুনাহ হইবে না।

কিন্তু এই সংজ্ঞা উত্তম ও যথার্থ নয় কেননা ইহাতে খোলা তালাকের বিনিময়ে নগদ ধন-মাল হওয়াকে শর্ত করা হইয়াছে। কোন রূপ ঋণ বা শাস্তির কারণে 'খোলা' হইয়া থাকিলে তাহাও এই সংজ্ঞার দৃষ্টিতে সহীহ বলিয়া মনে করিতে হয়। অথচ তাহা ঠিক নয়। বরং স্বামী কোনরূপ ধন-মাল গ্রহণ না করিলেও 'খোলা তালাক্' হইতে পারে। এই কারণে মূল লক্ষ্য লাভের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে, গ্রহণ করার উপর নয়। অন্যান্যরা বলিয়াছেনঃ

اَلْخُلْعُ اِزَالَةُ الزَّوْجِيَةِ بِمَا يُعْطِيْهِ مِنَ الْمَالِ

স্বামী স্ত্রীকে যাহা কিছু দিয়াছে তাহার বিনিময়ে স্ত্রীত্ব খতম করিয়া দেওয়াই হইল 'খোলা তালাক্'।

আল্লামা নাসাফী বলিয়াছেনঃ

اَلْخُلْعُ الْفَصْلُ مِنَ النِّكَاحِ بِاَخْذِ الْمَالِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ

ধন-মাল গ্রহণের বিনিময়ে 'খোলা' শব্দ প্রয়োগ সহকারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোই হইল 'খোলা তালাক্'।

ইহার শর্ত তাহাই যাহা সাধারণতঃ তালাকের শর্ত। আর ইহার পরিণতি হইল 'বাঈন তালাক্' সংঘটিত হওয়া। ইহা স্বামীর দিক দিয়া 'কসম' পর্যায়ের কাজ। আর স্ত্রীর দিক দিয়া ওদল-বদল করণ।

'খোলা তালাক্' কিভাবে সংঘটিত হয়? কেবল বিনিময় গ্রহণ করা হইলেই কি তালাক আপনা-আপনি সংঘটিত হইয়া যাইবে? না মুখের শব্দের কিংবা নিয়্যাতে তালাক্ বলিলেই তবে তালাক্ সংঘটিত হইবে? এই বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলিয়াছেন, উহা খোলা ও তালাক্ উভয় শব্দেই সংঘটিত হইতে পারে। তবে তাহাতে ধন-মালের বিনিময় হইতেই হইবে এবং ইহা বাঈন তালাক্ হইবে। ইমাম শাফেয়ীর প্রাচীন কথা হইল, ইহা ঠিক তালাক্ নহে, ইহা বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া মাত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)ও এই মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেনঃ যদি একই স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকবার খোলা করা হয় তবুও তাহাদের মধ্যে অন্য স্বামী গ্রহণ ছাড়াই বারবার বিবাহ হইতে পারিবে। ইমাম আহমাদও এইমত সমর্থন করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ীর আর একটি মত হইল, ইহা রিজয়ী তালাক্। তবে তাঁহার তৃতীয় একটি মতও আছে। আর তাহা হইল, ইহা এক তালাক্ বাঈন। হানাফী মাযহাবের মতও ইহাই। ইহার ভিত্তি হইল নবী করীম (স)-এর উক্তিঃ

اَلْخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ

'খোলা' এক তালাক্ বাঈন মাত্র।

হযরত উমর, আলী ও ইবনে মাসঊদ (রা) এই মতই দিয়াছেন।

এই ব্যাপারে আরও দুইটি কথা আছে। একটি, ইহা এক তালাক্ বাঈন। হযরত উসমান, আলী ও ইবনে মাসউদ (রা) ইহা বলিয়াছেন। ইহাতে যদি তিন তালাক্ বলা হয়, তবে তাহাই হইবে। ইহা ইমাম মালিক, সওরী, আওজায়ী ও কুফী ফিকাহবিদদের মত। আর দ্বিতীয় কথা হইল, ইহা তালাক্ নয়, ইহা ফিসখ্। অর্থাৎ বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া মাত্র। অবশ্য তালাকের নিয়্যাত করা হইলে তাহাই হইবে। ইবনে আব্বাস, তায়ূস, ইক্‌রামা, ইমাম আহ্‌মাদ, শাফেয়ী, ইসহাক, আবূ সওর প্রমুখ ফিকাহবিদদের এই মত। হানাফী মতের ভিত্তি যে হাদীসের উপর, তাহা হইল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخَلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً. (دار قطنى، بيهقى)

নবী করীম (স) খোলাকে এক তালাক্ বাঈন গণ্য করিয়াছেন।

কিন্তু ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে। ইমাম বুখারী এই হাদীসটি গ্রহণ করেন নাই। ইমাম নাসায়ী বলিয়াছেন, ইহার একজন বর্ণনাকারী পরিত্যক্ত। শু'বা বলিয়াছেনঃ এই হাদীসটি তোমরা পরিহার কর। দারে কুতনী ইহার সনদ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই। তবে ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আরও একটি উক্তি উহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইলঃ اَلْخُلْعُ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ 'খোলা বিচ্ছিন্নকরণ মাত্র'।—ইহা তালাক নয়।

আর সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً (عبد الرزاق، ابن ابى شيبه)

নবী করীম (স) খোলা'তে এক তালাক হয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বস্তুত 'খোলা'—তালাকের ব্যবস্থা রাখা ও মূল তালাকের সুযোগ রাখার মতই ইসলামী শরীয়াত ও সমাজ ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিবাহ হইয়া গেলে জীবন দুর্বিসহ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর হইতে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ উন্মুক্ত না থাকা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা। তাহা মানবোপযোগী ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাই বস্তুনিষ্ঠ ও অনিবার্য কারণের ভিত্তিতে তালাক দেওয়া বা নেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ইসলাম বিশ্ব মানবতার অবর্ণনীয় কল্যাণকর অবদান রাখিয়াছেন, একথা বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বলিতে হইবে।

দাম্পত্য জীবনের জন্য একান্তই অপরিহার্য হইতেছে, পারস্পরিক নিবিড় শান্তি, স্বস্তি, প্রেম-ভালবাসা, গভীর প্রীতি, আন্তরিক দরদ, সহানুভূতি, সহযোগিতা, উত্তম আচার-আচরণ এবং প্রত্যেকেরই অপরের অধিকার আদায়ের জন্য অতন্ত্র প্রহরীর মত সদা সচেতন ও সদাজাগ্রত হইয়া থাকা। এইরূপ না হইলে দাম্পত্য জীবন মরুভূমির উপর দিয়া নৌকা বাওয়া কিংবা সমুদ্রের উপর দিয়া রেলগাড়ী চালানোর মতই অসম্ভব, অচল। তাই দাম্পত্য জীবনে সাধারণত এইরূপ অবস্থারই বিরাজমানতা কাম্য এবং লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, উক্তরূপ সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ সুমধুর দাম্পত্য জীবনেও বিপর্যয় আসে। আর যখন বিপর্যয় আসিয়াই পড়ে তখন আর একসঙ্গে জীবন যাপনের কথা চিন্তা না করিয়া পরস্পর হইতে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি হইতে পারে তাহাই প্রধান চিন্তা ও বিবেচনার বিষয়। ইসলাম এ অবস্থায় যে ব্যবস্থা উপস্থাপিত করিয়াছে তাহাকেই বলা হয় খোলা তালাক্।

এই তালাকের দুইটি দিক। কখনও স্বামী ইহার প্রয়োজন বোধ করে। ফলে সে-ই উদ্যোগী হইয়া নিজ হইতেই তালাক্ দিয়া দেয়। আবার এমন কারণের উৎপত্তি হওয়াটাও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়

যে, স্বামী হয়ত তালাক্ দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে না, কিন্তু স্ত্রী এই স্বামীর ঘর করিতে পারে না—এই স্বামীর ঘর করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তখন স্ত্রীই উদ্যোগী হইয়া স্বামীর নিকট হইতে তালাক্ গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারের তালাক্ গ্রহণই হইল 'খোলা তালাক্'।

উপরোদ্ধৃত হাদীসে যে ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে,তাহার সার কথা হইল, হাবীবা সাবিতের স্ত্রী ছিল। বিবাহটা উভয়ের পছন্দ ও সম্মতিক্রমে হইয়াছিল কিনা, এই বর্ণনায় তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু বিবাহিত জীবনে হাবীবা সাবিতকে পাইয়া কিছুমাত্র সুখী হয় নাই। সুখী না হওয়ারএকটি মাত্র কারণেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইল, সে তাহার স্বামীকে অপছন্দ ও ঘৃণা করিত। আর এই অপছন্দ ও ঘৃণা করার কারণ হইল, সে ছিল 'দমীম'। আরবী دَمِيمٌ শব্দের অর্থ قَبِيحُ مَنْظَرِهِ وَصِغَرُ جِسْمِهِ 'দেখিতে কুৎসিত ও দৈহিক আকার আকৃতিতে ক্ষুদ্র, বেঁটে'। এই শব্দটির মূল হইল الدمة। ইহার অর্থ القَمْلَةُ أَوِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ 'ক্ষুদ্রকায় পিপিলিকা'। আর একটি লোককে دَمِيمٌ বলার অর্থ, সে আকার আকৃতিতে ক্ষুদ্র। অর্থাৎ স্বামীর কুৎসিত বীভৎস চেহারা ও আকার-আকৃতির ক্ষুদ্রত্বের কারণে হাবীবা তাহাকে পছন্দ করিতে পারে নাই। বরং সে তাহাকে ঘৃণা করে। স্বামীর প্রতি তাহার এই ঘৃণা কতখানি তীব্র ও উৎকট ছিল তাহা তাহার পরবর্তী কথা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। সে নিজেই রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বিবাহের ফয়সালা প্রার্থনা করে এবং তাহার তালাক্ চাওয়ার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া সে নিজেই বলিয়া উঠেঃ আমি তাহাকে দেখি বটে; কিন্তু আল্লাহ্র ভয় না থাকিলে আমি তাহার মুখের উপর-ই থু থু নিক্ষেপ করিতাম। বস্তুত কোন কিছুর প্রতি থু থু নিক্ষেপ করা সেই জিনিসের প্রতি প্রবল তীব্র ও উৎকট ঘৃণার চরমতম প্রকাশ। এই ঘৃণা তাহার মন মগজে শক্ত হইয়া বসিয়াছিল এবং ইহাকে পছন্দে ও আকর্ষণে পরিবর্তিত করার কোনই উপায় নাই। রাসূলে করীম (স) তাহার এই কথা শুনিয়াই মূল অবস্থাটা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই দম্পতির স্থিতি অসম্ভব। ইহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য, অপরিহার্য এবং তাহা যত শীঘ্রই হয় ততই মঙ্গল। তাই নবী করীম (স) এ বিষয়ে অধিক আর কোন কথা-বার্তা বলার প্রয়োজন মনে করিলেন না। বরং কি ভাবে এই বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে অনতিবিলম্বে সেই দিকেই নজর দিলেন।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, স্বামীর চেহারা-ছূরত ও দৈহিক আকার-আকৃতি স্ত্রীর পছন্দ ও মনোমত হওয়া দাম্পত্য জীবনের স্থিতি ও স্থায়ীত্বের জন্য একান্তই জরুরী। ইহা না হইলে স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামীর সহিত থাকিতে অস্বীকার করা এবং তাহার নিকট তালাক্ চাওয়া। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনায় রাসূলে করীম (স) শুধু এই কারণেই হাবীবার অভিযোগের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাহার তালাক্ চাওয়ার আবেদনকে অগ্রাহ্য করিলেন না।

তিনি এই তালাক্ সংঘটিত হওয়ার পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে হাবীবাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমাকে সে মহরানা বাবদ যে বাগানটি দিয়াছিল, তাহা কি তুমি ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছ? ইহার অর্থ, খোলা তালাকে—স্ত্রীর ইচ্ছা ও উদ্যোগে স্বামী যে তালাক্ দেয় তাহাতে স্বামীর মহরানা বাবদ দেওয়া মাল-সম্পদ ফিরাইয়া দিতে হয়। উহা ফেরত দেওয়ার বিনিময়েই স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে তালাক্ গ্রহণ করে।

কিন্তু স্বামী মহরানা বাবদ স্ত্রীকে যাহা কিছু দিয়াছিল তাহা ফিরাইয়া লওয়া ও উহার বিনিময়ে তালাক্ দেওয়া পর্যায়ে শরীয়াত বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত হইয়াছে। আবূ বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল মুজানী তাবেয়ী এ সম্পর্কে বলিয়াছেন, স্ত্রীকে তালাক্ দেওয়ার বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে স্বামীর কোন কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়—তাহার জন্য তাহা হালালও নয়। কেননা কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইহা করিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন। দলীল হিসাবে তিনি এই আয়াতটি পেশ করিয়াছেনঃ

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হও এবং তোমরা তাহাদের কাহাকেও বিপুল পরিমাণ সম্পদও দিয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিও না। (আন-নিসা-২০)

এই আয়াতটি হইতে তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীর কিছুই গ্রহণ করা নিষেধ জানা যায়।

কিন্তু কুরআন মজীদেরই অপর একটি আয়াত হইতে ইহার বিপরীত কথা জানা যায়। আয়াতটি এইঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة: ٢٢٩)

তোমরা যদি আশংকাবোধ কর যে, স্বামী স্ত্রী আল্লাহ্র সীমা সমূহ কায়েম ও রক্ষা করিতে পারিবে না (বা করিবে না), তাহা হইলে স্ত্রী যে বিনিময় মূল্য দিবে, তাহার ভিত্তিতে (বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত করায়) তাহাদের দুই জনের কোন গুনাহ হইবে না। এই আয়াতটি হইতে বিনিময় গ্রহণ করা স্বামীর জন্য জায়েয প্রমাণিত হয়। (আল বাকারা-ঃ ২৯)

আবূ বকর ইবনে আবদুল্লাহ মনে করিয়াছেন যে, সূরা বাকারা এই শেষোক্ত আয়াতটি সূরা নিসার উপরোদ্ধৃত আয়াতটি দ্বারা মনসুখ হইয়া গিয়াছে। অতএব তালাকের বদলে স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিতে পারিবে না—এই হুকুমই বলবত রহিয়াছে।

ইবনে জায়দ প্রমুখ বলিয়াছেন, আবূ বকরের কথা যথার্থ নয়। বরং সূরা বাকারার যে আয়াতটি দ্বারা সূরা নিসার আয়াতটিই মনসুখ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ - (البقرة)

তোমরা স্ত্রীদের যাহা কিছু দিয়াছ তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করা—হে স্বামীরা—তোমাদের জন্য হালাল নয়।

অতএব তালাকের বিনিময়ে স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে মাল-সম্পদ গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু মনসুখ হওয়া সম্পর্কে এই দুইটি কথাই ঠিক নয়। কেননা প্রকৃত পক্ষে এই কোনটিই আয়াত কয়টিই কোনটি কর্তৃক মনসুখ বা বাতিল হইয়া যায় নাই। বরং আয়াতত্রয়ের প্রত্যেকটি স্ব স্ব স্থানে অনড়, অবিচল, অপরিবর্তিত- مُحْكَم। আসল ব্যাপার হইল ইহাদের প্রত্যেকটি আয়াতই এক একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য। ইমাম তাবারী বলিয়াছে, আবূ বকরের কথার কোন অর্থ নাই। কেননা স্ত্রী দিতে প্রস্তুত হইলে স্বামীর পক্ষে তাহা গ্রহণ করা স্বয়ং নবী করীম (স) কর্তৃকই জায়েয ঘোষিত হইয়াছে। যে মূল হাদীসটি লইয়া এই আলোচনা। তাহাই ইহার অকাট্য প্রমাণ। ইহাতে নবী করীম (স) সাবিতের জন্য তাহার দেওয়া বাগানটি তাহার স্ত্রী হাবীবাকে তালাক্ দেওয়ার বিনিময়ে ফিরাইয়া আনিয়া দিয়াছেন।

এই পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে যে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে তাহা এখানে উল্লেখ্য। হাদীসটি এইঃ

اَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِىْ خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً. (بخارى، نسائى)

সাবিত ইবনে কাইসের স্ত্রী নবী করীম (স)-এর নিকট আসিল ও বলিলঃ ইয়া রাসূল! কাইসের পুত্র সাবিত সম্পর্কে তাহার চরিত্র ও দ্বীনদারীর দিক দিয়া আমি কোন দোষারোপ করিব না। কিন্তু আসল কথা হইল, ইসলামে কুফরিকে আমি ঘৃণা করি। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তুমি কি তাহার বাগানটি ফিরাইয়া দিবে? সে বলিল, হ্যাঁ, দিব। তখন নবী করীম (স) কাইসের পুত্র সাবিতকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেনঃ তুমি বাগানটি গ্রহণ কর এবং উহাকে (স্ত্রী হাবীবাকে) এক তালাক্ দাও।

এ বর্ণনায় সাবিতের স্ত্রীর নাম বলা হয় নাই। কিন্তু বুখারীর-ই অপর একটি বর্ণনায় তাহার নাম বলা হইয়াছে জমীলা বিনতে উবাই ইবনে সলূল। বর্ণনায় বলা হইয়াছে, জমীলা সাবিতের পূর্বে হানজালা ইবনে আবু আমেরের স্ত্রী ছিল। পরে সাবিতের সঙ্গে বিবাহ হয়। ইবনে মাজার বর্ণনায়ও এই নামই বলা হইয়াছে।

প্রথমোদ্ধৃত হাদীসটির শেষ কথাটিতে দাবি করা হইয়াছে যে, সাবিত হাবীবাকে যে খোলা তালাক্ দিয়াছিল, তাহাই ছিল ইসলামী সমাজের প্রথম খোলা তালাক্। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনায় ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে। সে বর্ণনাটি এইঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ

اَوَّلُ مَنْ خَالَعَ فِى الْاِسْلَامِ اُخْتُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسِىْ وَرَأْسُهُ اَبَدًا اِنِّىْ رَفَعْتُ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ اَقْبَلَ فِىْ عِدَّةٍ اِذْ هُوَ اَشَدُّهُمْ سَوَادًا وَاَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَاَقْبَحُهُمْ وَجْهًا فَقَالَ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَاِنْ شَاءَ زِدْتُهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (القرطبى)

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ভগ্নির খোলা তালাকই ইসলামী সমাজের প্রথম ঘটনা। সে নবী করীম (স)-এর নিকট আসিল ও বলিলঃ ইয়া রাসূল! আমার ও তাহার মাথা কখনও একত্রিত হয় না। আমি তাঁবুর এক পাশ খুলিয়া তাকাইয়া দেখিলাম সে কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে চলিয়া আসিতেছে। বুঝিতে পারিলাম, সে সঙ্গের অন্যান্য সব লোকের তুলনায় অধিক উৎকৃষ্টভাবে কৃষ্ণবর্ণ, আকৃতিতে সকলের অপেক্ষা ছোট ও বেঁটে এবং চেহারার দিকদিয়া সকলের তুলনায় অধিক কুৎসিত ও বীভৎস। তখন নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি তাহার দেওয়া বাগানটি ফেরত দিবে? সে বলিল, হ্যাঁ, দিব। সে তাহারও বেশী চাহিলে তাহাও তাহাকে দিব। পরে নবী করীম (স) এই দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেন। (আল্-কুরতুবী)

আল্লামা কুরতুবী বলিয়াছেন, 'খোলা তালাক্' পর্যায়ে এইটিই আসল হাদীস—মূল ভিত্তি। জমহুর ফিকাহবিদগণেরও এই মত। ইমাম মালিক বলিয়াছেনঃ শরীয়াতবিদদের নিকট হইতে আমি সব সময় এই কথাই শুনিয়া আসিতেছি। আর বস্তুতও এই মতটি সর্বসম্মত।

এই সব আয়াত ও হাদীস হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন কষ্ট না দেয়, কোনরূপ খারাপ বা ক্ষতিকর আচরণ না করে, সে তালাক্ দিতে ইচ্ছুকও না হয়, তাহা সত্ত্বেও এরূপ অবস্থায় কেবল স্ত্রীই যদি স্বামী হইতে তালাক্ নিতে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলেঃ

يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا افْتَدَتْ بِهٖ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلعم

তালাকের বদলে স্ত্রী যাহা কিছুই দিতে প্রস্তুত হইবে, তাহা সবই গ্রহণ করা স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ হালাল—যেমন নবী করীম (স) ইহা করাইয়াছেন।

পক্ষান্তরে দুর্ব্যবহার ও খারাপ আচরণ যদি স্বামীর হয়, সে যদি স্ত্রীকে কষ্ট দেয়, তাহার ক্ষতি করে, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছে,তাহা সে ফেরত দিতে বাধ্য হইবে, সেই সঙ্গে তালাক্ও দিবে।

কিছু লোকের মতে খোলা তালাক্ লওয়া জায়েয হইবে কেবল মাত্র তখন যখন উভয়ের মধ্যে চরম বিরোধ ও ক্ষতিকর অবস্থার উদ্ভব হইবে। খোলা তালাকের জন্য ইহাই শর্ত। সাবিত সম্পর্কিত আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনাটির ভাষা ইহার সমর্থক। তাহা হইল, হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেনঃ

اَنَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاس فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ نُغْضَهَا فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْ اِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيُّ صلعم ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا (ابوداؤد)

সহল তনয়া হাবীবা সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী ছিল। সে তাহাকে মারধর করে এবং তাহার কাঁধ চূর্ণ করিয়া দেয়। সকাল বেলা সে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার অভিযোগ করে। নবী করীম (স) সাবিতকে ডাকিয়া বলিলেনঃ তুমি ইহার নিকট হইতে তাহার কিছু মাল-সম্পদ গ্রহণ কর ও তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও।

এই বর্ণনাটি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর নিকট হইতে ধন-মাল লইয়া তাহাকে তাহার প্রস্তাব অনুযায়ী তালাক্ দেওয়া জায়েয। এই বর্ণনার শেষে বলা হইয়াছে, সাবিত নবী করীম (স)কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

وَيَصْلُحُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

ইহা আমার জন্য ভাল হইবে, ইয়া রাসূল?

তিনি বলিলেন হ্যা, তখন সাবিত বলিলেনঃ

فَاِنِّىْ اَصْدَقْتُهَا حَدِيْقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا

আমি তাহাকে দুইটি বাগান মহরানা স্বরূপ দিয়াছি এবং সে দুইটিই তাহার হাতে রহিয়াছে।

নবী করীম (স) বলিলেনঃ خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا এই দুইটি বাগানই তুমি ফিরাইয়া লও এবং তাহাকে বিচ্ছিন করিয়া দাও।

বস্তুত ইহাই জমহুর ফিকাহবিদদের মত। তাঁহারা বলিয়াছেনঃ

يَجُوْزُ الْخُلْعُ مِنْ غَيْرِ اِشْتِكَاءِ ضَرَرٍ

স্বামীর কোন রূপ ক্ষতিকর আচরণের অভিযোগ ছাড়াই খোলা তালাক্ লওয়া জায়েয।

এ ক্ষেত্রে সূরা বাকারার আয়াতটির ভিত্তিতে বিপরীত কথা বলা যাইতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে শর্ত হিসাবে পেশ করেন নই। খোলা তালাকের সাধারণ প্রচলিত নিয়মের ও অবস্থার দৃষ্টিতেই সে কথাটি বলা হইয়াছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র একথাটিও স্মরণীয়ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْأً مَّرِيْئًا (النساء: ٤)

স্ত্রী যদি নিজ হইতেই কোন কিছু দেয় তবে তোমরা তাহা খুব স্বাদ লইয়াই খাইবে।

(عمدة القارى، بلوغ الامانى، الجامع الاحكام القران، لقرطبى)

ইদ্দাত

عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَةٍ وَّعِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا ذٰلِكَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا. (ترمذی، بخاری، مسلم)

আবুস্-সানাবিল ইবনে বাকাক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ সুবাইয়া নাম্নী এক মহিলা তাহার স্বামীর মৃত্যুর তেইশ দিন কিংবা পঁচিশ দিন পর সন্তান প্রসব করিল। অতঃপর তিনি যখন নেফাস হইতে পবিত্র হইয়া বিবাহ করার ইচ্ছুক ও উদ্যোগী হইলেন, তখন তাহাকে এই কাজ করিতে নিষেধ করা হইল। পরে এই ব্যাপারটি নবী করীম (স)-এর নিকট বলা হইল। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ সে যদি তাহা করে তবে করিতে পারে। কেননা তাহার ইদ্দাতের মেয়াদ তো অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। (তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা এই হাদীসের মূল বর্ণনাকারী হযরত আবুস্-সানাবিল (রা) একজন প্রখ্যাত সাহাবী। তিনি সুবাইয়া নাম্নী এক মহিলার ইদ্দাত সংক্রান্ত একটি ব্যাপার এই হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন। সুবাইয়া ছিলেন হারিস নামক এক সাহাবীর কন্যা। সুবাইয়া সায়াদ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। সায়াদের ইন্তেকালের তেইশ পঁচিশ দিন পর সুবাইয়ার সন্তান প্রসব হয়। পরে নেফাস হইতে পবিত্র হওয়ার পর বিবাহ করার প্রস্তুতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। লোকেরা তাহা করিতে নিষেধ করে। কেননা তাহারা মনে করিয়াছিল, তাহার স্বামী মরিয়াছে মাত্র কয়েক দিন হয়। এখনও স্বামী-মৃত্যুর ইদ্দাত অতিক্রান্ত হয় নাই। কাজেই এখনই কি করিয়া সে বিবাহ করিতে পরে। অথচ মরিয়া যাওয়া ব্যক্তির স্ত্রীকে অবশ্যই ইদ্দাত পালন করিতে হয় ইহা ইসলামী শরীয়াতের বিধান। পরে নবী করীম (স) এই সব কথা জানিতে পারিয়া বলিলেনঃ হ্যাঁ সে যদি বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে সে এখনই তাহা করিতে পারে। কেননা তাহার যাহা ইদ্দাত ছিল, সে ইদ্দাত অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। আর ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করা সম্পূর্ণ রূপে শরীয়াত সম্মত।

এখানে প্রশ্ন ছিল, সুবাইয়ার স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাকে ইদ্দাত পালন তো করিতে হইবে, কিন্তু তাহা কত দিনের ইদ্দাত? স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রীকে কতদিন ইদ্দাত পালন করিতে হইবে তাহা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

(البقرہ:٢٣٤)

তোমাদের মধ্যে যে সব লোক মৃত্যু বরণ করিবে এবং স্ত্রী রাখিয়া যাইবে, সেই স্ত্রীরা নিজদিগকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় বসাইয়া রাখিবে।

অপেক্ষায় বসাইয়া রাখিবে অর্থাৎ ইদ্দাত পালন করিবে এবং এই ইদ্দাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ করিবে না। পুনঃবিবাহ করিত পারিবে না। অন্য কথায় স্বামী মৃত্যু জনিত ইদ্দাতের মেয়াদ মোট চার মাস দশদিন। ইহা স্বামী মরা বিধবা হওয়া সব স্ত্রীলোকের জন্যই প্রযোজ্য। স্ত্রী ছোট বয়সের হউক কিবা বড় ও বেশী বয়সের সঙ্গমকৃতা হউক কি অসঙ্গমকৃতা। স্বামী মরিয়া গেলে তাহাকেই এই ইদ্দাত পালন করিতে হইবে। তাহা হইলে সুবাইয়া এই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পুনরায় বিবাহিতা হওয়ার ও অন্য স্বামী গ্রহণ করার উদ্যোগ কিরূপে গ্রহণ করিল? আর রাসূলে করীম (স)ই বা তাহাকে অনুমতি দিলেন কিভাবে? ...এই পর্যায়েই গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দাত সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে।

গর্ভবতী স্ত্রীকে যদি তালাক দেওয়া হয়; অথবা স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর উদ্দাতের মেয়াদ কত? এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٤)

আর গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দাতের সময় সীমা হইল তাহাদের সন্তান প্রসব হওয়া।

স্বামীর মৃত্যু হওয়া জনিত স্ত্রীর মেয়াদ চার মাস দশ দিন এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক তালাক প্রাপ্তা হইলে তাহার ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই দুইটি কথা কুরআন মজীদের উপরোদ্ধৃত আয়াতটি হইতে নিঃসন্দেহে জানা গেল। কিন্তু যে গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামী সন্তান প্রসব হওয়ার পূর্বে সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হইল—সে কি করিবে? আয়াতদ্বয় হইতে প্রমাণিত দুই ধরনের মিয়াদের মধ্যে কোন্ মেয়াদের ইদ্দাত সে পালন করিবে, এই বিষয়ে কুরআন মজীদে কিছুই বলা হয় নাই। এই বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য হাদীসের আশ্রয় লইতে হইবে।

কথিত স্ত্রী লোকটির অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া এই দুইটি আয়াত-ই প্রযোজ্য। তাহার স্বামী মরিয়া গিয়াছে, অতএব তাহার উপর সূরা বাকারার প্রথমোদ্ধৃত আয়াতটি প্রযোজ্য। কিন্তু যেহেতু সে তখন গর্ভবতী ছিল ও পরে তাহার সন্তানও প্রসব হইয়াছে, এই দিক দিয়া তাহার ইদ্দাতকাল শেষ হইয়া গিয়াছে মনে করিতে হয় এই শেষোক্ত সূরা আত্-তালাক্-এর আয়াত অনুযায়ী। কিন্তু এই দুই মেয়াদের দীর্ঘতায় বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে।

হাদীসের ঘোষণা হইতে এই সমস্যা চূড়ান্ত সমাধান পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলিয়াছেনঃ

مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

(بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه)

যাহার ইচ্ছা সে আমার সহিত পারস্পরিক অভিশাপ বর্ষণের প্রার্থনায় যোগ দিতে পারে এই কথা লইয়া যে, সূরা আত্-তালাকের আয়াতটি সূরা আল-বাকারার আয়াতের পরে নাযিল হইয়াছে।

আর একই বিষয়ে দুইটি ভিন্ন ধরনের হুকুম নাযিল হইয়া থাকিলে উহার মধ্যে শেষে যেটি নাযিল হইয়াছে সেইটিই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই শরীয়াতের বিধান। কাজেই সুবাইয়ার সন্তান প্রসব ও নেফাস হইতে পবিত্রতা লাভের পরই পুনরায় স্বামী গ্রহণে উদ্যোগী হওয়ার সর্বোতভাবে শরীয়াত সম্মত কাজ। উহার বিরোধী মোটেই নয়। নবী করীম (স) ঠিক এই কারণেই তাহার এই কাজের বৈধতা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন—এখানে এই বর্ণনাটিও স্মরণীয়ঃ

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِى الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ اَتَجْعَلُوْ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ

وَلَا تَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ؟ أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الطُّوْلٰى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (بخاری، نسائی)

যে স্ত্রী লোকটির স্বামী মরিয়া গিয়াছে—এ অবস্থায় যে, সি নিজে গর্ভবতী, তাহার সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলিয়াছেনঃ তোমরা কি তাহার উপর কঠোরতা করিতে ও নির্মমতা চাপাইতে চাও? এবং তাহার পক্ষে সুবিধা হয় এমন নীতি গ্রহণ করিতে চাও না? ছোট সূরা (অর্থাৎ আত্-তালাক্) তো বড় সূরা নিসা (সূরা আল-বাকারা)র পরে নাযিল হইয়াছে। আর যে আয়াতটি পরে নাযিল হইয়াছে, উহার হুকুমকে এই স্ত্রীলোকটির জন্য গ্রহণ করা হইলে তাহার প্রতি সহজতা আরোপ করা হয়। আর শেষে নাযিল হওয়া সে আয়াতটি হইলঃ গর্ভবতী মেয়ে লোকের ইদ্দাত কাল হইল তাহাদের সন্তান প্রসব হওয়া। (বুখারী, নাসায়ী)

হযরত আলকামা (রা)-এর এই কথাটিও হাদীসগ্রন্থ সমূহে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَنَّ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ اٰيَةِ الْمُتَوَفّٰى فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَقَرَأَ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا الْاٰيَةَ (مسند البزار)

যাহার ইচ্ছা সে আমার সহিত এই কথা লইয়া হলফ বিনিময় করিতে পারে যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্তই তাহাদের ইদ্দাতের মেয়াদ। এই কথাটি স্বামী মরিয়া যাওয়া স্ত্রীর ইদ্দাত সংক্রান্ত আয়াতের পর নাযিল হইয়াছে। কাজেই স্বামী মরিয়া যাওয়া গর্ভবতী স্ত্রী যখন-ই সন্তান প্রসব করিবে, তখনই অন্য স্বামী গ্রহণ তাহার জন্য হালাল হইয়া যাইবে। স্বামী মরিয়া যাওয়া সংক্রান্ত আয়াতটির কথা হইলঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা মরিয়া যায় ও স্ত্রীদের রাখিয়া যায় তাহারা চারমাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করিবে।

আল্কামার এই কথাটি এ পর্যায়ে আরও স্পষ্ট ও বলিষ্ঠঃ

نَسَخَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقَصْرٰى كُلَّ عِدَّةٍ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ مُطَلَّقَةٍ أَوْ مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

(ابن مردويه)

সূরা আত্-তালাকের আয়াত 'গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ইদ্দাত তাহাদের সন্তান প্রসব হওয়া অন্য সব ইদ্দাতকে বাতিল করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ তালাক্ প্রাপ্তা বা স্বামী মরিয়া যাওয়া স্ত্রীর ইদ্দাতের শেষ হইল তাহার সন্তান প্রসব হওয়া।

হযরত উবাই ইবনে কায়াব (রা) বলিয়াছেনঃ

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلعم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلٰثًا أَوِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا فَقَالَ هِيَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلٰثًا وَالْمُتَوَفّٰى عَنْهَا (مسند احمد)

'আমি নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলামঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত' এই কথাটি কি তিন তালাক্ প্রাপ্তা স্ত্রী সম্পর্কে, না স্বামী মরিয়া যাওয়া স্ত্রী সম্পর্কে? জবাবে তিনি বলিলেন, ইহা এই উভয় প্রকারের স্ত্রী লোকদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে স্বামী মরিয়া যাওয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দাতের মেয়াদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেনঃ

إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ

সে যখন-ই সন্তান প্রসব করিবে, তখনই তাহার ইদ্দাত শেষ হইয়া গিয়াছে মনে করিতে হইবে।

এই সময় একজন আনসার ব্যক্তি বলিলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলিয়াছেনঃ

لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيْرِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ حَلَّتْ (موطأ مالك، شافعى، ابن ابى شيبه)

সেই গর্ববতী স্ত্রী লোকটি যদি তাহার মৃত স্বামীর লাশ খাটের উপর থাকা অবস্থায় এবং দাফন হওয়ার পূর্বেই সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলেও তাহার ইদ্দাতের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে।

প্রথমে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, বুখারী শরীফে উহার আর একটি বর্ণনার ভাষা এইরূপঃ

اَنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ صلعم فَاسْتَأْذَنَتْهُ اَنْ تَنْكِحَ فَاَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ

সুবাইয়া আসলামী তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক রাত্রির পরই সন্তান প্রসব করে। পরে সে নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করে। নবী করীম (স) তাহাকে অনুমতি দেন। অতঃপর সে বিবাহ করে।

সুবাইয়ার নিজের কথা হইলঃ

فَاَفْتَانِىْ بِاَنِّىْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِىْ وَاَمَرَنِىْ بِالتَّزْوِيْجِ اِنْ بَدَالِىْ

রাসূলে করীম (স) আমাকে ফতোয়া দিলেন যে, আমি যখনই আমার সন্তান প্রসব করিয়াছি তখনই আমার পালনীয় ইদ্দাত শেষ করিয়াছি। আর আমার ইচ্ছা হইলে আমি বিবাহ করিতে পারি বলিয়া আমাকে নির্দেশ করিলেন।

ইমাম তিরমিযী প্রথমোদ্ধৃত হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর লিখিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীদের অধিকাংশ আহলি-ইলম-ই এই মত পোষণ করিতেন যে, গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামী মরিয়া যাওয়ার পর যখনই সন্তান প্রসব করিবে,তখনই তাহার ইদ্দাতের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে, স্বামী মৃত্যু সংক্রান্ত ইদ্দাত (চারমাস দশ দিন) তখন শেষ না হইলেও কোন অসুবিধা নাই এবং সে তখনই অন্যত্র বিবাহিতা হইতে পারিবে। কিন্তু হযরত আলী (রা), সায়ীদ ইবনে মনছুর, আবদ্ ইবনে হুমাইদ ও অন্যান্য কয়েকজনের মত হইলঃ تَعْتَدُّ اٰخِر الْاَجَلَيْنِ দুই ধরনের ইদ্দাতের মধ্যে যেটি অধিক দীর্ঘ ও বিলম্বে আসে, সেইটিই পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ চারমাস দশদিন গত হওয়ার আগেই যদি সে সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে এই মেয়াদটি শেষ করা পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সন্তান

প্রসব করিলেই ইদ্দাত শেষ হইল মনে করা যাইবে না। আর যদি চারমাস দশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও গর্ভ থাকে সন্তান প্রসব না হয়, তাহা হইলে উহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এইমত সহীহ নয়। সুবাইয়া সংক্রান্ত হাদীস হইতে সহীহ কথা জানা যায়।

স্বামী মরা স্ত্রীর ইদ্দাত

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَائَتْ إِمْرَأَةٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ إِبْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَنَكْحَلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدٰى كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ (ترمذى، بخارى، مسلم)

হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একজন স্ত্রীলোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলঃ ইয়া রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মরিয়া গিয়াছে। এখন তাহার চক্ষুদ্বয় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় আমরা কি তাহাকে সুর্মা ব্যবহার করাইব? জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেন, না। দুইবার কি তিনবার জিজ্ঞাসার প্রত্যেক বারের জওয়াবে তিনি না-ই বলিতে থাকিলেন। পরে বলিলেন, ইহাতো ইদ্দাতের চার মাস দশদিনের ব্যাপর মাত্র। অথচ জাহিলিয়াতের জামানায় তোমাদের এক-একজন বৎরের মাথায় গিয়া উষ্ট্রীর গোবর নিক্ষেপ করিতে। (তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা যে স্ত্রীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, সে কতদিনের ইদ্দাত পালন করিবে এবং ইদ্দাত কালে কি করিতে পারিবে, কি পারিবে না, হাদীসটিতে সেই বিষয়ে কথা বলা হইয়াছে। হাদীসটির শেষাংশে ইসলাম পূর্ব কালে স্বামী মরা স্ত্রীরা কি করিত সে দিকে ইংগিত করা হইয়াছে।

বস্তুত স্বামীর মৃত্যু জনিত ইদ্দাত চার মাস দশ দিন। ইহা সুনির্দিষ্ট। এই মেয়াদ নির্দিষ্ট করার মূলে গর্ভে সন্তান সঞ্চার হওয়ার জন্য জরুরী সময়ের যৌক্তিকতা রহিয়াছে। মূলত ইদ্দাত পালনের একটি উদ্দেশ্য হইল, স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান আছে কিনা তাহা দেখা। প্রজনন বিদ্যা পারদর্শীদের মতে মা'র গর্ভে সন্তান পুরাপুরি দানা বাঁধিয়া উঠিতে এবং উহাতে প্রাণের সঞ্চার হইতে অন্তত একশত বিশ দিন অর্থাৎ চারটি পূর্ণ মাস সময় প্রয়োজন। আর সতর্কতাবলম্বনের উদ্দেশ্যে আর মাত্র দশটি দিন অতিরিক্ত ধরা হইয়াছে। কেননা চন্দ্র মাস বেশী কম হইতে পারে বিধায় কখনও কম হইয়া গেলে এই অতিরিক্ত ধরা দশটি দিন দ্বারা সেই কমতি পূরণ করা হইবে। কুরআন মজীদে এই মেয়াদের ইদ্দাত নির্দিষ্ট করার মূলে নিহিত ইহাই কারণ। বলা বাহুল্য, চার মাস দশ দিনের সঙ্গে উহার রাত্র গুলিও অবশ্যই ইদ্দাতের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। এই কারণে পরবর্তী স্বামী একাদশ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে পারিবে না। (عمدة القارى)

হাদীসটিতে যে সুর্মা লাগানোর ব্যাপারটির উল্লেখ হইয়াছে উহার কারণ হইল স্বামী-মৃত্যুর কারণে স্ত্রীর শোক পালন। কিন্তু সুর্মা লাগানো বিশেষত মেয়েদের জন্য যেহেতু বিলাসিতা ও সাজ-শয্যার উদ্দেশ্যে প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের মধ্যেও গণ্য হইতে পারে। এই কারণে উহা ইদ্দাত কালে ব্যবহার

করা জায়েয কিনা, সেই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। আর এই বিষয়ে শরীয়াতের ফয়সালা কি তাহাই এই হাদীসটির আলোচ্য।

কাযী ইয়ায বলিয়াছেন, জাহিলিয়াতের যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া গেলে সে একটি সংকীর্ণ ঘরে প্রবেশ করিত, নিকৃষ্ট ধরনের পোশাক পরিধান করিত। কোনরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করাও তাহার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এতদ্ব্যতীত কোন রূপ প্রসাধন দ্রব্য বা অলংকারাদি ব্যবহার করারও তাহার জন্য অনুমতি ছিল না। এই ভাবে দীর্ঘ একটি বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া যাইত। পরিশেষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের পরই সে কোনরূপ সুগন্ধী ব্যবহার করিতে পারিত। কিন্তু ইসলাম এই সব বদ রসম বাতিল করিয়া দিয়াছে।

ইসলামে স্বামী মরা স্ত্রীর জন্য মাত্র চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাসূলে করীম (স)-এর কথা হইল, জাহিলিয়াতের জামানার কষ্টকর ও দীর্ঘ মেয়াদী অপেক্ষার পরিবর্তে এখন মাত্র এই সময়টুকুও অপেক্ষা করা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর বোধ হইতেছে, ইহা কেমন কথা! এই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যে আবার তোমরা চোখের সামান্য কষ্টের জন্য ইসলামের সহজ নিয়মাদিও পালন করিতে প্রস্তুত হইতে চাহনা। অথচ অপেক্ষার সময় কাল চারমাস দশ দিনের বেশী নয়। কাজেই এই সংক্ষিপ্ত মেয়াদের মধ্যে তোমরা চোখে সুর্মা লাগাইবার কাজ করিবা না। স্বামী মরা যে স্ত্রী লোকটির চোখে সুর্মা লাইবার এই বর্ণনা,—ইবনে অহব তাঁহার 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে বলিয়াছেন—তাহার নাম আতেকা বিনতে নয়ীম ইবনে আবদুল্লাহ্। (عمدة القارى)

হযরত উম্মে আতীয়াতা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (স) সুর্মা ব্যবহার করিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়া বলিয়াছেনঃ لَاتَكْتَحِلُ 'তুমি সুর্মা ব্যবহার করিও না।' এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী মরা স্ত্রীর পক্ষে ইদ্দাত কালে সুর্মা ব্যবহার করা হারাম। উহার প্রয়োজন দেখা দিক আর না-ই দিক, কোন অবস্থায়ই সুর্মা ব্যবহার করা যাইবে না।

হযরত উম্মে সালমা বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর কথাটি এই ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

اِجْعَلِيْهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيْهِ بِالنَّهَارِ (موطأمالك)

তুমি রাত্রি বেলা সুর্মা লাগাও, আর দিনের বেলা উহা মুছিয়া ফেল।

এই কথা হইতে ইদ্দাত কালে সুর্মা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ও সার্বিক ভাবে হারাম প্রমাণিত হয় না। বরং রাত্রি বেলা উহা ব্যবহার করার সুস্পষ্ট অনুমতি ঘোষিত হইয়াছে। যদিও দিনের বেলা উহা মুছিয়া ফেলার নির্দেশও সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে। ফলে এই দুই ধরনের হাদীসে স্পষ্ট বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাইতেছে।

উক্ত দুই প্রকারের কথার মাঝে সংগতি ও সামঞ্জস্য সৃষ্টির পর্যায়ে হাদীসবিদগণ বলিয়াছেন, স্বামী মরা স্ত্রীর ইদ্দাত পালন কালে যদি রোগের চিকিৎসার্থে সুর্মা ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা হইলে এই শেষোক্ত হাদীস অনুযায়ী কেবলমাত্র রাত্রি বেলা তাহার ব্যবহার করা জায়েয হইবে, দিনের বেলায় নয়। আর প্রয়োজন ব্যতীত তাহা ব্যহার করা সম্পূর্ণ হারামই থাকিবে। আর প্রয়োজন বশত যদি কেহ রাত্রি বেলা উহা ব্যবহার করেও, তবুও দিনের বেলা উহা সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলা কর্তব্য হইবে। তবে প্রয়োজন দেখা দেওয়া সত্ত্বেও যদি উহার ব্যবহার না করিয়া পারে এবং উহা ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকে, তবে তাহাই উত্তম।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনুমতি দেওয়ার হাদীসটি হইতে বুঝিতে হইবে যে, মূলত উহা ব্যবহার করার অনুমতি না থাকিলেও কেবল মাত্র প্রয়োজনের কারণে ব্যবহার করা হারাম হইবে না এবং তাহাও

কেবলমাত্র রাত্রি বেলার জন্য। আর যে হাদীসে স্পষ্ট নিষেধ উদ্ধৃত হইয়াছে, সে হাদীসটি সম্পর্কে মনে করিতে হইবে যে, ইহা কোনরূপ প্রয়োজন না হওয়া অবস্থার জন্য শরীয়াতের ফয়সালা। উপরন্তু যে হাদীসে চোখের অসুখ হওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও নিষেধ উদ্ধৃত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে যে, এই নিষেধ তানজীহী মাত্র। অর্থাৎ কাজটি মূলত হারাম নয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে কেবলমাত্র স্বামীর মৃত্যুর কারণে স্ত্রীর শোক পালনের নিয়ম হিসাবে। অন্যান্য ফিকাহবিদদের মতে এই নিষেধ কেবলমাত্র সেই সুর্মা সম্পর্কে যাহা নিছক প্রসাধন দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যাহা ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এই নিষেধ সে সম্পর্কে নয়।

এই প্রেক্ষিতেই স্বামী-মৃত্যুর শোক পালন রতা ও ইদ্দাত পালনকারী স্ত্রীর পক্ষে সুর্মা বা কোন রূপ সুগন্ধী ব্যবহার পর্যায়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, সুলাইমান ইবনে ইয়ামার এবং ইমাম মালিক হইতে একটি বর্ণনানুযায়ী চোখের ব্যাপার বড় রকমের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে সুগন্ধীহীন সুর্মা ব্যবহার করা জায়েয। অনেক ফিকাহবিদ বলিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে উহা ব্যবহার করা জায়েয—উহাতে সুগন্ধী থাকিলেও দোষ হইবে না। কেবল শরীয়াতের আইনে প্রকৃত প্রয়োজন রক্ষার স্পষ্ট অনুমতি রহিয়াছে, তাহাতে হারাম জিনিস ব্যবহার করিতে হইলেও। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রয়োজন হইলে সুগন্ধীহীন সুর্মা ব্যবহার করা যাইবে কেবলমাত্র রাত্রি বেলা, দিনের বেলা নহে।

রাসূলে করীম (স)-এর কথাঃ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ইহা মাত্র চার মাস দশ দিনের ব্যাপার—ইহার বেশী নয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, জাহিলিয়াতের জামানার দীর্ঘ এক বৎসর কাল উদ্দাত পালনের প্রচলনকে ইসলাম মনসুখ ও বাতিল করিয়া দিয়াছে। জাহিলিয়াতের জামানায় স্ত্রী লোকদের ইদ্দাত পালন ছিল অত্যন্ত কঠোর ও কষ্টসাধ্য এক কৃচ্ছ সাধনার ব্যাপার। এই পর্যায়ে হযরত উম্মে সালমারই অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ

(بخاری، مسلم)

জাহিলিয়াতের জামানায় কোন মেয়েলোকের স্বামী মরিয়া গেলে সে একটি ঝুপড়ী কিংবা তাঁবুতে প্রবেশ করিত, নিকৃষ্টতম কাপড় পরিধান করিত, কোনরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করিতে পারিত না—কোন জিনিসই না, এই ভাবে দীর্ঘ একটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইত। পরে একটি গাধা বা ছাগল কিংবা একটি পাখী তাহার নিকট দেওয়া হইত। সে উহার উপর পানি ছিঁটাইত।

ইবনে কুতাইবা হিজাজ বাসীদের কথার আলোকে এই কথাটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন এইভাবে যে, ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের জামানায় ইদ্দাত পালনকারী স্ত্রী গোসল করিতে পারিত না, পানি ছুঁইতে পারিত না। নখ কাটিতে পারিত না। এই অবস্থায় একটি বৎসর কাল কাটাইয়া দেওয়ার পর অত্যন্ত বীভৎস চেহারা ও আকার-আকৃতি লইয়া তাঁবু হইতে বাহির হইত, পরে একটি পাখী বা ছাগী কিংবা কোন জন্তুর সাহায্যে ইদ্দাত ভঙ্গ করিত। তাহা এই ভাবে যে, প্রথমে সেটি পানি দ্বারা গোসল করাইত, পরে সে নিজেও গোসল করিত। ইমাম মালিক বলিয়াছেন, পানি দ্বারা উহার পক্ষ ও পালক বা গাত্র মুছিয়া দিত। ইবনে অহাব বলিয়াছেন, স্ত্রী লোকটি নিজের সিক্ত হাত দ্বারা উহার পিঠ মালিশ করিয়া দিত। অপর লোকদের মতে জন্তু বা পাখীকে গোসল করাইবার পর সে নিজেও সেই পানি দ্বারা গোসল করিত। এবং পরে সে ভাল পানি দ্বারা গোসল করিয়া নিজের শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করিয়া লইত।

ইহার পর সে ঘর হইতে বাহির হইত। তখন তাহার হাতে গোবর তুলিয়া দেওয়া হইত। সে উহা নিক্ষেপ করিত। এই রূপ ঘৃণ্য পন্থায় ইদ্দাত কাল অতিক্রম করাই ছিল জাহিলিয়াতের সময়ের সাধারণ প্রচলিত নিয়ম। অর্থাৎ ইসলাম পূর্ব কালে স্বামী মরা স্ত্রীর ইদ্দাত কাল ছিল পূর্ণ একটি বৎসর। ইসলাম তাহা বাতিল করিয়া মাত্র চার মাস দশ দিন ইদ্দাতের মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে।

স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ (بخارى)

হযরত উম্মে আতীয়াতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে তিন দিনের বেশী কাল কাহারও জন্য শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর জন্য স্বতন্ত্র কথা। এই সময় সে সুর্মা লাগাইবে না, কোন রঙীন কাপড় পরিবে না, তবে মোটা সুতীর কাপড় (পরিবে)। (বুখারী)

ব্যাখ্যা নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে স্ত্রীলোককে শোক পালন করিতে হয়। আত্মীয়তার নিকটত্ব বিশেষ এই শোকের মেয়াদের মধ্যে তারতম্য হইয়া থাকে। হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার—অর্থাৎ মুসলমান স্ত্রীলোক পিতা-মাতা বা ভাই বোন কিংবা অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে যে শোক পালন করিবে, উহার মেয়াদ হইল মাত্র তিন দিন। তিন দিনের অধিক কাল কোন মৃত্যুর জন্য শোক পালন করা কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের জন্যই জায়েয নয় তবে স্বামীর কথা স্বতন্ত্র। কেননা স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার স্বামীর তুলনায় অধিক নিকটাত্মীয় ও অতি আপনজন কেহ হইতে পারে না। এই কারণে স্বামীর জন্য শোক করার মেয়াদ মাত্র তিন দিন নয়। ইহা হইতে অনেক বেশী। আর তাহা হইল চার মাস দশ দিন। এই শোক কাল নির্ধারণের মূলে আরও একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

এই শোক কালকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'ইদ্দাত' عدة। 'ইদ্দাত' শব্দের শাব্দিক ও অভিধানক অর্থ 'গণনা' করা। এই দিনগুলি বিশেষ ভাবে গণিয়া গণিয়া শেষ করা হয়। এবং কবে যে তাহা শেষ হইবে সে জন্য উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করা হয়। এই কারণেই ইহাকে 'ইদ্দাত' বলা হয়। মুহাদ্দিস কাহলানী সানয়ানী লিখিয়াছেনঃ

هِىَ اِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّزْوِيْجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا اِمَّا بِالْوِلاَدَةِ اَوِ الْاَقْرَاْ اَوِ الْاَشْهُرِ (سبل السلام)

ইদ্দাত হইল সেই মেয়াদের নাম, যে কালে স্ত্রী তাহার স্বামী গ্রহণ হইতে বিরত থাকে ও প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। ইহা পালন করা হয় সন্তান প্রজনন দ্বারা কিংবা তুহর গণনা দ্বারা অথবা মাস গণনার দ্বারা।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ

فِى الشَّرْعِ هِىَ تَرَبَّصٌ اَىْ اِنْتِظَارٌ مُدَّةٌ تَلْزِمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ (عمدة القارى)

শরীয়াতের দৃষ্টিতে ইদ্দাত হইল অপেক্ষা কাল—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বিবাহ শেষ হইয়া যাওয়ার পর যে সময়টা তাহাকে পুনর্বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিয়া কাটাইতে হয় তাহারই নাম ইদ্দাত।

স্ত্রীকে এই ইদ্দাত বা অপেক্ষাকাল কিভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে এবং তখন তাহার জীবন ধারা কি রূপ হইবে, তাহাই আলোচ্য হাদীসটির বক্তব্য। নবী করীম (স) বলিয়াছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর এই অপেক্ষাকাল অত্যন্ত সাদাসিদা ভাবে কাটাইতে হইবে। এই সময় সে সুর্মা লাগাইতে পারিবে না। কোন রঙীন বা রেশমী চকচকে পোশাখ পরিধান করিতে পারিবে না।, এই সময় সে সুতার মোটা কাপড় পরিধান করিবে। হাদীসের পরিভাষায় বিধবা স্ত্রীর এইরূপ করাকে বলা হয় احداد।

ইবনুল মুনযির বলিয়াছেন, শোকাতুরা স্ত্রীর পক্ষে রঙিন চকচকে কাপড় পরা জায়েয নয়। তবে কালো বর্ণের বা কালো রঙ করা কাপড় পরিতে পারিবে। হযরত ওরওয়া ইবনে জুবাইর, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী কালো রঙের কাপড় পরা জায়েয বলিয়াছেন। ইমাম জুহরী কালো রঙের কাপড় পরা মাকরূহ বলিয়াছেন। ওরওয়া বলিয়াছেন, লাল বর্ণের কাপড় পরিতে পারিবে না।

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, যে বর্ণে ও রঙেই চাক্‌চিক্য বা সৌন্দর্য আছে, তাহা পরা যাইবে না, উহা মোটা কাপড়ই হউক, কিংবা পাতল। হালকা সাদা কাপড় পরাই বিধেয়। ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

وَيَحْرُمُ حُلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذٰلِكَ اللُّؤْلُؤُ

স্বর্ণ ও রৌপ্যের বা মূল্যবান পাথরের—মণি-মুক্তার অলংকার এই সময় ব্যবহার করা হারাম।

উম্মে আতীয়াতার অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا اِلَّا اَدْنٰى طُهْرِهَا اِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَاَظْفَارٍ (بخارى)

এই পর্যায়ে নবী করীমের এই নিষেধবাণী বর্ণিত হইয়াছেঃ সে (বিধবা স্ত্রী) সুগন্ধী স্পর্শ করিতে পারিবে না। তবে হায়য হইতে যখন পবিত্র হইয়া উঠিবে, ঠিক সেই শুরুতে পবিত্রতা লাভের প্রাথমিক সময় কুশত ও আজগার সুগন্ধী সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করিতে পারিবে।

ইমাম নববী বলিয়াছেনঃ ইহা সুগন্ধীর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবেনা, ব্যবহার করিবে হায়য জনিত দুর্গন্ধ দূর করার উদ্দেশ্যে।

আবূ হাতেম আর-রাযী বর্ণনাটি এই ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ تَحُدَّ الْمَرْاَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسَّ طِيْبًا (بيهقى، بخارى)

রাসূলে করীম (স) স্ত্রীলোককে তিন দিনের অধিক কাহারও জন্য শোক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে স্বামীর মৃত্যুতে সে শোক করিবে চার মাস দশ দিন। আর এই সময় সে রঙীন কাপড় পরিবে না,পরিবে মোটা সুতীর কাপড়। সুর্মা লাগাইবে না এবং সুগন্ধি স্পর্শ করিবে না। নাসায়ীর বর্ণনায় অতিরিক্ত শব্দ হইতেছেঃ ولا تمتشط মাথায় চিরুনী চালাইবে না। মাথা আচড়াইবে না।

(عمده القارى، تحفة الفقها)

ইদ্দাতকালে স্ত্রীর বসবাস

عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ اَخْبَرَتْ اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِىْ بَنِىْ خُدْرَةَ وَاَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِىْ طَلَبِ اَعْبُدٍ لَهُ اَبَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ فَاِنَّ زَوْجِىْ لَمْ يَتْرُكْ لِىْ مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ اَوْفِى الْمَسْجِدِ نَادَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْاَمَرَبِىْ فَنُوْدِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِىْ ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِىْ قَالَ اُمْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَسَأَلَنِىْ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضٰى بِهِ

(موطا مالك، ترمذى، ابوداؤد، نسائي ابن ماجه)

মালিক ইবনে সিনানের কন্যা ফুরাইয়া (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি রাসূলে করীম (স)কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন যে, তিনি বনু খুদরা বংশে অবস্থিত তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট ফিরিয়া যাইবেন কিনা। কেননা তাঁহার স্বামী তাহার পালাইয়া যাওয়া ক্রীত দাসগণের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, তিনি যখন 'তরাফুল কুদুম' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন উহারা তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। ফুরাইয়া বলেন, আমি রাসূলে করীম (স) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি আমার পিতৃ বংশের লোকদের নিকট ফিরিয়া যাইব কিনা? কেননা আমার স্বামী আমার জন্য এমন কোন ঘরবাড়ী রাখিয়া যায় নাই (কিংবা আমাকে এমন ঘরে রাখিয়া যায় নাই) যাহার সে মালিক এবং খরচ পত্রেরও কোন ব্যবস্থা করিয়া যায় নাই। ফুরাইয়া বলেন, আমার এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ 'হ্যাঁ'। ফুরাইয়া বলিয়াছেন, অতঃপর আমি ফিরিয়া যাইতে লাগিলাম।

পরে আমি হুজরা কিংবা মসজিদের মধ্যে থাকিতেই রাসূলে করীম (স) আমাকে ডাকিলেন কিংবা আমাকে ডাকার জন্য আদেশ করেন, ফলে আমি ডাকিত হই। পরে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি কিসের কথা বলিলে? ফুরাইয়া বলেন, অতঃপর আমি আমার স্বামীর সম্পর্কে ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছিলাম সেই সমস্ত কাহিনী আবার বলি। সবকিছু শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তোমার ঘরে অবস্থান কর যতক্ষণ না ইদ্দাতের মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়। ফুরাইয়া বলিয়াছেন, অতঃপর আমি আমার থাকার ঘরে চার মাস দশদিন ইদ্দাত পালন করি। ফুরাইয়া বলেন, হযরত উসমান যখন খলীফা হলেন, তখন তিনি আমার নিকট লোক পাঠাইয়া আমাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাঁহাকে সব খবর জানাইয়া দেই। তখন তিনি পূর্ব সিদ্ধান্তই অনুসরণ করেন এবং উহারই ফয়সালা করিয়াছেন। (মুয়াত্তা মালিক, তিরমিযী, আবূ দায়ূদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

ব্যাখ্যা এই দীর্ঘ হাদীসটিতে স্বামী মরিয়া যাওয়া এক স্ত্রীর ইদ্দাত পালন কালীন অবস্থান সমস্যার বিবরণ এবং রাসূলে করীম (স) কর্তৃক দেওয়া উহার সমাধান বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

স্ত্রী লোকটির নাম ফুরাইয়া। তিনি একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বনু খুদরা নামক এক প্রখ্যাত গোত্রের কন্যা এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ সায়ীদ খুদরির ভগ্নি ছিলেন। তাহার সম্পর্কিত এই দীর্ঘ বিবরণ জয়নাব বিনতে কায়াব কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ফুরাইয়ার স্বামীর নাম না মূল হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে, না হাদীসটির কোন ব্যাখ্যাকারী তাহা বলিয়াছেন। ফুরাইয়া তাঁহার স্বামীর নিহত হওয়ার কাহিনী নিজেই বলিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর অনেকগুলি ক্রীতদাস ছিল। তাহারা পালাইয়া গিয়াছিল। স্বামী তাহাদের সন্ধানে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া মদীনা শহর হইতে ছয় মাইল অবস্থিত 'তরফুল কুদুম' (অগ্রসর হইয়া আসার দিক) নামক স্থানে পৌছিয়াছিল, তখন সেই ক্রীতদাসগুলি তাহাকে হত্যা করে। ইহাতে, ফুরাইয়া বিধবা হইয়া যায়। অতঃপর তাঁহাকে স্বামীর ইদ্দাত চার মাস দশ দিন পর্যন্ত পুনর্বিবাহের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। কিন্তু এই সময় তিনি কোথায় অবস্থান করিবেন, তাহাই ছিল সমস্যা। তিনি তাঁহার এই সমস্যার কথা বলার ও ইহার সমাধান পাওয়ার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিহত হওয়ার কাহিনী বলার পর বলিলেন, তাঁহার স্বামীর নিজের মালিকানায় কোন ঘর নাই এবং খরচ পত্রেরও কোন ব্যবস্থা নাই, এমতাবস্থায় তিনি তাঁহার পিতৃবংশের লোকদের নিকট ফিরিয়া যাইবে কিনা তাহা জানিতে চাহিলেন। নবী করীম (স) প্রথমে তো বলিলেন হ্যাঁ! অর্থাৎ যাও। কিন্তু ফুরাইয়ার মসজিদে নববী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাওয়ার পূর্বেই আবার তাঁহাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেনঃ তুমি যে ঘরে এতকাল ধরিয়া অবস্থান করিতেছিলে, এখনও সেই ঘরেই থাক ও অবস্থান কর। যতক্ষণ না কুরআনের লিখিয়া দেওয়া ও ফরয করিয়া দেওয়া তোমার ইদ্দাত খতম হয়। হাদীসের ভাষা হইলঃ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ইহার শাব্দিক তরজমা হয়ঃ যতক্ষণ না 'লেখা' উহার মিয়াদ পর্যন্ত পৌছায়। ইহার অর্থ, ইদ্দাত কাল শেষ হওয়া। ইদ্দাত কালকে 'কিতাব' বলা হইয়াছে কেননা এই ইদ্দাত—অর্থাৎ স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রীর ইদ্দাত পালনের এই কথাটি আল্লাহ্র কিতাবে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং চার মাস দশ দিনের মিয়াদে ইদ্দাত পালন করা আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করিয়া দিয়াছেন।

এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট ভাবে জানা গেল, স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রীকে মৃত্যু জনিত ইদ্দাত পালন করিতে হইবে। কিন্তু এই ইদ্দাতের কালে সে কোথায় অবস্থান করিবে, এই সময়টা সে কোথায় থাকিয়া কাটাইবে, ইহা ফিকাহ্শাস্ত্রের একটা বিতর্কিত বিষয়। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর লিখিয়াছেন।

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ اَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتّٰى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا

নবী করীম (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা ও অন্যান্যরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করিয়াছেন। তাঁহারা ইদ্দাত পালনকারী স্ত্রীর পক্ষে ইদ্দাত সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন নাই।

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, সুফিয়ান সওরী, ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ ও ইসহাক প্রমুখ ফিকাহ্বিদগণও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে অন্য কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ ও কতিপয় ফিকাহ্বিদ এই মতও দিয়াছেন যে, স্বামী মরা স্ত্রীর যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকিয়াই ইদ্দাত পালন করিতে পারে। স্বামীর ঘরে থাকিয়া ইদ্দাত পালন না করিলেও কোন দোষ নাই। ইমাম তিরমিযীর কথা এই পর্যন্তই।

শরহহিস্ সুন্নাহ গ্রন্থে বলা হইয়াছে, স্বামী মরা স্ত্রীর ইদ্দাত পালন কালীন অবস্থান সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়াছেন। এই পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ীর দুইট কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সহীহতম কথা হইল, স্বামী মরা স্ত্রীকে ইদ্দাত পালন কালে অবস্থানের জন্য স্থান দিতে হইবে। হযরত উমর হযরত উসমান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, উপরোদ্ধৃত হাদীসে নবী করীম (স) ফুরাইয়াকে প্রথমে বাপের বাড়ি চলিয়া যাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু পরে বলিয়াছেনঃ اُمْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ 'তুমি তোমার বর্তমান ও এ যাবত কালের অবস্থানের ঘরেই বসবাস কর'। ইহাতে এই শেষোক্ত কথাটি দ্বারা তাঁহার প্রথম কথাটি মনসুখ ও বাতিল হইয়া গিয়াছে। ইহার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ বলিয়াছেনঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى جَوَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ

এই ঘটনায় একথার দলীল রহিয়াছে যে, শরীয়াতের দেওয়া কোন হুকুম অনুযায়ী আমল করার পূর্বেই উহাকে মনসুখ করা সম্পূর্ণ জায়েয।

এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর দ্বিতীয় কথা এই যে, স্বামী-মরা স্ত্রীকে ইদ্দাত কালে বসবাসের স্থান দেওয়া জরুরী নয়। সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দাত পালন করিতে পারে। হযরত আলী হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) এই মত দিয়াছেন। তাঁহাদের দলীল হইল, নবী করীম (স) ফুরাইয়াকে তাঁহার পিতৃ ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন। এই অনুমতির অর্থ হইল, বসবাসের স্থান স্বামীর নিকট হইতে পাওয়ার তাহার অধিকার নাই। আর পরে যে তিনি ফুরাইয়াকে তাঁহার স্বামীর ঘরে থাকিয়া ইদ্দাত পালন শেষ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন, এই নির্দেশ মুস্তাহাব পর্যায়ের। কিন্তু ইহা সহীহ কথা মনে হয় না।

হাদীসবিদ মুল্লা আলী আল কারী লিখিয়াছেন, স্বামী মরা স্ত্রীকে যে স্বামীর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে না, তাহাতো কুরআন মজীদেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের সে আয়াতটি এইঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ (البقرة:٢٤١)

তোমাদের মধ্যে যাহারা মরিয়া যায় ও স্ত্রীদের রাখিয়া যায় তাহারা যেন তাহাদের স্ত্রীদের জন্য অছীয়াত করিয়া যায় এক বৎসর কালের জীবন-জীবিকা দেওয়ার, ঘর হইতে বাহ্স্কৃত না করার অবস্থায়।

মুল্লা আলী আল কারী বলিয়াছেন, এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী মরা স্ত্রী তাহার স্বামীর ঘরে অবস্থান করিবে এবং সেখান হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করা চলিবে না। পরে অবশ্য এক বৎসর কালের কথাটি মনসুখ হইয়া গিয়াছে এবং সেখানে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে যে ঘর হইতে বাহির করা যাইবে না, এই কথাটি মনসুখ হয় নাই। ইহা অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে।

ইবনুল কাতান বলিয়াছেন, এই হাদীসটি সহীহ। ইবনে আবদুল বার বলিয়াছেন, ইহা এক প্রখ্যাত হদীস। কাজেই ইহাকে অবশ্যই গণ্য ও গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই অনুযায়ী আমলও করিতে হইবে। এই পর্যায়ে দারে কুতনীর একটি বর্ণনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাতে নবী করীম (স) স্বামী মরা এক স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ اَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দাত পালন

করিতে পারে। দারে কুতনী বলিয়াছেন, এই হাদীসের সনদে আবূ মালিক নখয়ী যয়ীফ। ইবনুল কাত্তান বলিয়াছেন, ইহা অপর একজন বর্ণনাকারী মাহবুব ইবনে মুহরাজও যয়ীফ। আতা ইবনে আবদ্ সংমিশ্রণকারী আর আবূ বকর ইবনে মালিক সর্বাধিক যয়ীফ। ইমাম শওকানী লিখিয়াছেন, ফুরাইয়ার হাদীসটি হইতে প্রমাণিত হয় যে, যে ঘরে থাকা অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর খরব শুনিতে পায়, তাহার সেই ঘরেই অবস্থান করা উচিত এবং উহা হইতে বাহির হইয়া অর্থাৎ সেই ঘর ত্যাগ করিয়া সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে না। تفسيرا القرطبي، تحفة الاحوذي، مرقات، نيل الاوطار

তালাক্বের পর সন্তান পালন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اِمْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءٌ وَحَجْرِيْ لَهُ حِوَاءٌ وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءٌ وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَزَعَمَ اَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّيْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِيْ - (ابوداؤد، مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ একটি স্ত্রী লোক নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইল। অতঃপর বলিলঃ হে রাসূল! এই পুত্রটি আমার সন্তান। আমার গর্ভই ছিল ইহার গর্ভাধার, আমার ক্রোড়ই ছিল ইহার আশ্রয়স্থল, আর আমার স্তনদ্বয়ই ছিল ইহার পানপাত্র। ইহার পিতা আমাকে তালাক্ দিয়াছে এবং সংকল্প করিয়াছে ইহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া নিবার। তখন রাসূলে করীম (স) তাহাকে বলিলেনঃ তুমি যতদিন বিবাহ না করিবা ততদিন ইহার লালন পালনের ব্যাপারে তোমার অধিকার সর্বাগ্রগণ্য।

(আবূ দায়ূদ, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা থাকায় তালাকের পর সন্তান পালনের ব্যাপারে পিতা ও মাতা—ইহাদের মধ্যে কাহার অধিকার অগ্রগণ্য, ইহা সবসময়ই একটি জটিল সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। কেননা সন্তান পিতা ও মাতা উভয়ের। উভয়ই একত্রিত হইয়া সন্তান লালন পালন করিবে, যতক্ষণ তাঁহারা একত্রিত হইয়া স্বামী-স্ত্রী হিসাবে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন যাপন করিতে থাকিবে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক্ দেয়, আর তাহার ক্রোড়ে শিশু সন্তান থাকে, তাহা হইলে এই সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে একটা জটিলতা দেখা দেওয়া অবধারিত। কেননা তখন পিতা বলিতে পারে, আমি এই সন্তানের পিতা, আমিই ইহাকে লালন পালন করিব। কিন্তু সন্তানের জননীর মমতা আর্তনাদ করিয়া উঠিতে পারে এই বলিয়া যে, আমিই তো ইহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি, আমিই ইহাকে কোলে করিয়া টানিয়াছি এবং আমার বুকের দুধ খাইয়াই সে লালিত পালিত হইয়াছে। কাজেই ইহার পরবর্তী লালন-পালনের অধিকার আমার। উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে নবী করীম (স) কর্তৃক এই রূপ একটি জটিল ব্যাপারেই নির্ভুল মীমাংসা করিয়া দেওয়ার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহিলাটির ব্যাপারটি বিবৃত করিতেই নবী করীম (স) বলিয়া দিলেন যে, এই সন্তানটি লালন পালনের ব্যাপারে তোমার অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য, পিতার নয়। মহিলাটি যে সব কাজের বিবরণ দিল তাহা একান্তভাবে তাহারই কাজ, এই ক্ষেত্রে পিতার কোন অংশ নাই। অতএব এইরূপ বিরোধ হইলে মা-ই সন্তান পালনের অধিকারী হইবে, পিতা নয়। তবে তালাক্ প্রাপ্ত মহিলার এই অধিকার থাকিবে যতদিন সে পুনরায় বিবাহ না করে, অন্য স্বামী গ্রহণ না করে। রাসূলে করীম (স) এই কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন। ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেনঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْاُمَّ اَوْلٰى بِالْوَالِدِ مِنَ الْاَبِ مَالَمْ يَحْصِلْ مَانِعٌ مِنْ ذٰلِكَ كَالنِّكَاحِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلٰى ذٰلِكَ

এই হাদীস প্রমাণ করিতেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ না করিবে বা অন্য কোন প্রতিবন্ধক না দেখা দিবে মা-ই সন্তানের লালন পালনের ব্যাপারে পিতার অপেক্ষা উত্তম। এই মত সর্বজন সম্মত।

কিন্তু সে যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে, তাহা হইলে তখন তাহার এই অধিকার থাকিবে না। তখন পিতা-ই উহার লালন-পালনের অধিকারী হইবে। ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেনঃ সন্তানটির মা যদি অন্যত্র বিবাহিতা হয় তখন সেই মায়ের মা (সন্তানটির নানী) বর্তমান থাকিলে তাহার স্থলে সে-ই এই অধিকার পাইবে। ইসলামী শরীয়াতের ইহাই বিধান। ইবনে শাইবা হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছে, তিনি তাঁহার স্ত্রী জমীলা বিনতে আসেমকে তালাক্ দিলে তাঁহার পুত্র আসেমকে লইয়া দুই জনের মধ্যে মত বিরোধ হয়। তখন ব্যাপারটি খলীফা হযরত আবূ বকরের (রা) গোচরীভূত করা হয়। তখন খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) ফয়সালা দিয়া বলিলেনঃ

مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرِيْحُهَا خَيْرٌ مِّنْكَ حَتّٰى يَشُبَّ الصَّبِيُّ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهٖ

হে উমর, তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও। তোমার তুলনায় তোমার এই তালাক্ দেওয়া স্ত্রীর ক্রোড় ও সুগন্ধি তোমার সন্তানের জন্য অধিক উত্তম ও কল্যাণবহ যতদিন সে যুব বয়স পর্যন্ত না পৌঁছায়। যুবক হইয়া উঠিলে সে নিজেই বাছিয়া লইতে পারিবে সে কাহার সহিত থাকিবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়াছেঃ

جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَاَرَادَتْ اَنْ تَاْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَهِمَا فَقَالَ الرَّجُلُ مَنْ يَّحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِبْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاِبْنِ اِخْتَرْ اَيُّهُمَا شِئْتَ فَاخْتَارَ اُمَّهٗ فَذَهَبَتْ بِهٖ (مسند احمد)

একটি স্ত্রীলোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল, তাহাকে তাহার স্বামী তালাক্ দিয়াছিল, সে তাহার সন্তানকে লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমরা স্বামী-স্ত্রীর দুইজন 'কোরয়া' (লটারী) কর। তখন পুরুষটি বলিলঃ আমার ও আমার পুত্রের মধ্যে কে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতে পারে? তখন নবী করীম (স) পুত্রটিকে বলিলেনঃ তোমার পিতা ও মাতা দুই জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তুমি গ্রহণ কর। অতঃপর ছেলেটি তাহার মাকে গ্রহণ করিল এবং মা তাহার পুত্রকে লইয়া চলিয়া গেল।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করার পর লিখিয়াছেন, সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে উহার মা ও বাবার মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হইলে তখন সন্তানকেই ইহাদের মধ্য হইতে একজনকে নিজের অভিভাবক রূপ বাছিয়া লইবার অধিকার ও সুযোগ দিতে হইবে। সে তাহার নিজের মত অনুযায়ী যে কাহাকেও মানিয়া লইতে পারে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলিয়াছেনঃ

مَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيْرًا فَالْأُمُّ أَحَقُّ فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِيْنَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

সন্তান ছোট থাকা অবস্থায় মা-ই উহার লালন পালনের অধিকারী। কিন্তু সন্তান সাত বছর বয়সে পৌঁছিলে তাহাকে বাপ ও মা এই দুইজনের মধ্যে একজনকে গ্রহণের ইখতিয়ার দিতে হইবে। সে নিজের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তানুসারে দুইজনের যে কোন একজনের সঙ্গে যাইতে ও থাকিতে পারিবে। এই মতের অনুকূলে ফতোয়া হইয়াছে।

এই পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ গণের মত হইল, সন্তান যদি নিজস্ব ভাবে খাওয়া পরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তখন পিতা-ই তাহার লালন পালনের অধিকারী। সাত বছর বয়স ইহারই একটি অনুমান মাত্র। হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, পিতা ও মাতার মধ্যকার বিবাদ মিটাইবার জন্য 'কোরয়া' (To cast cots)র ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে সন্তান সাত বৎসরের কম বয়সের হইলে মা-ই লালন পালনের অধিকার পাইবে এবং সাত বা উহার অধিক বয়সের হইলে সন্তানকেই তাহার অভিভাবক বাছাই করার সুযোগ দিতে হইবে। তখন সে নিজ ইচ্ছা মত যে কোন এক জনের সঙ্গে যাইতে পারিবে।

(تحفه الاحوذى، فتح الربانى، معالم السنن، المرقات، نيل الاوطار)

হাদীস শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

সামাজিক জীবন

সামাজিক জীবনের দায়দায়িত্ব

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ِالْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ اِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ

(بخارى، مسلم، ابوداؤد)

হযরত আবূ সায়ীদ আল্-খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা পথে-ঘাটে আসন গ্রহণ করা পরিত্যাগ কর। সাহাবীগণ বলিলেনঃ ইয়া রাসূল! পথে-ঘাটে বসা আমাদের জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে। আমরা সেখানে বসিয়া পারস্পরিক কথা-বার্তা বলি। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমরা এই বসা হইতে বিরত থাকিতে যখন অস্বীকার করিতেছ, তখন বস, তবে সেই সঙ্গে পথের অধিকার পুরাপুরি আদায় কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ পথের অধিকার কি হে রাসূল! বলিলেনঃ দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা, পীড়ন বন্ধ করা, সালামের প্রত্যুত্তর দেওয়া এবং ভাল-ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ-নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত রাখা। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দায়ূদ)

ব্যাখ্যা মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ও সামষ্টিকতা ছাড়া মানুষের জীবন অচল। এই সামাজিক জীবনে মানুষকে অন্যান্য মানুষের সহিত নানাভাবে সম্পর্ক ও সংশ্রব রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া মানুষের উপায় নাই। মানুষের এই সামাজিক-সামষ্টিক জীবনে রাস্তা-ঘাটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই রাস্তা-ঘাটে জনগণের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া যায়। এই সাক্ষাৎই তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। সামাজিক মানুষের পরস্পরে কথা-বার্তা হয় পথে-ঘাটে। জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহারা কথা-বার্তা বলে ও নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু রাস্তা-ঘাটে ভিড় করা বা দাঁড়াইয়া থাকা অনেক সময় সমাজেরই অন্যান্য মানুষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। সৃষ্টি করে নানারূপ অসুবিধা। ইহা অবাঞ্ছনীয়। ইহা ছাড়া পথে দাঁড়ানোর কিছু দায়-দায়িত্বও রহিয়াছে। পথে দাঁড়াইলে তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

পথে দাঁড়াইবার এই সব দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সাহাবীগণকে সতর্ক করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি বলিলেনঃ اِيَّاكُمْ وَ الْجُلُوْسَ فِى الطُّرُقَاتِ 'রাস্তা-ঘাটে বসা হইতে তোমরা নিজদিগকে দূরে রাখ।' হযরত আবূ তালহা বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছেঃ قَالَ مَالَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ اِجْتَنِبُوْا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ (مسلم) নবী করীম (স) বলিলেনঃ এই রাস্তা-ঘাটে না বসিলে তোমাদের কি হয়? তোমরা রাস্তা-ঘাটে বসা পরিহার কর।' কিন্তু রাস্তা-ঘাটে বসা বা দাঁড়ানো কিংবা চলা-ফিরা করা সামাজিক মানুষের জন্য অপরিহার্য, তাহা সত্ত্বেও রাসূলে করীম (স) ইহা করিতে

নিষেধ করিলেন কেন? মূলত নিষেধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হইল এই ব্যাপারে আপতিত দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সাহাবীগণকে সতর্ক ও সচেতন করিয়া তোলা। এজন্য প্রথমেই নিষেধকরা কথার উপর গুরুত্ব আরোপের জন্য রাসূলে করীমের (স) একটা বিশেষ স্টাইল। এইভাবে কথা বলিলে শ্রোতৃমণ্ডলি স্বভাবতঃই ইহার কারণ জানিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিবে—হইয়াছেও তাহাই। এই কথা শুনিয়াই সাহাবীগণ বলিলেনঃ ইহা না করিয়া আমাদের উপায় নাই। আমরা রাস্তা-ঘাটে বসিয়া পরস্পরে কথা-বার্তা বলিয়া থাকি। এই কথা-বার্তা তো বলিতেই হইবে। তখন নবী করীম (স) রাস্তা-ঘাটে বসার দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁহাদিগকে অবহিত করিলেন। বলিলেনঃ তোমরা রাস্তা-ঘাটে বসা হইতে বিরত থাকিতে যখন প্রস্তুত নহ, তখন রাস্তা-ঘাটের যে অধিকার তোমাদের উপর বর্তে, তাহা যথাযথভাবে আদায় করিতে তোমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

রাস্তা-ঘাটের কি অধিকার, তাহা জানিতে চাহিলে রাসূলে করীম (স) পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উল্লেখ করিলেন। এই পাঁচটি কাজ যথাক্রমেঃ (১) দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা, (২) কষ্টদান বা পীড়ন উৎপীড়ন বন্ধ করা, (৩) সালামের জওয়াব দেওয়া, (৪) ভাল ও সৎ বা পুণ্যময় কাজের আদেশ করা এবং (৫) অন্যায়, মন্দ ও পাপ কাজ হইতে নিষেধ করা।

রাসূলে করীম (স) এই যে পাঁচটি কাজের উল্লেখ করিলেন পথ-ঘাটের অধিকার হিসাবে, মূলত ইহা ইসলামী সমাজ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজ গুলি না করিলে পথে-ঘাটে বসার অধিকার থাকে না যেমন, তেমনই ইসলামী সমাজে বসবাস করারও অধিকার থাকিতে পারে না। পথে-ঘাটে বসার—অন্য কথায় সামাজিক জীবন যাপন করার তোমার যে অধিকার, তাহা যদি তুমি ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে পথ-ঘাট—তথা সমাজের অধিকার আদায় করিতেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহা তোমার কর্তব্য। তুমি তোমার অধিকার আদায় করিয়া নিবে, কিন্তু তোমার কর্তব্য তুমি পালন করিবে না, ইসলামে ইহা সম্ভব নয়। ইসলামী জীবন-আদর্শ মানুষ ও পৃথিবীকে পারস্পরিক অধিকার কর্তব্য রজ্জুতে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। এই বন্ধনে একটা হইবে আর অন্যটা হইবে না, তাহা হইতে পারে না। কর্তব্য কয়টির ব্যাখ্যা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ইসলামী সমাজের জন্য ইহার সবকয়টি একান্তই অপরিহার্য।

সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল চক্ষু নিম্নমুখী রাখা। নিজ চরিত্র নিষ্কলুষ রাখার জন্য চক্ষু নিম্নমুখী রাখা জরুরী। কেননা পথে কেবল পুরুষ লোকই চলাফিরা করে না, মেয়ে লোকও চলা-ফিরা করিতে পারে, করিয়া থাকে। পুরুষরা যদি পথে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলাচলকারী স্ত্রীলোকদের প্রতি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া রাখে এবং রূপ সৌন্দর্য ও যৌবন দেখিয়া চক্ষুকে ভারাক্রান্ত করিতে থাকে, তবে উহার কুফল তাহার চরিত্রে অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হইবে। পক্ষান্তরে মেয়ে লোক পথে চলিতে গিয়া যদি অনুভব করে যে, পুরুষদের চক্ষু তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিতে ব্যস্ত, তবে তাহাদের মনে কুণ্ঠা ও সংকোচ আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে। তাহাদের কোন দুর্ঘটনার শিকার হইয়া পড়াও অসম্ভব নয়। রাসূলে করীম (স) এই কারণেই একথাটির উল্লেখ করিয়াছেন সর্বপ্রথম।

রাসূলে করীম (স)-এর এই আদেশটি স্পষ্ট ও সরাসরিভাবে কুরআন মজীদ হইতে গৃহীত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই রাসূলে করীম (স)কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করিয়াছেনঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (النور - ٣٠)

হে নবী! মু'মিন লোকদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। ইহাই তাহাদের জন্য পবিত্রতর কর্মপন্থা। লোকেরা যাহা কিছু করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ পুরাপুরি অবহিত।

এ আয়াতে 'গদ্দে বাচার'—غَضُّ بَصَر -এর স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হাদীসেও ঠিক এই শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে উল্লেখ বাণী সমূহে রাসূলে করীম (স) নিজের ভাষায় প্রসংগত উল্লেখ করিয়া জনগণকে ইসলামের বিধান বুঝাইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য পুরুষদিগকে চক্ষু নিচু—নিম্নমুখী রাখিতে নির্দেশ দেওয়া। কুরআন মজীদে পর্দার বিধানের প্রসঙ্গে এই নির্দেশটি উদ্ধৃত হইয়াছে। চক্ষু নিচু রাখিতে বলা হইয়াছে কোন্ জিনিস হইতে, তাহা আয়াতে বলা হয় নাই। উদ্ধৃত হাদীসটিতেও উহার উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট ও সর্বজনবোধ্য যে, ভিন্—গায়র মুহাররাম—স্ত্রী লোকদের প্রতি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাকাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

বস্তুত চক্ষু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ স্পর্শকাতর এবং মর্মস্পর্শী। চক্ষু যাহাতে মুগ্ধ হয়, হৃদয় তাহাতে বিগলিত না হইয়া পারে না। ইন্দ্রিয় নিচয়ের মধ্যে ইহার কার্যকরতা অত্যন্ত তীব্র, শাণিত। এই কারণে মানুষ এই চক্ষুর দরুন বহু পাপ কাজে লিপ্ত হইয়া পড়ে। আয়াতটির আলোকেও বুঝা যায়, চক্ষু অবনত রাখা না হইলে লজ্জা স্থানের পাপ পংকিলতায় পড়িয়া যাওয়া সুনিশ্চিত। আর চক্ষু অবনত রাখা হইলে উহার সংরক্ষণ অতীব সহজ ও সম্ভব। চরিত্রকে পবিত্র রাখার ইহাই সর্বোত্তম পন্থা। যাহারা নিজেদের দৃষ্টি পরস্ত্রীর উপর অকুণ্ঠভাবে নিবদ্ধ করে, তাহারা প্রথমে নিজেদের মন-মগজকে কলুষিত করে এবং পরিণতিতে নিপতিত হয় কঠিন পাপের পংকিল আবর্তে। ইহাই স্বাভাবিক।

এই কারণে সর্বপ্রকার হারাম জিনিস হইতে দৃষ্টি নিচু ও অবনত রাখিতে হইবে। এই আদেশ উপরোক্ত কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই আদেশ স্ত্রী লোকদের জন্যও। ইহারই পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

قُل لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (النور. ٣١)

হে নবী! স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং এই ভাবে তাহাদের লজ্জাস্থানকে অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করে।

অতএব পুরুষদের জন্য যেমন ভিন্ মেয়ে লোক দেখা হারাম, তেমনি স্ত্রীলোকদের জন্যও ভিন্ পুরুষ দেখা হারাম। এই পর্যায়ে রাসূলে করীমের একটি কথা উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেনঃ

اَلْغَيْرَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْمِذَاُ مِنَ النِّفَاقِ

আত্মসম্মান চেতনা ঈমানের লক্ষণ এবং নারী পুরুষের একত্রিত হওয়া মুনাফিকির কাজ।

مذا অর্থঃ নারী পুরুষের একত্র সমাবেশ, নিবিড় নিভৃত একাকীত্বে ভিন্ নারী পুরুষের একত্রিত হওয়া। ইহা সর্বোতভাবে চরিত্র ধ্বংসকারী অবস্থা।

দ্বিতীয় হইল কষ্টদান বা পীড়ন উৎপীড়ন বন্ধ করা, ইহা হইতে বিরত থাকা। ইহার অর্থ পথে চলমান মানুষের সর্বাত্মক নিরাপত্তা বিধান। তুমি পথে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিয়া লোকদিগকে কোনরূপ কষ্ট দিতে পারিবে না। কাহাকেও কোন পীড়াদায়ক কথা বলিতে পারিবে না। এমন কাজও কিছু করিতে পারিবে না, যাহাতে মানুষের কষ্ট হয়।

তৃতীয় সালামের জওয়াব দান। অর্থাৎ তুমি পথে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিলে চলমান মুসলমান তোমাকে সালাম দিবে। তোমার কর্তব্য হইল সেই সালামের জওয়াব দান। এই সালাম দেওয়া ও উহার জওয়াব দেওয়া ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা সংস্কৃতির একটা অত্যন্ত জরুরী অংশ। মুসলমান মুসলমানকে দেখিলে বলিবেঃ আস্-সালামু আলাইকুম। আর ইহার জওয়াবে মুসলমান বলিবেঃ

অ-আলাইকুমুস্ সালাম। ইহা ইসলামের চিরন্তন রীতি। সালাম বিনিময় মুসলমানদের একটা সামাজিক কর্তব্য-ও।

চতুর্থ, আমরু বিল মা'রূফ—ন্যায়, ভাল ও সৎ কাজের আদেশ করা। مَعْرُوف 'মা'রূফ' একটি ইসলামী পরিভাষা। কুরআন মজীদে ইহার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। আল্লামা আইনী ইহার অর্থ লিখিয়াছেনঃ

وَهُوَ كُلُّ أَمْرٍ جَامِعٍ لِكُلِّ مَا عُرِفَ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ وَكُلُّ مَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ مِنَ الْمُحْسِنَاتِ

'মা'রূফ' বলিতে এটা ব্যাপক জিনিস বুঝায়। যাহাই আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজ, যাহাতেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয় এবং জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়। আর শরীয়াত যে সব নেক ও কল্যাণময় কাজের প্রচলন করিয়াছে, তাহা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম, মুনকার হইতে বিরত রাখা। মারুফ-এর বিপরীত যাহা তাহাই মুন্‌কার। সব রকমের খারাপ, কুৎসিত, জঘন্য, হারাম ও ঘৃণ্য অপছন্দনীয়, তাহা সবই মুন্‌কার-এর মধ্যে শামিল। আবূ দায়ূদের বর্ণনায় ইহার সহিত একটি অতিরিক্ত কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইলঃ

وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ

পথ দেখাইয়া দেওয়া বা পথের সন্ধান দেওয়া এবং হাঁচিদাতা যদি 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, তাহা হইলে يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে রহমাত করুন' বলা।

এই দুইটিও পথের অধিকার ও পথের প্রতি কর্তব্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর একটি বর্ণনায় এই সঙ্গে আরও একটি কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইলঃ وَحُسْنُ الْكَلَامِ 'উত্তম কথা বলা'। অর্থাৎ পথে-ঘাটে লোকদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হইলে কথা-বার্তা অবশ্যই হইবে। এ কথা-বার্তা খুব-ই উত্তম এবং ভাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনরূপ কটু বা অশ্লীল কথা বলা কিছুতেই উচিৎ হইতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুজ্জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

اَلْمَجَالِسُ حِلَقُ الشَّيْطَانِ إِنْ يَرَوْا حَقًّا لَا يَقُومُونَ بِهِ وَإِنْ يَرَوْا بَاطِلًا فَلَا يَدْفَعُونَهُ

বৈঠকগুলি শয়তানের চক্র। বৈঠকের লোকেরা 'হক' দেখিতে পাইলে তাহা গ্রহণ করে না এবং 'বাতিল' দেখিতে পাইলে তাহার প্রতিরোধ করেন না।

তিরমিযী শরীফে এই পর্যায়ে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার ভাষা এইরূপঃ

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَاهْدُوا السَّبِيلَ -

রাসূলে করীম (স) আনছার গোত্রের কতিপয় লোকের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই লোকেরা পথের উপরে বসিয়া ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি বলিলেনঃ তোমরা যদি এই কাজ একান্ত কর-ই

এবং এই কাজ না করিয়া তোমাদের কোন উপায় না-ই থাকে, তাহা হইলে তোমরা মুসলমানদের সালামের জওয়াব অবশ্যই দিবে। নিপীড়িত অত্যাচারিত লোকদের সাহায্য সহযোগিতায় সক্রিয়ভাবে আগাইয়া-আসিবে এবং পথহারা অন্ধ ও পথভ্রান্ত লোকদিগকে অবশ্যই পথ দেখাইবে।

কথার মূল সুর হইল, পথের উপর বসা যথার্থ কাজ নয়। কেননা পথ হইল লোকদের চলাচল ও যাতায়াতের স্থান। এই স্থান জুড়িয়া লোকেরা বসিয়া থাকিলে পথের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া পড়ে। আর তাহাতে সামাজিক সামাষ্টিক কাজ বিঘ্নিত হয়। এই কাজ সাধারণত করাই উচিৎ নয়। আর অবস্থা যদি এই হয় যে, এই কাজ তোমাদের না করিলেই নয়, তাহা হইলে এই কারণে তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাহা পালন করিতে তোমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এক কথায় হয় পথে আদৌ বসিবেই না। না হয়—অর্থাৎ পথে বসিলে এই দায়িত্ব পালন করিতেই হইবে।

উদ্ধৃত তিরমিযীর হাদীসটিতে মাত্র তিনটি দায়িত্বের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পর্যায়ের হাদীস সমূহে আরও বহু কয়টি দায়িত্ব ও কর্তব্যের উল্লেখ হইয়াছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এই পর্যায়ে বর্ণিত হাদীস সমূহ হইতে মাত্র সাতটি কর্তব্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। (بلوغ الامانى) ইবনে হাজার আল-আসকালানীর মতে এই দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল মোট চৌদ্দটি। একত্রে সে চৌদ্দটি কর্তব্য এইঃ

'সালাম বিস্তার করা, ভাল ভাল কথা বলা, সালামের জওয়াব দেওয়া, হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ বলিলে ইয়ার হামুকাল্লাহ বলা, বোঝা বহনে লোকদের সাহায্য করা, মজলুমের উপর জুলুম বন্ধ করানো, আর্তনাদকারীর ফরিয়াদ শোনা, লোকদের সুপথ সঠিক পথ দেখানো, পথভ্রষ্টকে পথ চিনাইয়া দেওয়া, ভাল ভাল ও উত্তম কাজের আদেশ করা, খারাপ বা পাপ কাজ হইতে লোকদিগকে বিরত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস পথ হইতে দূর করা, চক্ষু নিম্নমুখী রাখা এবং বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র যিকির করা।' (تحفة الاحوذى)

ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ পথে ঘাটে বসিতে ও জট পাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে নবী করীম (স) নিষেধ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি এই নিষেধের কারণও বলিয়া দিয়াছেন। সে কারণ হইলঃ ইহাতে নানা দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। স্ত্রীলোকদের চলাফিরায় অসুবিধা হইতে পারে। অনেক সময় এই পুরুষরা চলমান স্ত্রীলোকদের প্রতি তাকাইয়া থাকে, তাহাদের সম্পর্কে বদচিন্তা ও আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়, তাহাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা বা উক্তি করে। ইহাতে সাধারণ লোকদের অনেক অসুবিধাও হইতে পারে। ইহা ছাড়া চলমান লোকদের প্রতি সালাম জানানো কিংবা ভাল কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করার দায়িত্বও ইহারা পালন করে না। আর এই গুলিই হইল এই নিষেধের প্রকৃত কারণ।

ইহা সাধারণ অবস্থার চিত্র এবং যে নির্ভুল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই নবী করীম (স) উপরোক্ত কথাগুলি বলার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। বস্তুত ইসলাম পরিকল্পিত সামাজিক পরিবেশ গঠনের জন্য এই কথাগুলি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যে সমাজ পরিবেশে জনগণ এই কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে তাহাই যে সর্বাপেক্ষা উত্তম সমাজ, তাহা অস্বীকার করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়। (عمدة القارى، نبوى، تفسير القرطبى)

সালাম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ (مسلم)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যানবাহনে আরোহী পায়ে হাঁটা লোককে সালাম করিবে। পায়ে হাঁটা লোক বসিয়া থাকা লোককে সালাম করিবে এবং অল্প সংখ্যক লোক বহু সংখ্যক লোককে সালাম করিবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা মুসলমান মুসলমানের সাক্ষাৎ পাইলে বলিবে 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। ইহা ইসলামের সামাজিক বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। চৌদ্দশত বৎসর হইতে মুসলিম সমাজে এই ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা ইসলামী সংস্কৃতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ম। উপরে মুসলিম গ্রন্থ হইতে হাদীসটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বুখারী গ্রন্থে একটি অতিরিক্ত বাক্য আসিয়াছে, যাহা উপরোদ্ধৃত বর্ণনায় নাই। তাহা হইলঃ وَ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ 'ছোট বয়সের লোক বড় বয়সের লোককে সালাম করিবে। এই হাদীসে সালাম দেওয়ার একটা স্থায়ী নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত ইহা যেমন যুক্তি সংগত, তেমনি শাশ্বত ব্যবস্থা।

'সালাম' শব্দটি সম্পর্কে বলা যায়, ইহা আল্লাহ্‌র অসংখ্য নামের মধ্যকার একটি নাম। আবদুস্‌-সালাম— অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাস—কোন ব্যক্তির নাম রাখার রেওয়াজ ইসলামী সমাজে বহু পুরাতন। এ দৃষ্টিতে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এর অর্থ اِسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكَ 'সালাম' নামটি তোমার জন্য অর্থাৎ 'তোমার জন্য আল্লাহ্‌র নাম'। এই রূপ বলার তাৎপর্য হইলঃ اَنْتَ فِىْ حِفْظِ اللّٰهِ 'তুমি আল্লাহ্‌র হেফাযতে আছ বা থাক'। এই কথাটি এ রকমেরই কথা, যেমন বলা হয়ঃ الله معك কিংবা الله يصحبك 'আল্লাহ্‌ তোমার সঙ্গে এবং আল্লাহ্‌ তোমার সঙ্গী হইবেন'।

কেহ কেহ বলিয়াছেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ অর্থ اَلسَّلَامَةُ مُلَازِمَةٌ لَكَ শান্তি ও নিরাপত্তা তোমার জন্য অনিবার্য, অবিচ্ছিন্ন।

উপরোদ্ধৃত হাদীসে যে 'সালাম' দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রথমে দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু ইহার জওয়াব দেওয়া ও জওয়াবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলা ওয়াজিব। ইবনে আবদুল বার্‌ প্রমুখ মনীষীগণ বলিয়াছেনঃ اِجْمَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى اَنَّهُ اِبْتِدَاءُ السَّلَامِ سُنَّةٌ وَرَدُّهُ فَرْضٌ - প্রথমে সালাম দেওয়া সুন্নাত। আর উহার জওয়াব দেওয়া ফরয। যাহাকে সালাম করা হইয়াছে সে যদি একজন হয়, তাহা হইলে এই জওয়াব দেওয়া তাহার জন্য ফরযে আঈন। আর যদি একাধিক বা বহুলোক হয় তবে উহা ফরযে কেফায়া। যে কোন একজন দিলেই ফরয আদায় হইবে। (نووى) কেননা সালাম দেওয়া সম্পর্কে কুরআন মজীদে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ না থাকলেও জওয়াব দেওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

(النساء - ٨٦)

তোমাদিগকে যদি কোনরূপ সম্ভাষিত করা হয়, তাহা হইলে তোমরা উহাপেক্ষা উত্তম সম্ভাষণে সম্ভাষিত কর। কিংবা উহাই ফিরাইয়া দাও। জানিয়া রাখিও, আল্লাহ্ প্রত্যেকটি জিনিসেরই বিশেষ হিসাব গ্রহণকারী।

আয়াতের تَحِيَّةٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ اَلدُّعَاءُ بِالْحَيَاةِ 'জীবনের জন্য দোয়া'। ব্যবহারিত অর্থ, 'সালাম'। কুরআন মজীদের অপর একটি আয়াতে এই 'সালাম' শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। আয়াতটি এইঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (النساء - ٩٤)

যে লোক তোমাকে সালাম জানাইল তাহাকে তোমরা বলিও না যে, তুমি ঈমানদার ব্যক্তি নও।

এই আয়াতে উদ্ধৃত اَلسَّلَامُ অর্থ, আমাদের এখানে আলোচ্য اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -ই। প্রথমোক্ত আয়াতের নির্দেশ হইল, তোমাকে যদি কেহ শুধু اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে, তাহা হইলে তুমি উহা হইতেও উত্তমভাবে জওয়াব দিবে। আর উত্তমভাবে জওয়াব দেওয়ার অর্থ উহার জওয়াবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ বলা। আর তাহা না বলিলে কোন ক্ষতি নাই। তবে প্রথম ব্যক্তি যতটুকু বলিয়াছে, অন্তত অতটুকু তো বলিতেই হইবে। ইহাই আয়াতে দেওয়া নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রথম সালাম দাতা ও উহার জওয়াব দাতা যদি এক একজন লোকও হয়, তবুও বহুবচন সম্বলিত السلام عليكم ও وعليكم السلام ই বলিতে হইবে। ফিকাহবিদ ইবরাহীম নখয়ী বলিয়াছেনঃ

إِذَا سَلَّمْتَ عَلَى الْوَاحِدِ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ وَكَذَالِكَ الْجَوَابُ يَكُونُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ

তুমি যখন একজনকে সালাম করিবে, তখন বলিবে আস্‌সালামু আলাইকুম। কেননা সেই এক ব্যক্তির সঙ্গে ফেরেশতা রহিয়াছে। অনুরূপভাবে উহার জওয়াবও বহু বচনে হইবে।

ফকীহ ইবনে আবূ জায়দ বলিয়াছেনঃ

يَقُولُ الْمُسْلِمُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُ الرَّادُّ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ

প্রথম সালাম দাতা বলিবেঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। উহার জওয়াব দাতাও বলিবেঃ অ-আলাইকুমুস্ সালাম।

কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীস হইতে সালামের জওয়াব দানের নিয়ম জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন; নবী করীম (স) তাঁহাকে বলিলেনঃ اِنَّ جِبْرِيْلَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ হযরত জিবরাঈল তোমাকে সালাম বলিতেছেন। জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ তাহার প্রতিও সালাম, রহমত ও বরকত হউক। অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম-এর জওয়াবে অ-আলাইকুমুস্‌সালাম অ-রাহমাতুল্ল ও বারাকাতুহু' পর্যন্ত বলাই নিয়ম। (ترمذى)

প্রথমোক্ত আয়াতটিতে যে اَوْ رُدُّوْهَا বলা হইয়াছে, ইহাই তাহার অর্থ।

প্রথমে উদ্ধৃত হাদীসে বলা হইয়াছে, যানবাহনে আরোহী প্রথমে সালাম দিবে পায়ে হাঁটা লোককে। কেননা আরোহী ব্যক্তি বাহির হইতে আসিয়াছে। তাহার গতি বেশী পায়ে হাঁটা লোকটির তুলনায়। অনুরূপভাবে পায়ে হাঁটিয়া আসা লোক প্রথমে সালাম দিবে দাঁড়াইয়া থাকা বা বসিয়া থাকা লোককে। এখানেও সেই কারণ। আর অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে প্রথমে সালাম দিবে এই জন্য

যে, বেশী সংখ্যক লোকের মর্যাদা কম সংখ্যক লোকের তুলনায় বেশী। বালকদিগকে সালাম দেওয়া উচিৎ কিনা, সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে সালাম না দেওয়া অপেক্ষা দেওয়াই উত্তম। কেননা ইহা বড়দের পক্ষ হইতে ছোটদের জন্য দোয়া বিশেষ। ফিকাহবিদগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গায়র মুহাররম মহিলাদিগকে পুরুষদের সালাম দেওয়া উচিত নয়। কেননা তাহাদের নামাযে আযান ইকামত বলা হইতে তাহাদিগকে যখন অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে কণ্ঠস্বর প্রচারিত হওয়ার আশংকায়, তখন সালামের জওয়াব দেওয়াও তাহাদের জন্য ওয়াজিব হইতে পারে না। আর এই কারণেই তাহাদিগকে সালাম না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদিও হাদীসে গায়র মুহাররম মহিলাদিগকে সালাম দেওয়ার বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ فَأَلْوٰى بِيَدِهٖ بِالتَّسْلِيْمِ (ترمذى)

নবী করীম (স) একদা মসজিদে গমন করিলেন, তখন একদল মহিলা সেখানে বসা ছিল। নবী করীম (স) তাহাদিগকে সালাম সহকারে হাত দ্বারা ইশারা করিলেন। ইহা হইতে সালাম দেওয়ার একটা বিশেষ পদ্ধতি জানা গেল। এই সালাম দেওয়ায় নবী করীম (স) মুখের শব্দ ও হাতের ইংগিত কে একত্রিত করিয়াছেন।

আবূ দায়ূদে উদ্ধৃত হাদীসে এখানকার শব্দ হইলঃ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا তিনি আমাদের প্রতি সালাম করিলেন।

ইমাম বুখারী তাঁহার গ্রন্থে একটি অধ্যায় দাঁড় করিয়াছেন এই শিরোনামেঃ

تَسْلِيْمُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

পুরুষদের সালাম করা মহিলাদিগকে এবং মহিলাদের সালাম করা পুরুষদিগকে।

ইহাতে তিনি দুইটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটি হাদীসে বলা হইয়াছে সাহাবায়ে কিরামের সেই বৃদ্ধাকে সালাম করার কথা, যিনি জুময়ার দিন তাহাদিগকে খাবার আগাইয়া দিতেছিলেন। আর দ্বিতীয় হাদীসটি হইল, নবী করীম (স) হযরত আয়েশা'র নিকট হযরত জিবরাঈলের (আ) সালাম পৌঁছাইয়া দিলেন। এইভাবে ইমাম বুখারী পুরুষ-নারীর পারস্পরিক সালাম বিনিময় করা মাকরূহ—এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে কোনরূপ নৈতিক বিপদের আশংকা না থাকিলে এই সালাম বিনিময় জায়েয বটে। আর নবী করীম (স)-এর ব্যাপারে এইরূপ কোন আশংকা না-থাকাই যখন নিশ্চিত, তখন তাঁহার জন্য ইহা জায়েয হওয়াতে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাই কেহ যদি নিজেকে এই আশংকামুক্ত মনে করে, তবে সে-ও সালাম বিনিময় করিতে পারে। অন্যথায় চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। মুহাদ্দিস আবূ নয়ীম একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا يُسَلِّمُ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ

পুরুষরা মহিলাদের সালাম দিবে, মহিলারা পুরুষদের সালাম দিবে না।

কিন্তু ইহার সনদ একেবারে বাজে।

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস উল্লেখ্য। হযরত উম্মে হানী (রা) বলিয়াছেনঃ

أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ (مسلم)

আমি নবী করীর (স)-এর নিকট আসিলাম। তখন তিনি গোসল করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম।

ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ বহু সংখ্যক মহিলা একত্রে থাকিলে তাহাদিগকে পুরুষরা সালাম করিতে পারে। আর যদি একজনমাত্র মহিলা হয়, তবে অন্যান্য মেয়েলোক তাহার স্বামী ও অন্যান্য মুহাররম পুরুষরাই শুধু সালাম করিবে—সে মেয়ে লোকটি সুন্দরী হউক কিংবা নয়, অন্যরা করিবেনা।

(نبوی تحفة الاحوذی)

মহিলাদের সমাবেশকে সম্বোধন করিতে হইলে তখন প্রথমে আস্‌সালামু আলাইকুম বলা ইসলামী রীতিসম্মত। হযরত উমর (রা)কে মহিলাদের এক সমাবেশকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিবার জন্য রাসূলে করীম (স) পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দরজায় দাড়াইয়া সালাম দিলেন। মহিলারা ভিতর হইতে উহার জওয়াব দিয়াছিলেন। (আবু দায়ূদ كِتَابُ الصَّلٰوةِ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা) বলিয়াছেনঃ

اَلسَّلَامُ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَهُ اللّٰهُ فِى الْاَرْضِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ

'আস্‌সালাম' মহান আল্লাহ তা'আলার বহু সংখ্যক নামের মধ্যকার একটি নাম। এই নামটিকে তিনি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব তোমরা পারস্পরিক ক্ষেত্রে ইহার ব্যাপক বিস্তার সাধন কর।

ইমাম বুখারী এই হাদীসটি রাসূলে করীম (স)-এর একটি কথা হিসাবেই তাঁহার আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেনঃ

كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَرَّقَ بَيْنَنَا شَجَرَةٌ فَاِذَا الْتَقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ (الطبرانی)

আমরা সাহাবীরা রাসূলের সহিত একত্রে থাকিতাম। সেখান হইতে উঠিয়া যাওয়ার পর আমাদের মাঝে একটি গাছও আড়াল হইয়া পড়িলে অতঃপর আমরা আবার যখন সাক্ষাত করিতাম আমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করিতাম'।

ইহারই সমর্থন পাওয়া যায় ফিকাহ্‌বিদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকারিয়ার কথায়, তিনি বলিয়াছেনঃ

لَقَدْ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَايَرُوْنَ فَيَفْرُقُ بَيْنَهُمُ الشَّجَرَةُ فَاِذَا اِلْتَقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীগণ এক সাথে চলিতে চলিতে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে একটি গাছের আড়াল হওয়ার পরও আবার যদি একত্রিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরস্পরকে সালাম দিতেন।

নামায পড়িতে কিংবা কুরআন পাঠ করিতে থাকা লোককে সালাম দেয়া উচিৎ নয়। যদি দেওয়া হয় তবে সে অংগুলির ইশারায় উহার জওয়াব দিতেও পার। আর নামাজ ও কুরআন শেষ করিয়াও দিতে পারে। অবশ্য প্রাকৃতিক ডাকের কোন কাজ পায়খানা-পেশাব ইত্যাদি পর্যায়ের করিতে থাকলে সেই অবস্থায় কাহাকেও সালাম দেওয়া সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)কে এইরূপ অবস্থায় সালাম দিলে পরে তিনি বলিলেনঃ

إِذَا وَجَدْتَنِىْ أَوْ رَأَيْتَنِىْ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَىَّ فَإِنَّكَ إِنْ سَلَّمْتَ عَلَىَّ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ

তুমি যখন আমাকে এইরূপ অবস্থায় পাও বা দেখ, তখন আমাকে সালাম দিও না। কেননা সালাম দিলে তখন আমি উহার জওয়াব দিতে পারিব না। (نبوى، تفسير القرطبى)

'সালাম' পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টির মাধ্যম

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ـ

(ترمذى، مسلم، مسند احمد)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনিবে এবং তোমরা ঈমানদার হইবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসিবে। আমি কি তোমাদিগকে এমন কাজের কথা জানাইব না যাহা করিলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে পারিবে? তাহা হইলেঃ তোমরা সকলে পারস্পরিক সালামের ব্যাপক প্রচার ও বিস্তার কর। (তিরমিযী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিও হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত। তবে বর্ণিত হাদীসটি 'সালাম' পর্যায়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ ভাবে এইজন্য যে, নবী করীম (স) মূল কথাটি বলার পূর্বে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ শব্দটি বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ। প্রাণীর প্রাণ কাহার মুঠের মধ্যে? ইহা সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত যে, প্রাণীর প্রাণ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলারই বিশেষ দান। তিনি এই প্রাণ দিয়াছেন বলিয়াই আমরা দুনিয়ায় জীবন লাভ করিয়াছি ও বাঁচিয়া আছি। কিন্তু এই জীবন বা প্রাণ আমার নিজস্ব কোন সম্পদ নয়, উহা লইয়া আমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারি না। আমার দেহাভ্যন্তরে উহার স্থিতি হইলে উহার উপর পূর্ণ ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই প্রতিষ্ঠিত। কোন প্রাণীরই প্রাণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ মক্ত নয়। যে কোন মুহূর্তে তাঁহার দেওয়া প্রাণ তিনিই টানিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া নিতে পারেন। অথচ প্রাণী সাধারণতঃ প্রাণ পাইয়া এই কথাটি বেমালুম ভুলিয়া যায় এবং জীবনে যাহা ইচ্ছা করিতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক প্রাণীরই যে মৃত্যু নির্দিষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী তাহা কোন মূহূর্তেই ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। মানব দেহ জৈব রাসায়নিক উপাদানে তৈরী। কিন্তু এই জৈব রাসায়নিক উপাদান সমূহ যৌগিক রূপ পরিগ্রহ করিলেই তাহাতে প্রাণের সঞ্চার স্বতঃই হইয়া যায় না। আল্লাহ্‌-ই এই প্রাণটা সেই যৌগিক উপাদান গঠিত দেহে নিজে ফুঁকিয়া দেন। কুরআন মজীদে প্রাণী—জীবন্ত মানুষ সৃষ্টির এই নিয়মের কথাই বলা হইয়াছে। রাসূলে করীমের এই শপথ সেই তত্ত্বের দিকে ইংগিত করিতেছে না এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

কিন্তু কথার পূর্বে এইরূপ শপথের তাৎপর্য কি? কোন গুরুত্বপূর্ণ ও তত্ত্বমূলক কথা বলার পূর্বে এইরূপ ভাষায় শপথ করাই ছিল রাসূলে করীম (স)-এর স্থায়ী নিয়ম। আলোচ্য হাদীসে এই শপথের পর যে কথাটি বলা হইয়াছে তাহা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ইমাম নববী মূল কথাটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ 'তোমরা ঈমানদার হইবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসিবে' এই কথার তাৎপর্য হইলঃ 'তোমাদের ঈমান পূর্ণত্ব লাভ করিবে না এবং ঈমানদার হিসাবে তোমাদের বাস্তব জীবন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে না পারস্পরিক ভালবাসা ছাড়া'। পারস্পরিক ভালবাসা না হইলে ঈমানই হইবে না, ঈমানের পরও বেঈমান—ঈমানহীন-ই থাকিয়া যাইবে, এমন কথা নয়। আসলে রাসূলে করীম (স) মূলত প্রকৃত ঈমানের যে পরিচয়, তাহাই বলিয়াছেন এইরূপ বলিয়া। আর আমাদের ভাষায় তাহা হইল পূর্ণ ঈমান। আর পূর্ণ ঈমান না হইলেই মানুষ সম্পূর্ণ বেঈমান হইয়া গেল এমন কথা বুঝা যায় না।

কিন্তু রাসূলে করীম (স)-এর প্রথম বাক্যটি সম্পূর্ণ যথার্থ। তাহা হইলঃ 'তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করিবে না ঈমান না আনিলে'। ইহা স্পষ্ট ও সত্য কথা। জান্নাতে প্রবেশের প্রথম শর্তই হইল ঈমান। বেঈমান লোক কখনই বেহেশতে যাইতে পারিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

শেয়খ আবূ আমর এই হাদীসের অর্থ বলিয়াছেনঃ لَا يَكْمُلُ اِيْمَانُكُمْ اِلَّا بِالتَّحَابِّ 'পারস্পরিক ভালবাসা না হইলে তোমাদের ঈমান পূর্ণ হইবে না।' আর পূর্ণ ঈমান না হইলে বেহেশতে প্রবেশ সম্ভব হইবে না।

মূল কথাটির দ্বিতীয় ভাগে আবার গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যেই রাসূলে করীম (স) শ্রোতৃমণ্ডলির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেনঃ 'তোমাদিগকে কি এমন একটা বিষয়ে বলিব না যাহা করিলে তোমাদের পরস্পরে ভালবাসা সৃষ্টি হইবে'? অর্থাৎ পারস্পরিক ভালবাসা না হইলে ঈমান পূর্ণ হইবে না। পূর্ণ ঈমান না হইলে বেহেশতে যাইতে পারিবে না। এইটুকু কথা বলিয়াই নবী করীম (স) তাঁহার দায়িত্ব পালিত হইয়াছে মনে করিতে পারেন নাই। কেননা এই ভালবাসা সৃষ্টির উপায়টা বলিয়া দেওয়াও তাঁহারই দায়িত্ব, সেই দায়িত্বই তিনি পালন করিয়াছেন কথার শেষাংশ পেশ করিয়া। তাহা হইলঃ তোমরা পারস্পরিক 'সালাম' প্রচার ও প্রসার বিস্তার কর ব্যাপক ভাবে। হাদীস ব্যাখ্যাতা তাইয়্যেবী বলিয়াছেনঃ

جَعَلَ اِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبًا لِلْمُحَبَّةِ وَالْمُحَبَّةَ سَبَبًا لِكَمَالِ الْاِيْمَانِ ـ

এই কথায় সালম বিস্তার করাকে পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টির কারণ বলা হইয়াছে এবং পারস্পরিক ভালবাসাকে কারণ করিয়াছেন পূর্ণ ঈমানের।

কেননা পারস্পরিক সালামের বিস্তারই পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুতার কারণ। উহার ফলেই পারস্পরিক প্রীতি, আন্তরিকতা ও মুসলিমদের মধ্যে সামষ্টিকতা ও সংহতি সৃষ্টি হইতে পারে। আর ইহার ফলেই দ্বীন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে, ইসলামের বাণী চতুর্দিকে ব্যাপক প্রচার ও বিস্তার লাভ করিতে পারে।

'সালাম' দ্বারা পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই সালাম দেওয়া না হইলে পারস্পরিক বিচ্ছেদ নিঃসম্পর্কতা ও মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে বিরাট ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। ইহা ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি ব্যবস্থার প্রতি পরম ঐকান্তিকতার লক্ষণ ও প্রমাণ। ইবনুল হাজার আল-আসকালানী লিখিয়াছেনঃ

وَالْمُرَادُ نَشْرُ السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوْا سُنَّتَهُ

লোকদের মধ্যে সালাম প্রচারের অর্থ উহার প্রচলনকে জীবন্ত ও অব্যাহত রাখা।

বস্তুত মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য, অপর মুসলমানের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র সালাম দেওয়া, আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা—সে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হউক কি অপরিচিত। মুল্লা আলী-আলকারী লিখিয়াছেনঃ

সালাম দেওয়া সুন্নাত এবং এই সুন্নাত ফরয হইতেও উত্তম। কেননা উহাতে ব্যক্তির বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায়। এবং ইহার ফলে ওয়াজিব আদায় করার অর্থাৎ সালামের জওয়াব দেওয়ার সুযোগ ঘটে। একজন সালাম দিলেই না উহার জওয়াব দেওয়া যাইতে পারে। এই জওয়াব দান ওয়াজিব।

শুরাইহ্ ইবনে হানী তাঁহার পিতা (হানী) নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলিলেনঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ بِشَيْئٍ يُوْجِبُ لِي الْجَنَّةَ قَالَ طِيْبُ الْكَلَامِ وَبَذْلُ السَّلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ (الطبرانی، ابن حبان، الحاکم)

'হে রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজ জানাইয়া দিন, যাহা করিলে আমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে'। রাসূল বলিলেনঃ মিষ্ট মধুর কথা বলা এবং 'সালাম' দেওয়া এবং লোকদের খাবার খাওয়ানো।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائ)

এক ব্যক্তি নবী করীম (স) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ধরনের ইসলাম পালন উত্তম? তিনি বলিলেনঃ খাবার খাওয়াইবে, সালাম বলিবে যাহাকে চিন তাহাকে, যাহাকে চিন না তাহাকেও।

এই সালাম দিতে হইবে প্রথমেই এবং কথাবার্তা বলার পূর্বেই। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ (ترمذی) السلام قبل الكلام 'কথা বলার পূর্বে সালাম দিতে। অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ لا تدعوا احد الى الطعام حتى يتسلم সালাম না দেওয়া পর্যন্ত কাহাকেও খাইবার জন্য ডাকিবে না।

হযরত ইবনে উমর (রা) প্রায়ই বলিতেনঃ

اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَكُوْنُوْا اِخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ (مسند احمد)

তোমরা সালাম ছড়াইয়া দাও, খাবার খাওয়াও এবং পরস্পর ভাই হইয়া যাও যেমন আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন।

আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া ইংগিত করা হইয়াছে কুরআনের আয়াতের দিকে। সূরা আলে-ইমরানে বলা হইয়াছেঃ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا তোমরা হইয়া গেলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে ভাই ভাই। আর সূরা আল-হুজুরাতে বলা হইয়াছেঃ انما المؤمنون اخوة 'মু'মিনগণ পরস্পর ভাই'। হযরত ইবনে উমরের কথার তাৎপর্য হইল, সালাম ছড়াইয়া দিলে ও খাবার খাওয়াইলে তোমরা পরস্পর সেই ভাই হইয়া যাইতে পারিবে যাহার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে দিয়াছেন।

(تحفة الاحوذی، نبوی، فتح الباری، طیبی، فتح الربانی، مرقاة)

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস হইলঃ

قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ (ترمذی)

রাসূলে করীম (স) আমাকে বলিয়াছেনঃ হে প্রিয় পুত্র! তুমি যখন তোমার পরিবার বর্গের নিকট ঘরে প্রবেশ করিবে, তখন সালাম দিবে। তাহা হইলে ইহা তোমার ও তোমার ঘরস্থ পরিবার বর্গের জন্য বরকতের কারণ হইবে।

এই হাদীসটির সনদে আলী ইবনে জায়দ ইবনে জাদয়ান একজন বর্ণনাকারী। মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে এই বর্ণনাকারী যয়ীফ হইলেও ইমাম তিরমিযীর বিচারে যায়ীফ নহেন। (تهذيب التهذيب)

এই পর্যায়ে একটি প্রশ্ন এই যে, সালাম তো কেবল মুসলমানদের জন্য। কিন্তু যেখানে মুসলিম অমুসলিম একত্রে আছে, সেখানে কিভাবে সালাম দেয়া যাইবে? ইহার জওয়াব পাওয়া যাইবে এই হাদীসেঃ হযরত উসামা ইবনে জায়দ বর্ণনা করিয়াছেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (ترمذى، بخارى، مسلم)

নবী করীম (স) এমন একটি মজলিসে উপস্থিত হইলেন, যেখানে মুসলমান ও ইয়াহুদী সংমিশ্রিত ছিল। তখন নবী করীম (স) সকলের প্রতি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিলেন।

বুখারী মুসলিমের বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ

মুসলমান, মুশরিক, মুর্তিপূজারী ও ইয়াহুদী সংমিশ্রিত ছিল।

ইহা সত্ত্বেও নবী করীম (স) সকলকে সালাম দিলেন। ইমাম নববী লিখিয়াছেন, 'এইরূপ মুসলিম-অমুসলিম সংমিশ্রিত লোকদের মজলিসে সাধারণ ভাবে সালাম করাই সুন্নাত। তবে মনের লক্ষ্য থাকিবে শুধু মুসলমানদের প্রতি সালাম করা। (نبوى، تحفة الاحوذى)

স্পষ্ট ভাষায় আস্‌সালামু আলাইকুম বলার পরিবর্তে কোনরূপ অংগ ভংগী করিয়া সম্ভাষণ করা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَاتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارٰى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارٰى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ (ترمذى)

আমাদের হইতে ভিন্ন লোকদের সহিত যে সাদৃশ্য করিবে, সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়। তোমরা ইয়াহুদী বা খৃস্টানদের সহিত সাদৃশ্য করিও না। ইয়াহুদীদের সম্ভাষণ অংগুলির ইশারা আর নাছারাদের সম্ভাষণ হাতের ইংগিত।

মুসলমানদের সামাজিক দায়িত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلٰى اَخِيْهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ (مسلم)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ একজন মুসলমানের অপর মুসলমানের অধিকার পাঁচটি। একজন মুসলমানের কর্তব্য তাহার ভাইর সালামের জওয়াব দেওয়া, হাঁচি দাতার দোয়ার জওয়াবে দোয়া করা, আহবান করিলে উহা কবুল করা ও যাওয়া, রোগীকে দেখিতে যাওয়া এবং দাফনের জন্য গমনকারী লাশের অনুসরণ করা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা মুসলমানকে সামাজিক জীবন যাপন করিতে হয়। তাই তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে যেমন ইসলামের নিয়ম নীতি পালন করিতে হয়, তেমনি বহু সামাজিক কর্তব্য দায়িত্বও তাহাকে পালন করিতে হয়। এই সামাজিক কর্তব্য ও দায়-দায়িত্বের তালিকা অনেক লম্বা, বহু দিকে তাহা সম্প্রসারিত। উপরোদ্ধৃত হাদীসে মাত্র পাঁচটি সামাজিক দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইহা কোন চূড়ান্ত তালিকা নয়। বরং এই কয়টি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের কর্তব্য ও দায়িত্ব। সামাজিকতার দৃষ্টিতে বিচার করিলে সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারের বহু কয়টি পর্যায় দেখা যাইবে। এই কয়টি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। বস্তুত প্রাথমিক পর্যায়ের এই দায়িত্ব-কর্তব্য কয়টিকে খুবই সামান্য নগণ্য ও গুরুত্বহীন মনে করা হইতে পারে। কিন্তু এই প্রাথমিক ও সামান্য দায়িত্ব-কর্তব্যের উপরই বৃহত্তর দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে সন্দেহ নাই। যে লোক এই প্রাথমিক ও সামান্য নগণ্য দায়িত্ব-কর্তব্য কয়টিই পালন করিতে প্রস্তুত হইল না; কিংবা যথাযথ ভাবে পালন করিল না, সে যে বৃহত্তর ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিতে প্রস্তুত হইবে বা যথাযথভাবে পালন করিবে, তাহার ভরসা কি করিয়া করা যাইতে পারে?

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) যে আদর্শ সমাজ গঠন করার দায়িত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাথমিক পর্যায় হইতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দর রূপে সজ্জিত ও সুবিন্যাস্ত।[১] প্রাথমিক পর্যায়ে এই কর্তব্য ও দায়িত্ব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। ইহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রহিয়াছে ব্যক্তিতে-সমষ্টিতে—ব্যক্তিতে রাষ্ট্রে।

উপরোদ্ধৃত হাদীসে যে পাঁচটি হক বা অধিকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আরোপিত। যদিও ইহাই শেষ কথা নয়।

যে পাঁচটি হক্ক বা অধিকারের কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম হইল সালামের জওয়াব দান। এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী হাদীসে পেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ —الْعَاطِس অর্থঃ হাঁচিদাতা—যে হাঁচি দেয় তাহার কর্তব্য হইল, সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলিবে। অতঃপর শ্রোতা বলিবেঃ يَرْحَمُكَ اللّٰه 'আল্লাহ্ তোমাকে রহমাত দান করুন'। এইরূপ বলাকেই পরিভাষায় বলা হয়

১. হাদীসের বর্তমান নব সংকলনে সেই বিন্যাসকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

اَلتَّشْمِيْتُ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِلْعَاطِسِ। ফিকাহবিদ লাইস বলিয়াছেনঃ تَشْمِيْت প্রত্যেকটি ব্যাপারে আল্লাহ্‌র স্মরণই হইল تَشْمِيْت; হাঁচি দাতাকে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা এইরূপ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ যিকর মাত্র। এই যিকর এর প্রয়োজন দেখা দেয় হাঁচিদানকারীর জন্য। কেননা হাঁচিটি দৈহিক বিকৃতি কম্পন ও সংকোচনের বহিপ্রকাশ। এইরূপ হাঁচি একবার হইতে হইবে। একাধিক বার হইলে বুঝিতে হইবে এই হাঁচি সর্দির দরুন এবং তাহাতে এইরূপ নিয়ম নাই। এইরূপ হাঁচিদাতাকে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ اَنْتَ مَزْكُوْمٌ তুমি সর্দিতে আক্রান্ত। হাঁচি উঠিলে কি করা উচিত এই পর্যায়ে হযতর আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهُ بِيَدِهٖ اَوْ بِثَوْبِهٖ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ (ابوداؤد، ترمذى ،حاكم)

নবী করীম (স) যখন হাঁচি দিতেন, তখন তিনি তাঁহার হাত বা কাপড় দ্বারা তাঁহার মখমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিতেন ও এই উপায়ে তদজনিত শব্দকে চাপিয়া রাখিতেন। (আবূ দায়ূদ, তিরমিযী, হাকেম)

ইবনুল আরাবী ও ইবনুল হাজার আল আসকালানী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ হাঁচি দাতার সামাজিক সৌজন্য মূলক নীতি হইল, সে উহার শব্দ চাপিয়া রাখিবে ও উচ্চৈস্বরে খোদার হামদ করিবে এবং মুখমন্ডল ঢাকিয়া ফেলিবে। কেননা এই সময় তাহার মুখের বিকৃতির দরুন তাহার নাক ও মুখ হইতে এমন সব জিনিস বাহির হইয়া পড়িতে পারে যাহা নিকটে বসা লোকদিগকে কষ্টে ফেলিতে পারে। এই কারণে তাহার মুখ ভিন্ন দিকে ফিরাইয়া রাখা কর্তব্য। (تحفة الاحوذى، فتحالبارى)

তৃতীয়টি হইলঃ اِجَابَةُ الدَّعْوَةِ আহবান-নিমন্ত্রণ কবুল করা ও যথাস্থানে উপস্থিত হওয়া। বস্তুত একজন মুসলমান যখন অপর একজন মুসলমানকে খাওয়ার আহবান জানায়, তখন সে আহবান কবুল করা ও খাওয়ার স্থানে উপস্থিত হইয়া আহার্য গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহা না করিলে সামাজিক জীবনের প্রাথমিক কর্তব্যটুকুও পালিত হয় না। শুধু তাহাই নয়, যে লোক উৎসাহ করিয়া এই আহবান জানায়, তাহার সব উৎসাহ উদ্দীপনা নিঃশেষ হইয়া যায়। মনে মনে দুঃখ পায়, নিজেকে রীতিমত অপমানিত বোধ করে। এই পর্যন্ত আসিয়াই ব্যাপারটি থামিয়া যায় না। আহবান দাতার অন্তরে ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রতি যে আন্তরিকতা পোষণ করিত তাহা শত্রুতার ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। আর এইরূপ অবস্থা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইসলাম ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে আন্তরিকতা ঐকান্তিকতা-সহৃদয়তার গভীর পূতভাবধারার উপস্থিতি চায়। কিন্তু এই অবস্থা উহার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। اِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ডাকের জওয়াব দেওয়ার আর একটি অর্থ হইল কেহ কোন কাজের বা প্রয়োজনে কাহাকেও ডাকিলে সে ডাকে সাড়া দেওয়া ও উপস্থিত হওয়া কর্তব্য।

চতুর্থটি হইলঃ عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ রোগীকে দেখিতে যাওয়া। কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে জানিতে পারিলে তাহাকে দেখার জন্য যাওয়া সর্বসম্মতভাবে সুন্নাত। নবী করীম (স) অতীব গুরুত্বসহকারে এই কাজটি করিতেন। কোন সময়ই ইহার ব্যতিক্রম হইতে দেখা যাইত না। রোগী আত্মীয় হউক, অনাত্মীয় হউক, পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক, তাহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এই ব্যাপারে।

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলিয়াছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ۔ (مسلم)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমরা যখন কোন রোগী বা মৃতের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন খুব ভাল ভাল কথা বলিবে। কেননা তোমরা এই সময় যাহা বলিবে, উপস্থিত ফেরেশতাগণ তাহাতে আমীন আমীন বলিয়া থাকেন।

ইমাম নববী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ রোগী বা মৃতের নিকট উপস্থিত হইয়া ভাল ভাল কথা বলা এই হাদীস অনুযায়ী মুস্তাহাব। ব্যক্তির জন্য দোয়া ও গুনাহমাফী চাওয়া, তাহার কষ্ট দূর বা আসান হওয়ার কামনা করা ইহার মধ্য গণ্য। হাদীসটি হইতে ইহাও জানা গেল যে, এই সময় তথায় ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন এবং লোকদের এ পর্যায়ের কথা ও দোয়া সমর্থন করিয়া আমীন—হে আল্লাহ্ তাহাই হউক—হে আল্লাহ্ তাহাই হউক বলিয়া খোদার নিকট প্রার্থনা জানান।

পঞ্চম হইল জানাযার নামায পড়া ও মৃতের লাশ দাফনের জন্য যখন কবরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তখন উহার সহিত যাওয়া। এই পর্যায়ে রাসূলে করীমের (স) বহু সংখ্যক হাদীস গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেনঃ

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِى الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ

(مسلم)

যে ব্যক্তি মৃতের জানাযা পড়িল তাহার জন্য এক 'কীরাত' সওয়াব এবং যে লোক লাশের অনুসরণ করে কবরে রক্ষিত (দাফন) হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকিল তাহার জন্য দুই কীরাত সওয়াব।

এই হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলে করীমের (স) এই কথা উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ (مسلم)

যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়িল কিন্তু উহার (লাশের) অনুসরণ করিল না, তাহার জন্য এক 'কীরাত'। যদি উহার অনুসরণ করে তবে তাহার জন্য দুই 'কীরাত'।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেনঃ مَا الْقِيرَاطَانِ 'কীরাতানে' বলিতে কি বুঝায়? জওয়াবে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলিলেনঃ

مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

'দুইটি বড় পাহাড়ের মত'।

'কীরাতানে' (দুই কীরাত)-এর এক বচনে 'কীরাতুন'—এক 'কীরাত'।

'কীরাত' বলিতে বাস্তাবিকই কি বুঝায়, এই পর্যায়ে ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

اَلْقِيرَاطُ مِقْدَارٌ مِّنَ الثَّوَابِ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللّٰهِ

'কীরাত' সওয়াবের এমন একটা পরিমাণ যাহা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

এই পর্যায়ের হাদীস সমূহ হইতে জানা যায়, কবরস্থানে যাওয়া ও দাফন হইতে দেখাই যথেষ্ট নয়, কবরের উপর মাটি দেওয়াও ইহার মধ্যে শামিল। অন্যথায় সওয়াব পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইবে না। (مسلم)

এই পর্যায়ে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীস এইরূপঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (مسلم)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক্ ছয়টি। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূল, ঐগুলি কি কি? বলিলেনঃ তুমি যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন তাহাকে সালাম করিবে, সে যখন তোমাকে ডাকিবেন বা আহবান করিবে তুমি তাহার জওয়াব দিবে। সে যখন তোমার নিকট নসীহত চাহিবে, তুমি তাহাকে নসীহত করিবে। সে যখন হাঁচি দিবে ও খোদার হামদ করিবে, তখন তুমি তাহাকে 'আল্লাহ্ তোমাকে রহমত করুন' বলিবে। সে যখন রোগাক্রান্ত হইবে তুমি তাহাকে দেখিতে যাইবে এবং সে যখন মরিয়া যাইবে তুমি তাহার সহিত কবর পর্যন্ত যাইবে।

এই হাদীসটিতে এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অধিকার পাঁচটির পরিবর্তে ছয়টির উল্লেখ করা হইয়াছে। আসলে এই অধিকারের কোন সংখ্যা সীমা নাই, সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়। এই অধিকার অসংখ্য এবং ইহার ক্ষেত্র বিশাল। রাসূলে করীম (স) যখন যে কয়টির উল্লেখ জরুরী মনে করিয়াছেন তখন সেই কয়টিরই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বৈপরীত্য কিছুই নাই। পূর্বের হাদীসটিতে কথার যে ধরন ছিল, এই হাদীসটিতে কথার ধরন ভিন্নতর। ইহাতে যে অতিরিক্ত অধিকারটির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইলঃ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ যখন তোমার নিকট কেহ নসীহত চাহিবে, তখন তুমি তাহাকে 'নসীহত' করিবে। 'নসীহত' শব্দের অর্থঃ কাহারও মংগল ও কল্যাণ কামনা করা। ইমাম রাগেব লিখিয়াছেনঃ

النصح تحرى فعل او قول فيه اصلاح صاحبه

কাহারও সংশোধন বা কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে কোন কথা বলা বা কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করাই হইল 'নসীহত'।

এই প্রেক্ষিতে 'যদি কেহ নসীহত চায় তবে তাহাকে নসীহত করিবে' অর্থ কাহারও কল্যাণের কোন কথা বলা বা কোন কাজ করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। এই কাজ ওয়াজিব। (مرقات)

মুসাফিহা ও মুয়ানিকা

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يَلْقِىْ صَدِيْقَهُ اَيَنْحَنِىْ لَهُ؟ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ ، قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لاَ ، قَالَ فَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ اِنْ شَاءَ (ترمذى، ابن ماجه، مسند احمد)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একব্যক্তি বলিলঃ হে রাসূল! আমাদের কেহ তাহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে কি তাহার জন্য মাথা নত করিবে? হযরত আনাস বলেন, ইহার জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেন, না। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তবে সে কি তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে ও চুম্বন করিবে? রাসূলে করীম (স) বলিলেন, না। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি সে তাহার সহিত করমর্দন করিবে? রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ হ্যাঁ—যদি সে ইচ্ছা করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা সামাজিক জীবনে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ কার নিত্যকার ঘটনা। কিন্তু এই পর্যায়ে প্রশ্ন হইল, দুইজন পরস্পর পরিচিত লোক একত্রিত হইলে তাহারা পরস্পরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে? একজন অপর জনকে কিভাবে গ্রহণ করিবে? উপরোদ্ধৃত হাদীসটি এই পর্যায়ে লোকদের পন্থা নির্দেশ করিতেছে।

প্রশ্নকারী বলিয়াছিল, এই সময় একজন অপর জনের জন্য মাথা নত করিয়া দিবে? يَنْحَنِىْ শব্দটি اَلْاِنْحِنَاءُ হইতে গঠিত। আর ইহার অর্থঃ اِمَالَةُ الرَّأْسِ وَ الظَّهْرِ মাথা ও পীঠ ঝুঁকাইয়া দেওয়া, নত করা। রাসূলে করীম (স) কাহারও জন্য এই কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা মাথা ও পীঠ নত করাকেই ইসলামী পরিভাষায় রুকূ ও সিজদা করা। আর এই রুকূ ও সিজদা ইসলামী ইবাদত পর্যায়ের অনুষ্ঠান এবং ইহা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই করা যাইতে পারে।

বস্তুত মাথা ও পীঠ অবনমিত করা কাহারও প্রতি সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চূড়ান্ত রূপ। এই চূড়ান্ত রূপের সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তওহীদ বিশ্বাসী মানুষ একমাত্র মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও জন্য করিতে প্রস্তুত হইতে পারে না। করিলে তাহা পরিষ্কার হারাম হইবে। এই কারণে নবী করীম (স) উক্ত জিজ্ঞাসার জওয়াবে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেনঃ 'না'।

পরবর্তী প্রশ্ন ছিল 'জড়াইয়া ধরা' ও 'চুম্বন করা' সম্পর্কে এবং ইহার জওয়াবেও নবী করীম (স) 'না' বলিয়াছেন বলিয়া উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। اِلْتِزَامٌ 'জড়াইয়া ধরা'কে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় مُعَانَقَه 'মুয়ানিকা' বা গলাগলি করাকে। 'মুয়ানিকা' বা গলাগলি করা এই হাদীস অনুযায়ী নিষিদ্ধ মনে হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। কেননা এই পর্যায়ে বহু কয়টি হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাতে 'মুয়ানিকা' গলাগলি করা সম্পূর্ণ জায়েয বলিয়া ঘোষণা কারা হইয়াছে।

হযরত বরা ইবনে আজেব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِذَا الْتَقَا الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا (ابوداؤد)

দুই জন মুসলমান যখন পরস্পর মিলিত হয় ও পরস্পর করমর্দন করে, দুই জনই আল্লাহ্‌র হামদ করে ও মাগফিরাত চায়, তাহাদের দুই জনকে ক্ষমা করা হয়।

হযরত আনাস হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীসের ভাষা এইরূপঃ তিনি বলিয়াছেনঃ

مَا اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ رَجُلٍ فَفَارَقَهُ حَتّٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ابن السنى)

রাসূলে করীম (স) কোন লোকের হাত ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে তিনি অবশ্যই বলিতেনঃ হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে দুনিয়ায় মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও পরকালেও এবং জাহান্নামের আযাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। — এইরূপ না বলিয়া তিনি কাহারই হাত ছাড়িতেন না।

আবূ দায়ূদ (তাবেয়ী) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত বরা ইবনে আজেব (রা)-এর সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে প্রথমে সালাম দিলেন। অতঃপর আমার হাত ধরিলেন এবং আমার দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ تَدْرِىْ لِمَ فَعَلْتُ هٰذَا بِكَ তুমি জান, আমি তোমার সহিত এইরূপ করিলাম কেন? আমি বলিলাম, জানি না, তবে আপনি নিশ্চয়ই ভাল'র জন্য করিয়া থাকিবেন। তখন তিনি বলিলেনঃ

اِنَّهُ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِىْ مِثْلَ الَّذِىْ فَعَلْتُ بِكَ فَسَأَلَنِىْ فَقُلْتُ مِثْلَ الَّذِىْ قُلْتَ لِىْ فَقَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ اَحَدُهُمَا عَلٰى صَاحِبِهٖ وَيَأْخُذَ بِيَدِهٖ لَا يَأْخُذُهُ اِلَّا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتّٰى يَغْفِرَ لَهُمَا

(ابوداؤد، ترمذى، ابن ماجه)

রাসূলে করীম (স) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন তিনি আমার সহিত তাহাই করিলেন যাহা আমি তোমার সহিত করিয়াছি। অতঃপর তিনি আমাকে সেই প্রশ্নই করিলেন যাহা আমি তোমাকে করিয়াছি এবং উহার জওয়াবে আমি তাহাই বলিলাম যাহা তুমি আমাকে বলিলে। তাহা পর নবী করীম (স) বলিলেনঃ দুইজন মুসলমান পরস্পরে মিলিত হইয়া একজন অপরজনকে সালাম করিবে ও একজন অপরজনের হাত ধরিবে। —হাত ধরিবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ওয়াস্তে—তাহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার পূর্বেই তাহাদের গুনা মায়াফ হইয়া যাইবে।

হাদীসের অংশ لَا يَأْخُذُهُ اِلَّا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ধরিবে না তাহাকে বরং শুধু মহান আল্লাহ্র জন্য—এই কথার অর্থঃ

لَا يَحْمِلُهُ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا الْحُبُّ فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا الرِّيَاءُ لِكَوْنِهٖ غَنِيًّا اَوْ صَاحِبُ جَاهٍ

এই হাত ধরার কাজে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে অন্য কিছুই নয়—শুধু মহান আল্লাহ্র কারণে সৃষ্ট ভালবাসা। সে ধন বা অতীব সম্মান ও মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলিয়া দেখানোপনার জন্য সে এই রূপ করিবে না—তবেই এই মাগফিরাত পাওয়া যাইবে।

আতা ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-খুরাসানী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ (موطا مالك)

তোমরা পরস্পর 'মুছাফিহা'—করমর্দন কর, তাহা হইলে ক্রেদ হিংসা বিদ্বেষ দূর হইয়া যাইবে এবং তোমরা পরস্পর উপহার তোহফার বিনিময় কর, তাহা হইলে পরস্পরে ভালবাসার সৃষ্টি হইবে এবং পারস্পরিক শত্রুতা চলিয়া যাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম (স) হইতে তাঁহার এই কথাটি বর্ণনা করিয়াছেনঃ

مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ

অর্থাৎ একজন মুসলমান যখন অপর মুসলমানের সাক্ষাৎ পাইবে তখন যে সালাম বিনিময় করার ব্যবস্থা রহিয়াছে, এই সালামের সম্পূর্ণতা হইল পরস্পরের হাতে হাত রাখা ও মুসাফিহা করা। কেননা মুসাফিহা করা সুন্নাতে মুয়াক্কিদাহ্।

সনদের দিক দিয়া এই হাদীসটি মরফু নয়। একটি মতে ইহা আবদুর রহমান ইবনে জায়দ কিংবা অন্য কাহারও কথা। ইবনে হাজার আল-আসকালানীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। (تحفة الاحوذى)

হযরত বরা ইবনে আজেব (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَتَفَرَّقَا (ترمذى)

দুইজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাত করা ও মিলিত হওয়ার পর পরস্পর মুসাফিহা করিলে তাহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সেই দুইজনকে মাফ করিয়া দিবেন।

এই হাদীস হইতে জানা গেল, দুই মুসলমানের সাক্ষাৎ কালে সালাম ও মুসাফিা করা এবং এই সময় আল্লাহ্র হাম্দ করা ও গুনাহের মাফী চাওয়া সুন্নাত।

হযরত হুযায়ফাতা ইবনুল ইয়ামান (রা) নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا لَقِىَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاَخَذَ بِيَدِهٖ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرَةِ (الطبرانى فى الاوسط)

এক মু'মিন ব্যক্তি যখন অপর মু'মিন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে সালাম দেয় ও তাহার হাত ধরিয়া মুসাফিহা করে তখন এই দুই জনের গুনাহ সমূহ ঠিক সেই রকম করিয়া ঝরিয়া পড়ে যেমন করিয়া গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে।

হযরত সালমান ফারেসী (রা) হইতেও ঠিক এই রকমেরই একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

এই সব কয়টি হাদীস হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম সমাজে সালামের সঙ্গে সঙ্গে মুসাফিহা বা করমর্দনও একটি সাংস্কৃতিক কাজ এবং ইহা রাসূলের সুন্নাত। কিন্তু ইসলামের নিছক কমমর্দনের কোন মূল্য নাই। মুসাফিহা করার সময় প্রথমতঃ আল্লাহ্র হামদ্ করিতে হইবে এবং উভয়কেই বলিতে হইবে (يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ) আল্লাহ্ আমাদেরও মাফ করুন, মাফ করুন তোমাদেরও। সেই সঙ্গে রাসূলের প্রতি দরুদ পাঠও মুস্তাহাব। এই পর্যায়ে হে খোদা আমাদিগকে এই দুনিয়ায়ও মঙ্গল দাও, পরকালেও মঙ্গল দাও এবং জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাও বলিয়া দোয়াও করা যাইতে পারে। ইহা মুস্তাহাব।

মুহাদ্দিস ইবনে বাত্তাল বলিয়াছেনঃ ইসলামে বিশেষজ্ঞ মনীষীদের মতে 'মুসাফিহা' খুবই উত্তম কাজ। ইমাম মালিক প্রথমে ইহাকে মাক্‌রূহ মনে করিতেন। কিন্তু পরে তিনি মত পরিবর্তন করিয়া ইহাকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন।

ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ 'মুসাফিহা' সর্বসম্মতভাবে সুন্নাত। তিনি اَلْاَذْكَار গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ إِنَّ الْمُصَافَحَةَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ। সর্বপ্রকার সাক্ষাৎকার কালেই মুসাফিহা করা খুবই পছন্দনীয় কাজ। তবে লোকেরা ফজর ও আছরের নামযের পরে মুসাফিহা করার যে রেওয়াজ রহিয়াছে, শরীয়তে ইহার কোন ভিত্তি নাই। তবে তাহাতে গুনাহও নাই কিছু। শাহ্ অলী উল্লাহ্ দিহ্‌লভী মুয়াত্তার শরাহ المسوى। গ্রন্থেও এই কথাই লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঈদের দিনের 'মুসাফিহা' সম্পর্কেও এই কথাই বলিতে চাই। কেননা মূলত শরীয়াতে ইহার বিধান রহিয়াছে। এখন লোকেরা যদি ইহা বিশেষ বিশেষ সময়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে করে, তবে তাহাতে এই বিধানের তো কোন হের-ফের হইতে পারে না এবং তাহাতে কোন গুনাহের কাজ হইল, তাহা বলা যাইবে না।

ইবনুল হাজার আল-আস্‌কালানী বলিয়াছেনঃ 'সাধারণভাবে সকলের সঙ্গেই মুসাফিহা করা যাইবে। তবে গায়র মুহাররম মহিলা ও অল্প বয়স্ক সুশ্রী যুবক ইহার মধ্যে গণ্য নহে। অর্থাৎ ইহাদের সহিত করমর্দন বা মুসাফিহা করা জায়েয নয়।

এই মুসাফিহায় প্রত্যেকের একটি মাত্র হাত ব্যবহৃত হওয়া সুন্নাত এবং উহা ডান হাত হইতে হইবে। হানাফী শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। কেননা ডান হাতই সাধারণত সকল ভাল কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব এই কাজে বাম হাত ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

يَسْتَحِبُّ اَنْ تَكُوْنَ الْمُصَافَحَةَ بِالْيُمْنٰى وَهُوَ اَفْضَل

মুসাফিহা ডান হাত দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং ইহাই উত্তম।

শায়খ আবদুর রউফ আল মুনাভী শাফেয়ী লিখিয়াছেনঃ

وَلَا تَحْصِلُ السُّنَّةُ اِلَّابِوَضْعِ الْيُمْنٰى فِى الْيُمْنٰى حَيْثُ لَا عُذر

কেননা কোন ওযর না থাকিলে ডান হাতে ডান হাত না রাখিলে সুন্নাত হাসিল হইবে না।

ইহার দলীল হিসাবে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করিয়াছেনঃ হযরত আবদুল্লা ইবনে বুসর (রা) বলিয়াছেনঃ

تَرَوْنَ كَفِىْ هٰذِهٖ فَاشْهَدُ اَنِّىْ وَضَعْتُهَا عَلٰى كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(مسند احمد)

তোমরা আমার এই হাতখানা দেখিতেছ। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এই হাতই আমি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর হাতের উপর রাখিয়াছি। (এই বলিয়া তিনি তাঁহার ডান হাতই দেখাইয়াছেন)

অপর বর্ণনায় ইহার ভাষা এই রূপঃ

تَرَوْنَ يَدَ هٰذِهٖ صَافَحْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التمهد لابن عبد البر)

তোমরা আমার এই হাতখানি দেখিতেছ, এই হাত দিয়াই আমি রাসূলে করীম (স)-এর সহিত মুসাফিহা করিয়াছিঃ

হযরত আবূ ইমামা (রা) বলিয়াছেনঃ

تَمَامُ التَّحِيَّةِ الْاَخْذُ بِالْيَدِ وَالْمُصَافَحَةُ بِالْيُمْنٰى - (حاكم، كنزالعمال)

'হাতদ্বারা ধরা ও ডান হাত দিয়া মুসাফিহা করাই হইল সালামের সম্পূর্ণ রূপ।

অন্যকথায় মুখে সালাম করাই শুধু জরুরী নয়; বরং সেই সঙ্গে মুসাফিহা করাও জরুরী।
(تحفة الاحوذى)

এই প্রসঙ্গে 'মুয়ানিকা' কোলাকুলি সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য উল্লেখ্য। প্রথমে উদ্ধৃত 'জড়াইয়া ধরিবে কিনা' প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলে করীম (স) 'না' বলিয়াছেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কথাও ঠিক নহে। কেননা 'মুয়ানিকা'—পরস্পরকে জড়াইয়া ধরা বা গলাগলি করাও ইসলামে জায়েয আছে। এই পর্যায়ের কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُبْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللّٰهِ مَارَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ (ترمذى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ হযরত সায়াদ ইবনে হারেসা (রা) সফর হইতে ফিরিয়া মদীনায় উপস্থিত হইলেন, এই সময় রাসূলে করীম (স) আমার ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত জায়দ আসিয়া দরজায় শব্দ করিলেন। তখন নবী করীম (স) জায়দের আগমনে আনন্দিত হইয়া বাহিরে যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন গাত্র নগ্ন ছিলঃ তিনি পরিধানের কাপড় টানিতে টানিতে বাহিরে গেলেন—খোদার পশথ, আমি তাঁহাকে কখনও নগ্ন গাত্রে বাইরের কোন লোকের সহিত মিলিত হইতে দেখি নাই—না ইহার পূর্বে, না ইহার পর—অতঃপর তিনি তাঁহার সহিত 'মুয়ানিকা' (গলাগলি) করিলেন এবং তাঁহাকে চুম্বন করিলেন।
(তিরমিযী)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেনঃ আমি সিরিয়া গিয়া আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইসের দরজায় দাঁড়াইয়া নিজের উপস্থিতির কথা জানাইলে ইবনে উনাইস পরনের কাপড় টানিতে টানিতে আসিলেন। অতঃপর فَاعْتَنَقَنِىْ وَاعْتَنَقْتُهُ তিনি আমার সহিত গলাগলি করিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত গলাগলি করিলাম।

হযরত আবু যা'র (রা) বলিয়াছেনঃ

اُرْسِلَ اِلَىَّ فَاَتَيْتُهُ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَوَجَدْتُهُ مُضْطَجِعًا فَاَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَالْتَزَمَنِىْ (مسند احمد، تاريخ الكبير للبخارى)

আমাকে ডাকিয়া আমার জন্য লোক পাঠানো হইয়াছিল। আমি রাসূলের নিকট আসিলাম যখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। আমি তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তিনি তাঁহার হাত উপরে তুলিলেন ও আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

'জড়াইয়া ধরিলেন' অর্থ আমার সহিত তিনি 'মুয়ানিকা' করিলেন। 'মুয়ানিকা' পর্যায়ে উদ্ধৃত হাদীস সমূহ হইতে একথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ইসলামী সমাজে সালাম ও মুসাফিহার পর মুয়ানিকা করারও ব্যাপক প্রচালন ছিল এবং ইহা শরীয়াত সম্মত কাজ।

হযরত জায়দ বর্ণিত হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া ইমাম তিরমিযী উহাকে একটি উত্তম হাদীস (حديث حسن) বলিয়াছেন। ইমাম বুখারী এই হাদীসটি তাঁহার (الادب المفرد) গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা অতীব উত্তম সনদ সম্পন্ন হাদীস। এই সব হাদীস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, 'মুয়ানিকা' শরীয়াত সম্মত। তবে বিশেষ করিয়া বিদেশাগত ব্যক্তির সহিত মুয়ানিকা করা খুবই উত্তম। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলিয়াছেনঃ

كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوْا وَاِذَا قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوْا (طبرانى فى الاوسط)

নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ যখন পরস্পরে সাক্ষাৎ করিতেন তখন (সালাম দেওয়ার পর) মুসাফিহা করিতেন এবং তাঁহারা যখন বিদেশ সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন পরস্পর 'মুয়ানিকা' করিতেন।

মুহাদ্দিস হায়সামী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ইহার বর্ণনাকারী সব কয়জন লোকই সিকাহ্।

এই পর্যায়ে হযরত আনাস বর্ণিত প্রথমে উদ্ধৃত হাদীসটিতে মুয়ানিকা করার যে নিষেধ উল্লেখিত হইয়াছে তাহা সেই লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁহারা বিদেশ সফর হইতে আসেন নাই। আর হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস এবং হযরত আবূ যা'র (রা) বর্ণিত হাদীস দুইটি হইতে বিদেশাগত মুসলমান ভাইর সহিত 'মুয়ানিকা' করার কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হইয়াছে। কাজেই ইহার শরীয়াত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বস্তুত ইসলামী সমাজের লোকদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টির জন্যই এই সব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্য কোন সমাজে ইহার তুলনা নাই। بلوغ الامانى، نبوى، فتح البارى

এই হাদীসদ্বয় হইতে প্রমাণিত হয় যে, বিদেশ হইতে আগত আপন জনের সহিত গলাগলি করা শরীয়াত সম্মত। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হইলঃ

كَانُوْا اِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوْا وَاِذَا قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوْا

'সাহাবাগণ যখন পরস্পর মিলিত হইতেন তখন পরস্পর মুসাফিহা করিতেন। আর যখন বিদেশ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন তখন তাঁহারা পরস্পর কোলাকুলি করিতেন।

মুসাফিহা ও মুয়ানিকা করমর্দন ও গলাগলি মুসলিম সমাজের স্থায়ী সংস্কৃতি মূলক কাজ। পারস্পরিক ভালবাসা বন্ধুতা ও আপনত্বের ভাবধারা গাঢ় ও গভীর করার জন্য ইহার বিশেষ অবদান রহিয়াছে।

ব্যক্তির সামাজিক কর্তব্য

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوْفِ سِتٌّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ اِذَا تُوُفِّيَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ (ترمذی، ابن ماجه، مسند احمد)

হযতর আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের ছয়টি ভাল ভাল কাজ করণীয় হইয়া আছে। (১) সে যখন তাহার সাক্ষাৎ পাইবে, তাহাকে সালাম দিবে, (২) সে যখন হাঁচি দিবে (ও আল্‌হামদুলিল্লাহ বলিবে), (৩) সে যখন রোগাক্রান্ত হইবে, তখন তাহার শুশ্রূষা করিবে, (৪) সে যখন তাহাকে ডাকিবে সে উহার জওয়াব দিবে, (৫) সে যখন মৃত্যু বরণ করিবে তখন তাহার নিকট উপস্থিত হইবে (৬) এবং সে নিজের জন্য যাহা ভালবাসে বা পছন্দ করে তাহার জন্যও ঠিক তাহাই ভালবাসিবে ও পছন্দ করিবে এবং অসাক্ষাতে অনুপস্থিতিকালে তাহার কল্যাণ কামনা করিবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা রাসূলে করীম (স) যে সমাজ গঠনের জন্য প্রাণান্ত সাধনা করিয়াছেন, তাহাকে এক কথায় বলা যায়, জনগণের পারস্পরিক অধিকার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ। এই সমাজের কেহ সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত নয়। এই অধিকারের অপর নাম হইল পরস্পরের প্রতি কর্তব্য। বস্তুত যেখানেই কর্তব্য সেখানেই অধিকার এবং যেখানে অধিকার, উহারই অপর দিক কর্তব্য। এই কর্তব্য অবশ্যই পালনীয়।

এই সমাজ অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পরিবর্তে কর্তব্য পালনে প্রত্যেকের নিজের তীব্র অনুভূতি ও কর্তব্য পালনের প্রতিযোগিতায় সমৃদ্ধ। সেই কারণে এখানে শ্রেণী সংগ্রামের অবকাশ নাই, কাহারও অধিকার অনাদায় থাকিয়া যাওয়ারও নাই একবিন্দু আশংকা।

উপরোদ্ধৃত হাদীসে যে ছয়টি ভাল ভাল কাজের উল্লেখ হইয়াছে, বস্তুত রাসূলের ইপ্সিত আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য এই কয়টি এবং এই ধরনের অন্যান্য যে সব কাজের উল্লেখ অন্যান্য হাদীসে হইয়াছে তাহা একান্ত জরুরী।

উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রায় সব কয়টিরই ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। 'সালাম' মুসলমানের পারস্পরিক ভালবাসা ও আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতা সৃষ্টির একটা অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা। হাঁচি দেহের জড়তা নিঃসরণের লক্ষণ। তাই হাঁচি দেওয়ার পর ব্যক্তির কর্তব্য আল-হামদুলিল্লাহ বলিয়া এই জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা এবং ইহা যে লোক শুনিতে পাইবে, তাহার কর্তব্য লোকটিকে 'আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহমত করুন' বলা। ইহাতেও আন্তরিক কল্যাণ কামনা প্রকাশ নিহিত। তবে হাদীসে এই হাঁচিকে তিন বারের মধ্যে সীমিত করা হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَاِنْ اِزْدَادَ فَاِنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ اِنْ شِئْتَ فَلَا (ترمذی)

হাঁচি দাতা তিন বার পরপর হাঁচি দিলে তবেই দোয়ার বাক্য বলিতে হইবে। উহার বেশী হইলে কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

রোগ হইলে দেখিতে যাওয়া ও রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা একটা অতীব মানবীয় ও মানব কল্যাণ মূলক কাজ। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে সে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম—তত্ত্ব-তালাশী ঔষধ সেবন

ইত্যাদি কিছুই করিতে পারে না। তাহা করিয়া দেওয়া সুস্থ মানব শ্রেণীর মানবীয় ও সামাজিক দায়িত্ব। তাহা ছাড়া রোগী সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে বিধায় তাহার মনে বাসনা জাগে, তাহার আপনজন বন্ধু বান্ধব ইত্যাদিরা তাহাকে দেখিতে আসুক। লোকেরা দেখিতে আসিলে রোগী রোগের অনেক যন্ত্রণাই ভুলিয়া যায়। সাময়িক ভাবে হইলেও অনেক মানসিক কষ্ট হইতে সে রেহাই পায়।

ডাকিলে উহার জওয়াব দেওয়া, ডাকে সাড়া দেওয়া এবং তাহার নিকট উপস্থিত হওয়াও কর্তব্য। কেননা এই ডাক সাধারণত প্রয়োজনের কারণেই হইয়া থাকে। বিনা প্রয়োজনে কেহ কাহাকেও ডাকে না। কাজেই কাহারও ডাককে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাহাতে ব্যক্তি নিজেকে অপমানিত বোধ না করিয়া পারে না।

আর কাহারও মৃত্যু ঘটিলে তাহার কাফন জানাযা ও দাফনে উপস্থিত হওয়া যে সমাজের লোকদের একান্তই কর্তব্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। কেননা মৃত্যু অবধারিত। প্রত্যেক প্রাণী ও মানুষকেই উহার শিকার হইতে হইবে। পার্থক্য শুধু আগে ও পরের। নতুবা মৃত্যু হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

হাদীসটির সর্বশেষ বাক্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হইয়াছে। মানুষ নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে তাহাই তাহার পছন্দ করা উচিত অন্য মানুষের জন্য। বস্তুত যে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ এই গুণে গুণান্বিত ও এই কর্তব্যে সজাগ ও সক্রিয় সে সমাজে কোন মানুষেরই একবিন্দু দুঃখ থাকিতে পারে না। কেননা কোন ব্যক্তিই নিজের জন্য দুঃখ কষ্টকে পছন্দ করিতে পারে না। তাহা হইলে কেহ অন্য মানুষের জন্যও দুঃখের কারণ ঘটাইবে না। আর যে সমাজে মানুষ মানুষের জন্য দুঃখের কারণ ঘটায়না, সে সমাজে প্রত্যেকটি মানুষই নিরবচ্ছিন্ন ও অখন্ড সুখে জীবন যাপন করিতে পারে; তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই হাদীসটি বহু কয়টি সূত্রে বর্ণিত। ইহার একটি সূত্রের একজন বর্ণনাকারী আল হারেস দুর্বল। কিন্তু এমন সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে এই আল-হারেস নাই। আর অন্যান্য সূত্রগুলি নিঃখুত। সেই কারণে ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে 'হাদীসুন হাসানুন' বলিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত অপর একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলে করীমের একটি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে এই ভাষায়ঃ

أَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا

(ترمذی، مسند احمد)

তুমি তোমার পাড়া-প্রতিবেশীর সহিত সদাচরণ কর, তাহা হইলে তুমি প্রকৃত মু'মিন হইতে পারিবে এবং তুমি লোকদের জন্য তাহাই পছন্দ কর, যাহা পছন্দ কর নিজের জন্য।

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত ও আবূ দায়ূদ ছাড়া অন্যান্য সব কয়খানি হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত এই পর্যায়ের একটি বর্ণনা হইলঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

তোমাদের কেহ ঈমানদারই হইবে না যতক্ষণ না সে তাহার ভাইর জন্য তাহাই পছন্দ করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে—ভাল বাসে।

হযরত আবূ যার (রা) নবী করীম (স)-এর একটি কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেনঃ

أَوْصَانِىْ حِبِّىْ بِخَمْسٍ أَرْحَمُ الْمَسَاكِيْنَ وَأُجَالِسُهُمْ وَاَنْظُرُ اِلٰى مَنْ هُوَ تَحْتِىْ وَلَا اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِىْ وَاَنْ اَصِلَ الرَّحِمَ وَاَنْ اَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا

(مسند احمد، بزار، طبرانی)

আমার প্রিয় আল্লাহ্ আমাকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়াছেন। সে পাঁচটি নির্দেশ হইল (১) আমি গরীব মিসকীন লোকদের প্রতি দয়াশীল হইব, তাহাদের সহিত উঠা-বসা ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিব,

(২) যাহারা আমার নীচে, তাহাদের প্রতিই দৃষ্টি দিব, যাহারা আমার উপরে তাহাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ফেলিব না। আমি রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিব। আর সত্য কথাই বলিব, তাহা যতই তিক্ত হউকে না কেন।

বস্তুত নবী করীম (স)-এর প্রতি তাঁহার প্রিয় খোদার এই নির্দেশ মুসলিম মাত্রের প্রতিও নির্দেশ এবং ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত গুণাবলী নিজের মধ্যে অর্জন করা। কেননা পরিকল্পিত ইসলামী সমাজ এই সব গুণাবলী সমন্বিত ব্যক্তিদের ছাড়া গড়িয়া উঠিতে পারে না।

ইসলামী সমাজে ধনী-গরীব বা বড় ছোটর কোন শ্রেণী বিভাগ নাই। এখানে সমস্ত মানুষ নির্বিশেষ। বিশেষজ্ঞরাও এখানে নির্বিশেষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ও একাকার হইয়া জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ফলে এখানে কোন দিনই শ্রেণী পার্থক্য ও তদজনিত শ্রেণী সংগ্রামের আশংকা থাকে না। তাহার কোন অবকাশই নাই। এখানে রক্তের সম্পর্ক যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার পাইয়া থাকে। কেহই এই সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে না। কেহ তাহা করিলে সে ইসলামী সমাজ নীতিরই বিরুদ্ধতা করার মতই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই সত্য কথা বলিবার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পন্ন। সত্য কথা সর্বাবস্থায়ই বলিতে হইবে, তাহা কাহারও পক্ষে হউক, কি কাহারও বিপক্ষে। কেননা এই সমাজ শাশ্বত ও মহান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য যদি কখনও উপেক্ষিত হয়, যদি উহার উপর অন্য কোন দৃষ্টি বা বিবেচনা প্রাধান্য লাভ করিয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে সমাজের সত্য ভিত্তিই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর যে সমাজ উহার ভিত্তির উপর কুঠারাঘাত চালায় বা চালাইবার সুযোগ দেয়, সে সমাজ কোন দিনই রক্ষা পাইতে পারে না। উহার ধ্বংস চির নিশ্চিত।

হযরত উবাদাতা ইবনে চামেত (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اَصْدِقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوا اِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ

(مسند احمد، الهيثمي طبراني في الاوسط)

তোমরা নিজেদের দিক হইতে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। সে ছয়টি বিষয় হইল (১) যখন তোমরা কথা বলিবে, সত্য ও যথার্থ কথা বলিবে, (২) যখন তোমরা ওয়াদা করিবে যে কোন রকমের ওয়াদাই হউক না কেন—তাহা অবশ্যই পূরণ করিবে, (৩) তোমাদের নিকট যখন কোন কিছু আমানত স্বরূপ রাখা হইবে, তোমরা উহা অবশ্যই রক্ষা করিবে—প্রকৃত মালিককে উহা যথা সময় পৌঁছাইয়া ফিরাইয়া দিবে। (৪) তোমাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা অবশ্যই রক্ষা করিবে, (৫) তোমাদের দৃষ্টি অবনত রাখিবে এবং (৬) তোমাদের হাত সর্বপ্রকার ক্ষতিকর কাজ হইতে বিরত রাখিবে।

এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায়, যে সমাজের লোকেরা মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যস্থ, ওয়াদা করিয়া উহা পূরণ করে না, প্রতিশ্রুতি ভংগ করে, আমানতে খিয়ানত করে, বিনষ্ট করে বা নিজেই ভক্ষণ করে, মালিককে ফিরাইয়া দেয় না, নারী বা পুরুষ কেহই স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে না, উহার যথেচ্ছ যেখানে সেখানে ও অবাধ ব্যবহার করে, জ্বেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং সামান্য সামান্য কারণে হস্ত উত্তোলিত হয়, লোকেরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিতে শুরু করিয়া দেয়, সেই সমাজে লোকদের পক্ষে বেহেশতে যাওয়া তো দূরের কথা, তাহাদের পক্ষে মানুষের মত সুখে নিরাপদে জীবন যাপন করাও সম্ভব হইতে পারে না। কাজেই সমাজকে এইসব দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত ও পবিত্র রাখার জন্য চেষ্টা করা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তির এবং সামষ্টিকভাবে গোটা সমাজের দায়িত্ব। রাসূলে করীম (স) উপরোদ্ধৃত বাণীতে সেই দায়িত্বের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন।

হাদীসটির সনদে হযরত উবাদাহর পরে রহিয়াছেন আল-মুত্তলিব। কিন্তু তিনি নিজে হযরত উবাদাহ্‌র নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে শুনেন নাই বলিয়া মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

(تحفة الاحوذي، بلوغ الاماني)

মজলিসে আসন গ্রহণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يُقِيْمُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ (بخاری، مسلم، ترمذی)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যেন তাহার ভাইকে তাহার আসন হইতে উঠাইয়া দিয়া পরে নিজেই সেই আসন গ্রহণ না করে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা সামাজিক জীবনে বহু সংখ্যাক লোকের একত্রিত হওয়ার ও আসন গ্রহণের ব্যাপারে সাধারণত সংঘটিত হইয়া থাকে। এই রূপ মজলিস অনুষ্ঠান ও উহাতে আসন গ্রহণের ব্যাপারটি বাহ্যদৃষ্টিতে খুবই সামান্য মনে হইলেও ইসলামের দৃষ্টিতে ইহার গুরুত্ব কিছু মাত্র কম নহে। প্রকৃত পক্ষে বহু সংখ্যক লোকের একত্র সমাবেশ ও আসন গ্রহণের মাধ্যমেই সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে। এই সব ক্ষেত্রে আসন গ্রহণের ব্যাপারটি লইয়া পরস্পর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই কারণে নবী করীম (স) সুস্থ শালীনতাপূর্ণ সমাজ জীবন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে বিশেষ হেদায়াত দানের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন।

হাদীসটিতে ব্যবহৃত শব্দের বিশেষ মাহাত্ম্য রহিয়াছে। মনে করা যাইতে পারে, মজলিস যথারীতি বসিয়া গিয়াছে। উপস্থিত লোকদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিয়াছে। এমন সময় একজন মান্যবর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু তাহার বসিবার মত কোন আসন শূন্য নাই। তখন সাধারণত এই ঘটে যে, আসীন লোকদের মধ্য হইতে একজনকে তাহার আসন হইতে তুলিয়া দিয়া সেই আসনে নবাগত ব্যক্তির বসিবার ব্যবস্থা করা হইল। এই পর্যায়েই নবী করীম (স)-এর আলোচ্য কথাটি প্রযোজ্য। তাঁহার কথার মর্ম হইল, যে লোক পূর্বেই উপস্থিত হইয়া একটি আসন গ্রহণ করিয়াছে, সে তো তাহার দ্বীনী ভাই। কেননা এই সমাজ একই দ্বীনের ধারক ও অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত। এইরূপ অবস্থায় সেই দ্বীনী ভাইকে তাহার আসন হইতে তুলিয়া দেওয়া ও সেই আসন অপর এক দ্বীনী ভাইদ্বারা অলংকৃত হওয়া কিছুতেই শোভন হইতে পারে না। কেননা প্রথমতঃ যাহাকে তাহার আসন হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল, সে মূলত কোন অপরাধ করে নাই, যাহার জন্য তাহাকে এই শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ একজনকে তুলিয়া দিয়া সেই আসনে আর একজনকে বসানোর বাহ্যত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রথম ব্যক্তির তুলনায় দ্বিতীয় ব্যক্তি সমধিক সম্মানার্হ। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য সৃষ্টির কোন ভিত্তি নাই। ইহারা দুইজন একই দ্বীনের ধারক ও অনুসারী হওয়ার দিকদিয়া উভয়ই সমান মান-মর্যাদার অধিকারী—সমান সম্মানার্হ। অকারণে একজনকে অপর জনের উপর প্রাধান্য ও অধিক মর্যাদা দানে একজনের মনে আত্মসম্মান বোধ জনিত দুঃখ ও অপমান বোধ এবং অপরজনের মনে আত্মম্ভরিতা জাগ্রত হইতে পারে। আর মন-মানসিকতার দিক দিয়া এইরূপ পার্থক্য সৃষ্টির ফলে সমাজ জীবনের একাত্মতার পক্ষে খুবই মারাত্মক হইয়া থাকে। এই জন্যই নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ এক ভাইকে তাহার আসন হইতে তুলিয়া দিয়া সেই আসন অপর ভাইর গ্রহণ করা কিছুতেই উচিত হইতে পারে না।

ইমাম নববী লিখিয়াছেন, এই রূপ আসন গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম। অতএব মসজিদে বা অন্যত্র জুময়ার দিনে কিংবা অন্য কোন সময় যে ব্যক্তি প্রথমেই কোন আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে, সেই আসনে বসিয়া থাকার জন্য অন্যান্য সকলের তুলনায় সেই লোকই বেশী অধিকারী। অপর কাহারও জন্য সেই

আসনের উপর কোন অধিকার থাকিতে পারে না। অন্য লোকের জন্য এই পূর্বদখল করা আসনে বসা হারাম। বিশেষজ্ঞগণ মনে করিয়াছেন, কোন লোক যদি মসজিদে বসিয়া ফতোয়া দান অথবা কুরআন শিক্ষাদান কিংবা শরীয়াতের ইলম শিক্ষা দানের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া থাকে, সেই স্থানটি সেই লোকের জন্য নির্দিষ্টই থাকিবে। উহা কোন সময় শূন্য পাইয়া অপর কেহ উহাতে বসিতে পারিবে না। এই পর্যায়ে মুল্লা আলী আল-ক্কারী প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, মসজিদে সকলেরই অধিকার সমান, কেহ নিজের জন্য কোন একটি স্থানকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া লইতে পারে না। ইহা হাদীস হইতে প্রমাণিত। এই কথা পূর্বোক্ত মতের বিপরীত। এই কারণে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর উল্লেখ করিয়াছেনঃ

وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْمُ لِابْنِ عُمَرَ فَمَا يَجْلِسُ فِيْهِ

হযরত ইবনে উমরের জন্য কোন লোক দাঁড়াইয়া নিজের আসনে বসিবার জন্য আহবান করিলে তিনি তাহাতে কখনই বসিতেন না।

এই কথাটি হযতর ইবনে উমরের 'আমল' বা আচরণ প্রকাশ করিতেছে। আর মূল হাদীসটি বর্ণনাকারীও হইতেছেন হযরত ইবনে উমর। তাঁহার এই 'আমল' বা আচরণের উল্লেখে হাদীসটির একটি বিশেষ তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়। আর তাহা এই যে, কোন আসনে আসীন ব্যক্তি কাহারও জন্য নিজের আসন ছাড়িয়া দিতে চাহিলেও তাহা কাহারও গ্রহণ করা উচিত নয়। সে এইরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করিলে উহার জওয়াবে সেই আসন গ্রহণ করিতে রাযী না হইয়াই সৌজন্য প্রদর্শন করিতে হইবে।

ইবনে আবূ জুমরা বলিয়াছেনঃ এই হাদীসটি সাধারণভাবে সর্বপ্রকার মজলিসেই প্রযোজ্য ও অনুসরণীয়। তবে বিশেষ ভাবে ইহা প্রযোজ্য সর্বপ্রকার মুবাহ ধরনের মজলিসে। সাধারণভাবে শাসকদের আহবানে অনুষ্ঠিত মজলিস, শিক্ষাকেন্দ্র, সভা-সমিতির বৈঠক—এই সবই ইহার মধ্যে শামিল। অপর দিকে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইতেছে যেসব মজলিস বিশেষ ব্যবস্থার অধীন অনুষ্ঠিত হয় তাহা। যেমন কেহ নিজের বাড়ীতে বিবাহ বা অলীমা ইত্যাদির জন্য বিশেষ ভাবে আহূত মজলিসসমূহ। এ ছাড়া এমন কিছু মজলিসও হইয়া থাকে, যেখানে লোকেরা উঠে, বসে, দাঁড়ায়, আসে ও যায়। এইসব ক্ষেত্রে কাহারও জন্য বিশেষ কোন আসন নির্দিষ্ট থাকে না। কেহ নির্দিষ্টও করিতে পারে না।

ইবনে জুমরা আরও বলিয়াছেনঃ এইরূপ আসন গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার মূলে এই এই যুক্তি রহিয়াছে যে, ইহাতে একজন মুসলমানের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার সমূহ আশংকা রহিয়াছে। অথচ ইহা অবাঞ্ছনীয়। সেই সঙ্গে এই নিষেধ দ্বারা মানুষের মধ্যে বিনয় ও সৌজন্য জাগ্রত করিতে চাওয়া হইয়াছে। কেননা সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুতা-ভালবাসা সৃষ্টির জন্য এইরূপ বিনয় ও সৌজন্য অপরিহার্য। উপরন্তু اَلنَّاسُ فِى الْمُبَاحِ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ 'মুবাহ ব্যাপার সমূহে সমস্ত মানুষ সমান-সমান অধিকার ও মর্যাদা সম্পন্ন'। কাজেই কোন লোক যদি তাহার কোন অধিকারের জিনিস সর্বাগ্রে দখল করিয়া থাকে তবে সেই উহার অধিকারী। আর কেহ কোন জিনিস অধিকার ছাড়াই দখল করিয়া লইলে উহাকে বলা হয় 'গচব'—অপহরণ। আর 'গচব' বা অপহরণ সম্পূর্ণ হারাম। অবস্থা বিশেষে কখনও উহা মাকরূহ—মাকরূহ তাহ্‌রীম হয়।, আর কখনও হয় সম্পূর্ণ হারাম।

বুখারীর বর্ণনায় হযরত ইবনে উমরের আমল সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ مِنْ مَكَانِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ مَكَانَهُ

কোন লোক নিজের আমল ছাড়িয়া দাঁড়াইবে আর সেই খানে তিনি বসিবেন, ইহা ইবনে উমর অপছন্দ করিতেন।

অপছন্দ করিতেন অর্থ মাকরূহ মনে করিতেন। ইমাম নববীর মতে ইহা তাঁহার অতিরিক্ত তাকওয়ার প্রকাশ। কেননা কোন লোক নিজে ইচ্ছা করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কাহারও জন্য নিজের আসন ছাড়িয়া দিলে তাহাতে তাহার বসা হারাম হয় না। তবে যেহেতু যে লোক নিজের আসন ছাড়িয়া দিতেছে সে খুশী হইয়া ছাড়িতেছে, না ভয়ে কিংবা লজ্জায় ছাড়িতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এই কারণে তিনি এই আশংকার দ্বারও চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া সমীচীন মনে করিয়াছেন। অথবা তিনি মনে করিয়াছেন, কেহ কোন নৈকট্যের জন্য নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিলে তাহাও কোন পছন্দনীয় ব্যাপার হয় না।

হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে আর একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَّجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ، فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (ابوداؤد)

এক ব্যক্তি রাসূলে করীমের নিকট তাঁহার মজলিসে আসিল। তখন অপর এক ব্যক্তি তাহার জন্য নিজের আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। নবাগত লোকটি সেই ছাড়িয়া দেওয়া আসনে বসিবার জন্য যাইতে লাগিল। তখন রাসূলে করীম (স) তাহাকে নিষেধ করিলেন। (আবূ দায়ূদ)

এই হাদীসটি হইতে রাসূলে করীম (স)-এর পূর্বোদ্ধৃত মৌখিক কথার বাস্তব আমলের সমর্থন পাওয়া গেল। ফলে এই ব্যাপারটি সর্বোতভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ্য। কেহ মজলিসের মধ্যে কোন আসন দখল করিয়া বসিয়াছে। এই সময় প্রয়োজনের কারণে সে উঠিয়া গেলে সে যখন ফিরিয়া আসিবে তখন সেই আসনে বসার অধিকার তাহারই অগ্রগণ্য হইবে। রাসূলে করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেনঃ

اَلرَّجُلُ اَحَقُّ بِمَجْلِسِهٖ وَاِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهٖ، ثُمَّ عَادَ فَهُوَ اَحَقُّ بِمَجْلِسِهٖ

(ترمذی، مسند احمد)

ব্যক্তি তাহার দখল করা আসন ফিরিয়া পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী। যদি সে তাহার কোন প্রয়োজনে আসন ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে তবে সে তাহার পূর্বদখলকৃত আসনে বসিবার অধিকার অন্যদের অপেক্ষা তাহার বেশী।

ইমাম নববী লিখিয়াছেন, মসজিদ বা অন্য যে কোন স্থানে নামায বা অন্য যে কাজের জন্যই বসিয়া থাকুক না কেন, পরে সে যদি উহা পুনরায় ফিরিয়া আসার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করে যেমন অজু করা বা এই ধরনের কোন হালকা কাজের উদ্দেশ্যে বলিয়া যায় এবং পরমুহূর্তে ফিরিয়া আসে তাহা হইল সেই আসনে তাহার বিশেষ অধিকার বাতিল হইয়া যাইবে না। সেই সেখানে—অন্তত সেই সময়কার নামাযের বা যে কাজের জন্য বসা হইয়াছে সেই কাজ সুসম্পন্ন হওয়া পর্যন্তের জন্য অন্যদের তুলনায় তাহার অধিকার বেশী হইবে। এই অবসরে যদি কেহ সেই আসনটি দখল করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার উঠিয়া সেই লোকের জন্য আসন খালী করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। প্রথম ব্যক্তি ফিরিয়া আসিলে দ্বিতীয় ব্যক্তির আসন ছাড়িয়া দেওয়া কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ওয়াজিব। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এই মত ইমাম মালিকের। তবে প্রথম কথাই অধিকার সহীহ। এই পর্যায়ে উপরোক্ত হাদীসটিই হইতেছে বিভিন্ন মতের ভিত্তি ও দলীল। বস্তুত আসন গ্রহণ লইয়া লোকদের মধ্যে

যে মতবিরোধ বা ঝগড়া-ঝাটির সৃষ্টি হইতে পারে, এই হাদীসটির ভিত্তিতেই তাহার মীমাংসা হইতে পারে। পরন্তু এই হাদীসটির ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারণের ভিত্তি বহু প্রকারের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ-বিবাদের সুষ্ঠু মীমাংসা হওয়া সম্ভব। এই মত প্রকাশ করিয়াছেন ইমাম মাওয়ার্দি। আর ইমাম কুরতুবী বলিয়াছেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মত হইল, এই হাদীসটির সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া ওয়াজিব নয়।

ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেন, এই পর্যায়ের হাদীস হযরত আবূ বাকরাতা, হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। আবূ হুরাইরা বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁহার আল-আদাবুল মুফরাদ এবং ইমাম আহমাদ তাঁহার মুসনাদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুসলিম, আবূ দায়ূদ ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছ। ইবনে মাজাহ উদ্ধৃত হাদীসটির ভাষা এইঃ

مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهٖ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهٖ

যে লোক তাহার আসন হইতে উঠিয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে, সে সেই আসনে বসার ব্যাপারে বেশী অধিকারী।

দুইজন লোক পাশাপাশি বসা থাকিলে তহাদের মাঝখানে বসা সমীচীন কিনা, এই পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا

(مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی)

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ দুই ব্যক্তির মাঝখানে সেই দুইজনের অনুমতি ব্যতীত বসা কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়। (মুসনাদে আহমাদ, আবূ দায়ূদ, তিরমিযী)

ইহার কারণ সুস্পষ্ট। দুইজন লোক হয়ত বিশেষ কোন কথা বলার উদ্দেশ্যে কিংবা পারস্পরিক বন্ধুতা একাত্মতা নিবিড় হওয়ার কারণে একত্রে ও পাশাপাশি আসন গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কোন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া যদি তাহাদের দুইজনের মাঝখানে বসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের এই বসার উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায় বা বসার কারণ ব্যাহত হয়। ফলে তাহাদের মনে দুঃখ ও অসন্তোষ জাগিয়া উঠিতে পারে। আর সুষ্ঠু সমাজ জীবনের পক্ষে ইহা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় বা কল্যাণবহ হইতে পারে না। تحفة الاحوذی، نووی

সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়ানো

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مِنَ النَّارِ (ترمذى، ابوداؤد، مسند احمد)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক পুলক অনুভব করে এই কাজের যে, লোকেরা তাহার সম্মানার্থে দাঁড়াইবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের আশ্রয় স্থল বানাইয়া লয়। (তিরমিযী, আবূ দায়ূদ, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা হাদীসের মূল বক্তব্য সুস্পষ্ট। মানুষ মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও প্রকাশ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সম্মান প্রদর্শনের জন্য যদি দাঁড়নো হয় এবং সেই দাঁড়ানোয় কেহ যদি নিজের পুলক ও আনন্দ বা গৌরব বোধ করে, তবে সে লোকদের উপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক গণ্য হইবে। স্পষ্ট মনে হইবে, লোকেরা তাহাকে প্রভু বা মনিব মনে করুক, ইহাই সে চায়। আর এইরূপ মনোভাবই অত্যন্ত মারাত্মক। এই গৌরব বোধই মানুষকে জাহান্নামে লইয়া যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। হাদীসের ভাষা হইতে বোঝা যায় যে, এই ব্যক্তি নিজের এই গৌরব বোধের কারণেই জাহান্নামে যাইতে বোধ্য হইবে এবং সে জন্য সেই দায়ী।

আবূ দায়ূদের অপর একটি বর্ণনায় مَنْ سَرَّهُ এর পরিবর্তে مَنْ اَحَبَّ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ, যে ভাল বাসে বা যে পছন্দ করে। উভয় শব্দের মূল ভাব অভিন্ন। আর فَيتبوأ অর্থ 'সে যেন ব্যবস্থা করিয়া লয়'। ইহা নির্দেশমূলক। কিন্তু মূল তাৎপর্য সংবাদ মূলক। ইহার অর্থঃ

مَنْ سَرَّهُ ذٰلِكَ وَجَبَ لَهُ اَنْ يَّنْزِلَ مَنْزِلَهُ مِنَ النَّارِ

যে লোক তাহার সম্মানার্থে অন্য লোকদের দাঁড়ানোয় পুলক অনুভব করে তহার পক্ষে জাহান্নামে তাহার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া ওয়াজিব হইয়া পড়িবে।

প্রথমোক্ত মূল হাদীসটি একটি উপলক্ষে হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইল, হযরত মুয়াবিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলে তথায় আসন গাড়িয়া বসা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুজ্জুবাইর ও হযরত ছাফওয়ান (রা) তাঁহার সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেনঃ اِجْلِسَا 'তোমরা দুইজন বসিয়া যাও'। কেননা নবী করীম (স) এইরূপ বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় কাহারও সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ, তাহা বোধ হয় এই সাহাবীদ্বয়ের জানা ছিল না বলিয়াই তাঁহারা দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু হাফেয ইবনুল হাজার আল-আস্‌কালানী লিখিয়াছেনঃ وَقَدْ اِتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّ اِبْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَقُمْ আবদুল্লাহ্ ইবনুজ্জুবাইর (রা) দাঁড়ান নাই, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ সম্পূর্ণ একমত। আবূ দায়ূদ গ্রন্থে উদ্ধৃত অন্যান্য হাদীস সমূহ হইতেও এই কথাই প্রমাণিত হয়।

এই সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ

لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ (ترمذی)

সাহাবীদের নিকট রাসূলে করীম (স) অপেক্ষা অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি যখন দৃশ্যমান হইতেন ও তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন, তখন তাঁহারা দাঁড়াইতেন না। কেননা তাঁহারা জানিতেন যে, নবী করীম (স) ইহা খুবই অপছন্দ করেন।

এইরূপ দাঁড়ানোকে নবী করীম (স) পছন্দ করিতেন না; এই কথা হইতে মনে হইতে পারে যে, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অপছন্দের বর্ণনা। হযরত মুহাম্মাদ (স) যে উন্নত আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে ইহাই স্বাভাবিক গুণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু এই পর্যায়ে প্রথমোদ্ধৃত হাদীস হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নয়। ইহার সহিত ইসলামের মৌল আকীদা ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার সহিত গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। কেননা এই রূপ দাঁড়াইয়া যাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইবে তাহার মনে পুলক অনুভূত হইতে পারে। আর পুলক অনুভূত হইলে অতি সহজেই মনে করা যায় যে, সে নিজেকে খুব সামান্য নগণ্য ব্যক্তি মনে করিতেছেনা, মনে করিতেছে অসামান্য অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আর এইরূপ মনে করাই ইসলামের তওহীদী আকীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হযরত আনাস বর্ণিত এই হাদীসটিতে একদিকে যেমন নবী করীম (স)-এর মনোভংগী জানা যায়, তেমনি জানা যায় সাহাবীগণের আমলের বিবরণ। বস্তুত ইহাই তওহীদী আকীদার ভিত্তিতে গঠিত আদর্শ ইসলামী সমাজের বিশেষত্ব।

হযরত আবূ ইমামাতা (রা) বর্ণিত ও আবূ দায়ূদ ইবনে মাজাহ গ্রন্থদ্বয়ে উদ্ধৃত অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ـ

রাসূলে করীম (স) একখানি লাঠির উপর ভর করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। তখন আমরা তাঁহার জন্য দাঁড়াইয়া গেলাম। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেনঃ তোমরা দাঁড়ইও না যেমন করিয়া অনারব লোকেরা পরস্পরের সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া থাকে।

রাসূলে করীম (স) সাধারণত লাঠিহাতে চলাফিরা করিতেন না। কিন্তু হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, তিনি লাঠির উপর ভর করিয়া বাহির হইলেন। ইহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, এই সময় লাঠি হাতে লওয়ার ও উহার উপর ভর করার কোন দৈহিক কারণ ঘটিয়াছিল। হয়ত তিনি এই সময় অসুস্থ ছিলেন।

এই হাদীসটিতে সম্মানার্থে দাঁড়ানো সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। পর পর উদ্ধৃত তিনটি হাদীস হইতে যাহা জানা গেল, তাহাতে কাহারও সম্মানার্থে দাঁড়ানো প্রথমে ব্যক্তিগত অপছন্দের ব্যাপার, দ্বিতীয় পর্যায়ে উহার সমাজিক প্রচলন—অর্থাৎ না দাঁড়ানোটাই মুসলিম সামজের সাধারণ রেওয়াজ। আর তৃতীয় পর্যায়ে ইহা আইন।

কিন্তু ফিকাহর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মতে উপনীত হইয়াছেন। ইমাম নববী প্রমুখ প্রখ্যাত হাদীসবিদগণ বলিয়াছেন, কাহাকেও দেখিয়া দাঁড়াইয়া যাওয়া জায়েয। শায়খ আবূ আবদুল্লাহ ইবনুল হাজ্জ আল-মালেকী প্রমুখ ইহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইমাম নববী الاذكار গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ সেই ব্যক্তি আগমনে দাঁড়াইয়া সম্মান দেখানো মুস্তাহাব, যাঁহার জ্ঞানগত যোগ্যতা-মর্যাদা, কোন মহান কাজের দরুন বিশেষ সম্মান বা বেলায়েত রহিয়াছে। এই রূপ দাঁড়ানোটা প্রদর্শন মূলক বা

বড় মনে করার কারণে নয়, ইহা নিছক ভাল কাজ, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ মাত্র। আর এই ভাবধারায় কাহারও জন্য দাঁড়নোর প্রচলণ প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া ইমাম নববী দাবি করিয়াছেন। এই মতের বড় সমর্থন পাওয়া যায় হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী বর্ণিত রাসূলে করীম (স)-এর একটি কথায়। কুরাইজার অধিবাসীরা হযরত সায়াদ ইবনে আবূ অক্কাচের হুকুমে নামিয়া গেল। তখন নবী করীম (স) হযরত সায়াদ (রা)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে নবী করীম (স) বলিলেন قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ 'তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য দাঁড়াও'। ইহাতে সম্মানিত ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানোর নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার জওয়াবে বলা হইয়াছে, রাসূলে করীমের এই নির্দেশ এমন বিষয়ে যাহাতে কোন বিরোধ নাই। কেননা কয়েকটি বর্ণনা হইতে জানা যায়, হযরত সায়াদ অসুস্থ ছিলেন। তিনি তাঁহার জন্তুযানে সওয়ার হইয়া আসিয়া ছিলেন। এই সময় রাসূলে করীম (স) সাহাবীদের বলিলেনঃ 'তোমরা আগাইয়া গিয়া তোমাদের এই সরদারকে তুলিয়া আন।' জন্তুযানের উপর হইতে তাঁহাকে নামাইয়া আনার জন্য এই নির্দেশ ছিল। আর এই রূপ অবস্থায় সবসময়ই সমাজের লোকদের জন্য ইহা বিশেষ কর্তব্য হইয়া পড়ে। ইহার সমর্থন পাওয়া যায় হযরত আবূ সায়ীদ (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেনঃ

فَلَمَّا طَلَعَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ فَانْزِلُوْهُ

হযরত সায়াদ যখন উপস্থিত হইলেন, তখন নবী করীম (স) উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেনঃ তোমরা আগাইয়া গিয়া তোমাদের সরদারকে নামাইয়া আনো।

এই হাদীসটির সনদ উত্তম। ইহার ফলে কাহারও প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ানোর আলোচ্য ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায় এবং বুঝা যায় যে, রাসূলে করীমের এই নির্দেশে সম্মান প্রদর্শনের ভাব নাই। আছে সমাজিক কর্তব্য পালনের নির্দেশ।

হযরত কায়াব ইবনে মালিক (রা)-এর তওবা সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণে তিনি বলিয়াছেনঃ

فَقَامَ طَلْحَةُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ فَصَافَحَنِىْ وَهَنَّأَنِىْ

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ দাঁড়াইয়া দৌড়াইয়া আসিলেন ও আমার সতি মুসাফিহা করিলেন ও আমাকে মুবারকবাদ দিলেন।

ইমাম নববী এই বর্ণনার ভিত্তিতে বলিতে চাহেন যে, কাহারও সম্মানার্থে দাঁড়ানো কিছু মাত্র নাজায়েয নয়। কিন্তু এই যুক্তি খুব বলিষ্ঠ ও অকাট্য নয়। কেননা হযরত তালহা (রা) দাঁড়াইয়াছিলেন হযরত কায়াবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাঁহাকে মুবারকবাদ দেওয়ার জন্য। তাঁহার সহিত মুসাফিহা করার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়তঃ উপস্থিত সাহাবী গণের মধ্য হইতে তিনি একাকীই কাজটি করিয়াছিলেন। নবী করীম (স) নিজে দাঁড়াইয়াছেন বা দাঁড়াইবার জন্য তিনি আদেশ করিয়াছেন, অথবা উপস্থিত বিপুল সংখ্যক সাহাবীদের মধ্যে অন্য কেহ এই কাজ করিয়াছেন, তাহা কোন বর্ননা হইতেই প্রমাণিত হয় নাই। বিশেষত হযরত তালহা একাকী এই কাজ করিয়াছেন এই কারণে যে, হযরত কায়াবের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ও ভালবাসা ছিল। আর যাহার সহিত যতটা ভালবাসা ও বন্ধুতা হইবে, উহার বাহ্যিক প্রকাশও সেই অনুপাতে হইবে ইহা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু সালাম এইরূপ নহে। তাহা তো পরিচিত অপরিচিত সকলকেই দিতে হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেনঃ

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

فَاطِمَةَ كَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا فَاَخَذَ بِيَدِهَا وَاَجْلَسَهَا فِىْ مَجْلِسِهٖ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ اِلَيْهَا قَامَتْ اِلَيْهِ فَاَخَذَتْ بِيَدِهٖ فَقَبَّلَتْهُ وَاَجْلَسَتْهُ فِىْ مَجْلِسِهَا

(ابوداؤد ، ترمذی، نسائی)

হযরত ফাতিমার অপেক্ষা সর্বদিক দিয়া রাসূলে করীমের সহিত সাদৃশ্য রক্ষাকারী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি যখন নবী করীমের ঘরে প্রবেশ করিতেন তখন নবী করীম (স) দাঁড়াইয়া যাইতেন ও তাঁহার হাত ধরিতেন, হাতে স্নেহের চুম্বন করিতেন এবং নিজের আসনে তাঁহাকে বসাইতেন। পক্ষান্তরে রাসূলে করীম (স) যখন তাঁহার ঘরে উপস্থিত হইতেন, তখন তিনি (ফাতিমা) দাঁড়াইয়া যাইতেন, তাঁহার হাত ধরিতেন, হাতে বাৎসল্যের চুম্বন করিতেন এবং নিজের আসনে তাঁহাকে বসাইতেন।

ইমাম নববী তাঁহার মতের সমর্থনে এই হাদীসটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার জওয়াবে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) ও হযরত ফাতিমার পরস্পরের জন্য এই দাঁড়ানোর মূলে বিশেষ করণও থাকিতে পারে। উভয়ের ঘরের ছোটত্ব ও সংকীর্ণতা ও বসার স্থানের অভাব সর্বজন বিদিত। একজন আর একজনকে বসাইবার উদ্দেশ্যে নিজর আসন ত্যাগ করা ও সেজন্য দাঁড়ানো ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না হয়ত। কিন্তু তাহাতে এখানে আলোচ্য ও বিরোধীয় বিষয়ে কোন দলীল পাওয়া যাইতে পারে না।

একবার রাসূলে করীমের দুধ-পিতা ও দুধ-মাতা আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের নিকটে চাদরের উপরে বসাইলেন। অতঃপর দুধ-ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলে নবী করীম (স) দাঁড়াইলেন ও তাঁহাকে নিজের আসনে বসাইলেন। আবূ দায়ূদ উমর ইবনুস সায়েব (রা) এই বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য দাঁড়ানোর পক্ষে ইহাকেও একটি দলীল হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদ্বারা প্রকৃত পক্ষে তাহা প্রমাণিত হয় না। কেননা সম্মানার্থে দাঁড়ানো যতি জায়েযই হইতে, তাহা হইলে নবী করীম (স) তাঁহার দুধ-পিতা দুধ-মাতার জন্য দাঁড়াইতেন, তাঁহাদের পরিবর্তে দুধ-ভাইয়ের জন্য দাড়ানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। হযরত দাঁড়াইয়া ছিলেন এই জন্য যে, বসার স্থান কিংবা চাদঁরের প্রশস্ততা সৃষ্টির জন্য এই রূপ দাঁড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। উপরন্তু মুহাদ্দিস ইবনুল মুনযির বলিয়াছেন, এই বর্ণনাটি مُعْضَل —অতএব ইহাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

ফিকাহবিদগণ এই সমস্ত হাদীস সামনে রাখিয়া মীমাংসা হিসাবে বলিয়াছেনঃ হযরত আনাস বর্ণিত হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, কাহাকেও দেখিয়া দাঁড়াইয়া যাওয়া মাকরূহ। হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস হইতে জানা যায় যে, ইহা জায়েয। ইহা নিছক ভদ্রতা ও একজনের মানবিক মর্যাদা বোধের প্রকাশ মাত্র। তবে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তুলিয়া আনার উদ্দেশ্যে উঠিয়া যাওয়া বা বিদেশ হইতে আগত ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো, কিংবা কেহ কোন নিয়ামত লাভ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে মুবারকবাদ দেওয়ার জন্য দাঁড়ানো অথবা বসার স্থানে প্রশস্ততা সৃষ্টির জন্য দাড়ানো সর্ব সম্মত ভাবে জায়েয। এই হিসাবে কাহারও জন্য দাঁড়ানোকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—যেমন এই মাত্র বলা হইল। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ইহাকে চার পর্যায়ের রাখিয়া বলিয়াছেনঃ কাহারও জন্য দাঁড়াইলে তাহার মনে অহংকারবোধ জাগে এই রূপ দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। কাহারও মনে এইরূপ ভাব জাগিবার আশংকা থাকিলে তাহার জন্য দাঁড়ানো মাকরূহ। এই দুইটি পর্যায় শাসক, ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিবেচ্য। নিছক ভদ্রতা ও সৌজন্যমূলক ভাবে দাঁড়াইলে তাহা জায়েয। কাহারও বিদেশ হইতে আগমন বা প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া আনন্দ ও খুশীর দরুন দাঁড়নো মুস্তাহাব।

تحفة الاحوذی، عمدة القاری، نووی

স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা

মোঁচ কাটা, দাড়ি রাখা, নাভির নিচের পশম মুন্ডন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ وَ الْاِسْتِحْدَادُ وَ الْخِتَانُ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْاِبِطِ وَ تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ

(بخاري، مسلم، ابو داؤد، ترمذى، نسائى، ابن ماجة، مسند احمد)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ পাঁচটি কাজ স্বাভাবিক পর্যায়ের। তাহা হইল, লৌহ ব্যবহার, খাতনা করণ, গোঁফ কাটা, বগলের পশম উৎপাটন এবং নখ কাটা।

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দায়ূদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা হাদীসটির শুরুর বাক্যাংশ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ পাঁচ কাজ স্বাভাবিক পর্যায়ের। এর অর্থ, এই পাঁচটি কাজ স্বাভাবিকভাবেই এবং সকলেরই করা কর্তব্য। 'স্বাভাবিক পর্যায়ের' বলিতে বুঝানো হইয়াছেঃ এই পাঁচটি কাজ সুন্নাত—স্থায়ী রীতি। এই সুন্নাত বা স্থায়ী রীতি হইতেছে নবী রাসূলগণের। দুনিয়ায় মানব জাতিকে কল্যাণময় আদর্শ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যত নবী রাসূলের আগমন হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই কাজ কয়টি যেমন নিজেরা করিতেন, তেমনিই তাঁহারা সকলেই এই কাজ পাঁচটি করার শিক্ষা দিয়াছেন। করার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। আর এই নবী রাসূলগণকে—তাঁহাদের উপস্থাপিত আদর্শ, রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ মানিয়া চলা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষেরই কর্তব্য। ইহা অতীব প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসা রীতি। খোদার অবতীর্ণ সমস্ত শরীয়াতেই এই রীতির কথা বলা হইয়াছে ও ইহা পালন করার তাকীদ করা হইয়াছে। ফলে ইহা মানব-প্রকৃতি সম্মত কাজ রূপে মানব সমাজে আদিম কাল হইতেই এই কাজগুলি মানুষ করিয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া এই কাজ পাঁচটি মুসলিম সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ।

সর্বপ্রথম বলা হইয়াছে اَلْاِسْتِحْدَادُ ইহার শাব্দিক অর্থ লৌহ ব্যবহার। ইহা ইংগিত মূলক শব্দ। ইহার অর্থ, নাভির নিম্নদিকে গজানো পশম কামানোর জন্য লৌহ—লৌহ নির্মিত ক্ষুর কেশ মুন্ডনের অস্ত্র ব্যবহার করা। ইহা সুন্নাত, নবী রাসূলগণের অবলম্বিত ও অনুসৃত রীতি। পুরুষাংশের ও স্ত্রী অংগের চতুর্পার্শে গজানো পশম নিখুঁতভাবে কামাইয়া রাখাই ইহার লক্ষ্য। নিম্নাংগে পিছনে-সমুখে যত পশমই গজায়, সবই কামাইতে হইবে। ইহা বয়স্ক পুরুষ ও নারীর উভয়ের কর্তব্য।

দ্বিতীয় বলা হইয়াছে, পুরুষাংগের খাত্না করা। আল্লামা মা-অর্দী খাত্না করার অর্থ বলিয়াছেনঃ

خِتَانُ الذَّكَرِ قِطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِىْ تُغَطِّى الْحَشَفَةَ

পুরুষাংগের অগ্রভাগ আচ্ছাদন করিয়া চর্ম কাটিয়া ফেলা।

ইহা কাটিয়া ফেলিয়া পুরুষাংগকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন বোঝা মুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা এমনভাবে কাটিতে হইবে যেন, পুরুষাংগের উপর এক বিন্দু অতিরিক্ত চর্ম থাকিতে না পারে ও পুরুষাংগটি সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকদের যৌন অংগের উপরিভাগে যে চর্ম উচ্চ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা কর্তন করাও ইহারই অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহা তদানীন্তন মদীনীয় সমাজে কিছুটা প্রচলিত থাকিলেও ইহা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয় নাই। উম্মে আতীয়া (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَنْهَكِيْ فَإِنَّ ذٰلِكَ اَحْظٰى لِلْمَرْأَةِ

মদীনায় একটি মেয়ে লোক স্ত্রী অংগের খাত্না করার কাজ করিত। নবী করীম (স) তাহাকে বলিলেন, বেশী বাড়াবাড়ি করিও না। কেননা ভুলিও না যে স্ত্রী অংগের এই অংশটি যৌন স্বাদ আস্বাদনে অধিকতর সহায়ক।

মুহাদ্দিস আবূ দায়ূদের মতে এই হাদীসটি খুব শক্তিশালী সনদ সম্পন্ন নয়। ইবনে হাজার আসকালানী বলিয়াছেনঃ এই কথার সমর্থনে হযরত আনাস (রা) ও হযরত উম্মে আইমান (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আর বায়হাকী গ্রন্থে দহাক ইবনে কায়স হইতেও এই ধরনের হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে।

কিন্তু এই খাত্না করার কাজটি কখন—কোন্ বয়সে করা দরকার? এই বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকিলেও অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ এই মত দিয়াছেন যে, ইহার জন্য কোন সময় বা বয়স কাল নির্দিষ্ট নয়। ছোট্ট বয়সেই করাইতে হইবে, তাহা ওয়াজিব নয়। এই মতের সমর্থনে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ مَا اَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ سَنَةً

মহান আল্লাহ্‌র বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার আশী বৎসর বয়স হইয়া যাওয়ার পর খাত্না করাইয়াছেন।

তবে শাফেয়ী মযহাবের মত হইলঃ

اَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِىِّ اَنْ يَّخْتَنَ الصَّغِيْرَ قَبْلَ بُلُوْغِهِ

অভিভাবকের কর্তব্য হইল সন্তানদের অল্প বয়স থাকা কালেই এবং পূর্ণ বয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বেই খাতনা করানো।

কিন্তু ইহার বিপরীত মত প্রমাণকারী হাদীসও উদ্ধৃত হইয়াছে। বুখারী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইলঃ

مِثْلُ مَنْ اَنْتَ حِيْنَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের সময় আপনি কাহার মত ছিলেন?

জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ

اَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُوْنٌ وَكَانُوْا لَا يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتّٰى يُدْرِكَ

তখন আমার খাত্না করানো হইয়াছিল। আর তখনকার সময় লোকেরা বালকের পূর্ণ বয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে খাত্না করিত না।

এই মতের সমর্থনে ইহাও বলা হইয়াছে যে, দশ বৎসর বয়সের পূর্বে খাত্না করানো হারাম। কিন্তু ইহা আদৌ সত্য নয়। কেননা হাদীস বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا

(حاكم بيهقى)

নবী করীম (স) হযরত হাসান ও হুসাইন (রা)-এর খাত্না করাইয়াছিলেন তাহাদের জন্মের সপ্তম দিনে।

ইমাম নববী এই প্রেক্ষিতে লিখিয়াছেনঃ

اَسْتَحِبُّ اَنْ يَخْتِنَ فِى الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ

শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে খাত্না করানোই শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

ইহার পর প্রশ্ন উঠিয়াছে, খাত্না করানো ওয়াজিব না সুন্নাত? ইবনুল হাজার আসকালানী লিখিয়াছেনঃ ইমাম শাফেয়ী ও বিপুল সংখ্যক ফিকাহ্বিদ মত দিয়াছেন যে খাত্না করানো ওয়াজিব। প্রাচীন ফিকাহ্বিদদের মধ্যে আতা-ও এই মত দিয়াছেন। তিনি এতদূর বলিয়াছেনঃ

لَوْ اَسْلَمَ الْكَبِيْرُ لَمْ يَتِمَّ اِسْلاَمُهُ حَتّٰى يَخْتَتِنَ

কোন বড় বয়সের লোকও যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবুও তাহার খাত্না না করানো হইলে তাহার ইসলাম গ্রহণই পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

ইমাম আহমাদ ও মালিকী মাযহাবের কোন কোন ফকীহ্ও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা বলিয়াছেনঃ খাত্না করানো ওয়াজিব—ফরয নয়। তাঁহার অপর একটি মত হইল, ইহা সুন্নাত। এমন সুন্নাত যাহা না করা হইলে গুনাহগার হইতে হইবে। স্ত্রীলোকদের খাত্না করানো ইমাম শাফেয়ীর মতে ওয়াজিব নহে।

তবে খাত্না করানো ওয়াজিব বলিয়া যে সব হাদীসের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি হাদীসও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। ইমাম শাওকানী এই পর্যায়ের হাদীস সমূহ পর্যালোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ

وَالْحَقُّ اَنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوْبِ وَالْمُتَيَقَّنُ السُّنَّةُ

সত্য কথা এই যে, ওয়াজিব প্রমাণকারী কোন নির্ভুল দলীলই পাওয়া যায় নাই। তবে সর্বপ্রকার সন্দেহমুক্ত ও প্রত্যয় পূর্ণ কথা হইল, ইহা সুন্নাত।

তৃতীয় কাজ হইল গোঁফ কাটা। অর্থাৎ গোঁফ কাটিয়া ছোট করিয়া রাখাই স্বভাব সম্মত, নবী রাসূল কর্তৃক পালিত এবং আদিম কাল হইতে চলিয়া আসা নিয়ম। ইহার বিপরীত—অর্থাৎ লম্বা ও বড় মোচ রাখা যেমন স্বভাব নিয়ম বহির্ভুত, চরম অসভ্যতা, বর্বরতা, জঘন্য, তেমনি পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার দিকদিয়া অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক কাজ। লম্বা ও বড় মোচে ময়লা আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া থাকা অবধারিত। মুখের উপরিভাগে এই জংগল রক্ষা করা অত্যন্ত হীন মানসিকতার প্রমাণ। মুখাবয়বের সূচিতা সুশ্রীতার প্রক্ষেও বড় প্রতিবন্ধক। নবী করীম (স) নিজে নিয়মিত মোচ কাটিয়া ছোট করিয়া রাখিতেন। এই ব্যাপারে অত্যন্ত তাকীদী ভাষায় নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا (ترمذى، ابوداؤد، بيهقى، طحاوى، احمد، نسائى)

যে লোক তাহার মোচ কাটিয়া ছোট করিয়া রাখে না, সে আমার মধ্য হইতে নয়।

অর্থাৎ সে আমার রীতি-নীতি সংস্কৃতির অনুসারী নয়।

অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

وَكَانَ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ اِبْرَاهِيْمُ يَفْعَلُهُ

আল্লাহ্র দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ) এই কাজ নিয়মিত করিতেন।

ইহা হইতে বুঝা গেল মূলত ইহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রবর্তিত ও অনুসৃত রীতি। হযরত মুহাম্মাদ (স)ও এই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং সমস্ত উম্মতের জন্য ইহা করা কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অন্যথায় সে যেমন হযরত মুহাম্মাদের অনুসারী গণ্য হইবেনা, তেমনি হইবে না আল্লাহ্র দোস্ত হযতর ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণকারী।

চতুর্থ বলা হইয়াছে, বগলের পশম উৎপাটন করার কথা। আসলে চলিত রীতি হইল বগল কামানো। কেননা উৎপাটনে কষ্ট হওয়ার আশংকা। ইমাম শাফেয়ী বগল কামাইতেন। তিনি বলিয়াছেনঃ আমি জানি, বগলের পশম উৎপাটন করাই সুন্নাত। কিন্তু উহাতে যে ব্যথা হয়, আমি তাহা

সহ্য করিতে পারি না। অবশ্য উৎপাটনের অভ্যাস হইলে পরে আর ব্যথা অনুভূত হয় না বলিয়া ইমাম গাজালী মত প্রকাশ করিয়াছেন। মোট কথা কামানো বা উৎপাটন যাহাই করা হউক, তাহাতেই সুন্নাত পালন হইবে। কেননা এই স্থানে বেশী পশম জমা হইলে ময়লা জমিয়া যায় ও দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়—ইহা নিঃসন্দেহ।

আর পঞ্চম হইল, নখ কাটা। কাঁচা বা সাদা নখের উপর বাড়তি অংশ কাটিয়া ফেলা নবীর সুন্নাত। কেননা ইহাতেও নানাবিধ ময়লা আবর্জনা জমে। আর হাত দিয়াই খাদ্য গ্রহণের সময় বাড়তি নখে জমা ময়লা আহার্যের সঙ্গে পেটে চলিয়া যায়। এই কারণে নখ কাটা একটা অপরিহার্য স্থায়ী রীতি।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ وَالْمَضْمَضَةُ (ترمذی، بخاری، ابوداؤد، مسلم، احمد، نسائی)

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ দশটি কাজ স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার জন্য জরুরী। তাহা হইলঃ মোচ কর্তন করা, দাড়ি বৃদ্ধি করা, মিসওয়াক করা, নাক পানি দিয়া ধৌত করা, নখ কাটা, গ্রন্থীগুলি ভাল করিয়া ধৌত করা, বগলের পশম উৎপাটিত করা, নাভির নিম্নাংশের পশম মুণ্ডন করা, পানি দিয়া শৌচ করা ও কুলি করা। (তিরমিযী, বখারী, আবু দাযূদ, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী)

এই হাদীসটি মোট দশটি কাজের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে পূর্ববর্তী হাদীসের অতিরিক্ত পাঁচটি কাজ শামিল করা হইয়াছে। সেই অতিরিক্ত পাঁচটি কাজ হইল দাড়ি বৃদ্ধি করা, মিসওয়াক করা, নাসারন্ধ্র ধৌত করা, হাত ও পায়ের গ্রন্থীগুলি মর্দন করিয়া ধোয়া, পানি দিয়া শৌচ করা ও কুলি করা। এই পাঁচটি ও দশ সংখ্যার মধ্যে মৌলিক ভাবে কোন বিরোধ বা পার্থক্য নাই। ইহার তাৎপর্য এই যে, রাসূলে করীম (স) সর্বপ্রথম মাত্র পাঁচটি কাজের কথা বলিয়াছেন এবং পরে অতিরিক্ত আরও পাঁচটির কথা বলিয়াছেন। অথবা বলা যায়, স্থান বিশেষ এক এক স্থানে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এক একটি কথা বলা হইয়াছে। কেননা এই সাংস্কৃতিক মূল্য সম্পন্ন কার্যাবলী বিশেষ কোন সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। সহজে কথা বুঝাইবার ও স্মরণ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেও এই সংখ্যার উল্লেখ হইতে পারে।

'দাড়ি বৃদ্ধি করা' অর্থ দাড়ি লম্বা করা, বড় করিয়া রাখা এবং মোচের মত ছোট করিয়া না কাটা। হাদীসের শব্দটি হইল اعفاء। ইহার অর্থ ছাড়িয়া দেওয়া, বৃদ্ধি করা ও বেশী করিয়া দেওয়া।

অপর একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর উক্তি হইলঃ

اِحْفُوا الشَّوَارِبَ وَفِرُوا اللِّحٰى (بحاری، ترمذی)

মোচ কাটিয়া ফেল এবং দাড়ি বৃদ্ধি কর।

এই পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হইলঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِاِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَاِعْفَاءِ اللِّحٰى

(ترمذی، مسلم، ابوداؤد، نسائی)

রাসূলে করীম (স) নির্দেশ দিয়াছেন মোচ কর্তন করিতে ও দাড়ি ছাড়িয়া দিতে।

এই বিষয়ে বর্ণিত মোট পাঁচটি বর্ণনায় পাঁচটি বিভিন্ন শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। সে শব্দ সমূহ হইলঃ اِعْفُوا، اَوْفِرُوا، اَرْخُوا، اَرْجُوا، وَفِّرُوا এই সব কয়টি শব্দের অর্থ হইল 'দাড়িকে উহার নিজ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া। আর ইহার বিপরীত অর্থ হইল, দাড়ি আদৌ এবং কিছুমাত্রও না কাটা।

কিন্তু আমর ইবনে শুয়াইব তাঁহার পিতা শুয়াইব হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهٖ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا (ترمذى)

নবী করীম (স) তাঁহার দাড়ির দৈর্ঘ প্রস্থ হইতে কর্তন করিতেন।

ইমম তিরমিযী বলিয়াছেন, এই হাদীসটি غَرِيْبٌ অর্থাৎ হাদীসটি যয়ীফ। কেননা এই সনদটির নির্ভরতা হইতেছে উমর ইবনে হারুন নামক বর্ণনাকারীর উপর। কিন্তু বর্ণনাকারী হিসাবে এই লোকটি অ-নির্ভর যোগ্য। ইবনুল হাজার আসকালানী উমর ইবনে হারুন সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

لَا اَعْلَمُ لَهٗ حَدِيْثًا مُنْكَرًا اِلَّا هٰذَا ـ

এই লোকটির বর্ণিত হাদীস সমূহের মধ্যে এই হাদীসটিই গ্রহণ অযোগ্য।

ফিকাহবিদদের মধ্য হইতে বহু লোক প্রথমোদ্ধৃত হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং দাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থ—কোন একটি দিক দিয়াও কিছু অংশ কর্তন করা মাকরূহ বলিয়াছেন। তবে কেহ কেহ এই দ্বিতীয় উদ্ধৃত হাদীসটির ভিত্তিতে মত দিয়াছেন যে, এক মুঠির বেশী হইলে এই বাড়তি অংশ কাটিয়া ফেলা যাইবে।

এই কথার সমর্থনে বলা হইয়াছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হইতে দাড়ি কর্তনের কাজ করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা)ও ইহা করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত জাবির (রা) হইতে উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

كُنَّا نُعْفِى السِّبَالَ اِلَّا فِىْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ

আমরা হজ্জ ও উমরা ছাড়া অন্যান্য সময় দাড়ির বৃদ্ধি পাওয়া অংশ ছাড়িয়া দিতাম।

এই কথাটির অর্থ হজ্ব ও উমরা কালে তিনি ইহা ছাড়িয়া দিতেন না, কাঠিয়া ফেলিতেন। ইহাতে হযরত ইবনে উমর সম্পর্কে উপরে উদ্ধৃত কথারই সমর্থন রহিয়াছে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, দাড়ির কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে কি? ইহার জওয়াব এই যে, বহু সংখ্যক ফিকাহবিদ এক মুষ্ঠির অধিক কাটিয়া ক্ষান্ত হইতেন। হাসান বছরী বলিয়াছেনঃ

اَنَّهٗ يُؤْخَذُ مِنْ طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا مَالَمْ يَفْحُشْ

দাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থ হইতে কাটিয়া ফেলা যাইবে যদি কুদৃশ্য ও জঘন্য রূপ হয়।

দুনিয়ার বহু লোক সে কালেও যেমন একালেও তেমন দাড়ি মুন্ডন করে কিংবা দাড়ি কাটিয়া ছোট করিয়া কবুতরের লেজের মত করিয়া রাখে। ইহা হইতে এই সব হাদীসে নিষেধ করা হইয়াছে।

ফিকাহবিদ আতা বলিয়াছেন, কেহ যদি তাহার দাড়ি ছাড়িয়া দেয় এবং উহার কোন দিক দিয়া কোন অংশ না কাটে, তাহা হইলে উহা এমন কুদৃশ্য ও জঘন্য রূপ হইবে, যাহাতে সে তামাসা ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়া পড়িবে। তিনি উপরে উদ্ধৃত আমর ইবনে শুয়াইব বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাজী ইয়ায বলিয়াছেনঃ

يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّهَا وَتَحْذِيْفُهَا وَاَمَّا الْاَخْذُ مِنْ طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا اِذَا عَظُمَتْ فَحَسَنٌ ـ بَلْ تُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِىْ تَعْظِيْمِهَا كَمَا يُكْرَهُ فِىْ تَقْصِيْرِهَا

দাড়ি কামানো, কর্তন ও দৈর্ঘ-প্রস্থ বৃদ্ধি পাওয়া অংশ ফেলাইয়া দেওয়া সাধারণতঃ মাকরূহ। তবে যদি খুব বড় হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার দৈর্ঘ-প্রস্থ হইতে ছাটিয়া ফেলা উত্তম বরং খুব বড় দাড়ি রাখায় দুর্নাম হওয়ার আশংকা, যেমন উহাতে খুব ছোট করায়ও এই আশংকা রহিয়াছে।

এই ব্যাপারে উপমহাদেশের আহলি হাদীস মুহাদ্দিসগণের মতের লোক দাড়ি একেবারেই না কাটা, না ছাটা, না কামানোর মত পোষণ করেন। তাঁহারা আমর ইবনে শুয়াইব বর্ণিত হাদীস কে দুর্বল বর্ণনা বলিয়া মনে করেন। অতএব ফিকাহবিদ আতার কথাও তাঁহারা সমর্থন করেন না। আর এক মুষ্ঠি পরিমাণ রাখার বিষয়েও তাঁহারা একমত নহেন। কেননা হাদীসের বিচারে সম্পূর্ণ ও অকর্তিত ভাবে দাড়ি রাখিয়া দেওয়া হাদীস মরফু, সহীহ সনদে বর্ণিত। আর হযরত ইবনে উমর ও আবূ হুরাইরা (রা) সম্পর্কে উপরে উদ্ধৃত কথা সাহাবীদের আমল اثار পর্যায়ের। আর প্রথম ধরনের হাদীস দ্বিতীয় ধরনের হাদীসের উপর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য সব সময়ই। تحفة الاحوذي، فتح الباري، نووي

নাভির নিম্নস্থ পশম কামানো

মোচ ও নখ কাটা সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বিশেষ তাকীদ করিয়াছেন। এই কাজের জন্য সময়—মিয়াদ—নির্ধারণ পর্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছেঃ

أَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً تَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ

রাসূলে করীম (স) মুসলমানদের জন্য নখ ও মোচ ও মোচ কাটা ও নাভির নিম্নদেশস্থ পশম কামানোর সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। চল্লিশ রাত্র।

অর্থাৎ বেশীর পক্ষে চল্লিশ দিনে এক বর এই কাজ অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, এই কাজ কয়টি করার জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহার আসল অর্থ, যখন এই গুলি স্বাভাবিক সীমা লংঘন করিবে, যখনই ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে, তখনই এই কাজ করিতে হইবে।

এই পর্যায়ে একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (بيهقى)

রাসূলে করীম (স) প্রতি শুক্রবার দিন তাঁহার নখ ও মোচ কাটা পছন্দ করিতেন।

এই হাদীসটি মুরসাল। আবূ জা'ফর আল বাক্কের তাবেয়ী সাহাবীর নাম ছাড়াই সরাসরি রাসূল সম্পর্কে এই কথা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস অবশ্য ইহার সমর্থনে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার সনদ দুর্বল। কামাইয়া ফেলা চুলও কাটিয়া ফেলা নখ কি দাফন করিতে হইবে? এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) হইতে কোন বর্ণনা কি প্রমাণিত হইয়াছে? ইহার জওয়াবে বলা যায়, রাসূলে করীমের একটি কথা এই ভাষায় বর্ণিত হইয়াছেঃ

قَصُّوا أَظْفَارَكُمْ وَادْفِنُوا أَقْلاَمَكُمْ وَنَقُّوا أَبْرَاجَكُمْ (ترمذى)

তোমরা তোমাদের বাড়তি নখ কাটিয়া ফেল, কর্তিত জিনিস গুলি মাটিতে পুতিয়া ফেল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াস্থান গুলি ডলিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখ।

কিন্তু হাদীস বিশারদদের মতে এই হাদীসটির সনদ শক্তিশালী নয়। তবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইহা করিতেন বলিয়া ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) উল্লেখ করিয়াছেন।

বস্তুত স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা পর্যায়ে উপরে উদ্ধৃত হাদীসসমূহে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, ইসলামী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে উহার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং কোন মুসলমানের পক্ষেই এই কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

রাসূলে করীম (স.) বলিয়াছেন :
আল্লাহ্ তা'আলা সেই লোকের
মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত
করিবেন, চির সবুজ চির তাজা
করিয়া রাখিবেন, যে আমার
কথা শুনিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিবে
কিংবা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত
রাখিবে এবং অপর লোকের
নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবে।
জ্ঞানের বহু ধারকই প্রকৃত জ্ঞানী
নহে, তবে জ্ঞানের বহু ধারক
উহা এমন ব্যক্তির নিকট
পৌঁছাইয়া দেয়, যে তাহার
অপেক্ষা অধিক সমঝদার।
—আবূ দাঊদ
খায়রুন প্রকাশনী